তপোভূমি নর্মদা

চতুর্থ খণ্ড

লেখক-পরিচিতি

দি বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটুট-এর ডিরেক্টর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় বহু অধীতী সুপণ্ডিত, বেদাধ্যায়ী শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল ১৯২৮ সালের ৫ই মার্চ দোল-পূর্ণিমার দিন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কালিয়াড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ৺শশীভূষণ ঘোষাল ও মাতা ৺প্রভাবতী দেবীর ইনি মধ্যম পুত্র।

পিতার ইচ্ছানুসারে বেদাধ্যয়ন ও 'ভারতকে জান' এই আদেশ শিরোধার্য করে কৈলাস, মানস-সরোবর, শতপন্থ, কেদারবদ্রীসহ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ চারবার পরিভ্রমণ করেন।

১৯৫৭ সালে প্রথম গ্রন্থ 'আলোকতীর্থ' প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে তিনি বেদ-বিরোধী মূর্তিপূজা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণাদি খণ্ডন করেন এবং নূতন আলোর পথ দেখান।

রক্ষণশীল এবং গোঁড়া পণ্ডিতসমাজ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে এই গ্রন্থের প্রতিবাদে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করলেও বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক শ্রীজগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ, মনীষী চিন্তানায়ক শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ, এই সৎ প্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

তথাকথিত পণ্ডিতসমাজের সমালোচনার এবং অপযুক্তির অক্ষরশঃ খণ্ডন করেন 'আলোক-বন্দনা' (১৯২৮) নামক দ্বিতীয় গ্রন্থে।

পিতামাতাই শিব-শিবানী—প্রত্যেকের জীবনে পিতামাতাকেই আরাধ্য দেবতা হিসাবে পূজা করা উচিত—এই তত্ত্বই প্রকাশ করেন তাঁর 'পিতরৌ' (১৯৫৭) গ্রন্থে।

ঋষি-পিতার শেষ আদেশানুসারে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে নর্মদার উৎসস্থল মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক থেকে গুজরাটের ভৃগুকচ্ছ [যেখানে নর্মদা সমুদ্রে গিয়ে মিলেছেন] পর্যন্ত উভয়তট নগ্নপদে পরিক্রমাকালে যেখানে যা দেখেছেন তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন তাঁর এই 'তপোভূমি নর্মদা' গ্রন্থে। কয়েক খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই গ্রন্থে রয়েছে উচ্চকোটি সাধু-

মহাত্মাদের সাধন-পথ, শ্বাপদ-শঙ্কুল গভীর অরণ্যের পথঘাট ও আরও সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেক রচনার মধ্যে রয়েছে Science In The Vedas. বেদান্ত-সার, পাতঞ্জল যোগ-দর্শন, বৈদিক ভারত, প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিদ্যা প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থ।

১৯৫৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১২টায় পিতৃপক্ষের পূণ্যক্ষণে সমাধিস্থ হয়ে লেখক শিবতনু প্রাপ্ত হন।

গ্রন্থসূচী

পৃষ্ঠা ১—৩৯১

মহেশ্বরের পথে যাত্রা—মহেশ্বর ও অহল্যাবাঈ-এর সমাধি মন্দির দর্শন—মার্কণ্ডেয় যোগাশ্রমে স্থিতি—মহেশ্বরের সান্ধ্য-আরতি—যোগাশ্রমে তুরীয়জী কর্তৃক হঠযোগ ব্যাখ্যা, রাজা ভর্তৃহরি ও বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরির জীবন ও শাস্ত্র আলোচনা এবং সুমিষ্ট ভজন গান—ডাঃ বংশীলালজীকে চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ দান—মহেশ্বর ত্যাগ—খলঘাটে ঘাটলিঙ্গী মহাদেব দর্শন ও কমলভারতীজীর সম্প্রদায়ের সঙ্গে শূলপাণি অভিমুখে যাত্রা—যতীন্দ্রভারতীর সঙ্গে আলাপ—যতীন্দ্রভারতী কর্তৃক মোহান্ত নগেন্দ্রভারতীজীর সঙ্গে পরিচয়—মোহান্তজীর সরল ও সহৃদয় ব্যবহার—শূলপাণির ঝাড়িতে ধর্মপুরীর দ্বীপে কালেশ্বর ভৈরবের মন্দিরে অবস্থান—ভীলদের আচার-আচরণ ও ইতিহাস আলোচনা—সহস্রলিঙ্গ কালেশ্বর ভৈরবের আরতি—যতীন্দ্রের সুমিষ্ট গান—মোহান্তজীর ভাব-সমাধি—হবন—বিভিন্ন শিবলিঙ্গের স্বরূপ বর্ণনা—রাক্ষসদের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে শাস্ত্র আলোচনা—কালেশ্বর মন্দির ত্যাগ—প্রকৃতির নৈসর্গিক দৃশ্য—নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব দর্শন—রোশনলালের নৌকাতে চিতাবাঘের আক্রমণ—ভীলদস্যু কর্তৃক লুটপাট—বড়বাণীর ব্যারাকবাড়ীতে অবস্থান—জ্যোতিষচর্চা—নিশারপুরে ঘনঘোর জঙ্গলে মশাল-মিছিল—পাইথন কর্তৃক বৃদ্ধ ভীলকে আক্রমণ ও উদ্ধার—পল্লীবাসীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন—মাণ্ডবগড় কেল্লার পথে যাত্রা—আক্রমণোদ্যত কালো চিতার দল—অগ্নি প্রাকারের মধ্যে রাত্রিবাস—মহাত্মা সোমানন্দের আবির্ভাব—কালো চিতার পলায়ন—রক্ষা—মোহান্তজীর মুখে ওঘবতীর কদর্য উপাখ্যান—দলত্যাগ—ভীল পল্লীতে আশ্রয়লাভ—আথিতেয়তা—লছুর সঙ্গে হাতনোরার উদ্দেশ্যে যাত্রা—মোহান্তজীর সঙ্গে মিলন—বামদেব মহাদেবের আরতি—মোহান্তজীর সমাধি—মানসঙ্গম, বড়ালদা, সিমরদা পেরিয়ে অকালবাড়ায় প্রবেশ—করপাত্রীবাবার দর্শনলাভ ও তাঁর উপদেশ দান—অকালবাড়া ত্যাগ ও কোটেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা—আগ্নেয়লিঙ্গ কোটেশ্বরের পূজা—কোটেশ্বরের মন্দিরে ভীলদের আক্রমণ—করপাত্রীজীর আবির্ভাব ও ভীলদের হাত হতে প্রাণরক্ষা—করপাত্রীজীর

সঙ্গলাভ ও শাস্ত্রার্থ আলোচনা—করপাত্রীজীর যোগ-বিভূতি—করপাত্রীজী কর্তৃক রতনভারতীর মন্ত্রহরণ ও পুনরায় মন্ত্র-জাগরণ—পিতৃপুরুষের তর্পণ—বেদবতী আশ্রমের শাশ্বতী মায়ের গল্প—মহাভারতের গল্প—শাশ্বতী মায়ের আগমন ও খিঁচুড়ী ভোগ প্রদান—হাপেশ্বর জঙ্গলে প্রবেশ—মেঘনাদ তীর্থ দর্শন ও বর্ণনা—ধর্মরায়ের মন্দিরে রাত্রিবাস—হিরণ্যাক্ষতীর্থ—যমের তপস্যা-ক্ষেত্রে যম সম্বন্ধে আলোচনা—হিরণফাল—ভয়ঙ্কর ঝাড়ি-সুড়ং শুরু—কাঁটা ফুটে সাতজন নাগা চলৎশক্তিহীন—পথে চরম দুর্ভোগ—সাপের উপর অব্যর্থ বেদমন্ত্রের প্রয়োগ—ঋষিক্ষেত্র হাতনী সঙ্গমের ধর্মশালায় অবস্থান—মানসপটে প্রলয়দাসজীর আবির্ভাব ও ভর্ৎসনা—কপালীবাবার সেবা ও আতিথেয়তা—বিশ্ববারা ও স্বয়ংপ্রভার সিদ্ধিস্থান দর্শন—কপালীবাবার জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র আলোচনা, সরস্বতীর স্বরূপ ও বিভিন্ন ক্ষণের বর্ণনা—সকলকে লুকিয়ে মোহান্তজীর পিতৃ-তর্পণ—বৃষাকপি রুদ্রের আরতি—কপালীবাবার কাছে গ্রামের বুড়ী শীতলার বর্ণনা—একাদশ রুদ্রের স্বরূপ—এগারটি ডুংরি অতিক্রম—হাপেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণে স্থিতি—বিস্ময়কর হাপেশ্বর লিঙ্গ দর্শন—পুনরায় করপাত্রীজীর দর্শনলাভ ও করপাত্রীজী কর্তৃক প্রত্যেকের হৃদয়ে স্ব স্ব গুরুর প্রকাশ—বানপক্ষ সঙ্গম—পাগলী ঘাট ও পাগলী মার প্রসঙ্গ মাকড়খেড়ার জঙ্গলে রাত্রিবাস—পুষ্করিণী তীর্থ—সবিতা হিরণ্যপাণির ব্যাখ্যা ও হিরণ্যপাণি মহাদেবের আরতি—মোহান্তজীর ভাব-সমাধি—জ্যোৎস্না আলোকিত রাত্রে নর্মদাতটে অলৌকিক দৃশ্য দর্শন—পথে বাঘ ও মহিষের লড়াই—আদিত্যেশ্বর মন্দির—সুদর্শন ঝাড়ুকাজীর সুমিষ্ট মীরার ভজন ও মীরার জীবনী আলোচনা—আদিত্যেশ্বর মন্দির ত্যাগ।

তপোভূমি নর্মদা

ওঁ

॥ হর নর্মদে হর ॥

মণ্ডলেশ্বর অতিক্রম করে আমি ভাল রাস্তা পেলাম, যেন সমতল অঞ্চল দিয়েই আমি হাঁটছি। বামদিকে নর্মদা বয়ে চলেছেন। ডানদিকে সুউচ্চ বিন্ধ্যপর্বত। বিন্ধ্যপর্বতের দিকে তাকালেই দুরাবগাহ ঘন অরণ্য চোখে পড়ছে। কিন্তু আমার এই চলার পথে তেমন কোন জঙ্গল নেই। মনে হচ্ছে যেন আমি সমতলভূমির উপর দিয়েই হাঁটছি। সমতলভূমির দুধারে যেমন গাছপালা থাকে তেমনি এখানেও তেমন কিছু সেগুন, করঞ্জা, পেয়ারা, কাঁঠাল এবং নাম-না-জানা কিছু কিছু বন্যবৃক্ষ যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। রাস্তার কাছে এবং রাস্তা হতে দূরে অনেক ঘরবাড়ীও চোখে পড়ছে।

—আপ্ ভেইয়া কিধর যায়েঙ্গে? আপ্ নর্মদা মাইয়াকো পরকর্ম্মা কর্ রহে হো?

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম, শিখা উপবীতধারী সদ্যস্নাত এক ব্রাহ্মণ নর্মদার ঘাট থেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন।

আমি অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিলাম—জী হাঁ।

তিনি নর্মদার ঘাট থেকে উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—লেকিন্ আপ্ নাহি জানতে হো, মায়ীকো ডাহিনে তরফ রাখকে পরকর্ম্মা কী বিধি হো। যো সাধু রুণ্ডা পরকর্ম্মা করতা হৈ, উহ্ সদৈব দক্ষিণতট্‌সে পরকর্ম্মা উঠাতা হৈ। কেঁওকী দক্ষিণতট্‌সে পরকর্ম্মা করনেসে নর্মদামাতা ডাহিনে তরফমেঁই রহতা হৈ। ফিন্ ব্রোচসে উত্তরতট পরকর্ম্মা করনেসে 'নর্মদা হরবখৎ ডাহিনা তরফমেঁই রহতা হৈ। আপ্ কোঈ জমাত্ কা সাথ পরকর্ম্মা করনেসে আপ্‌কো গলতি নেহি হোতা থা।

—আপ্‌কো উপদেশকে লিয়ে বহুৎ সুক্রিয়া জানাতা হুঁ। লেকিন্ লেড়কা যব্ মায়ীকো প্রণাম করতা হৈ, উহ্ আপনা মায়ীকো ডাহিনেসে, বাঁয়াসে,

আগলিসে, পিছলিসে সব তরফসে প্রণাম নিবেদন কর্ সকতে হৈ কি নেহি? হম্ সাধু নেহি হৈ, হম মায়ীকী এক অবোধ লেড়কা হুঁ। হম্ অন্তরসে জানতা হুঁ, হম্ সচ্ মুচ সবিশেষ বিধিসে পরকর্ম্মা করনেকে লায়েক নেহি। ইসীওয়াস্তে মাতাজীকো হার্দিক প্রণাম নিবেদন করতা হুঁ।

হমারা ভাবনা এহি হ্যায়। এহি শোচতে শোচতে যা রহেঁ—নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্থে, নমোঽস্তুতে সর্বত এব সর্ব (গীতা ১১।৩৯)। এ মায়ী! তুমহারা সামনেমেঁ প্রণাম, পশ্চাৎমেঁ প্রণাম, তৃতাপ সর্বব্যপ্তা; ইস্‌লিয়ে পরকর্ম্মা কি ঢংসে সর্বহি দিক্‌সে প্রণাম করতা হুঁ।

এই বলে আমি ব্রাহ্মণকে নমস্কার জানিয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম নিজের পথে। আমি মনে মনে প্রলয়দাসজীকে স্মরণ করে বলতে লাগলাম, তুমি ত সর্বদর্শী, তুমি চেয়ে দেখ, আমি তোমার প্রথম উপদেশ 'হাস বোল্ খাপা নহো কিসীসে' একথা রক্ষা করতে পেরেছি কিনা! আমি ব্রাহ্মণের কথায় বিন্দুমাত্র ক্ষেপে উঠিনি, হেসেই কথা বলেছি!

যতদূর এগিয়ে যাচ্ছি, সমতলের শোভা একই রকম। ধরণীর উচ্চাবচ ভূমিরেখা এখানে সুপরিস্ফুট, বন তাদের ঢাকেনি, কোথাও দু'এক ঝাড় পাহাড়ী বাঁশ, কোথাও অদূরের শৈলশ্রেণী থেকে ছোট ছোট ঝরণা বয়ে চলেছে বন্ধুর উপলাস্তৃত পথে, কোথাও বা দেখা যাচ্ছে দূরে দু'একটা বন্যগ্রাম। এর আগেও দু'একবার যা মনে হয়েছিল এখনও মনে হল, কি হবে পরিক্রমার কষ্ট সয়ে, এই অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্যে নর্মদার কোলে একটা পর্ণকুটীর বেঁধে রয়ে গেলে কেমন হয়! সন্ধ্যায় এই স্থান নিশ্চয়ই শান্ত তপোবনের মত হবে। নর্মদার জল ও গাছের ফল খেয়ে শৈবাগমের সাধনায় ডুবে গেলে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হওয়ার মত জীবনের স্বর্ণফসল নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু সংগ্রহ করে উঠতে পারব। আর তা যদি নাও হয়, তবুও নর্মদার কলকল্লোলে, পাহাড়ী বেণুবনের ছায়ায়, নৈশ বাতাসে কীচকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বাঁশি বাজবে, পর্ণকুটীরে শুয়ে শুয়ে নিস্তব্ধ নিশীথে তা শুনবো আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে।

হঠাৎ একটা গাছের শিকড়ে ঠোক্কর খেয়ে সতর্ক হলাম। সতর্ক হলাম মনেও। মনের উদাস ভাবের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি হানলাম, রান্না করা ত দূরের কথা, উনুন ধরাতেই জানিস্ না, এখনও অন্নগত প্রাণ, পেটে

যখন ক্ষুধার আগুন জ্বলবে তখন এই নির্জন কুটীরে বসে সাধন-ভজন করার সখ কতদিন বজায় থাকবে? আগে সংকল্প রক্ষা, পরিক্রমার শপথ রক্ষা করা তারপর অন্য কথা।

কতটা যে পথ হাঁটা হয়ে গেল বুঝতে পারছি না। বেলা বোধহয় দশটা বাজতে যায়। যত মন্থর গতিতে হাঁটি না কেন, তিন মাইল নিশ্চয়ই হেঁটে ফেলেছি। মাদলের শব্দ কানে ভেসে আসছে। মিনিট দশেক হাঁটার পরেই দেখি রাস্তার কিছুদূরেই খাওয়া এবং ধূসর বর্ণের মহরীন্ গাছের তলায় একদল মেয়ে পুরুষের জটলা। অনুমান করলাম, এখানে হাট বসেছে। হাট এদের কাছে একটা দেখবার মত জিনিষ! গোঁড়, ওয়াঙ্কি, ভীল সবাই এখানে দল বেঁধে ভাল সাজগোজ করে হাটে আসবেই। হাট এদের কাছে উৎসবের জায়গা। এখানেই সাতদিন পরে পাঁচ গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে দেখাশোনা হয়, গল্পগুজব হয়, তাই হাটবারটা এদের কাছে একটা আমোদের দিন। আদিবাসী পুরুষদের প্রায় সকলেরই হাতে তীর, ধনুক, গোঁড়, ছত্রী প্রভৃতি পুরুষদের হাতে বড় বড় মোটা মোটা লাঠি বা টাঙ্গি। তীর ধনুক বা লাঠি-টাঙ্গি হাতে না নিয়ে এদেশের মেয়ে পুরুষ কেউ পথে চলে না। ওয়াঙ্কি ভীল প্রভৃতি জাতের মেয়েদের বেশও বিচিত্র। তাদের চুলে প্রচুর করঞ্জার তেল, খোঁপা টিলে ও বাঁকা, তাতে বুনো ফুল গোঁজা।

আমি হাটের দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে 'মহেশ্বর আর কতদূর' এই কথা জিজ্ঞাসা করার অজুহাতে উঁকি মেরে দেখে এলাম হাটে বিক্রী হচ্ছে বীচিওয়ালা হলদে ও সাদা রং এর বেগুন, টোম্যাটো, পেঁয়াজ, শুঁটকী মাছ, কুমড়ো, ভাণ্ডা, মকাই, জেঁাদা অর্থাৎ নালসে পিঁপড়ার ডিম, বাখর অর্থাৎ মদ তৈরী করবার মত মসলা, দেখতে কদমার মত; মাটির হাঁড়িকুড়ি, মহুয়ার তেল, করঞ্জার তেল, তাঁতে তৈরী মোটা কাপড় ও গামছা। হাটের একপাশে মাদল বাজছে। মেয়ে পুরুষ পরস্পরের কোমর জড়াজড়ি করে গোলাকারে নাচছে, তাদের মাঝখানে ঠ্যাঙে ছুরি বাঁধা দুটো লড়াকু মোরগের ঝটাপটি চলছে।

হ্যাঁ, এই মুরগীর লড়াই একটা আকর্ষণের বস্তু বটে এদের জীবনে। সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে সাঁওতালদেরকেও দেখেছি, এখানে নর্মদাতটে পরিক্রমাপথে গাড়াসরাইতেও দেখে এসেছি,

আদিবাসীরা মুরগী লড়াই দেখে প্রচুর আনন্দ ও উন্মাদনা অনুভব করে। হাটে এসে কেনাবেচা, ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকা রোজগার—এসব জীবনের অতি তুচ্ছ জিনিষ। এর কি দাম আছে জীবনে। আসল জিনিষ হল মুরগীর লড়াই!

আমি হাট থেকে উঠে এলাম বড় রাস্তায়। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলাম—এহি মহল্লাকী নাম ক্যা? উত্তর এল মাজনা দাদার।

—মহেশ্বর ঔর ক্যাতনা দূর বা?—'করীব দো মিল'।

লোকটি শুধু মহেশ্বরের দূরত্ব বলেই ক্ষান্ত হল না, ঝটপট্ নেমে পড়ল নর্মদার জলে। এক হাঁটু জল পর্যন্ত নেমে আমাকেও ইশারা করল সেখানে নেমে যেতে। আমি রাস্তার উপর গাঁঠরী ফেলে দিয়ে মা নর্মদার জল মাথায় ছিটিয়ে, প্রণাম করে এগিয়ে গেলাম লোকটির কাছে। আমাকে আঙুল বাড়িয়ে দূরে পশ্চিমদিকে তাকাতে বলল। ভাল করে দৃষ্টি দিতেই জঙ্গলাকীর্ণ নর্মদাতটেই তিন চারটি মন্দিরের চূড়া এবং কয়েকটি সুউচ্চ অট্টালিকা চোখে পড়ল। লোকটি 'জয় মহেশ্বর, জয় মহেশ্বর' বলে যুক্ত করে মহেশ্বরের উদ্দেশে দণ্ডবৎ জানাল। কমণ্ডলুতে জল ভরে উঠে এলাম রাস্তায়। এই সময় লোকটি আমাকে খুব কাকুতি-মিনতি করে জানাল—আপ পরকরমাকারী সাধু হো। হমারা পাঁচ বরষ্ কা লেড়কা আজ পাঁচ মাহিনা ভারী বিমারমেঁ হ্যায়। দাবাবুটিসে কুছ্ হোতাই নাই। আপ্ মুঝে কুছ্ আচ্ছা দাবা দিজিয়ে। মেরে নাম মদনলাল বদ্‌রী।

আমি ভাবলাম, সাধারণ সরলপ্রাণ গ্রাম্য এই পাহাড়ী লোকটির কোন দোষ নেই। সাধুর বেশে থাকলেই ভক্তলোক তাকে সাধু বলে ভেবে নেয়। আর সাধু যদি হন, তাহলে তাঁর কোন সিদ্ধাই থাকবে না, তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারবেন না কিংবা দাবাইবুটি করতে পারবেন না একি কখনও সম্ভব? শুধু এখানে নয়, সারাভারত জুড়ে সাধারণ লোকের এই বদ্ধমূল ধারণা। শুধু এখন নয়, প্রাচীনকাল থেকে ধর্মধ্বজী তথাকথিত সাধুবেশধারী লোকরা পয়সা রোজগারের ফিকিরে নানাবিধ কলাকৌশল শিখিয়ে আসছেন। সেইজন্যই ত কবীর সাহেব ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—

চাঁড়া করুঁ চাঁপড়া করুঁ করুঁ দাবাই বুটি,
সহজে মহন্তাই মিল গয়া, কৃষ্ণ প্রেম গঈ ছটি।

মহাফাঁপরে পড়লাম। তার হাতে দেখছি রুদ্রাক্ষ ও তিন চারটে মাদুলি বাঁধাই আছে। কাজেই রুদ্রাক্ষ দিয়ে কোন লাভ নেই। আমি তাকে ভাল করে বুঝিয়ে বললাম—আমি সাধু নয়, দাবাবুটি কিছুই জানি না। তুমি মহেশ্বরে বা অন্য কোথাও হতে পাশকরা ডাক্তারের কাছ হতে 'দাবাই' এনে ছেলের চিকিৎসা কর, মহেশ্বরের কৃপায় সে সেরে উঠবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আমার গায়ে আলখাল্লা, হাতে কমণ্ডলু, সাধু নই বললেই হল! সে সহসা আমার পা দুটো চেপে ধরল। অগত্যা তার হাত হতে রেহাই পাবার জন্য আমি ঝোলা হাতড়ে ধাবড়ীকুণ্ডে পাওয়া একটি সুদৃশ্য স্ফটিক লিঙ্গ তার হাতে দিলাম। বললাম, ইনি সর্ববিঘ্ন বিনাশন। এঁর নিত্যপূজা করে স্নানজল বাচ্চাকে খাওয়াতে থাক। আশা-করি, এঁর দয়ায় তোমার সন্তান সেরে উঠবে। ডাক্তাররা যে চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন, সেও এঁর কৃপাতে। কাজেই তাঁদের দেওয়া দাবাবুটি মহেশ্বরেরই আশীর্বাদ বলে জেনে যথাবিধি চিকিৎসা করাও তাতে মহেশ্বর তুষ্টই হবেন।

আমার কথা লোকটির কর্ণগোচর হল বলে মনে হল না। সে তখন দরবিগলিত অশ্রু হয়ে স্ফটিক লিঙ্গকে বুকে চেপে ধরে বিড়বিড় করে কি বকে যাচ্ছে। এই লোকটিই আমাকে জলে নেমে সর্বপ্রথম মহেশ্বরের মন্দির দেখাল, কাজেই ধ্বজা দর্শনী স্বরূপ শিবলিঙ্গটি দিয়ে তৃপ্তি পেলাম; আরও এই ভেবে শান্তি পেলাম যে এই দুর্লভ শিবলিঙ্গ একজন প্রকৃত ভক্তের হাতেই পড়ল। ভক্তকে আপনভাবে থাকতে দিয়ে আমি গাঁঠরীটি বগলে নিয়ে হাঁটা সুরু করলাম। সুন্দর পাথরের রাস্তা সোজা চলেছে মহেশ্বরের দিকে। পথের ধারে যত্রতত্র ঘরবাড়ী রয়েছে। পথচারী ও সাইকেল আরোহীরও অভাব নেই। রাস্তার দুধারেই শাল, সেগুন, অশ্বত্থ, বেল, অঞ্জন ধাওয়া ও আমলকী গাছ চোখে পড়ছে। আমি নিরুদ্বেগে হেঁটে চলেছি ইন্দোরের হোলকার বংশের মহারাণী শিবতপস্বিনী অহল্যাবাঈ-এর পুণ্যজীবন অনুধ্যান করতে করতে।

মহারাষ্ট্রের গৌরব ছত্রপতি শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র শাহু চিৎ-পাবন ব্রাহ্মণ বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র বাজীরাওকে নিযুক্ত করেছিলেন পেশোয়া রূপে। সেই পেশোয়া বাজীরাও একবার ছদ্মবেশে তীর্থ পর্যটনে

বেরিয়ে ইন্দোরের কাছাকাছি গোধূলিয়া গ্রামে এসে তিনি নদীর উত্তাল তরঙ্গ দেখে কিভাবে তা অতিক্রম করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। জলের তলায় সূঁচালো পাথর, মাঝে মাঝে দহ, সেই দহগুলো আবার বিষাক্ত সাপে ভর্ত্তি। এমন সময় তাঁর কাছে একটি লোক এসে বলে—আমার নাম মলহর ভৈঁসওয়ালা। হোলকার গোষ্ঠীর মারাঠা, বিদর্ভে বাড়ী ছিল আগে। বিজাপুরী সুলতান ফৌত হওয়ার পর আমাদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে নেয় মুঘলেরা। পালিয়ে এসে এখানে কিছু জমি কিনে, ভৈঁস পুষে দিন গুজরান করছি। এখানকার মুঘল চৌকিতে দুধ দিতে গিয়ে আমি দেখে এসেছি জনাকুড়ি মুঘল সৈনিক রওনা হচ্ছে আপনাকে ধরতে। আপনার পরিচয় তারা জেনেছে। আসুন, আমি আপনাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান দিয়ে নদীর অপর পারে পৌঁছে দিই। মলহর পেশোয়াকে পথ দেখিয়ে জল পেরিয়ে যেখানে এসে উঠেছিল, সে জায়গাটা সংকীর্ণ, তার দুই দিকে খাড়া পাহাড়; ঠিক যেন একটা স্বাভাবিক গিরিবর্ত্ম। পেশোয়া নদীর এপারে এসেই দেখতে পেলেন মলহরের কথাই ঠিক। জনাকুড়ি সশস্ত্র মুঘল সৈনিক তখন নদীর উল্টো কূলে জলের মধ্যে নেমে পড়েছে। মলহর নতজানু হয়ে বলল—পেশোয়া আপনাকে চিনেছি, আপনি ছুটে পালান, বাড়তি তরোয়াল যদি একখানা থাকে, তাহলে দিয়ে যান আমাকে। দরকার হলে, আমি ওদের রুখব যতক্ষণ পারি। আপনার জীবনের অনেক দাম। আপনার জন্য যদি আমায় জীবন দিতে হয়, কর্তব্যবোধেই দেব। আজ আমি ভৈঁস চরাই, কিন্তু দেহে আমার সৈনিকেরই রক্ত। কর্তব্যসাধনে রক্তদানই ত সৈনিকের কাজ! আপনি যান, নিজে বাঁচুন, মারাঠাজাতিকে বাঁচান।

পেশোয়া নিজের তারোয়ালটি মলহরের হাতে দিয়ে বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় নিলেন। মুঘল সৈনিকরা মলহরের কাছাকাছি তখন পৌঁছে গেছে। কিন্তু সংকীর্ণ ঘাঁটিতে একাধিক সৈনিকের একসঙ্গে তারোয়াল চালানো সম্ভব নয়। এক-একজন করে এগিয়ে আসে, আর মলহরের তারোয়ালে ঘায়েল হয়ে পড়ে যায় জলে। সাপেরা অমনি ভেসে উঠে ছেঁকে ধরে হতাহত সৈনিকদেরকে। পরপর পাঁচটি সৈনিকের এইরকম দশা দেখে বাকী সৈন্যরা গালি দিতে দিতে পিছন ফিরল। তারা ফিরে গিয়েই চড়াও হল মলহরের

বাড়াতে। স্ত্রী-পুত্র হল নিহত, তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তার ভৈঁসের পালকে তাড়িয়ে নিয়ে তুলল নিজেদের চৌকিতে। মলহরের জমি জায়গাও বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

বিপদের এই বন্ধুকে ভোলেননি বাজীরাও। সর্বহারা মলহরকে নিজে সন্ধান করে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। উত্তরকালে সেই ভৈঁসওয়ালা মলহর পরিচিত হয়েছিলেন ভারত ইতিহাসের অন্যতম কৃতি পুরুষরূপে। ইন্দোরে হোলকার রাজবংশের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। আর মহীয়সী অহল্যাবাঈ হলেন তাঁরই পুত্রবধূ।

আমাদের গ্রামের মধ্যস্থল দিয়ে গেছে অহল্যাবাঈ রোড। কাজেই শিশুকাল হতেই তাঁর পুণ্যনাম শুনে আসছি। কিশোর বয়সে যখন স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে তাঁর কথা পড়তাম, তখন বাবা ইতিহাসের বই-এ তাঁর ছাপানো ছবিটিকে দেখিয়ে বলতেন—এই মহীয়সী মহিলার কথা চিরকাল মনে রাখবি, ইনি হলেন মর্ত্যের শংকর কন্যা! এঁর দয়া ও দানের, বিশেষতঃ অনন্য শিবনিষ্ঠার কোন তুলনা হয় না। মলহর রাওএর পুত্র খান্দেরাও-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু অসংযম ও বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে তাঁর অকালে মৃত্যু হয়। কাজেই অল্পবয়সেই অহল্যাবাঈ বিধবা হন। তাঁর একমাত্র পুত্র মালেরাও তখন শিশু। সেই একমাত্র পুত্রও যৌবনে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিবগতপ্রাণা মায়ের সকল মহৎ আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে অনাচারী ও ব্যভিচারী হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত উন্মাদ অবস্থায় আত্মহত্যা করে। শোকের উপর শোক, তাঁর একমাত্র কন্যা বালবিধবা হয়ে সতীদাহের নিয়মানুসারে স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করে। তাঁর শ্বশুর মলহর রাওয়ের যখন দেহান্ত হয়, তখন অহল্যাবাঈ-এর বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর। সেই বয়সেই রাজ্যের শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে খল আত্মীয় স্বজনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। অন্য যে কেউ হলে এত শোকে দুঃখে পাথর হয়ে যেত, ভাবত যে ঠাকুরের নিত্য উপাসনা করেও যখন এত দুঃখ-শোক তখন সে ঠাকুরকে ডেকে লাভ কি? কিন্তু অহল্যাবাঈ ছিলেন প্রকৃত ভক্ত। তিনি জীবনের সকল শোক দুঃখকে মহাদেবের চরণে পুষ্পাঞ্জলির মত সমর্পণ করে শিবচিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন। মহাদেবের রাতুল চরণ আঁকড়ে ধরেই তিনি এত বিরুদ্ধ সংঘাতের মধ্যেও সুষ্ঠুভাবে

রাজ্য পরিচালনা এবং নিরন্তর কল্যাণযজ্ঞে ব্রতী থেকেছেন। রাজধানী ইন্দোর অহল্যাবাঈএর সৃষ্টি। তাঁরই সুশাসনে ইন্দোর রাজ্য ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠেছিল। আমার গন্তব্যস্থল মহেশ্বর তীর্থে তিনিই নাকি মহানগর স্থাপন করেছিলেন এবং বহু মন্দির, সুবিস্তৃত ঘাট তৈরী করে মহেশ্বরকে মধ্যপ্রদেশের বারাণসী করে তুলেছিলেন।

দয়া ও দান—এ দুটি শব্দের জীবন্ত মানবী বিগ্রহ ছিলেন অহল্যাবাঈ। লক্ষ লক্ষ দীন দুঃখী আতুর এবং সাধু সন্ন্যাসী তাঁকে ডাকতেন করুণাময়ী মা বলে। তাঁর জনহিতকর কার্য, দয়া এবং দান কেবল ইন্দোর রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মর্ত্যের এই শংকর-কন্যা সারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে অসংখ্য দেবমন্দির, বহু রাজপথ, জলাশয়, পান্থশালা, অন্নসত্র, সদাবর্ত এবং নদীতীরে স্নানঘাট নির্মাণ করে গেছেন। সহস্র সহস্র আতুর, ভিক্ষুক, সর্বহারা এবং সাধু মহাত্মাকে অন্ন বস্ত্র দান ছিল তাঁর দৈনিক ব্রত। গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির এবং কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির, উভয় মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া ও স্বর্ণকলস, অহল্যাবাঈ-এর অকৃপণ দানেই গড়ে উঠেছিল। এই নর্মদাতটের কত তীর্থকে যে তিনি জাগ্রত করে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। অমরকণ্টকে দেখে এসেছি তাঁর দানে নির্মিত আদি যাত্রী-নিবাস, এখন তার নাম অহল্যাবাঈ ধর্মশালা; জব্বলপুরে দুইদিকে মার্বলরকস্, মধ্যে প্রবহমানা নর্মদার স্ফটিক-পাহাড়ের উপর শ্বেত শিবলিঙ্গ স্থাপন করে ধর্মার্থীদের 'জলে হরি' পরিক্রমার সুযোগ তিনিই করে দিয়ে গেছেন। ওঁকারেশ্বরে বিষ্ণুপুরীর ঘাটে অমলেশ্বরের মন্দিরে আজ তাঁর দান ও ব্যবস্থাপনায় নিত্য বাইশজন ব্রাহ্মণ পনেরো হাজার আট শত সদ্য নির্মিত মৃন্ময় শিবলিঙ্গ পূজা করে জলে বিসর্জন দিয়ে চলেছেন। সেইসব ব্রাহ্মণ যাতে সপরিবারে স্বাচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন, তারও পাকা বন্দোবস্ত করে গেছেন তিনি……।

হঠাৎ চোখে পড়ল হাজারখানিক গরু গলায় ঘণ্টিবাঁধা, সমগ্র রাস্তা ঢেকে এগিয়ে আসছে। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। আমি রাস্তা থেকে নেমে একটা হরিতকী গাছের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে গরুর দল হাঁটছে ত হাঁটছেই। তারা রাস্তা থেকে সরে যেতেই রাস্তায় উঠে হাঁটা সুরু করেছি, এমন সময় চোখে পড়ল একটি একতলা পাথরের বাড়ী, খোলার ছাউনি। গেটে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। গেটের গায়েই একটি

সাইনবোর্ড, তাতে হিন্দীতে লেখা আছে—'পুলিশ-চৌকি, মহেশ্বর, জেলা ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ।'

আমি তাহলে এসে গেছি মহেশ্বরে। কনস্টেবল মহোদয়ের গলায় একটা মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা। বাবাজী, বোধহয় স্নান ও মন্দির দর্শন করে এসে রাজকার্যে ব্রতী হয়েছেন। তাঁকেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম—মন্দির কোন্ দিকে? সশ্রদ্ধভাবে তিনি একটি ছোট রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। ঘাটে এসে পৌঁছে গেলাম। লাল পাথর দিয়ে বাঁধানো এত বড় ঘাট আমি কল্পনাতেও আনতে পারিনি। এত বিশাল এর বিস্তৃতি এবং দৈর্ঘ্য যে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম। যতদূর চোখে পড়ছে, নর্মদাতট বড় বড় লাল পাথরে যেন মুড়ে দেওয়া হয়েছে। কাশীতে গঙ্গার ঘাটও বহুদূর পর্যন্ত, বাঁধানো সন্দেহ নেই, তবে এইরকম বড় বড় চওড়া লাল পাথরের বাঁধানো ঘাট কাশী ত দূরের কথা সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

ঘাটে অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, মহেশ্বর মন্দিরেও ভক্তের ভীড়। আরও তিন-চারটি মন্দির আছে, সেগুলিতে তত ভীড় নেই। আমি মহেশ্বর মন্দিরের সামনের ঘাটেই গাঁঠরী ঝোলা রেখে স্নান করতে নামছি এমন সময় এক সম্ভ্রান্ত যুবক আমাকে এসে বললেন যে আপনি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে মন্দিরে না গেলে এখন আর দর্শন পাবেন না। বেলা বারটা বাজলেই মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্নান করতে নামলাম। স্নান ও তর্পণাদি সেরে এক কমণ্ডলু জল নিয়ে মন্দিরে ঢুকলাম। এখানে দেখছি, দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের দাপট বেশী। তাঁরা কোন ভক্তকেই দু মিনিটের বেশী মহেশ্বরের অর্চনার জন্য সময় দিচ্ছেন না। শিবলিঙ্গটি চমৎকার মসৃণ। প্রায় দু'ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ, মাথায় একটি রূপার সাপ। আমি ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে মহেশ্বরের মাথায় জল ঢাললাম, তারপর প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। ঘাটে এসে দেখি, সেই ভদ্রলোক আমার গাঁঠরী ও ঝোলার কাছে বসে আছেন। আমি তাঁকে বললাম—ছিঃ ছিঃ আমার ঝোলা গাঁঠরী পাহারা দেবার জন্য এই রৌদ্রে আপনার অহেতুক বসে থাকার দরকার ছিল না। আমি পরিক্রমাবাসী। পরিধেয় আলখাল্লা, চাদর, কম্বল দু'চারখানা বই,

বড়জোর কয়েকটা রুদ্রাক্ষ ও শিবলিঙ্গ ছাড়া আর কি আছে? এই জিনিষ চোরেও ছোঁবে না।

—না, তার জন্য নয়, এখানে চুরি হয় না। তবে ঐ যে দেখছেন মহেশ্বরের বিশাল বিশাল ষাঁড়গুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা শিং-এ করে খাঁটাখাঁটি করত, হয়ত জলেও ফেলে দিতে পারত। তাছাড়া এই মন্দিরের পেছনের মহল্লাতেই আমার বাড়ী। এখন কোন কাজ নেই। আমি ডাক্তার। ভূপাল থেকে ডাক্তারী পাস করে এসে বাড়ীতেই চেম্বার খুলেছি। আজ বিকালে আমার চেম্বার বন্ধ। হাতে সময় আছে, আর সময় থাকলেই আমি এই সুন্দর ঘাটে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি। সে যাক্‌গে, আপনি মহেশ্বরকে দর্শন করলেন আর মহেশ্বরের প্রতিষ্ঠাত্রী দেবীজী অহল্যাবাঈএর সমাধি-মন্দির দেখবেন না? ঐ ত মন্দিরের পাশেই সমাধি-মন্দির দেখা যাচ্ছে।

আমি বললাম—নিশ্চয়ই দেখব, তবে দু'চার মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসছি। এই বলে আমি তাড়াতাড়ি ঘাটে নামলাম। মহেশ্বর দর্শনের তাড়ায় আমি মর্ত্যের এই শিবকন্যার উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে ভুলে গেছলাম। আমি ঘাটে নেমে তর্পণ করে এলাম। মন্দিরের পাশেই অহল্যাবাঈ-এর সমাধি-মন্দির। একতলা পাথরের বাড়ী, দরজা খোলাই আছে। ঘরের মধ্যে একটি প্রশস্ত বেদী। চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত তাঁর নরদেহের ভস্মাবশেষের উপর এই বেদী। বেদীর উপর একটি শিবলিঙ্গ। যিনি জীবনে বোধহয় বাইশ কোটি টাকা এবং মনখানিক সোনা দান করে গেছেন জনকল্যাণ ও ধর্মকার্যে, তাঁর সমাধি-মন্দির এতখানি আটপৌরে ও সাধারণ হবে ভাবতেও পারিনি। মনে বড় দুঃখ হল। সেই ডাক্তারবাবু আমাকে জানালেন—দেবীজী অহল্যাবাঈ-এর দেহান্ত হয়েছিল তাঁর এই প্রিয় মহেশ্বরেই। ভেতরে ঢুকে দেখুন, দেওয়ালে তাঁর একটি প্রতিমূর্তি খোদাই করা আছে। তাঁর ম্লান গম্ভীর মুখ, ললাটে অজস্র দুঃখ শোকের ছাপ, সর্বাঙ্গে স্তব্ধ বেদনার ছায়া; সন্নত দুই চোখে কিন্তু অপার করুণা ও মমতা যেন ঝরে পড়ছে। হাত দুখানি বুকের কাছে, বাম হাতের উপর ডান হাতটি ন্যস্ত, তাতে একটি শিবলিঙ্গ ধরে রেখেছেন। শিবগতপ্রাণা এই মহীয়সী দেবীমূর্তি যেন কৃতাঞ্জলি-পুটে মহাদেবের চরণে আর্তি জানাচ্ছেন—

প্রভু! দক্ষিণা লও আমারে
দিবার আমার নাই কিছু গো,
শুধুই তুমি আছ
মোর ভাণ্ডারে॥

স্মারক-মন্দির হতে বেরিয়ে এলাম। সেই ডাক্তারকে বললাম, আপনি এবারে আসুন, আমার নিত্যকর্ম কিছু বাকী আছে।

—আপকো ভিক্ষা তো আভিতক্ নাহি হুয়া। একটি বাড়ী দেখিয়ে বললেন—ওহি হ্যায় দেবীজীকা অন্নসত্র। রোজ পাঁচশো নারায়ণকো উধর সেবা মিলতি হ্যায়। আপ চলিয়ে হমারা সাথ। কোঈ অসুবিধা নেহি হোগা। অন্নসত্রকা পাশমেঁ ধর্মশালা ভি হ্যায়। দেবীজীনে প্রতিষ্ঠা কিয়ে থে, উধর্ রাতমেঁ আপ ঠার সকতে হৈ।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, খানা হমারা সাথমেঁই হ্যায়। আপ বেফিকর্ রহে। তিনি বললেন—হমারা নাম ডাঃ বংশীলাল দ্বিবেদী। সামকা বখৎ হম্ ফিন্ মিলেঙ্গে।

এই বলে তিনি চলে গেলেন। আমার তখন সত্যই খুব ক্ষুধা পেয়েছে। আমি নর্মদার ঘাটে গিয়ে ঝোলা থেকে কন্দমূল চিবিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলাম। আজ পর্যন্ত বহুলোকের ব্যবহৃত ধর্মশালায় রাত্রিযাপন কিংবা কোন অন্নসত্রে তথা লঙ্গরখানায় বহুলোকের সঙ্গে ভাত-রুটি ভক্ষণে আমার কোনদিন প্রবৃত্তি হয়নি। আমি ঝোলা গাঁঠরী ইত্যাদি মন্দিরের পেছনে নিয়ে গিয়ে চাতালের উপর কম্বল বিছিয়ে মহর্ষি তণ্ডিকৃত শিবস্তবের পুস্তিকাটি নিয়ে পাঠ করতে লাগলাম। রৌদ্রালোকিত মুক্ত আকাশের তলে এইরকম পরিচ্ছন্ন এইরকম ঝকঝকে বিশাল ঘাটে নর্মদার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলেই মন আপনা হতেই নিবিষ্ট হয়ে যায়। আমি নিবিষ্ট চিত্তে মহাদেবের স্তব করতে লাগলাম। আমার পাঠ শেষ হতেই তাকিয়ে দেখি, একটু দূরেই সেই ডাঃ বংশীলাল দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপ্ ফিন্ আগয়ে?

—কি করব বলুন, আপনি আমাদের দেশে পরিব্রাজনে এসে উপবাসে থাকবেন কিংবা একান্ত নিরাধার ও নিরাশ্রয়ের মত এখানে মন্দিরের চাতালে

পড়ে থাকবেন, এটা আমার মন মেনে নিতে পারছে না। সন্ধ্যার পর আমার চেম্বার খালি পড়ে থাকে, সেখানে রাত কাটালে নিজেকে ধন্য মনে করব। আপনার কথা আমার গুরুদেব তুরীয় ব্রহ্মচারীজীকে বলেছি। তিনি পরিক্রমাবাসীদের সেবা করতে ভালবাসেন। একটু দূরেই মার্কণ্ডেয় যোগাশ্রম। আমার গুরুদেবই সেই আশ্রমের অধ্যক্ষ। তিনিও আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।

—মার্কণ্ডেয় যোগাশ্রম বলতে কি সেই নর্মদা রহস্যের উদ্‌গাতা, নর্মদার মানসপুত্র মহামুনি মার্কণ্ডেয় প্রতিষ্ঠিত কোন আশ্রমের কথা বলছেন?

—না, না, সেই মহামুনি মার্কণ্ডেয় নন। আমাদের পরমগুরুদেব মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মচারীজীর কথা বলছি। তিনি ছিলেন নর্মদাতটের একজন প্রসিদ্ধ হঠযোগী। তিনি গৌরীশংকরজীর সঙ্গে নর্মদা তিনবার পরিক্রমা করেছিলেন। পরিক্রমান্তে শেষজীবনে এইখানে ঝোপড়া করে সমাগত সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহী নির্বিশেষে সকলকে হঠযোগের প্রক্রিয়া শিক্ষা দিতেন। তাঁর দেহান্তের পর তাঁর প্রধান শিষ্য আমাদের গুরুজী এই যোগাশ্রম স্থাপন করেছেন। তিনি এখানে হঠযোগের ষট্‌কর্ম ধৌতি, বস্তি, নেতি, নৌলী-ক্রিয়া ত্রাটক ও কপালভাতির শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আজ মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মচারীজীর জন্মতিথি। ভূপাল ইন্দোর প্রভৃতি স্থান হতে বহু গন্যমান্য শিষ্য-শিষ্যা আশ্রমে এসে সমবেত হয়েছেন। দেবীজীর ধর্মশালায় তাঁদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আপনি আশ্রমেরই একটি ঘরে থাকবেন গুরুজীর সঙ্গে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মনে মনে ভাবছিলাম এই কোলাহলের মধ্যে আমার যাওয়া ঠিক হবে কি না। এমন সময় ডাক্তার বলে উঠলেন—ওহো। গুরুজী খুদ্ আ গয়া। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি, পককেশ পক্কশ্মশ্রু এক জটাজুট বয়স্ক সাধু হাসিমুখে আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করতেই তিনি 'হর নর্মদে' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—আজ হমারা গুরুজীকা জন্মতিথি হৈ, পরিক্রমাবাসীকো হম্ ছোড়েঙ্গে থোড়ি। এই বলে আমার লাঠি কমণ্ডলু ও ঝোলা তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন। গাঁঠরীটা বগলদাবা করে নিলেন ডাক্তার বংশীলাল। মহেশ্বর-মন্দিরের

পশ্চিমদিকে প্রায় দু'শ গজ দূরে নর্মদার ধারেই এই আশ্রম। আশ্রমের সামনে বড় বড় সতরঞ্চি পাতা হয়েছে, একটা চৌকির উপর ফুল দিয়ে সাজানো দুটি বড় তৈলচিত্র—একটি মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মচারীজীর এবং দ্বিতীয়টি গৌরীশংকরজীর। চারপাঁচজন লোক কারবাইডে জলে এইরকম চার-পাঁচটি গ্যাসবাতি সন্ধ্যায় জ্বালার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। তুরীয় ব্রহ্মচারীজী আশ্রমবাড়ীর মধ্যে আমাকে নিয়ে তুললেন একটি ঘরে। আশ্রমবাড়ী বলতে ঠাকুরঘর সহ চারখানা ঘর। একটি প্রশস্ত ঘর যোগাভ্যাস শেখানোর জন্য। বাকী দুটি ছোট ঘর, একটিতে স্বয়ং তুরীয় ব্রহ্মচারীজী থাকেন, বাকী ঘরখানি আমার জন্য নির্দিষ্ট হল। ঘরে কম্বল বিছিয়ে বসতে না বসতেই একখানা রেকাবিতে পুরী লাড্ডু নিজ হাতে নিয়ে এসে তুরীয়জী বললেন—কৃপা করকে পা লিজিয়ে। আভি সূর্যাস্ত নাহি হুয়া, দের হ্যায়। আমি হাত জোড করে বললাম, হম্‌নে কন্দমূল পা লিয়া। আপ্‌ত পরিক্রমাকা নিয়ম জানতে হ্যায়, দো-দফে খানাকী হুকুম নেহি।

আমার উত্তর শুনেই তিনি কপালে হাত চাপড়ে বললেন হমারা নসীব মন্দা হৈ। গুরুজীকা জন্মতিথিমেঁ নর্মদামায়ী পরিক্রমাবাসীকো মিলা দিয়া, লেকিন উনকা সেবা করনেকা মোকা নেহি মিলা। লেকিন্ কাল সবেরেই আপ্‌কো ইধর ভিক্ষা লেনে হোগা। ভিক্ষা পাকর্ আপ ইধরসে যাত্র করেঙ্গে। মুঝে বাত দিজিয়ে।

বৃদ্ধ সাধুর আন্তরিকতা দেখে অগত্যা আমি কথা দিলাম। কিছুক্ষণ পরে বাইরে বেরিয়ে এসেই দেখি সূর্যাস্তের আর বেশী দেরী নেই। অস্তগামী সূর্যের ম্লান রশ্মি নর্মদার জলে পড়ে ঝিকমিক করছে। সেই মনোহারী দৃশ্যের বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নর্মদাঘাটের সেই দৃশ্য আমি চোখ ভরে, মন ভরে, উপভোগ করলাম। এদিকে দেখছি, যোগাশ্রমে এক এক করে ভক্তদের আগমন সুরু হয়ে গেল। আমি এগিয়ে গেলাম মহেশ্বরের মন্দিরের দিকে। সেখানে আরতির আয়োজন হচ্ছে। সন্ধ্যা হতেই পুরোহিত আরতি আরম্ভ করলেন। শিঙা ডম্বরু ও দামামা বাজতে লাগল। মহেশ্বরকে রাজপোষাকে সাজানো হয়েছে। লিঙ্গের মাথায় রৌপ্য মুকুট পরানো হয়েছে। মণ্ডলেশ্বরে, পণ্ডিত ভট্টনারায়ণ ভার্গবজীর যে প্রাণঢালা আরতি দেখে এসেছি, সেইরকম আরতি আর কোথাও দেখলাম না; অমরকণ্টকের

নর্মদা উদ্‌গম মন্দিরেও না, ওঁকারেশ্বরের মন্দিরেও না। কিছুক্ষণ আরতি দেখে আমি নর্মদা ও মহেশ্বরকে প্রণাম করে ফিরে এলাম যোগাশ্রমে। গ্যাসবাতি জ্বলছে, নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সব মিলিয়ে বোধ হয় শতখানিক লোক বসে আছেন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। এখানেও আরতি হচ্ছে। তুরীয় ব্রহ্মচারীজী তাঁর গুরু মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মচারীজীর তৈলচিত্রে চামর দোলাচ্ছেন। ভক্তরা সমবেত কণ্ঠে গাইছেন—

শিবগুরু, শিবগুরু, শিবগুরু রাম।
রেবা শিব, রেবা শিব, রেবা রেবা রাম॥

আরতি শেষ হল। আমি সকলের পেছনে আসনের এককোণে গিয়ে বসলাম। আমাকে দেখতে পেয়েই তুরীয়জী হাত ধরে নিয়ে গৌরীশংকরজীর যেখানে তৈলচিত্র সেখানে বসালেন। ডাক্তার বংশীলালও আমার পাশে এসে বসলেন। একগুচ্ছ শিখা ও উপবীতধারী, কপালে রামানুজ সম্প্রদায়ের তিলক ধারণ করে দুজন পণ্ডিত একটা পৃথক গালিচার উপর বসেছিলেন, গলায় ফুলের মালা গায়ে রেশমী চাদর। তাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টি অনুসরণ করে তুরীয়জী তাঁদের কাছে আমার পরিচয় দিলেন—বাংলা মুলুকসে ইনোনে মাইয়াকো পরক্রমা করনেকো লিয়ে আয়া হৈ। পণ্ডিতজীরা তাঁদের পার্শ্বে উপবিষ্ট দু'তিনজন ভক্তকে মুখ নিচু করে বললেন—বাচ্‌পনমেঁ পরকর্মা করনেকো লিয়ে আয়া উহ্‌ত আচ্ছাই হৈ। লেকিন্‌, বাঙালী হ্যায়। বাঙালী মছ্‌লি খাতা হৈ, উনকা আচার বিচার আচ্ছা নেহি হ্যায়। পণ্ডিতজীদের শ্রুতিমধুর বাক্য তাঁরা চুপিসারে বললেও আমার শ্রুতিগোচর হল। আমি মনে মনে মহাত্মা প্রলয়দাসজীকে স্মরণ করে জানালাম তুমি উপদেশ দিয়েছিলে, 'হাস বোল, খ্যাপা ন হো কিসীসে'। এই দেখ পণ্ডিতদের কথায় আমি বিন্দুমাত্র রাগ করিনি! ওদিকে তুরীয়জী বলতে আরম্ভ করেছেন—পূজনীয় গুরুদেবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কতদূর থেকে আপনারা এসেছেন, আপনারা মা নর্মদা ও গুরুদেবের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। গুরুদেবের অপার করুণায় আমি তাঁর প্রদর্শিত হঠযোগ প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে আপনাদেরকে শিক্ষা দিয়ে আসছি। আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন যে ষট্‌কর্ম দ্বারা শরীরের মধ্যস্থ নাড়ীগুলির মলশুদ্ধি হয়।

তাতে দৃঢ় বলিষ্ঠ শরীর স্থির যৌবন ও নীরোগ স্বাস্থ্য লাভ হয়। এই হঠযোগের অভ্যাস সতত গোপনে করা কর্তব্য।

হঠবিদ্যা পরা গোপ্যা যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
ভবেৎ বীর্যবতী গোপ্যা নির্বীর্যা তু প্রকাশিতা॥

হঠযোগের প্রক্রিয়া গোপনে অভ্যাস করলে তা বীর্যবতী হয়, আর সকলের সামনে একজন নটের মত ভেল্কীবাজি দেখালে তা নিবীর্য হয়ে পড়ে অর্থাৎ তাতে কোন আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয় না। আমার গুরুদেবের কাছে শুনেছেন, আমিও বারবার বলেছি যে হঠযোগ অভ্যাসে সিদ্ধিলাভ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আহার সংযম। আহার্য বস্তুর সঙ্গে শারীরিক ক্রিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। একথা সকলে অবশ্যই স্বীকার করবেন যে দ্রব্যগুণ শরীরের উপর অবশ্যই ক্রিয়া করে। শরীর সুস্থ না থাকলে মনও সুস্থ থাকে না। অসুস্থ দেহ-মন নিয়ে কি যোগ সাধনা সম্ভব? যোগ ত দূরের কথা কোন সাংসারিক সূক্ষ্ম বিষয়েও চিন্তা করা সম্ভব হয় না। রাজসিক তামসিক আহার কিংবা অতিভোজনে ইন্দ্রিয়বর্গ চঞ্চল হয়, মনও চঞ্চল হয়। সাত্বিক ভোজনও যদি মাত্রাতিরিক্তভাবে গ্রহণ করা হয়, তাতেও শরীরে অসুখ জন্মে এবং মন চঞ্চল হয়। চঞ্চল মন দিয়ে ধ্যান পূজা হয় না। আহার সংযম এবং ইন্দ্রিয় সংযমের সঙ্গে হঠযোগ অভ্যাস করতে পারলে মন সহ অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গ শান্তভাব ধারণ করে, ক্রমে ঈশ্বর বিষয়ে সমাধানের যোগ্য হয়ে ওঠে। যোগশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পাতঞ্জল দর্শনে যে, যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের বর্ণনা আছে, তাও আয়ত্ত করতে হলে সর্বাগ্রে হঠযোগ অভ্যাস করা প্রয়োজন। এইজন্য যোগশাস্ত্রের নির্দেশ—

হঠং বিনা রাজযোগঃ রাজযোগং বিনা হঠঃ।
ন সিধ্যতি ততঃ যুগ্মমানিষ্পত্তেঃ সমভ্যসেৎ॥

হঠযোগ ছাড়া রাজযোগ এবং রাজযোগ ছাড়া হঠযোগ কখন সিদ্ধ হয় না, সেইজন্য একই সময়ে দুই যোগ অভ্যাস করতে হয়। যারা সংসার সুখের বাইরে অন্য কোন দিব্য সুখ কল্পনা করতে পারে না, সেইসব ভোগাকাঙ্খীদেরও উচিত হঠযোগ অভ্যাস করা। প্রসিদ্ধ নাথযোগী গুরু

গোরক্ষনাথজী বলেছেন—মনথির মেঁ, পবনথির, পবনথির মেঁ বিন্দু অর্থাৎ হঠযোগের সাধনে মনস্থির হলে বায়ুস্থির হয় আর বায়ুস্থির হলে বিন্দুস্থির হয়। বিন্দুর অর্থ বীর্য, ষাট ফোঁটা রক্ত গাঢ় হলে একফোঁটা বীর্য উৎপন্ন হয়। আর ষাট ফোঁটা বীর্য ঘণীভূত হলে একফোঁটা ওজঃ ধাতু জন্মে। যারা ওজঃ ধাতুর অধিকারী তারাই সংসারে চরম সুখ দিতে এবং চরম সুখ ভোগ করতে সমর্থ। কাজেই সুখী সংসার জীবনের জন্যও অন্ততঃ হঠযোগ অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। ইত্যাদি।

তুরীয়জীর বক্তৃতা শেষ হল, এইবার তিনি পূর্বোক্ত দুজন পণ্ডিতের একজনকে অনুরোধ করলেন কিছু বলতে। তিনি সহাস্যে বললেন আপনে যোগ কা বারেমেঁ আচ্ছা ভাষণ দেকর কামাল কর দিয়া, ঔর হম্ বলেগা ক্যা ?

—আপ্ বৈরাগ্য কা বারেমেঁ দশমিনট্ কি লিয়ে কুছ্ বলিয়ে।

—ব্রহ্মচারীজী ! শংকরাচারিয়া নে বৈরাগ্যশতকম্‌মেঁ বৈরাগ্য মহিমা আচ্ছিতরেসে বর্ণন কর্ চুকা। ওহি বৈরাগ্যশতকম্ পূরি ব্যাখ্যা করেঙ্গে তো দোঘণ্টা বীত যায়েগা। দশ মিন্‌টমে বলেগা ক্যা ? খ্যার, আপ্‌কো আদেশ শিরোধার্য হ্যায়। লেও ভাইয়ো ! বহিনো ! বৈরাগ্যকা বারেমেঁ থোড়া কুছ শুন লিজিয়ে।

এইভাবে গৌরচন্দ্রিকা করে তিনি যা বললেন তার বাংলায় সারমর্ম হল—বৈরাগ্য পরম ধন। বৈরাগ্য ছাড়া ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। গীতাতে আছে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যখন বললেন যে, মন অতি চঞ্চল এবং ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপ উৎপাদক। আকাশস্থ বায়ুকে মুষ্টিতে আবদ্ধ করা যেমন দুঃসাধ্য তেমনি মনকেও বিষয় বাসনা হতে নিরুদ্ধ করাও অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তখন ভগবান তাঁকে উত্তর দিলেন যে, মন যে দুর্নিরোধ ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও হে কৌন্তেয়, নিত্য যোগাভ্যাসেও বৈরাগ্যের সেই মনকেও সংযত করা যায়—অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। বৈরাগ্য বলতে বোঝায় ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা। বিষয়-ভোগে লিপ্ত মন নিয়ে সাধনা করা যায় না। তাই আবহমান কাল থেকে তামাম হিন্দুস্থানে বৈরাগ্যের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। এইজন্যই আমাদের দেশে সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসী বৈরাগ্য অবলম্বন করে অর্থাৎ আপন প্রিয়-পরিজন

ত্যাগ করে গভীর অরণ্যে ও গিরিগুহায় বাস করে ভগবানের সাধনা করে চলেছেন। বৈরাগ্য অবলম্বন করতে পারলে কোন পিছুটান থাকে না, একমনে ভগবানকে ডাকা যায়। সংসারে শোক-দুঃখের আঘাতে জর্জরিত হয়ে অনেকে সংসার ত্যাগ করে ভগবানের দয়ায় অপার শান্তির সন্ধান পেয়েছেন সেইরকম উদাহরণের অভাব নেই। এই সংসারে নারী ও অর্থ এই দুইটি ভগবৎলাভের অন্তরায়। অনেক ঠকে মানুষ শেখে যে অর্থ নাশবান আর প্রাণপ্রিয়া প্রেয়সী নারী বিশ্বাসঘাতিনী। অনিত্য অর্থলালসা ও বিশ্বাসঘাতিনী নারী নিয়েই জগৎ ডুবে আছে। নারী ও অর্থের প্রতি মোহ মারাত্মক ক্ষয়রোগের মত, তিলে তিলে মানুষকে ক্ষয় করে। ঐ রোগ নিরাময়ের বৈরাগ্যই একমাত্র মহৌষধ। বৈরাগ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি আপনাদের কাছে রাজা ভর্তৃহরির গল্প বলছি শুনুন। স্কন্দপুরাণের অবন্তীখণ্ডে তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের অংশ সম্ভূত গন্ধর্বসেন উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ভর্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্য, কন্যার নাম মৈনাবতী। গন্ধর্বসেনের মৃত্যুর পর ভর্তৃহরি সামান্যকাল রাজত্ব বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক পরম যোগীতে পরিণত হয়েছিলেন। রাজা ভর্তৃহরি যে কারণে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন তা শুনলেই আপনারা সংসারের প্রধান মোহপাশ যে কামিনী, তার স্বরূপ বুঝতে পারবেন। কোন একসময় জয়ন্ত নামক একজন তপস্বী ইন্দ্রকে প্রসন্ন করে একটি অমৃতফল লাভ করেছিলেন। তিনি সেই ফলটি পরম শিবভক্ত রাজা ভর্তৃহরিকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন যে ফলটি ভক্ষণ করলে তাঁর যৌবন অটুট থাকবে এবং সুদীর্ঘ জীবন লাভ করবেন। রাজা প্রেমবশতঃ সেই ফল নিজে না খেয়ে ভোগের পাত্রী তাঁর পরমাসুন্দরী রাণীকে খেতে দিলেন। এদিকে রাণীর একজন উপপতি ছিল। তার যৌবন অটুট থাকলেই রাণীর সুখ বেশী হবে। তাই তিনি ফলটি নিজে না খেয়ে সোহাগ ভরে উপপতির হাতে দিলেন। ঐ উপপতির আবার প্রাণের টান ছিল এক বারাঙ্গনার প্রতি। তাই সেই ফলটি নিজে না খেয়ে বারাঙ্গনার যৌবন অটুট রাখার জন্য তাকে উপহার দিল। বারাঙ্গনা ফলের গুণ শুনে ভাবল, নিজের কলুষিত জীবনকে দীর্ঘতর করে লাভ কি? আমার বহুভোগ্যা যৌবনশ্রীকে দীর্ঘায়িত করে কোন পুরুষার্থ লাভ করব? তার চেয়ে প্রজাবৎসল দয়ালু রাজা যদি

এই অমৃতফল ভক্ষণ করেন, তাহলে অটুট যৌবন শক্তির অধিকারী হয়ে তিনি আরও দীর্ঘকাল ধরে প্রজাদের মঙ্গল সাধন করতে পারবেন। এই ভেবে সে পরদিন রাজসভায় গিয়ে পরমশ্রদ্ধা ভরে ফলটি রাজার হাতে দিয়ে এল। ফলটি হাতে পেয়ে রাজা ত বিস্ময়ে হতবাক্। মহাত্মা প্রদত্ত যে ফল তিনি প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে দিয়েছিলেন, সেই ফল কিভাবে বারাঙ্গনার হাতে গেল সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে আদ্যন্ত সমূহ বিবরণ তিনি জানতে পারলেন। সংসারী লোকের ভাব-ভালবাসা এবং ভোগরাগ যে কত অকিঞ্চিৎকর তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করলেন—অনুভব করলেন যে জাগতিক প্রেমের কোন মূল্য নেই। এর মূলে আছে শুধুই বঞ্চনা, দেহসুখ, স্বার্থপরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা।

সংসারের উপর রাজার ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মাল। রাজ্যপাট ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। সেই সময়কার তাঁর একটি বিখ্যাত খেদোক্তি পণ্ডিত সমাজে আপ্তবাক্যের মত প্রচলিত আছে। ভর্তৃহরির সেই হৃদয়-মথিত দীর্ঘশ্বাস পূর্ণ শ্লোকটি হল—

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সাপি অন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতে চ পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিকং তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ॥

অর্থাৎ—

যার চিন্তা সদা করি, বিরক্ত সে আমার উপর,
চাহিছে সে অন্যজনে, অন্যে পুনঃ আসক্ত সে নর।
অপর কেহ বা মোরে, তুষ্ট করে চাহে পুনরায়
ধিক্ নারী ধিক্ নরে, ধিক্ কামে, তারে ও আমায়॥

পূর্বেই বলেছি, সংসারে দুটি বস্তু মোহকরী—অর্থ ও নারী। মানুষ এই দুটি নিয়েই মত্ত থাকে। কিন্তু সংসার জীবনের আকর্ষণ এই দুটি জিনিষই মানুষকে আঘাত দেয়। পত্নীর কাছে মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে রাজা ভর্তৃহরি রাজ্যপাট ত্যাগ করেছিলেন এবং পত্নীর সংশ্রব ছিন্ন করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন। বৈরাগ্য অবলম্বন করেই তিনি যোগী হতে পেরেছিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক এবং স্ফোটবাদের বিখ্যাত গ্রন্থ বাক্যপদীয় ও ভট্টিকাব্য রচনা করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তাঁর শেষোক্ত গ্রন্থ দুটি অমর অবদান। ভর্তৃহরি রাজা হিসেবে রাজত্ব করে, যতই ভোগসুখ করুন না একদিন না একদিন তাঁকে কালগ্রাসে পতিত হতে হত। আমাদের দেশে কত রাজা এসেছেন এবং গিয়েছেন। কিন্তু কে তাঁদেরকে মনে রেখেছে? কিন্তু যোগী ভর্তৃহরিকে তাঁর বাক্যপদীয়, তৎপ্রতিপাদ্য স্ফোটবাদ এবং ভট্টিকাব্যের জন্য ভারতবাসী চিরকাল মনে রাখবে। আপনারা মনে রাখবেন বৈরাগ্য প্রভাবেই ভর্তৃহরির মধ্যে এই প্রতিভা ও বোধির স্ফুরণ ঘটেছিল। ভোগ মানুষকে ক্রমে অন্তঃহীন অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায় কিন্তু বৈরাগ্য দেয় পরমা শান্তি। বৈরাগং পরমং সুখং। অলম্ ইতি।

পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শেষ হতেই তুরীয়জী আমার হাত চেপে ধরে অনুরোধ করলেন—'আপ্ ভি থোড়া কুছ্ বলিয়ে'। আমি তাঁকে আমার অক্ষমতা জানালাম। পণ্ডিতজীও মন্তব্য করলেন—সব্‌সে সব কুছ্ হোতা নেহি। বেচারা কো কেঁও পরেসানি করতে হো! তা শুনেও তুরীয়জী বললেন—থোড়া কুছ। পাঁচ মিনিট কী লিয়ে যো কুছ হো কহিয়ে জী। আমি আর বৃদ্ধ সাধুর অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না। আমি মহেশ্বরজী এবং যোগী মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মচারীজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে বলতে সুরু করলাম—

যোগ ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে স্বয়ং তুরীয়জী এবং পণ্ডিতজী সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছেন। আমি সেই যোগ ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে কিছু বলতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু আমি নিজে যোগীও নয়, বৈরাগীও নয়। আমার বাবার আদেশে নর্মদা পরিক্রমা করতে বেরিয়েছি মাত্র। এইমাত্র পণ্ডিতজী বৈরাগ্যের মহিমা ব্যক্ত করতে গিয়ে যেভাবে নারী চরিত্র সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তা সর্বাংশে মেনে নিতে পারছি না, ভর্তৃহরি বললেও না। ভর্তৃহরি আপন পত্নীর ব্যভিচার ও বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত হয়েছিলেন বলে মনের যন্ত্রণায় তিনি যা ইচ্ছে বলতে পারেন, কিন্তু সেইটাই মেয়েদের সম্বন্ধে সত্যিকার ছবি নয়। মেয়েরা অন্নপূর্ণার জাত, মায়ের জাত। দেশে দু'দশজন ব্যভিচারিণী থাকতে পারে, সকল কালেই ছিল এখনও আছে,

কিন্তু সতী সাধ্বীরও অভাব নেই। এ জগতের রূপ রস ও মধুর উৎস হলেন নারী। ন+অরি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় করেও নারী শব্দ সিদ্ধ করা যায়। নারীকে কোনমতেই সাধনার পথে বাধা বলা যায় না, অরি বা শত্রু ভাবা যায় না। পুরুষ ও নারীর অন্তরস্থ কামলোলুপতা বা চঞ্চল ইন্দ্রিয়বর্গই আসল অরি। নারীর শুধু কামকটাক্ষই নেই, তার হৃদয়ে আছে অপার মমতা স্নেহ সেবা ও ভালবাসার উৎস।

এই সময়ে মেয়ে শ্রোতারা হাততালি দিয়ে উঠলেন। তুরীয়জী হাত তুলে তাঁদেরকে শান্ত থাকতে ইঙ্গিত করলেন। আমি বলতে লাগলাম—চোখের সামনে মা নর্মদা এবং চিরস্মরণীয়া অহল্যাবাঈ-এর স্মৃতি চিহ্ন থাকলেও এক মহীয়সী নারীর প্রতিষ্ঠিত ঘাটে বসে সমগ্র নারীজাতি সম্বন্ধে পণ্ডিতজী যে সব অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন তা যেমন আমি মেনে নিতে পারছি না, তেমনি মেনে নিতে পারছি না রাজা ভর্তৃহরি সম্বন্ধে তাঁর বিকৃত তথ্যকে। রাজা ভর্তৃহরি কস্মিনকালেও বাক্যপদীয় কিংবা ভট্টিকাব্য রচনা করেননি। ব্যভিচারিণী স্ত্রীর উপর বিরক্ত হয়ে যিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন, সেই রাজা ভর্তৃহরি এবং বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি উভয়েই স্বতন্ত্র ব্যক্তি। রাজা ভর্তৃহরি মালব দেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন (৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দী)। পণ্ডিতজীর কথা মত তার পিতার নাম গন্ধর্বসেনই ছিল বটে। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যশোধর্মার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করেছিলেন। এই যশোধর্মাই মিহিরকুল ও অন্যান্য হূণদেরকে পর্যুদস্ত করে "বিক্রমাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর রাজা ভর্তৃহরির তপস্যা ক্ষেত্র ছিল বারাণসীর সন্নিকটস্থ চুণার পর্বত। চুণারে এখনও তাঁর সমাধিক্ষেত্র রক্ষিত আছে। পণ্ডিতজী এইটুকু কথা ঠিকই বলেছেন যে রাজা ভর্তৃহরি লিখিত বইএর নাম শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক। বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি হতে রাজা ভর্তৃহরির পার্থক্য চেনবার জন্য তাঁর লেখন শৈলীরও (style) যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমে শৃঙ্গারশতকের কথাই ধরা যাক্। এই বই-এ কেবল কামকলারই কথা নেই। চপলমতি যুবকরা যাতে কোন মতে ক্ষণিক প্রলোভনের ফাঁদে পা না দেয়, সেজন্য অনেক সাবধান বাণীও উচ্চারিত হয়েছে। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে কবি নিজের জীবনে গভীর মর্মযাতনা

ভোগ করেছিলেন বলে সমগ্র মাতৃজাতি সম্বন্ধে নয় কেবল চটুলকামিনীদের সম্বন্ধে তাঁর বক্রোক্তি—

জল্পন্তি সার্ধমন্যেন পশ্যন্ত্যন্যং সবিভ্রমম্।
হৃদয়ে চিন্তয়ত্যন্যং প্রিয় কো নাম যোষিতাম্।

বাক্যলাপ করে কারও সনে—
স বিভ্রমে চাহে অন্য পানে।
হৃদয়ে চিন্তয়ে অন্যে,
নারীর যে কে বা প্রিয়,
কেই বা তা জানে?

'বৈরাগ্যশতকে' ধ্বনিত হয়েছে তীব্র বৈরাগ্যের সুর। সংসার অনিত্য, এখানে তৃষ্ণার নিবৃত্তি কোনমতেই সম্ভব নয়, তবুও বাসনা বদ্ধ জীব কিভাবে সেই মরীচিকার পেছনে উন্মত্তের মত ছুটে চলেছে, রাজা ভর্তৃহরি তা দেখিয়েছেন বৈরাগ্যশতকের পঞ্চম শ্লোকে:

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্যাতা গিরির্ধাতবো।
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্ররোধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্ত কার্নবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চমাম্।
রতন মিলিবে ভাবি ক্ষিতিতল করেছি খনিত
গিরি হতে ধাতু আনি অনলে করেছি বিগলিত।
সাগরে দিয়েছি পাড়ি, নৃপগণে তুষেছি যতনে,
কেটেছে শ্মশানে নিশা একমনে মন্ত্রের সাধনে;
পাই নাই কানাকড়ি কোনখানে কখন কোথায়।
ওগো তৃষ্ণে! এবে তুমি ছাড়হ আমায়॥

বৈরাগ্যশতকের কোন কোন শ্লোক শংকরাচার্য বিরচিত মোহমুদ্গরের শ্লোক স্মরণ করিয়ে দেয়। মোহমুদ্গরে আছে—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভনদণ্ডং তদপি ন মুঞ্চতি আশা ভাণ্ডম্॥ ৮

এরই পাশাপাশি বৈরাগ্যশতকের একটি শ্লোক শুনুন, মানুষের ভোগ-লালসার নগ্নরূপটি দেখাতে গিয়ে ভর্তৃহরি শংকরাচার্যের মতই তীব্র খেদের সঙ্গে বলেছেন।

ভিক্ষাশেনং তদপি নীরসমেকবারং
শয্যা চ ভূঃ পরিজনো নিজ দেহমাত্রম্।
বস্ত্রঞ্চ জীর্ণপটখণ্ডনিবদ্ধকন্থাঃ
হা হা তথাপি বিষয়ান্ ন পরিত্যজন্তি॥ ১৬
নীরস ভিক্ষান্ন, তাও জোটে একবার,
ভূমিশয্যা, নিজ দেহমাত্র পরিবার,
জীর্ণ বস্ত্রে গাঁথা কন্থা তাহাই বসন,
হায়রে বিষয় তবু নাহি ত্যজে মন॥

সংক্ষেপে এই হল রাজা ভর্তৃহরির জীবন ও কবিকৃতির পরিচয়। একমাত্র নাম সাদৃশ্য ছাড়া এঁর সঙ্গে বাক্যপদীয় ও ভট্টিকাব্য প্রণেতা আচার্য ভর্তৃহরির জীবন ও জীবন-বেদে আর কোন মিল নেই। বৈরাগ্যশতকাদি প্রণেতা ভর্তৃহরি ছিলেন রাজা কিন্তু বাক্যপদীয়কার রাজা ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজার আশ্রিত একজন বিচারমল্ল পণ্ডিত। তাঁর পিতার নাম শ্রীস্বামী। গন্ধর্বসেন পুত্র রাজা ভর্তৃহরি আর শ্রীস্বামীর পুত্র বাক্যপদীয়কার আচার্য ভর্তৃহরি দুজনে পৃথক পৃথক ব্যক্তি। টড ও ফার্গুসনের ইতিহাস হতে জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গুজরাটে কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত বল্লভীপুরে শ্রীধর সেন নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁদের বংশের নাম বল্লভী বংশ। এই বল্লভী বংশ নিজেদেরকে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলে দাবী করতেন। শ্রীধর সেনের আশ্রয়ে থেকেই যে আচার্য ভর্তৃহরি বাক্যপদীয় ও ভট্টিকাব্যের মত অমর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, ভট্টির বাইশ সর্গের একটি শ্লোকই তার প্রমাণ। তিনি লিখেছেন—

কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বল্লভ্যাং শ্রীধর সেন নরেন্দ্র পালিতায়াম্।
(৩৫ শ্লোক)

চৈনিক-পরিব্রাজক হিউ এন-সাঙ এবং ইৎসিঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হতেও আমরা ভর্তৃহরির (যাঁকে আমি অতঃপর আচার্য ভর্তৃহরি বলে উল্লেখ করব)

স্থিতিকাল নির্ণয় করতে পারি। ইৎসিঙ্ লিখেছেন, ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভারত আগমনের ৪০ বছর পূর্বে অর্থাৎ ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ভর্ত্তৃহরির দেহান্ত ঘটে।

এই ঐতিহাসিক বিবরণ ছাড়াও উভয় ভর্ত্তৃহরির মধ্যে একটি বৈসাদৃশ্য আছে যা দিয়ে সহজেই বোঝা যায় যে উভয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। উভয় ভর্ত্তৃহরির গ্রন্থাবলী কোন নিরপেক্ষ পাঠক যদি পাঠ করেন, তা হলে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে বৈরাগ্যশতকাদি প্রণেতা রাজা ভর্ত্তৃহরি স্বভাব কবি হলেও তাঁকে ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞ বলা যায় না। কারণ তাঁর রচিত কোন কোন শ্লোকে অপাণিনীয় পদের বহুল প্রয়োগ আছে। কিন্তু বাক্যপদীয়কার আচার্য ভর্ত্তৃহরি ছিলেন ধুরন্ধর বৈয়াকরণ। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি স্বরচিত ভট্টিতে বেদের চক্ষু ব্যাকরণকে কাব্যরূপ দিতে পেরেছিলেন। ভট্টিকাব্য চারখণ্ডে বিভক্ত। ১ম হতে ৫ম সর্গের নাম প্রকীর্ণখণ্ড, ৬ষ্ঠ হতে ৯ম সর্গের নাম অধিকারখণ্ড, ১০ম হতে ১৩শ সর্গের নাম প্রসন্নকাণ্ড এবং ১৪শ হতে ২২শ সর্গের নাম তিঙন্ত কাণ্ড। উক্ত প্রসন্নকাণ্ডে, অলংকার শাস্ত্রের যে বিচার আছে, তাতে আচার্য ভর্ত্তৃহরিকে একজন শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক বলা যায়।

কিন্তু এহ বাহ্য। আচার্য ভর্ত্তৃহরির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়, তিনি স্ফোটবাদ তথা শব্দব্রহ্মবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মশাই দুই ভর্ত্তৃহরিকে এক ভেবে যে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছিলেন তা নীরবে গলাধঃকরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না বলে আমি দুঃখিত। আমার প্রগলভতার জন্য পণ্ডিতজীর কাছে মার্জনা চাইছি। কি করব আমি 'মছলিখোর বাঙালী' বলেই হয়ত এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করে ফেললাম। আমার ঋষি-কল্প পিতার শিক্ষায় আমি এই সংস্কারে গড়ে উঠেছি যে, সত্যসন্ধ ঋষিরা যে শাস্ত্রের দ্রষ্টা এবং প্রণেতা তাঁদের সেই শাস্ত্রবাণীতে কিংবা কোন ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার মধ্যে মিথ্যার কুহক মিশিয়ে বিকৃতি ঘটালে গুরুতর অপরাধ হয়। শাস্ত্রবাণীই আমাদের জ্ঞানদেহ তথা আন্তর সত্তার একাধারে জনয়িত্রী ও ধাত্রী। মাতাপিতার সঙ্গে মানুষের এই জন্মের সম্বন্ধ কিন্তু শাস্ত্র আমাদের যে কতজন্মের মাতাপিতা তার ইয়ত্তা নেই। সুতরাং শাস্ত্র যে সকল তত্ত্ব

অবধারণ করেছে সে সম্বন্ধে কেউ পর্যনুযোগ* করলে তা বসে বসে সহ্য করে যাওয়াটাকে আমি কোন মতেই পুত্রোচিত কাজ বলে ভাবতে পারি না। হর নর্মদে।

আমি ভাষণ শেষ করে সকলকে নমস্কার জানিয়ে বসে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, সেই দুজন পণ্ডিত উঠে পড়লেন। তাঁরা যে আমার উপর বিলক্ষণ রুষ্ট হয়েছেন, তাঁদের হাবভাবেই তা বুঝতে পারলাম। তুরীয়জী তাঁদেরকে বললেন—'ঔর থোড়া বৈঠ যাইয়ে। আভি রাখী মাঈকী ভজন হোগা।'

—'উহ্ হমলোগ্ আপ্না কোঠিমেঁ বৈঠ্কর শুনুঙ্গা'—এই বলে তাঁরা চলে গেলেন। তুরীয়জী হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপ্কা কোঈ কসুর নাহি হুয়া। পণ্ডিৎ পহেলে আপ্কো ঠোকর মারা। ইহ্ বাঙ্গালী হৈ, উহ্ উড়িয়া হৈ, ইহ্ মছলিখোর হৈ, উহ্ ছাতুখোর হৈ, এ্যায়সা সওয়াল বহোৎ গন্ধা চিজ হ্যায়।

এইবার তাঁর ইঙ্গিতে তাঁর রাখীমা তানপুরা নিয়ে ভজন আরম্ভ করলেন। তিনি সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করে মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগলেন—

ত্যজ মন হরি বিমুখন্কো সঙ্গ্।
যাকে সঙ্গ কুমতি উপজত্ হৈ করত ভজনমেঁ ভঙ্গ॥
কাগহি ক্যাহ্ কপূর চুনায়ে শ্বান্ নহায়ে গঙ্গ্।
খরকো ক্যাহ্ অরগজ্জালেপন মরকট ভূষণ অঙ্গ॥
সুমতি সুসঙ্গতি তিনহিঁ ন ভবেত পিয়ত বিষয়রস ভঙ্গ॥
সুরদাস প্রভু কারি কমরিয়া চঢ়ৎ ন দুজা রঙ্গ্॥

অর্থাৎ হে মন! যে লোক হরি সেবায় বিমুখ, তার সংসর্গ পরিত্যাগ কর। কারণ, তার সঙ্গদোষে কুপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং ভজন নষ্ট হয়ে যায়। কাককে যদি কর্পূর ভোজন করানো হয় আর কুকুরকে যদি গঙ্গাস্নান করানো যায়, তা হলেই বা কি হবে? গর্ধভের গায়ে গন্ধদ্রব্য লেপন করলেই বা কি! আর মর্কটের অঙ্গে অলঙ্কার পরালেই বা কি! সুমতি ও

* পর্যনুযোগ—শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতিকূল তর্ক উত্থাপন কিংবা সত্য মিথ্যার রঙ মিশিয়ে বিকৃত তথ্য পরিবেশনকে পর্যনুযোগ বলা হয়।

সৎসঙ্গ তাদের ভাল লাগে না; তারা বিষয়-রস-রূপ সিদ্ধি পান করে বুঁদ্ হয়ে থাকে। সুরদাস বলছে, প্রভু! হরিবিমুখ ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ কম্বল স্বরূপ; তাকে অন্য বর্ণ করা যায় না অর্থাৎ তাকে কিছুতেই হরিভক্ত করতে পারা যায় না।

আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ। চাঁদের হাসির যেন বান ডেকেছে আকাশে। বিন্ধ্যপর্বতের কোলে এই মনোরম নির্জন পরিবেশে, জ্যোৎস্না-প্লাবিত বাতাবরণ সুরলোকের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। আমরা শ্রোতারা যেন ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছি কোথাও। গায়িকার বয়স বড়জোর ত্রিশ বা বত্রিশ হবে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে চন্দন তিলক। তাঁর ভাববিহ্বল অশ্রুসিক্ত নয়নে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। তিনি প্রথম গানটি শেষ করেই তানপুরাতে মধুর ঝঙ্কার তুলে আর একটি গান ধরলেন।

তব গুণ কেয়া জগৎগুরো! জো পাপ করম ন নাশে।
সিংহ শরণ কেঁও যাইয়ে জো জম্বুক গরাসে?
এক বুঁদকে কারণ চাতক নিত দুঃখ পাবে!
প্রাণ গয়ে সাগর মিলে ফিন্ কৌন কাম মেঁ আবে?
মৈঁ নহি প্রভু হৌ নহি কুছ্ অহৈ ন মেরা।
আবসর লাজ রাখ্‌লে মধু দাসী তুমারা॥

যদি পাপ কর্মের নাশই না হয়, তবে হে জগদ্‌গুরো! তোমার মহিমা কি? যদি জম্বুকেই গ্রাস করে তবে সিংহের শরণ কেন নিয়েছি? এক বিন্দু জলের জন্য চাতকী নিরন্তর কষ্ট পাচ্ছে। এইভাবে যদি প্রাণবিয়োগ হয় আর পরে যদি সাগরও মেলে তখন তাতে আর কোন কাজ দেবে না। আমি কিছু নই, আমারও কিছু নেই হে প্রভু! আমার বলতে একমাত্র তুমিই আছ। আমাকে এই দুঃখ ও লজ্জা হতে রক্ষা কর, মধু তোমারই, এ দাসী তোমারই।

গায়িকা গানের প্রত্যেকটি কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন দরদ দিয়ে ভক্তিস্নিগ্ধ কণ্ঠে গাইলেন যে তাঁর তানপুরার ঝঙ্কার স্তব্ধ হলেও পাঁচমিনিটকাল কেউ কোন কথা বলতে পারলেন না। সকলেরই চোখে জল। অবশেষে তুরীয়জী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। ডাঃ বংশীলাল ঘড়ি দেখে বললেন রাত্রি দশটা।

এইবার কয়েকজন ভক্ত আমাকে ঘিরে ধরলেন। তাঁরা ইন্দোর থেকে এসেছেন। তাঁরা প্রস্তাব করলেন—আপ্ হমারা সাথমেঁ ইন্দোর চলিয়ে। উধর লালবাগ, মানিকবাগ প্রাসাদ, শীশমহল (কাঁচ মন্দির) হুকুমচাঁদ ইন্দ্রপুরী বাগেরা বহোৎ দেখনেকা লায়েক চিজ হৈ। সেই পিক্-কণ্ঠী গায়িকা বললেন—উধর ছত্রীবাগমেঁ হোলকার বংশকা বড়া বড়া মহারাজাকে স্মৃতি-মন্দির হৈ। সবসে যে উঁচা মন্দির মলহর রাও হোলকার জীকো, সবসে যে ছোটা উহ্ হ্যায় সবসে মহীয়সী দেবী অহল্যাবাঈকা।

আমি তাঁদেরকে মিষ্টি করে বুঝিয়ে বললাম, পরিক্রমা করতে বেরিয়েছি, আমি সখের ভ্রমণকারী নয়, নিছক ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানও আমার লক্ষ্য নয়। এখান থেকে তট ধরে যেতে যেতে যদি ইন্দোর শহর সামনে পড়ে তাহলে ইন্দোর ও ছত্রীবাগে নিশ্চয়ই যাবো। না হলে বিলাসবৈভববহুল কোন শহরের কলকারখানা আধুনিক দোকান পসার ঐশ্বর্য আড়ম্বর দেখতে আমার কোন রুচি নেই।

—*ঠিক হ্যায়, পরিক্রমান্তে এক দফে যায়েগা* ত?—গায়িকা বললেন।

—তাই বা কি করে বলি। নর্মদাতটে দাঁড়িয়ে হাঁ না কোন কিছুই বলা উচিত হবে না। নর্মদার কূলে দাঁড়িয়ে কিছু বললে তা পালন করতে হয়, এই হল পরিক্রমার কঠিন শপথ। তাঁরা নমস্কার বিনিময় করে চলে গেলেন ধর্মশালার দিকে। আমার হাত জড়িয়ে ধরে তুরীয়জী প্রসন্ন চিত্তে ঢুকলেন আশ্রমে।

তুরীয়জী তাঁর আশ্রম সেবককে বললেন—কাল সুবে সুবে ভোগ প্রস্তুত করিয়েগা। ইনোনে ভিক্ষা লেকর্ যাত্রা করেঙ্গে।

রাত্রি অনেক হয়ে গেছল, তাই আর বৃথা কালক্ষেপ না করে শুয়ে পড়লাম। খুব ভোরেই ঘুম ভেঙেছে। আশ্রমে কাউকে দেখতে পেলাম না। দরজা খোলা। শৌচাদি সেরে আমি নর্মদাতে নামলাম স্নান করতে। স্নান তর্পণাদি সেরে শ্রীশ্রীমহেশ্বরকে দর্শন করতে চললাম। পথেই তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি মহেশ্বরের পূজা করে ফিরছেন। মহেশ্বরের মাথায় জল ঢেলে বন্দনাদি সেরে বেরিয়ে আসতেই ডাঃ বংশীলালের সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমার সঙ্গে আশ্রম পর্যন্ত এলেন। আশ্রমে এসে বসতেই বংশীলালজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—গতকাল আপনি যখন এসে

পৌঁছলেন, তখন স্নান করে মহেশ্বরের পূজা করতে গেলে আমি আপনার গাঁঠরী আগলে দাঁড়িয়েছিলাম। সেই সময় আপনি বলেছিলেন, আপনার গাঁঠরীতে বা ঝোলায় কিছু রুদ্রাক্ষ এবং শিবলিঙ্গ ছাড়া আর কিছু নেই। আপনার সেই কথাতেই জেনেছি, আপনার কাছে রুদ্রাক্ষ আছে। আমার বাবাকে বছর দুই আগে এই মহেশ্বরেই জনৈক পরিক্রমাবাসী প্রাচীন মহাত্মা একটি চারমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে বলেছিলেন। তাঁর কাছে চারমুখী রুদ্রাক্ষ ছিল না। সেই থেকে সাধু দেখলেই আমি তাঁর কাছে চারমুখী রুদ্রাক্ষ আছে কিনা খোঁজ করি। আপনার কাছে আছে কি?

—একটু অপেক্ষা করুন, আমি ঝোলা হাতড়ে দেখি।

ঝোলাতে খুঁজতে খুঁজতে একটি চারমুখী রুদ্রাক্ষ হাতে উঠে এল। আমি রুদ্রাক্ষটি হাতে নিয়ে বললাম—এই রুদ্রাক্ষ দুর্লভ বস্তু। শিবপুরাণের জ্ঞানসংহিতায় ৩১তম অধ্যায়ে চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষের গুণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

চতুর্মুখী তদা জ্ঞেয়া চৌরাশ্চান্ধা ভবন্তি হি।
জলে তু মুচ্যমানা সা মজ্জতি ন তরেদিহ॥

অর্থাৎ চারমুখী রুদ্রাক্ষ জলে ভাসে না, জলে দিলেই ডুবে যায়। যে ধারণ করে তার ঘরে চোর চুরি করতে এলে চোরের চোখে আঁধি লাগে। সে কোন মূল্যবান বস্তু চোখে দেখতে পায় না।

—ঠিক বলেছেন। ইন্দোর শহরে আমার বাবা কাপড়ের ব্যবসা করেন। বছর দুই আগে সেই দোকানে গভীর রাত্রে চোর ঢুকে আমাদের যথাসর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায়। সেই আঘাত বাবা এখনও সামলে উঠতে পারেন নি। তাই বোধহয়, সেই প্রাচীন মহাত্মা বাবাকে এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে বলেছিলেন।

আমি আপনার হাতে এই রুদ্রাক্ষটি দিচ্ছি তবে আপনাকেও আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে। আমি মণ্ডলেশ্বর হতে মহেশ্বরে আসার পথে মাজনা-দাদার নামক গাঁয়ে যেখানে হাট বসে, সেখানে মদনলাল বদরী নামক একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার পাঁচ বছর বয়সের একমাত্র পুত্র পাঁচ মাস ধরে নানারকম অসুখে ভুগছে। সাদাসিধে পাহাড়ীলোক জড়ি বুটি কবচ মাদুলি তুকতাক করে যাচ্ছে। অর্থাভাবে

কোন আধুনিক চিকিৎসা করাতে পারছে না। আপনি যদি দয়া করে বাচ্চাটিকে পরীক্ষা করে ঔষধ-পত্র দিয়ে সুস্থ করে তুলতে পারেন, তাহলে আমি বিশেষভাবে বাধিত হব।

ডাঃ বংশীলাল আমার কথা শুনে এক কথায় রাজী। আমাকে সোৎসাহে বলে উঠলেন—আপনি যদি দয়া করে আজ এখানে থেকে যান, তাহলে আমি বিকেলের মধ্যে মাজনা-দাদারে গিয়ে শিশুকে দেখে আপনাকে সব সমাচার জানিয়ে দেবো।

আমি বললাম—অত তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই। আপনি রোগীকে ঔষধ-পত্র দিয়ে নিরাময় করার চেষ্টা করবেন, এইটুকু জেনেই আমি খুশী। ফলাফল মহেশ্বরের হাতে।

এইসময় তুরীয়জী জানালেন—ভোজন প্রস্তুত। আমি অন্নপ্রিয় বাঙালী বলে হয়ত আমার জন্য ভাণ্ডা সিদ্ধ ও ঘি সহ ভাত তৈরী করা হয়েছে। আমি ভিক্ষাগ্রহণ করে তুরীয়জীর কাছ হতে বিদায় নিতে যেতেই তুরীয়জী বললেন—'বনবাসী কোল ভীল নর্মদাকে কিনারে কিনারে রহতে হৈ। পহিলে ইয়ে জঙ্গলী কন্দমূল ফল তথা মাংস পর হী নির্বাহ করতে থে, অব তো ইয়ে ছোটে ছোটে গাঁব বনাকর রহনে লগে হৈ। ইয়ে অব ভী তীর ঔর লকড়ি আদি কাটনেকে কুল্‌হাড়ী ভী রাখতে হৈ। ইয়ে নিশানা লাগানে মেঁ বড় দক্ষ হোতে হৈ। পরিক্রমাকালে যাত্রীয়োঁ পর সামান দেখতে হৈঁ তো উসে লুট লেতে হৈ। জিন পর কুছ সামান নহীঁ হোতা এ্যায়সে সাধুয়োঁ কো খানে কে লিয়ে অন্ন ভী দে দেতে হৈ। পহিলে তো বহুৎ হী লুটপাট হোতী থী। অব তো থোড়া কম হো গঈ হৈ। ফির ভী লুটপাট তো চলতী হী হৈ। মা নর্মদা আপ্‌কা ভালা করে।'

আমি তুরীয়জীকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে এগিয়ে চললাম নর্মদার তটধরে। রাস্তা ভালই, হাঁটতে কোন কষ্ট হচ্ছে না। ডাঃ বংশীলাল আমার পেছনে পেছনে কতকটা এগিয়ে দিয়ে গেলেন। আমাকে জানালেন —খলঘাট এখান থেকে বড়জোর সাত আটমাইল হবে। এই পথ ধরে আপনার কোন কষ্ট হবে না। মাইল দুই যাবার পর হয়ত রাস্তা খারাপ পড়বে। আপনি যদি মাইলখানিক উত্তর-পশ্চিমে একটু নর্মদা-তট থেকে উপরে উঠে যান, তাহলে পাকা রাস্তা পাবেন। ঐ রাস্তা গেছে সোজা

ইন্দোর শহরের দিকে। ঐ রাস্তায় বাস চলে। আমাদের মার্কণ্ডেয় যোগাশ্রমে যেসব ভক্তদেরকে গতকাল সন্ধ্যায় দেখেছিলেন, তাঁরা ইন্দোর থেকে বাস রিজার্ভ করেই এখানে এসেছিলেন। আজ ভোরেই ধর্মশালা থেকে তাঁরা বাসে চড়েই ইন্দোরের পথে যাত্রা করেছেন। তবে সেই পথে গেলে রাস্তা ভাল পেলেও নর্মদা কিনার হতে ক্রমশঃই দূরে চলে যাবেন ; নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে পরিক্রমা করা সম্ভব হবে না। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম—ভাল রাস্তা, পাকা রাস্তার জন্য নর্মদা তট ছেড়ে আমি যাব না। অমরকণ্টক থেকে আসছি, মুণ্ডমহারণ্য ও ওঁকারের ঝাড়ি লাখড়াকোট ও সীতাবনের মত মহাজঙ্গল অতিক্রম করে এসেছি। এখন লক্ষ্য মহাভয়ঙ্কর শূলপাণির ঝাড়ি। কাজেই সুখকর পথের লোভে আমি নর্মদা মাতার কোল ছেড়ে অন্য পথে পা বাড়াব না। এবারে আপনি ফিরে যান, আগামীকাল ২৭শে ভাদ্র সোমবার। স্মার্ত পণ্ডিতদের মতে এটি শিবের বার। কালই মহেশ্বরকে স্পর্শ করিয়ে আপনি কিংবা আপনার বাবা চারমুখী রুদ্রাক্ষটি ধারণ করবেন।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ; আজই কিছুক্ষণ পরেই ঔষধপত্র নিয়ে মাজনা-দাদার গ্রামের মদনলাল বদরীর ছেলেটিকে আমি দেখতে যাব।

পুনরায় তাঁকে সুক্রিয়া জানিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালাম। কিছুদূর হেঁটে গিয়ে আমি পেছন দিকে একবার তাকালাম। তখনও ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন ; আমাকে দেখে হাত নাড়ছেন।

মাইল দুই হেঁটে যাবার পরেই সত্যই এবার রাস্তা খারাপ পেলাম। ছোট ছোট পাথরের টিলা, উঁচু টিলা নর্মদার কোল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। কোথাও প্লাবিত করে, কোথাও বা সেইসব টিলা ভেদ করে নর্মদা বয়ে চলেছে। ডানদিকে তাকিয়ে দেখি বিন্ধ্যপর্বত ঘন জঙ্গলে ঢেকে গেছে। পায়ে চলার দাগ খুঁজে খুঁজে আমি আঁকা-বাঁকা পথে হাঁটতে লাগলাম। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা দুই হাঁটার পর আমি একটা বাঁধানো পরিষ্কার ঘাটে এসে পৌঁছলাম। ঘাট থেকে একটু দূরে দু'চারটে পাকাবাড়ী এবং একটা মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম। ঘাটে দুজন লোক ছিল, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেই জানাল এইটাই খলঘাট। 'ইহ্ সাটক নদীকী সংগম হৈ। ইহ্ স্থানকো খাটলিঙ্গী তীর্থ ভি কহা যাতা হৈ। ওহি দেখিয়ে, খাটলিঙ্গীকা

মন্দির দেখাই দেতা হ্যায়। আপ্ যাইয়ে না, উধর নাগা সাধুয়োঁকো ছাউনী পড়া হ্যায়।'

আমি ঘাটে নেমে নর্মদা স্পর্শ করলাম। হাত-মুখ ধুয়ে জল খেলাম। নর্মদার অপর পারে অর্থাৎ দক্ষিণতটে বহুলোকের বসতি চোখে পড়তে সেই স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই সেই দুটি লোক উত্তর দিল—'উধর্ উহ্ গাঁও হ্যায় গোপালপুরা। উস্‌কা পাশমেঁই কসরাবাদকী বস্তি।' ঘাটে দাঁড়িয়েই একটু দূরেই নর্মদার উপর একটা পুল চোখে পড়ল। আবার আমার কৌতূহলী দৃষ্টি অনুসরণ করে সেই লোক দুটির একজন আমাকে জানাল—'আগরাসে জো বম্বই কো পক্কী সড়ক যাতী হৈ, উহ্ য়হী নর্মদাকো পার করতী হৈ। নর্মদাজী পর পানি সে ১৫ ফুট উঁচা পক্কা পুল হ্যায়। কহতে হেঁ ব্রহ্মাজীনে ইসী স্থান পর তপ কিয়া থা।' এই বলেই লোক দুটি সেই ভর দুপুরবেলা কানের কাছে হাত রেখে দরাজ গলায় গেয়ে উঠল—

রেবা ধার অনেক ইত, অদ্‌ভূত মাঁকো টাট হৈ।
সাটক-সংগম ষাটশিব, অতি সমীপ খলঘাট হৈ॥

ভক্তদের ভাবোচ্ছ্বাসে কোন বাধা না পড়ে, তাই সতর্ক হয়ে সেখান থেকে ঘাটের উপর দিকে ষাটলিঙ্গী মন্দির লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলাম। মনে মনে ভাবছি, নর্মদা এতদঞ্চলের প্রাণের দেবী। অমরকণ্টক থেকে রেবাসংগম পর্যন্ত মা নর্মদাকে কেন্দ্র করে কত যে প্রবাদ, লোক-সাহিত্য, বাংলাদেশের নানা মঙ্গলকাব্যের মত কাব্য ও ছড়া যে তৈরী হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ষাটলিঙ্গী মন্দিরের দুয়ারে এসে পৌঁছে গেলাম। দরজাতে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। পাথরের দেওয়ালে গুণে গুণে দেখলাম, ষাটটি বিভিন্ন ধরণের শিবলিঙ্গ খোদাই করা আছে। আর মন্দিরের মেঝেতেও প্রতিষ্ঠিত আছেন ষাটটি বিভিন্ন প্রকারের শিবলিঙ্গ। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করছি, এমন সময় 'হর নর্মদে, হর নর্মদে', শব্দে কোলাহল উঠল। মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি একজন সাধু, মাথায় জটা চূড়া করে বাঁধা, হাতে ত্রিশূল, কাঁধে ঝোলা, আর তাঁর পেছনে প্রায় ত্রিশজন নাগা। তাঁদের কারও হাতে ত্রিশূল, কারও

হাতে মোটা লাঠি। প্রত্যেকেরই কাঁধে ছোটবড় গাঁঠরী, তাঁরা সারিবদ্ধ-ভাবে এসে মন্দির পরিক্রমা করতে লাগলেন। কেউ কেউ শাঁখ, শিঙ্গা বা ডম্বরু বাজাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে দুজন কুলীর কাঁধে তাঁবু ও নিশান—সঙ্গে দুজন পণ্ডিতও আছেন। তাঁরা মন্দির পরিক্রমা করেই নর্মদার ঘাটে গেলেন। আমার পূর্ব দৃষ্ট একজন লোক দৌড়ে এসে বললেন—ইয়ে সাধুয়োঁ। ছাউনি উঠাকর চল্ পড়ে। আপ্ পরিক্রমামেঁ যায়েঙ্গে ত ইন্‌লোগোঁকা সাথ যাইয়ে, আপ্‌কা আসানি হোগা। আমি মুহুর্তকাল চিন্তা করে সিদ্ধান্তে এলাম, লোকটি ঠিকই বলেছে। এই ছোট্ট জমাত্‌টির সঙ্গ ধরাই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। সকলের কাছেই শুনে আসছি, শূলপাণির ঝাড়িপথ ভয়ঙ্কর। আমার মা যখন তখন বলে থাকেন—'লোক লক্ষ্মী'। এই বিদেশে অজানা ভয়ঙ্কর পথে পাড়ি দিতে হলে সাথী থাকা ভাল। আমি তাড়াতাড়ি ঘাটে পৌঁছে তাঁদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝোলা, গাঁঠরী ও তাম্বু নিশান প্রভৃতি রেখে সকলেই নর্মদা স্পর্শ করলেন। একজন নাগা ঝোলা থেকে রূপার একটি পঞ্চপ্রদীপ বের করে তাতে ঘৃতসিক্ত তুলার বাতি সাজিয়ে তাঁদের প্রধান দলপতি সেই জটাজুট চূড়াধারীর হাতে দিলেন। তিনি পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে নর্মদা মায়ীর আরতি আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে বন্দনাপাঠ সুরু হল।

ওঁ নমোঽস্তুতে দেবি সমুদ্রগামিনি
নমোঽস্তুতে দেবি বরপ্রদে শিবে।
নমোঽস্তুতে লোকদ্বয়সৌখ্যদায়িনি
হ্যনেক ভূতৌঘ সমাশ্রিতেঽনঘে॥

হে সমুদ্রকো জানেবালী দেবি! তুম্ হে নমস্কার হৈ। হে বরদান দেনেবালী দেবি! হে কল্যাণ করণেবালী দেবি। তুম্ হে নমস্কার হৈ। হে ইস্‌লোক তথা পরলোক দোনোঁ লোকমেঁ সুখ দেনেবালী দেবি! হে অনেক প্রকারকে প্রাণীয়োঁ সে প্রশংসিত পাপরহিত দেবি! তুমহেঁ বারবার প্রণাম হৈ।

আরতি শেষ করে দলপতি মহাত্মা নিজে এবং অন্যান্য সকলের মাথায় নর্মদার জল ছিটিয়ে দিয়েই শিঙ্গা ও ডম্বরু বাজাতে বাজাতে নর্মদার তট

ধরে হাঁটতে লাগলেন। আমিও তাঁদের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলাম। নীরবে বোধহয় মাইল তিনেক হেঁটে যাওয়ার পর সেই দলপতি হেঁকে বললেন—'ইয়ে সুন্দরের মহল্লা হৈ। ইধর থোড়া বিশ্রাম কিয়া যায়।' এই বলে তিনি একটি আবলুষ গাছের তলায় বসার উদ্যোগ করতেই একজন নাগা শশব্যস্তে একটি হরিণছাল বিছিয়ে দিলেন এবং এক কল্‌কে গাঁজা সেজে দিলেন। অন্যান্য নাগারাও বিভিন্ন গাছের তলায় গিয়ে দলপতিকে আড়াল করে গঞ্জিকা সেবনে রত হলেন। আমিও তাঁদের কাছ থেকে একটু দূরে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। এই সময় একজন অল্পবয়সী (বয়স বোধহয় ৩৪।৩৫) নাগা আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—আপ্ কাহাঁকা রহনেবালা হো? আপ্ ক্যা একেলা পরকরমা কর্ রহে হো? আমি সংক্ষেপে আমার বৃত্তান্ত বললাম। আমার কথা শুনেই পরিষ্কার বাংলায় বললেন—আপনি বাঙ্গালী জেনে আমার খুব আনন্দ হল, আমিও বাঙালী। মেদিনীপুর জেলার বাদাড় গ্রাম আমার জন্মস্থান। বি. এ. পাশ করে যখন কলকাতায় গিয়ে এম. এ. পড়ার উদ্যোগ করছি, সেই সময় মেদিনীপুর শহর হতে দশবার মাইল দূরে ধলহারা নামক গ্রামে শ্রীশ্রীপাগলীমা নামে যোগসিদ্ধা মায়ের কথা শুনি। তাঁর অলৌকিক যোগবিভূতি ছিল। প্রতিদিনই তাঁর কাছে হাজার হাজার লোক যেত ভাগ্য গণনা করতে। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই তিনি নাম ধাম, কে কিজন্য এসেছে, কোন্ সমস্যায় পড়ে এসেছে, তার প্রতিকারই বা কি, তা তিনি গড়গড় করে বলে দিতেন। মনে হত, যে ভক্ত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর সমগ্র জীবনপট তাঁব সামনে যেন আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে গেছে। তিনি কেবল দেখছেন আর বলে যাচ্ছেন। এমন কি, তাঁর কাছে সেই ধলহারা গ্রামে আসতে আসতে, ভক্ত কোথায় কোথায় বিশ্রাম করেছিল বা কার সঙ্গে কি কি কথা বলেছিল, তাও তিনি বলে দিতে পারতেন। তাঁর ন ইঞ্চি দীর্ঘ একটি অষ্টধাতু নির্মিত গৌরী মূর্তি ছিল। এই শ্রীশ্রীগৌরীই ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবী। তাঁর গৌরী-পূজার রীতিও ছিল বিচিত্র। একটা ছোট্ট তামার বাটিতে ছটাকখানিক মধু নিয়ে তিনি মন্দিরে ঢুকতেন ঠিক বেলা ১২-টায়। ঢুকেই অশ্লীল ভাষায় গালি পাড়তেন গৌরীর উদ্দেশ্যে—'কি লো! বাপভাতারি! সবাই জানে. শিব তোর ভাতার! সেই ভাতারকেই তুই পায়ে করে দলছিস্। আবার

তাকে ছেলে হিসাবে পেটে ধরে বসে আছিস্। ওলো ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরি, নে নে হাঁ কর, আগে তোর পেটের জ্বালা মেটাই।' এই বলে তিনি আঙুলে করে মধু তুলে তুলে গৌরীমূর্তির ঠোঁটে ঠেকাতেন আর সেখানে সঙ্গে সঙ্গে চুক্ করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠত। হাজার হাজার ভক্তের সামনেই এই ঘটনা নিত্য ঘটত।

সারা মেদিনীপুর জেলা জুড়ে তাঁর নাম ছিল। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাংলাদেশ জুড়ে। কলিকাতাতেও তাঁর অজস্র ধনী মানী ভক্ত ছিল। আমি এম. এ. তে ভর্তি হওয়ার জন্য যখন উদ্গ্রীব, কিন্তু বাসার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছি না। সেই সময় আমাদের বাদাড় গ্রামেরই তাঁর কিছু ভক্ত আমাকে বলেন—কলিকাতায় আমাদের পাগলী মায়ের অনেক শিষ্যভক্ত আছেন, তুমি পাগলী মায়ের শরণ নাও; তিনি ইচ্ছে করলেই তোমাকে কলিকাতায় থেকে এম. এ. পড়ার ব্যবস্থা অতি সহজেই করে দিতে পারবেন। সেই আশাতেই আমি মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে পাগলীমাকে দর্শন করতে যাই। গিয়ে দেখি তাঁর সামনে প্রায় একমাইল দীর্ঘ লাইন, শুধু মানুষ আর মানুষ। আমরা তিনজনও লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন ছিল চৈত্র মাস। প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বাবা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। আমি তাঁকে ধরে বসিয়ে ছুটে যাই একটা পুকুরে জল আনতে। জল এনে বাবার চোখে-মুখে ঝাপটা মারছি, এমন সময় জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, রব উঠল পাগলীমা আসছেন। আমি চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, নগেন সাধু নামে তাঁর এক ভীমকায় ভক্ত চিৎকার করে বলতে বলতে আসছেন—বাদাড় হতে ঈশান মাইতি নামে কেউ এসেছে কি? এসে থাকলে হাত তোল, হাত তোল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুললাম। নগেন সাধুর পেছনেই পাগলীমা। স্বর্ণকান্তি দ্যুতি, স্বর্ণকেশী ভৈরবীমূর্তি। কপালে বড় সিন্দুরের ফোঁটা, সিঁথিতেও সিন্দুর, বেঁটে-খাটো মানুষটি, আমাদের কাছে এসে বাবার মাথায় হাত দিলেন। বাবা চোখ মেলে তাকাতেই তিনি বললেন—'একটু আগে জল খা দিকি।' নগেন সাধুর দিকে তাকিয়ে বললেন—'একে কোলে করে ঐ আশুদ্ (অশ্বত্থ) গাছটার ছায়ায় নিয়ে বসিয়ে দে। আশ্রম থেকে ভোগ এনে খাইয়ে দে। এক্ষুনি, এক্ষুনি। আগে এরা তিনজন খাবে। তারপর গৌরী খাবে। আমার দিকে

তাকিয়ে বললেন—তোর এম. এ. পড়া হবে না বাছা। তোর সন্ন্যাস বৃত্তি। ঝাড়েশ্বরের থানে, তমাল নদীর ধারে পড়ে থাক্‌গে যা। ঝাড়েশ্বর লোক জুটিয়ে দেবেন।'

এই বলেই তিনি আশ্রমে ফিরে গেলেন। একটু পরেই সেই নগেন সাধু গামলায় শালপাতা ঢাকা দিয়ে প্রচুর অন্নব্যঞ্জন এনে দিলেন। নগেন সাধু বললেন—'তোমরা খাওয়া দাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বাড়ী ফিরে যাও। পাগলী আমাদের স্বয়ং ব্রহ্মময়ী। বেটি একবার যা বলে দিয়েছে তার আর রদবদল হবে না। আমি ছিলাম ডাকাত। বেটির পাল্লায় পড়ে আমি সাধু বনে গেছি। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে যাকে দেখছি ত।'

আমি বললাম—আপনার কথা মানতে পারলাম না। দৈবই সব নয়, পুরুষকার বলে একটা কথা আছে। আমি এম. এ.-তে ভর্তি হয়েই মার সঙ্গে এসে দেখা করব।

আমার কথা শুনেই তিনি অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়লেন—হাসতে হাসতেই ছড়া কাটলেন,—কত গেল রথ রথী, শেওড়াতলায় চক্কোত্তি।

আমরা কতকটা হতাশ হয়েই ফিরে এলাম ধলহারা থেকে। বাড়ী যেতে যেতে বাবা বলেছিলেন—'মতি! তুই কিছু ভাবিস নি। তুই আমার একমাত্র ছেলে। আমার একশ বিঘে জমি আছে। জমি বেচে বেচে আমি তোর পড়ার খরচ চালাব, মেসের খরচাও চালাব। তুই কয়েকদিন পরেই কলকাতায় চলে যা। একটা মেসে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে এম. এ.-তে ভর্তি হয়ে যা।' কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ঘটে যায় আর এক রকম।

আপন ইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণ না পূরালে বাঞ্ছা কে পূরাতে পারে?

বাড়ী ফিরে যাওয়ার তিনদিন পরেই আমি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলাম। গায়ে বসন্তের গুটি দেখা দিল। মা বাবার অক্লান্ত সেবা এবং স্নেহস্পর্শে আমি পনের দিন পরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। কিন্তু মা পড়লেন মারাত্মক বসন্ত রোগে। কবিরাজ বললেন—রক্তচামদল বসন্ত। সারা শরীরে লাল ছোট ছোট ঘামাচির মত গুটি বেরোল। মাত্র তিনদিন রোগ ভোগ করেই তাঁর জীবনান্ত ঘটল। বাবারও শরীরে বসন্ত দেখা দিল। এগার দিনের

দিন তিনিও গত হলেন। আমার শরীরেই কালরোগ প্রথম এসে ছোবল মেরেছিল। আমি গেলাম বেঁচে কিন্তু মা বাবা চলে গেলেন। আমার সব সাধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হল। আমি একদিন গ্রাম ছেড়ে, সেই শ্মশানভূমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন একটি গ্রামের নির্জন কালী মন্দিরে রাত্রিবেলা আশ্রয় নিলাম। মন্দির বলতে একটা খড়ের আটচালা। শ্মশান। শ্মশানের ধার দিয়েই একটা ছোট নদী বয়ে চলেছে। সকাল হতেই একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—এটি কোন্ নদী? লোকটি উত্তর দিল—'তমাল নদী, আপনি ঝাড়েশ্বরের মন্দির যাবেন ত? নদীতে এক হাঁটু জল, নদী পেরিয়ে চলে যান—ঐ তো মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে।' তমাল নদী ও ঝাড়েশ্বরের নাম শোনা মাত্রই আমার পাগলী মায়ের কথা মনে পড়ে গেল! বুঝলাম তিনি অমোঘ নিয়তির অদৃশ্য বিধান সেদিন শুনিয়েছিলেন আমাকে। তমাল নদীতে স্নান করে গিয়ে পৌঁছলাম ঝাড়েশ্বর মন্দিরে। সেখানে পৌঁছে দেখি পাঁচ পাঁচটা বিরাট বিরাট বটগাছ ঘিরে আছে মন্দিরকে। মন্দিরের পেছনেই এক বিরাট দীঘি। বটগাছের তলায় ধূনি জেলে বসে আছেন এক সাধু। আমি তার কাছেই দীক্ষা নিই, ঝাড়েশ্বরে দুদিন থেকে সেই সাধুর সঙ্গেই কাশীতে পৌঁছি। কাশীতে ক্রীমকুণ্ডে কেনারাম বাবার মঠে থেকে আমি ব্যাকরণ ও কাব্য পড়তে আরম্ভ করে আচার্য উপাধি প্রাপ্ত হই। আমি যে মহাত্মার সঙ্গে কাশীতে পৌঁছেছিলাম, তিনি ছিলেন অঘোরপন্থী। কেনারাম বাবার মঠটাও অঘোরপন্থীদের আখড়া। অঘোরপন্থীদের বীভৎস কার্যকলাপ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। ইতিমধ্যে আমার আশ্রয়দাতারও দেহান্ত ঘটেছে। সেই সময় প্রয়াগে অর্ধকুম্ভমেলা হচ্ছিল। আমি কাশী ছেড়ে প্রয়াগে চলে যাই। সেইখানেই এই মহাপুরুষের দর্শন পাই। এঁর নাম শ্রীশ্রীনগেন্দ্র ভারতী। নর্মদাতটের প্রসিদ্ধ মহাত্মা নর্মদা পরিক্রমার অন্যতম প্রবর্তক কমলভারতীজীর গদীর বর্তমান মোহান্ত ইনি। এবার আপনার বৃত্তান্ত আমাকেও কিছু বলুন।

আমি বললাম—আপনি এতক্ষণ ধরে যা শোনালেন, তাহল "মার কাছে মাসীর বাড়ীর গল্প"। কারণ আপনার বর্ণিত স্থান, ও নিয়তির অমোঘ খেলা সবই আমার ঘনিষ্ঠভাবে জানা চেনা। আপনার বাদাড় গ্রাম আমি

চিনি। বাদাড় গ্রামে কংসাবতী নদীর তীরে যে বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির, তার সত্বাধিকারী প্যারিয়াল বাড়ী আমার বাবার মামা বাড়ী। সেই দাদুর বাড়ী আমি বাবার সঙ্গে দু'তিনবার গিয়েছি। আমার জন্মস্থান কালিয়াড়া গ্রাম। আমাদের গ্রাম হতে ১১ মাইল দূরেই অকড়া, বাজার-চণ্ডী, কুলিয়াড়া, মেউদীপুর, রামনগর, মুকুন্দপুর প্রভৃতি গ্রাম পেরিয়েই আপনার বাদাড় গ্রাম। ধলহারা গ্রামের পাগলীমা আমার অত্যন্ত সুপরিচিত, অত্যন্ত কাছের মানুষ। তিনি তান্ত্রিক ছিলেন বলে এবং তন্ত্রের প্রতি আমার বাবার অশ্রদ্ধা ছিল বলে, আমি যখন তখন তাঁর কাছে যেতে পারতাম না অর্থাৎ আমার বাবা আমাকে যেতে দিতেন না। আমার বাবা ছিলেন কট্টর বেদপন্থী, অগ্নিহোত্রী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। তিনিই আমার জীবনের যথাসর্বস্ব। তবুও একবার তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি পাগলীমাকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স নয়, সবেমাত্র তখন উপনয়ণ হয়েছে। আমার বাবার কথা বাদ দিলে একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে মহাযোগিনী পাগলীমার দর্শনই আমার জীবনের প্রথম সাধুদর্শন। তাঁর মুহুর্মুহু সমাধির অবস্থা আমি দেখেছি। ধলহারা গ্রামে আমাদের বহু আত্মীয় আছেন। তাঁদের বাড়ী গেলেই আমি পাগলীমাকে দর্শন করতে যেতাম। তিনি গৌরীমূর্তির ঠোঁটে মধু ছোঁয়ালেই যে আলো জ্বলে উঠত তা অন্ততঃ দশবার আমি নিজের চোখেই দেখেছি। তাঁর অলৌকিক বিভূতির অনেক ঘটনা আমার জানা আছে। একবার আমার দাদা, আমাদের গ্রামবাসী পুঁটিরাম পাত্র নামক পাগলী মায়ের এক ভক্তের সঙ্গে পাগলীমাকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সামনে দাঁড়াতেই ভাবাচ্ছন্ন অবস্থায় বলতে লাগলেন—'এই যাঃ! গেল গেলরে! যাক্ ঠিকমত লাফিয়ে ধরতে পারল না। তোর মায়ের সরের বাটি বেঁচে গেল। পরে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বললেন—তোর মা ঘি করবার জন্য একবাটি সর শিকাতে রেখেছে। একটা বিল্লী ঝাঁপ দিয়েছিল সরের বাটি লক্ষ্য করে। কিন্তু তোর বোন সময় মত এসে পড়ায় রক্ষা পেল। কিছুক্ষণ পরেই আবার ভাবের ঘোরে বলতে লাগলেন—ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে। ভীষণ বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল। মুহুর্মুহু বাজ পড়ছে। তোর বাবা আমার নিন্দা করে, এবার বামুন জব্দ হবে! একটা বাজ মাথায় পড়লেই বামুন কাৎ! তাঁর কথায় দাদা

এবং অন্যান্য সকলেই চমকে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, আকাশ পরিষ্কার, বেলা তখন ৪টা, চারদিক রোদে ঝলমল করছে। পরক্ষণেই পাগলীমা বললেন—নাঃ. তোর বাবা রক্ষা পেয়ে গেল। তোর বাড়ীর পূবদিকে মাঠের মধ্যে ঝাঁকড়া আশুদ (অশ্বত্থ) গাছটা আছে তার তলায় তোর বাবা দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। হুঁ হুঁ বাবা! ও বামুনের চোখে আগুন, মুখে আগুন, ফুঁয়ে আগুন, বাজের বাপেরও ক্ষমতা নেই, ঐ বামুনের ক্ষেতি (ক্ষতি) করতে। দাদা পরদিন বাড়ীতে এসে মিলিয়ে নিয়েছিলেন, ঘরের বাটিতে বিল্লীর ঝাঁপ এবং কালবৈশাখীর ঝড়ের মুখে বাবার অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়ানো, মুহুর্মুহু বাজ পড়া প্রভৃতি ঘটনা সবই সময় ও কাল ধরে অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। কাজেই একটু আগে যে আপনি বললেন কেউ পাগলী মায়ের চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেই তার সমগ্র জীবনপট, তার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যেন একটা আয়নার মধ্যে স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠত, তার অলৌকিক দৃষ্টি প্রদীপে সবই ভেসে উঠত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর তিরোধানের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। ১৯৫০ সালের বাসন্তী পূজার দিনে তিনি যোগাসনে বসে মহা-সমাধিতে প্রবেশ করেন। মৃত্যুর ১৫ দিন আগে থেকে তিনি তাঁর দেহান্তের তিথি, বার ও ক্ষণ সকল ভক্ত শিষ্যদের কাছে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। তার পরের বছরেই ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশীর দিন আমার বাবাও যোগস্থ হয়ে দেহরক্ষা করেন।

বাবার শ্রাদ্ধান্তেই আমি গৃহত্যাগ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল, আমি নর্মদা পরিক্রমা করি, তিনি দেহে থাকাকালেই এম. এ. পরীক্ষা দেবার পরেই তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন অমরকন্টকে। সেবার অমরকন্টক হতে জব্বলপুর পর্যন্ত আমি ঘুরে যাই। বাবার দেহান্তের পর তাঁর ইচ্ছে বা আদেশ পালনের জন্য আমি বেরিয়ে পড়েছি, অমরকন্টক হতে রেবাসংগম পর্যন্ত সমগ্র নর্মদা পরিক্রমা করার জন্য। এইখানেই আমার জীবনের সঙ্গে আপনার জীবনের একটা মর্মান্তিক সাদৃশ্য দেখছি। আপনার পিতার মৃত্যুর পর আপনি সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছেন, বাবাকে হারিয়ে আমার জীবনের গতিপথও গেছে বদলে।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই মোহান্ত মহারাজ হাঁক পাড়লেন—

আভি সব তৈয়ার হো যাও। যাত্রা করেঙ্গে। মতীন্দর কাঁহা গৈল বা? মতীন্দর?

মতীন্দর অর্থাৎ মতীন্দ্র ভারতীজী ব্যস্তব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। আমার হাত ধরে বললেন—'চলুন, আপনাকে গুরুজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।' তাঁর সঙ্গে আমি গিয়ে মোহান্ত মহারাজকে অভিবাদন ও দণ্ডবৎ জানালাম। মতীন্দ্রজী তাড়াতাড়ি আমার পরিচয় এবং আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জানাতেই মোহান্তজী আমাকে হাসিমুখে বললেন—মতীন্দরকা দোস্ত্ হমারাভি দোস্ত্। আপ হমারা পাশমেঁ চলিয়ে গপ্‌গপাতে (অর্থাৎ গল্প করতে করতে) হম্‌লোগ চলেঙ্গে। ইতিমধ্যে নাগারা প্রস্তুত হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। মোহান্তজী রব তুললেন—হর নর্মদে! এক সঙ্গে সবাই বলে উঠলেন—হর নর্মদে। বেলা তখন বোধ হয় দুটা বা আড়াইটা হবে। নাগারা যথারীতি শিঙ্গা ডম্বরু মাঝে মাঝেই বাজাতে লাগলেন। আমি তাঁর পাশে পাশেই গল্প করতে করতে হাঁটতে লাগলাম। তিনি বলতে থাকলেন—মতীন্দর্ খুব যোগনিষ্ঠ। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় ওর সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটে। আমিই ওকে সন্ন্যাস দিয়েছি। ওর সেবায় আমি খুবই সন্তুষ্ট। বুদ্ধিমান ও বিদ্বান। আজকাল আমার ওকে ছাড়া চলেই না। শুনলাম, তুমি তার একরকম গ্রামবাসী বললেই চলে। নর্মদা মার মহিমা বলে শেষ করা যায় না। নর্মদা পরিক্রমাই একটা মহা তপস্যা। তাই আমার দাদাগুরু ব্রহ্মলীন মহাত্মা কমলভারতীজী নর্মদা পরিক্রমার মাহাত্ম্য বা প্রচারকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আমি তাঁকে বললাম —আমি মণ্ডলেশ্বরে আপনার আশ্রমে শুনে এসেছিলাম, কোন গুরুতর প্রয়োজনে আপনি নাকি গুজরাট গিয়েছেন। এভাবে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি। আপনি ত এভাবে জঙ্গলের পথে পদব্রজে না গিয়ে ট্রেন বাস প্রভৃতির সাহায্যেও সহজেই গুজরাট যেতে পারতেন।

—তা যেতে পারতাম। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনবার আমি নর্মদা পরিক্রমা শেষ করেছি। গুজরাটে আমাদের দাদাগুরুর আমল থেকে আমাদের বহু শিষ্য ভক্ত আছে। তাই প্রতিবছরই এই সময় একবার করে আমাকে গুজরাট যেতে হয়। কিন্তু সম্প্রতি আমি পাঁচজন নূতন ভক্তকে সন্ন্যাস দিয়েছি। ভাবলাম, যদি মণ্ডলেশ্বর থেকে কড়াই প্রসাদ করে পরিক্রমা ওঠাই

এবং ভারোচে গিয়ে রেবা-সংগমে পরিক্রমা শেষ করি তাহলে সে বেচারাদের একরকম রুণ্ডা পরিক্রমা হয়ে যাবে। এতেও অনেকটা পুণ্য। তাই এইভাবে চলেছি। আমি খলঘাটে সাতদিন ছিলাম। সেখানে মহারুদ্র যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম। অগণিত ভক্তের ভীড় হয়েছিল। তাই আটকে পড়েছিলাম। যাক্ তাতে আমার ভালই হয়েছে। নতুবা তোমার সঙ্গে দেখা হত না। তুমি আমার আশ্রম হতে ফিরে এসেছ। সেখানে যে অপদার্থরা রয়েছে, অনুমান করছি, তারা অতিথি বা অভ্যাগত হিসাবে নিশ্চয়ই তোমার আপ্যায়ন করেনি। মা নর্মদা এইভাবে তোমাকে মিলিয়ে দিয়ে আমার সেই অপরাধ খণ্ডন করালেন।

—না, না আপনার আশ্রমে দুজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাঁদের কাছে অভ্যাগত হিসাবে আতিথ্য গ্রহণ করতে যাইনি। আমি পণ্ডিত ভট্টনারায়ণজীর বাড়ীতে উঠেছিলাম। তিনি এবং তাঁর ধর্মপত্নী আমার যথেষ্ট যত্ন করেছেন। তাঁর সঙ্গেই আমি আপনার আশ্রমে গিয়েছিলাম আপনার খোঁজ করতে। আপনার সঙ্গে দেখা করার খুব আগ্রহ ছিল, মা নর্মদা আমার সে ইচ্ছা পূরণ করেছেন। খলঘাটে তাই সহসা দেখা হয়ে যেতে, তখন আপনারা প্রস্থানোদ্যত জেনে আমি পত্রপাঠ খলঘাট থেকে আপনাদের জমাতের সঙ্গ ধরেছি বা বলতে পারেন আপনাদের পিছু নিয়েছি।

এই বলে আমি হেসে ফেললাম। তিনিও হাসতে হাসতে বললেন—ভালই করেছ। যতীন্দরকে আমি সন্তানের মত ভালবাসি, বৃদ্ধ হয়েছি, যদি আমার ‘গুরুচক্রে’ তাঁর নাম ওঠে, তাহলে হয়ত আমার অন্তিমকালে তাকেই পরবর্তী মোহান্ত পদে অভিষিক্ত করে যাব। যতীন্দরের (যতীন্দ্রের) দেশের লোক বলে তুমিও আমার সন্তানতুল্য। তাছাড়া তুমি পিতৃ আদেশে নর্মদা পরিক্রমার মত সুকঠিন ব্রত গ্রহণ করেছ বলে আমার মন দ্রবীভূত হয়েছে। তুমি আমার সম্প্রদায়ের হও আর না হও, আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ কর আর না কর, যাঁরাই নর্মদা পরিক্রমা করেন, তাঁরা সকলেই নর্মদার সন্তান। সেই হিসাবে আমরা সকলেই সহোদর ও সুহৃদ। এই শিক্ষাই আমাদের দাদাগুরু কমলভারতীজী আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। তুমি কিছুদিন থাকতে থাকতেই বুঝতে পারবে, আমাদের কোন সাম্প্রদায়িক

গোঁড়ামি নেই। তুমি কোন সংকোচ করো না আমাদেরকে নিজের লোক ভেবেই ভারোচ রেবা সংগম পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাক। ধর্মপুরী থেকেই আমাদের যে যাত্রাপথ সুরু হবে, সেই যাত্রা হবে কঠিনতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, পরিক্রমাবাসীর অগ্নি পরীক্ষা। এই অগ্নি পরীক্ষার নাম শূলপাণির ঝাড়ি। যেমন কঠোর পাহাড়ী পথ, তেমনি ভয়ঙ্কর গভীর জঙ্গল। দক্ষিণ তটে রাজঘাট থেকে শূলপাণিশ্বর মহাদেবের মন্দির, আর এই উত্তরতট চিখলদা থেকে পিপ্পলাদের আশ্রম পর্যন্ত এই জঙ্গলের সীমা। এই তটেও শূলপাণির মন্দির আছে। উভয় তটেই ঘন গভীর জঙ্গল। মুণ্ডমহারণ্য বা বা ওঁকারেশ্বর ঝাড়িতেও হিংস্র শ্বাপদের ভয় আছে বটে, কিন্তু এই জঙ্গলে তাদের সংখ্যা অনেক বেশী, তারপর আছে দুর্দান্ত ভীলদের লুটপাট ও অত্যাচারের ভয়। কাজেই দলবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে যাত্রা করাই ভাল। তুমি যতদিন আমার জমাতে থাকবে, ততদিন তুমি আমার সন্তানের মতই থাকবে। অন্তত: আমি তোমাকে সেই চোখেই দেখব।

মহাত্মার সরল ও সহৃদয় ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করল। লাখড়াকোটের জঙ্গল পথে মহেশ গিরি ও তাঁর সেই দুর্দান্ত নাগাদের সঙ্গে এঁর কত তফাৎ! তাঁদের সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু এঁর মন কত উদার! এই গুণেই এঁর অপর গুরু ভ্রাতা মোহনগিরি কিছু অনুচর নিয়ে আলাদা হয়ে গেলেও অধিকাংশ শিষ্যবর্গ এঁকেই তাঁদের দলপতি হিসাবে মান্য করেন এবং যতীন্দ্র ভারতীর মত অনেক শিক্ষিত যুবকও এরই নিশান বা পতাকার তলে এসে মিলিত হয়েছেন।

এমন সময়, যতীন্দ্র ভারতীজী পেছন থেকে চিৎকার করে উঠলেন গুরুজী! সামনেমেঁ নর্মদা কী পানি হ্যায়। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি পাহাড়ী পথ জলে থৈ থৈ করছে। পশ্চিমগামিনী নর্মদার সুন্দরের ঘাট থেকে আমরা উত্তর দিকে ক্রমশঃ উঁচুতে উঠে আসছিলাম জঙ্গল ঘেরা পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। হঠাৎ এখানে জল কোথা হতে এল? নর্মদার আবির্ভাবই ঘটল কিভাবে?

কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই মোহান্তজী বললেন—যে বছর প্রবল বর্ষা হয়, সে বছর নর্মদার জল উজান বেয়ে ধর্মপুরী মন্দিরকে ঘিরে ফেলে।

তখন মন্দিরকে একটি দ্বীপ বলেই মনে হয়। এখানকার লোকেরা 'ধর্মপুরী দ্বীপ' বলে। এবছর প্রবল বর্ষণ হয়েছে, তাই নর্মদা কূল প্লাবিত করে উঠে এসেছেন। দু' তিন মাস পরেই এ জল থাকবে না।

নর্মদার জল স্পর্শ করে, মাথায় ছিটিয়ে দুজন নাগা আগে আগে চলতে থাকলেন সতর্কভাবে পা ফেলে ফেলে। তাঁদের পেছনে তাঁদেরই পদক্ষেপ লক্ষ্য করে মোহান্তজীও জলে নেমে হাঁটতে লাগলেন। তাঁকে ঘিরে রেখেছেন যতীন্দ্র ও আর একজন নাগা। আমি তাঁদের পেছনে। জলের নিচে পাথর; জল বেশী নয়, হাঁটুর নিচে। তবে একটু এদিক সেদিক বা অসাবধান হলেই গভীর দহে পড়ে হাবুডুবু খেতে হবে। একথা অগ্রবর্তী নাগারা পথের ডাইনে বাঁয়ে লাঠি ঠেকিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন এবং হুঁসিয়ার করছেন। প্রায় আধঘন্টা লেগে গেল জল পেরিয়ে মন্দিরের কাছে পৌঁছাতে। প্রায় ২০০ ফুট উঁচু পাহাড় টিলার উপর পাথরের বিরাট প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের সীমায় উঠতে কুড়ি-পঁচিশ ফুট বাকী এমন সময় গোটা দশেক বুনো কুকুর দলবেঁধে তেড়ে এল। ভীষণাকার এই কুকুররা জ্যান্ত মানুষের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। নাগাদের গোটা দলটাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল; সে কেবল মিনিট খানিকের জন্য। চোখের নিমেষ ফেলতে না ফেলতেই নাগাদের হাত হতে আট-দশটা ত্রিশূল উৎক্ষিপ্ত হল সজোরে কুকুরের দলকে লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্য। তাদের চারটের গায়ে ত্রিশূল গিয়ে বিদ্ধ হল। সে কি বিকট চিৎকার। তারা যেন আরও মারমুখী হয়ে তেড়ে আসতে চায়। কিন্তু শিঙা ডম্বরুর শব্দে শেষ পর্যন্ত কুকুরের দল পিছু হটল। আমরা কালেশ্বর ভৈরবের মন্দিরে উঠে এলাম। মন্দিরের দরজা হয়ত কোনকালে ছিল, এখন নেই। মন্দিরের মধ্যে একে একে ঢুকে সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ছাউনী ফেলার ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন সবাই। তাঁবু টাঙানো, কাঠ কেটে এনে ধূনি জ্বালার ব্যবস্থা, ইত্যাদি সব কাজই আধঘন্টার মধ্যে চুকে গেল। বেলা তখন বোধহয় সাড়ে পাঁচটা কিংবা ছটা হবে। তখনও রোদ আছে। মহেশ গিরির নাগাদলেও দেখেছি, এখানেও দেখছি, নাগারা মিলিটারী ডিসিপ্লিনে সবাই মিলে কাজ করে, ক্ষিপ্র এবং ত্বড়িৎগতিতে।

মন্দিরের চারপাশ প্রশস্ত চওড়া বারান্দা। নাগারা যে যার কমণ্ডলুতে

টিলার তলদেশ থেকে উপচানো নর্মদার জল এনে বারান্দা এবং মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেললেন। মন্দিরের বারান্দা থেকে যেদিকে তাকাই সে দিকেই দেখি ঘন জঙ্গল। ভাল করে লক্ষ্য করলে কোথাও কোথাও জঙ্গলের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো দু' চারটে জঙ্গলী কুটীর চোখে পড়ছে। মহান্তজী বললেন—দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তাকাও, বাকানারার জঙ্গল চোখে পড়বে। ওখানে ভীলদের বাস। এই মন্দিরের কালেশ্বর ভৈরবজী দক্ষিণদিকে নর্মদার দিকে মুখ করে আছেন। এখান থেকে ঠিক সোজাসুজি তাকাও; নর্মদার দক্ষিণতটে বহু ঘরবাড়ী চোখে পড়বে। পাশাপাশি দুটি বস্তি—একটির নাম কঠোরা, আর একটির নাম ব্রাহ্মণগাঁও। কিন্তু অন্যান্য যে দিকে তাকাবে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। এখান থেকে চিখলদা পৌঁছে আমরা যতই এগুবো, ততই জঙ্গল আরও ঘন হবে। ভীল, ভীলালা ছাড়া আর কোন মানুষজন চোখে পড়বে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পরিক্রমার পথে বারবার নানাজনের মুখে ভীলদের কথা শুনে আসছি। দু'চারজন ভীলকে দেখেছি। তাদের কালো-কুচ্‌কুচে লোহাপেটা শরীর এবং তাদের দ্রড়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাদের মুখের সরল হাসি দেখে তাদেরকে আদৌ ভয়ঙ্কর জীব বলে মনে হয়নি। ওরা সত্যই কি নিষ্ঠুর প্রকৃতির?

—আগে শূলপাণির ঝাড়িতে প্রবেশ কর, চিখলদা অতিক্রম কর, তারপর নিজের চোখেই ওদের স্বরূপের পরিচয় পাবে। ভীলরা মধ্যপ্রদেশের সহজ সরল আদিবাসী সন্দেহ নেই কিন্তু অভাবের জ্বালায় এরা লুটপাট করতে বাধ্য হয়। তখন এরা সত্যই ভয়ঙ্কর। এদেরকে নর্মদামায়ীর খাস চৌকিদারও বলা যায়। পরিক্রমাবাসীরা ঠিক ঠিক শুচিশুদ্ধভাবে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পরিক্রমা করছে কিনা, কোন অনাচার করছে কিনা, তা এরা লক্ষ্য রাখে। কালো কালো গাছের আড়ালে নিজেদের কালো মিশ্‌মিশে শরীরকে মিশিয়ে দিয়ে এরা সংগোপনে অনুসরণ করতে থাকে। এদের সোজা হিসেব, মা নর্মদার শরণ নিয়ে যারা পরিক্রমায় বেরিয়েছে, মা নর্মদাই ত তাদেরকে পালন করবেন, যথাসময়ে তাদেরকে আহার যোগাবেন। তারজন্য পরিক্রমাবাসী সাধু নিজের কাছে খাদ্য বা টাকাকড়ি সঞ্চয় করে রাখবেন কেন? তবুও যদি কেউ রাখেন, তাহলে এদের হাতে তাঁদের

নিস্তার নেই। কোন সাধুকে যদি একান্তই অসহায় এবং নিঃসম্বল দেখে, তাহলে এরাই তাকে যা তাদের যৎকিঞ্চিৎ সম্বল আছে, তাই দিয়ে অর্থাৎ মকাই জোয়ার প্রভৃতি দিয়ে সাধুদেরকে আহার্য দিয়ে থাকে।

আর্য অনার্য এই ভেদ বিচারের কথা আমি মুখে উচ্চারণ করব না। কারণ আমাদের গুরুপরম্পরায় এই শিখেছি যে সবাই শিবের সন্তান। এরা কতকটা কোল বা মুণ্ডাজাতীয়, ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে মান্দালা জব্বলপুর সমগ্র নিমাড় জেলা হয়ে মধ্যভারত ও রাজপুতনায় একসময় এরা ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজপুতরা নিজেরাই স্বীকার করে যে ভীলরা তাদের পূর্ববর্তী। শিশোদীয় রাজপুত গোহ ভীলদের রাজা হয়েছিলেন। ভীল সর্দার নিজের আঙুল কেটে তাঁর কপালে রাজতিলক পরিয়ে দিয়েছিল। ভীলদের আদি দেবতা মহাদেব। তাদের মধ্যে এই উপকথা বা কিংবদন্তী প্রচলিত যে স্বয়ং শিবের ঔরষে এক পরমাসুন্দরী বন্যরমণীর গর্ভজাত সন্তান থেকে ভীলজাতির উৎপত্তি। তারা এই বলে গর্ব অনুভব করে যে, তারা স্বয়ং শিবের বংশধর, তাই শিবপুত্রী নর্মদার বিশেষ স্নেহদৃষ্টি তাদের উপর আছে।

শোনা যায়, রাজপুতদের সঙ্গে প্রাচীনকালে ভীলদের সামাজিক মেলামেশা ও বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রাজপুতদের উপর প্রভাব বিস্তার করার পর রাজপুতদের চোখে ভীলরা পতিত হয়ে যায়। একবার এক ভীল সর্দার নাকি মহাদেবের বাহন নন্দীর গায়ে অস্ত্রাঘাত করেছিল, তাই শিবসন্তান হয়েও নন্দীর অভিশাপে তারা নাকি নিষাদে পরিণত হয়ে গেছে। এইরকম একজন ভীলের তীরে কৃষ্ণও নাকি প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেই অপরাধেও নাকি তারা পূর্বগৌরব হারিয়ে সর্বহারায় পরিণত হয়েছে। ভীলদেরকে নিয়ে এইরকম কত যে উপকথা ও রোচক কাহিনী রচিত হয়েছে তার শেষ নেই। মারাঠারা মধ্যভারত অধিকার করার সময় স্থানীয় অধিবাসী ভীলদের উপর নিদারুণ অত্যাচার করেছিল। সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভীলরা বন্যদস্যুতে পরিণত হয়েছে। তাই দলবদ্ধ নিষ্ঠুর দস্যুবৃত্তি এখন ভীলদের জীবিকা। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভীলদস্যুদের দমন করতে বৃটিশ সরকার অভিযান চালিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে দমন করে বৃটিশের অনুগত একদল ভীল সৈন্যদলও তৈরী করেছিলেন জেনারেল আউটরাম। বর্তমানে নর্মদাতটের বহু অঞ্চলে ভীলরা কৃষিকর্মে

মন দিয়েছে। পথে যেতে যেতেই দেখতে পাবে। তবে শূলপাণির ঝাড়িতে ভীলদস্যু আছেই, লুণ্ঠনই তাদের প্রধান উপজীবিকা। আমি যতদূর জানি, আমার মতে ভীলরা সাহসী, পরিশ্রমী এবং সত্যবাদী জাতি। ভীলালারা ভীলদেরই একটি শাখা, গোঁড় থেকে যেমন রাজগোঁড়, তেমনি ভীল থেকেই ভীলালদের উৎপত্তি। মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চলের ভীলদের সঙ্গে রাজপুতদের মিলনের ফলেই এই খণ্ডজাতিটির সৃষ্টি হয়েছে। ভীল নারীর গর্ভে এবং রাজপুত পুরুষের ঔরষে ভীলালাদের জন্ম। ভীলালারা নিজেদেরকে উচ্চবংশীয় এবং তাদের মধ্যে যাঁরা রাজা জমিদার তাঁরা নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন। ওঁকারমান্ধাতার বর্তমান রাজবংশও ভীলালা জাতের। নাথুভীলকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁর সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন রাজপুত চৌহান বংশীয় রাজা।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখে আমার মনে পড়ে গেল যে আজ ২৭শে ভাদ্র, রবিবার, পূর্ণিমা। মোহান্তজী বললেন—অভি আরত্রিক কা ইন্তেজাম করিয়ে। তাঁর বলার আগেই দেখলাম কালেশ্বরের মন্দিরে ঘি-এর প্রদীপ জ্বালা হয়ে গেছে। পঞ্চপ্রদীপও সাজানো হয়ে গেছে। একটি তামার পাত্রে পাঁচটি বিল্বপত্র এবং কতকটা চন্দনও ঘুঁটে রাখা হয়েছে। কমণ্ডলুর জলে আচমণ করে কালেশ্বর ভৈরবের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে মোহান্তজী মন্ত্রোচ্চারণ করলেন—

ওঁ ঋতং সত্যং পরংব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
উর্ধ্বরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ॥

শিবলিঙ্গে চন্দন ও বিল্বপত্র অর্পণ করতে করতে বলতে লাগলেন—

১। ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
ভবে ভবে নাতি ভবে ভজস্ব, মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥

২। ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মানায় নমঃ॥

৩। ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোর ঘোরতরেভ্যঃ।
সর্বতঃ সর্বসর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ॥

৪। ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি,
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

৫। ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি-
ব্রহ্মণোঽধিপতি ব্রহ্ম শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্।

পূজা এবং আরতি সেরেই তিনি মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেই নিশানটিকে আরতি করে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করলেন। এবার সুরু করলেন মন্দির পরিক্রমা। মন্দিরের চারধারে চারটে বড় বড় ধুনি জ্বালা হয়েছে। মোহান্তজীর পেছনে কেউ শিঙা ডম্বরু বাজাতে বাজাতে; কেউ বা হাততালিসহ শিববন্দনা করতে করতে তিনবার পরিক্রমা করলেন। মন্দিরের বারান্দায় চারদিক ঘিরে সবাই বসতেই মোহান্তজী বললেন—চার চার আদমি করকে জাগতে রহো। কোঈ পতা নেহি, জানোয়ার আ সকতে হৈ। চারো তরফ জঙ্গল দেখাই দেতা হৈ। বিচ্ বিচ্ মেঁ 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' পুকারতে রহো। আভি আধাঘন্টাকে লিয়ে কীর্তন চালু রাখিয়ে।

যতীন্দ্রজী কীর্তনের ধুয়া ধরলেন। সমস্বরে সবাই গাইতে লাগলেন—

(জয়) যোগেশ্বর শংকর ধূর্জটী স্মরহর, বম্ বম্ বম্।
শম্ভু শুভঙ্কর, জয় শশাঙ্ক-শেখর, বম্ বম্ বম্ ॥
ত্র্যম্বক ব্যোমকেশ, পিনাকী গঙ্গেশ বম্ বম্ বম্।
জয় করুণাকর, বরদঅভয়কর, বম্ বম্ বম্ ॥
জয় শিব শংকর দয়াল মনোহর জয় শিব রাম।
জয় শিবওঁকারা হরশিবা ওঁকারা রেবা রেবা রাম ॥

তন্ময় হয়ে ভাবগদগদ কণ্ঠে সবাই কীর্তনে মেতে উঠলেন। আধঘন্টা পরেই কীর্তন শেষ করে মোহান্তজী গিয়ে তাঁর নিজস্ব তাঁবুতে ঢুকলেন। আমি ও যতীন্দ্রজী তাঁর অনুমতী নিয়ে মন্দিরের বারান্দায় কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম। রাত্রির শেষ প্রহরে যতীন্দ্রকে পাহারা দিতে হবে। আমাকেও জাগাতে অনুরোধ করলাম। চারজন বাদে আর সবাই শুয়ে পড়লেন। রাত্রির প্রথম প্রহর ঐ চারজনকে জাগতে হবে।

পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণে সমগ্র বনভূমি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কালেশ্বর

ভৈরবের উঁচু টিলা থেকে যেদিকে তাকাচ্ছি, সেইদিকেই যেন আলোর ঢেউ, নয় হাসির ঢেউ খেলছে। স্তব্ধ গম্ভীর রাত্রির নির্জনতার মধ্যে সাধারণত মনে ভয়ের শিহরণ জাগে। অন্ধকার রাত্রি হলে মনে হয়, আমার চারদিকে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ যেন কাছে এসে কিছু ফিস্‌ফিস্‌ করছে। সে সময় একটা গাছের পাতা পড়লেও চমকে উঠতে হয়, কারণ সে সময় নিরন্ধ্র অন্ধকারের জন্য চোখে ত কিছু দেখা যায় না। অদৃশ্য বস্তুই মনে ভয় জাগায়। কিন্তু এইরকম পূর্ণিমা রাত্রি, পূর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখের সামনে সবকিছুই অবারিত, সবই স্পষ্ট, দূরের দৃশ্যপটও স্পষ্টভাবে চোখের সামনে ভাসছে। এখনও মনে শিহরণ জাগছে, কিন্তু তা ভয়ের নয়, আনন্দের শিহরণ। সুখের মোহনীয়া আবেশ যেন। চাঁদের যে এমন যাদু আর মাধুর্য আছে, তা প্রাসাদে বা কুটীরের চার দেওয়ালের মধ্যে গাঢ় ঘুমে অচেতন থেকে জানালা বা ফোকড় দিয়ে চাঁদ দেখে অনুভব করা যায় না। মুক্ত আকাশতলে প্রকৃতির খোলামেলা মুক্তাঙ্গনেই জ্যোৎস্নারাতের মদিরতা ভালভাবে বোঝা যায়। আমি বিছানা থেকে উঠে মন্দিরের চারদিকে বেড়াতে লাগলাম। যাঁরা প্রথম প্রহরের প্রহরী, ত্রিশূলধারী সেই নাগা চারজন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন বলে মনে হল, কিন্তু তাঁদের কথা ভালভাবে আমার কানে ঢুকল বলে মনে হল না, আমি কোনমতে 'হুঁ হাঁ' করে নিজের সুখানুভূতিতে আবেগ চঞ্চল হয়ে তাঁদের কাছ হতে সরে এলাম। চাঁদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছি, হে শিবসুন্দর! তোমার সৃষ্টি এত রমণীয়! হঠাৎ দেখলাম, উল্কার মত একটা আলোর শিখা হাউই-এর মত নেমে আসছে তীব্রবেগে, মনে হল সেটা যেন মন্দিরের চূড়ার উপর পড়ল! আমি তাড়াতাড়ি সরে এসে মন্দিরের বারান্দায় পাতা নিজের বিছানায় এসে বসলাম। মন্দিরের গর্ভগৃহে যে ঘন্টা ঝোলানো আছে, তাতে শব্দ উঠল 'টং'। পূর্ণিমায় জ্যোৎস্না-স্নাত এরকম সুন্দর রাত্রি যে জীবনে এই প্রথম দেখছি তা তো নয়। তবে আজকের রাত্রি এত মোহন এত মধুর লাগছে কেন? মন্দিরের ভেতর থেকে এত সুগন্ধিই বা ভেসে আসছে কিভাবে?

আকাশের পাগলাকরা জ্যোৎস্না আর মন্দিরের পাগলাকরা সৌরভ আমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন রাত্রি বড়জোর

দশটা। ঘুমের মধ্যে মনে হল, জটাজুট কেউ যেন আমার পাশে বসলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তড়াক করে উঠে বসলাম। মোহান্তজী ফিস্‌ফিস্ শব্দে মতীন্দ্রকে ডাকছেন। এখন তাঁর জটা চূড়া করে বাঁধা নেই। জটাজুট মুক্ত দিগম্বর। আমি মতীন্দ্রকে ঠেলা দিতেই ক্যা হুয়া শের্, না, ডাকু? বিছানার পাশে রাখা ত্রিশূলটাকে জাপটে ধরেছেন তিনি। মোহান্তজী হেসে উঠতেই মতীন্দ্র থতমত খেয়ে বসে পড়লেন। মোহান্তজী বললেন—মতীন্দর! এই পরমাশ্চার্য রাত্রিটা কি আমরা ঘুমিয়েই কাটাব? বাইরে তাকিয়ে দেখনা, চন্দ্রকিরণ আজ চন্দ্রশেখরের ইঙ্গিতে মায়াজাল বিস্তার করেছে। তুমি চন্দ্রশেখর কালেশ্বরজীকো একঠো ভজন শোনাও। যো কুছ্ হো, আপ্ গাইয়ে, হম সমঝ্ লেঙ্গে।

মতীন্দ্রজী চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিজের ট্যাঁক ঘড়িটা জ্যোৎস্নাতে দেখে নিয়ে গজরাতে গজরাতে বলতে লাগলেন—এখন রাত্রি দুটা। এমন সময় আপনার গান শোনার ইচ্ছে হল। আমাদেরকে আপনি ঘুমোতে দেবেন না! এমন করলে আপনার কাছ থেকে পালাব। কিন্তু তাঁর কথা মোহান্তজীর কানে ঢুকল বলে মনে হল না। তিনি জড়িত কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন—মতীন্দর! মৈঁ বিনীত করতা হুঁ, যো কুচ্ হো, আপ্ গাইয়ে।

—তব শুনিয়ে, হম্ বাংলামেঁ গানা গাতা হুঁ। এই বলে মতীন্দ্রজী গান জুড়লেন—

বেলপাতা নেন মাথা পেতে, গাল বাজালে হন খুশী।
মান-অপমান সমান ত তাঁর, তাঁর কাছে নয় কেউ দোষী।
ভোলানাথ এত ত ভুলে থাকেন, তবু নেচে আসেন যে তাঁয় ডাকে
'বম্ ভোলা' বোল বলে, কেন লও না যেচে যে যা খুশী
যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে, ভালমন্দ নাই হুঁসই
ডাকলে পরেই সাড়া দেয় সে, কালের বিষও নেয় শুষি।

মতীন্দ্রজীর গলা যে এত মিষ্টি তা আমার জানা ছিল না। যেমনি পৌরুষদীপ্ত দরাজ গলা তেমনি দরদ ও অনুরাগের স্পর্শে মর্মস্পর্শী তার মীড়ক ও মূর্ছনা! ওস্তাদ শিল্পীর সুর ও রাগ সিদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন! গানটি শেষ

হতেই আবার মোহান্তজী ঢুলুঢুলু নেত্রে বলে উঠলেন—বঢ়িয়া! বঢ়িয়া! বেটা ঔর একঠো।

এবারে আরও যেন দরদ ঢেলে যতীন্দ্রজী গান সুরু করলেন—

শংকর ভোলা ভাবে নাচিছে রে।
বম্ বম্ বম্ ববম্ ববম্ অবিরাম গালে বাজিছে রে॥
ভুজঙ্গ-ভূষণ হাড়মালা গলে, শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমল দোলে
ত্রিনয়ন জ্বলে শশাঙ্ক হাসে ভালে, আবেশে চরণ টলিছেরে।
শংকর ভোলা ভাবে নাচিছে রে।

চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে তেমনিভাবে সুরের অপরূপ যাদুতে মুগ্ধ হয়ে, প্রায় সব নাগাই ঘুম ছেড়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছেন। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে এই সুন্দর পরিবেশে সবাই যেন একটা অলৌকিক আবেশের ঘোরে ঢুলছেন। আমার নীরস প্রাণেও দোলা লেগেছে। সহসা মোহান্তজী ভাবের ঘোরে ঢুলুঢুলু নেত্রে ঢুলতে ঢুলতে দুম্ করে মন্দিরের মেঝেতে পড়ে গেলেন। সবাই শশব্যস্তে বলে উঠলেন—'গুরুজীকো সমাধি লাগ গিয়া'। দুজন বলিষ্ঠদেহী নাগা তাঁকে ধরাধরি করে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। যতীন্দ্রজী কিন্তু তাঁর গান থামালেন না, তিনি সমান তালে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে গাইতে লাগলেন। গান গাইতে গাইতে তিনিও সমাধিমগ্ন গুরুদেবের দেহকে ঘিরে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁকে তাঁর বিছানার উপর শুইয়ে দিয়ে আমরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এলাম। তাঁবুতে পাহারা দেবার জন্য ত্রিশূল হস্তে দাঁড়িয়ে রইলেন একজন নাগা সন্ন্যাসী। গুরুদেবের শয্যাকে ঘিরে হাতে তাল দিতে দিতে যতীন্দ্রজী গেয়ে চললেন তাঁর ভজন। তাঁবু থেকে ফিরে এসে বিছানায় বসে বসে ভাবতে লাগলাম, যতীন্দ্রজী যে ভজনটি এখনও গেয়ে যাচ্ছেন, একাজ খুব ভালই। ভাব-সমাধি হতে যোগীকে ব্যুত্থিত করার এইটাই সঠিক প্রক্রিয়া। সাধারণত আশ্রম-গুরুর সমাধি হলে যে প্রসঙ্গ বা সূত্র ধরে মহাত্মার সমাধি হয়, শিষ্যরা তার আসল কারণ ও রহস্যটি বাদ দিয়ে 'হরিবোল হরিবোল' বলতে বলতে কিংবা রাম নাম, শিবনাম বা দুর্গানাম করতে উদ্দণ্ড নৃত্য বা কলরোল সুরু করে দেন। তাতে ভাব-সমাধি ভাঙতে দেরী হয়, সমাধি ভাঙার পর তাই

অধিকাংশ যোগীকে ক্লান্ত ও অসুস্থ হতে দেখা যায়। অবশ্য যে সব ভণ্ড-তপস্বীরা শিষ্যদের মধ্যে পসার জমানোর জন্য সমাধির ভাণ করে নানারকম acting posing করে থাকে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। নতুবা প্রকৃতক্ষেত্রে যতীন্দ্র-গৃহীত পন্থাই সমাধি-ভঙ্গ করার সঠিক পন্থা। যে মন্ত্রের ধ্বনিতে বা নামগানে সাধকচিত্ত উদ্বেলিত হয়, যে নামের উন্মাদনায় তাঁর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে চিতিশক্তির স্পন্দন জাগে, তাঁর মনপ্রাণ উধাও হয়ে যায় ভূমার ভূমিতে, সেই চৈতন্য ভূমি হতে তাঁকে ব্যুত্থিত করতে হলে সেই নাম, বীজ বা ভজনের ধুন্ ধরে রাখতেই হবে। যতীন্দ্রজী নির্ভুল পন্থাই অবলম্বন করেছেন।

মনে হচ্ছে এখন রাত্রি ৩টা। এখনও সকাল হতে অনেক বাকী। আমি আবার শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন আমার গায়ে সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। উঠে দেখি, প্রত্যেকেই যে যার কাজে তৎপর হয়ে উঠেছে। যজ্ঞকুণ্ড তৈরী করা হয়েছে। যজ্ঞকাষ্ঠ প্রচুর বনফুল এবং ঘি কুণ্ডের কাছে সাজানো আছে। প্রত্যেকের স্নান ও ভস্ম-বিলেপন পর্বও শেষ হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি কমণ্ডলু নিয়ে এই পাহাড়ী টিলার তলায় যেখানে নর্মদার জল বর্ষার সময় এসে জমা হয়েছে, সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। মোহান্তজী ও যতীন্দ্রজীকে দেখলাম, তাঁদের স্নান হয়ে গেছে, তাঁরা সূর্যার্ঘ্য অর্পণ করছেন। আমিও স্নান তর্পণ শেষ করলাম। মন্দিরে ফিরে এসে দেখি, তিনি মন্দিরের ভেতরে কালেশ্বর ভৈরবের কাছে বসে আছেন। বোধহয় পূজা করবেন। আমাকে হাতের ইসারায় ডাকলেন। আমাকে ইঙ্গিত করলেন শিবলিঙ্গটির উপর জল ঢালতে। আমি মন্ত্র পড়ে স্নান করালাম এবং শিবলিঙ্গটি হাত দিয়ে ভাল করে মার্জনা করলাম। তারপর প্রণাম করে উঠে আসব, তিনি বললেন—কালেশ্বর ভৈরবজীকী যো লিঙ্গ আপ দেখতে হেঁ, ইনকা নাম সহস্রলিঙ্গ। সহস্রলিঙ্গ উহ্ হৈ জিসমেঁ খুব লকীর পড়ী হো। তুমি ভাল করে দেখ, এতে বিশেষ কোন চিহ্ন দেখতে পাও কি না?

তাঁর কথায় শিবলিঙ্গের চারপাশ ঘুরে ঘুরে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতেই দেখতে পেলাম শিবলিঙ্গের গায়ে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা নিচের দিকে নেমে এসেছে। আমি সে কথা তাঁকে বলতেই তিনি বললেন—গিন্তী করিয়ে। আমি গুণে তাঁকে বললাম—২৮টি সূক্ষ্মরেখা দেখতে পাচ্ছি।

—সহস্রলিঙ্গমেঁ পাঁচ, সাত, নয়, বার, ষোল, চব্বিশ ইয়া পঁচিশঠো ধারিয়াঁ হোতী হৈ। ইয়ে ধারিয়াঁ জলধারায়োঁ কী দ্যোতক হোতী হৈ। হমেঁ গুরুজীকে সাথ যব কৈলাস, মানস-সরোবর গয়ে থে, উস্ বখৎ এক বিরাট শিবলিঙ্গমেঁ হাজার সে অধিক ধারিয়াঁ দেখ চুকা হৈ। ইন্ সহস্র-লিঙ্গমেঁ জিতনী অধিক ধারিয়া হোংগী, উহ্ (বহ) শিবভক্ত কে লিয়ে উত্না হী অধিক পূজ্য হোগা, জ্যাদা ফলপ্রদ ভি হোগা।

তাঁর কথায় আমি মুণ্ডমহারণ্য হতে ওঁকারেশ্বর ঝাড়ি পর্যন্ত তটে তটে যেখানে যত শিবলিঙ্গ দেখেছি, সেগুলি নিবিষ্টমনে চিন্তা করতে লাগলাম। মা নর্মদার দয়ায় মনে পড়ে গেল। আমি তাঁকে বললাম—সে স্থানের নামও ধর্মপুরী। লাখড়াকোটের জঙ্গলে ঢোকার আগে পামাখেড়ি ও তিথিঘাটের মধ্যস্থলে নর্মদাতটেই সেই ধর্মপুরীস্থিত মন্দিরেও এইরকম শিবলিঙ্গ আমি দেখেছি। তাতে এইরকম সূক্ষ্মরেখা আমি দেখেছি, কিন্তু রেখার সংখ্যা গুণে দেখিনি এবং তা যে সহস্রলিঙ্গ তা আমি বুঝতে পারিনি।

উন্‌মেঁ চব্বিশ ঠো রেখা হৈ। দো ধর্মপুরীমেঁ দোনো শিবলিঙ্গ সহস্রলিঙ্গ হৈ, সদা জাগ্রত হৈ। বহোৎ কিসিম্‌কা শিবলিঙ্গ হোতী হৈ। আজ মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ সুরু হোগা। সাম্‌কা বখৎ আপ্‌কো বাতায়েঙ্গে, কালভি হম্‌লোগ ইধরই রহেঙ্গে। অভি আপ্ যজ্ঞবেদীকা পাশ যাকর বৈঠিয়ে। কালেশ্বরজীকা পূজা করকে ম্যয় ভি যাতা হুঁ।

আমি মন্দিরের গর্ভগৃহ হতে বেরিয়ে এসে ভিজে গামছা রোদে শুকোতে দিয়ে যেখানে যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে, সেখানে গিয়ে বসলাম। দুজন পণ্ডিত অগ্নি আবাহন, অগ্নিপূজা এবং মহামৃত্যুঞ্জয় শিবপূজার সব উপাচার সাজিয়ে ফেলেছেন। দুজন চার কমণ্ডলু ঘি যে কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনলেন বুঝতে পারলাম না। শ্রীশ্রীকালেশ্বর ভৈরব মহাদেবের সামনেই যজ্ঞ করার ব্যবস্থা হয়েছে। উভয় পণ্ডিতজী প্রারম্ভিক পূজা পর্ব শেষ করলেন, শেষ করলেন গণেশ, সূর্য, নারায়ণ, শিব, দুর্গা ও নর্মদার পূজা। সবাই মিলে আমরা নর্মদা ও নর্মদেশ্বর মহাদেবের স্তব পাঠ করছি, এমন সময় মোহান্তজী এসে যজ্ঞকুণ্ডকে তিনবার পরিক্রমা করে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নিস্থাপন করলেন। পণ্ডিতজীরা অগ্নিস্থাপনের মন্ত্র পাঠ করলেন। মোহান্তজী চমসে ঘি নিয়ে আহুতি দিতে থাকলেন, আমরা সকলেই

উঠে দাঁড়িয়ে যজ্ঞকুণ্ডের চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে বেদমন্ত্র পাঠ করতে লাগলাম—

ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া।
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥
ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা॥

(ঋগ্বেদ, ১ম, ৯৪ সূ, ১)

বন্দনীয় জাতবেদা হুতাসনের তরে আজি,
তাঁর চলিষ্ণু রথের মত গড়ছি মোরা স্তোত্ররাজি।
দীপ্ততর হউক মতি অগ্নিদেবের সন্তুজনে।
হিংসা তাঁরে ছোঁয় না কভু, অগ্নি যাঁরে বন্ধুগণে॥
ওঁ ত্বমধ্বর্যুরুত হোতাসি পূর্ব্যঃ প্রশাস্তা পোতা জনুষা পুরোহিতঃ।
বিশ্বা আর্ত্বিজ্যা ধীর পুষ্যস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥
ওঁ অগ্নেয়ে স্বাহা॥

(ঐ, মন্ত্র ৬)

হে হুতাশন, হে অধ্বর্য্যু! তুমিই যাগের মুখ্য হোতা,
হে পুরোহিত আজন্মকাল, হে প্রশাস্তা! তুমিই পোতা।
পূর্ণ কর যজ্ঞ মোদের জানো তুমি সকল কর্ম,
হিংসা তারে পায় না কভু, তুমি যাহার রও হে বর্ম॥
ওঁ বধৈর্দুঃশংসাঁ অপ দূঢ্যো জহি দূরে বা যে অন্তি
বা কে চিদত্রিণঃ।
অথা যজ্ঞায় গৃণতে সুগং কৃধ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥
ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা॥

(ঐ, মন্ত্র ৯)

বিনাশ কর তীক্ষ্ণ অস্ত্রে, দুষ্ট যারা নষ্ট মতি,
হনন কর শত্রুজনে নিকট-দূরে যাদের গতি।
সুগম কর পন্থা মোদের তোমার যাগে আমরা ব্রতী,
আমরা তোমার! কে হিংসিবে? তুমি খুসী যাহার প্রতি॥

বেদমন্ত্রে কিছুক্ষণ এইভাবে আহুতি দেবার পর, মোহান্তজীর উচ্চারিত মন্ত্র অনুসরণ করে আমরা বলতে লাগলাম—

ওঁ শুভঙ্করায় নর্মদা শংকরায় তে নমঃ শিবায়।
ওঁ জুং সঃ স্বাহা॥
ওঁ কর্মপাশনাশ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়।
ওঁ জুং সঃ স্বাহা॥
ওঁ শর্মদে নর্মভস্মকণ্ঠ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়।
ওঁ জুং সঃ স্বাহা॥
ওঁ সংসার-ঘোর-দুঃখ-হারিণে নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়।
ওঁ জুং সঃ স্বাহা॥
ওঁ অন্তশ্চিন্মাত্রৈক-লিঙ্গরূপ-দেহম্ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়।
ওঁ জুং সঃ স্বাহা॥

এইসব মন্ত্রে আহুতি প্রদান শেষ হলে মোহান্তজী এবং তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও "ওঁ নর্মদায়ৈ স্বাহা" মন্ত্রে পাঁচবার আহুতি প্রদান করলাম। তারপরেই তিনি সঙ্কেত করলেন যতীন্দ্রকে। তাঁর সঙ্কেতের মর্ম আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না। কিন্তু যতীন্দ্র ঠিকই বুঝলেন। তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে যে চারজন নাগা আমাদের জন্য মন্দিরের পেছনে চাঁদোয়া টাঙিয়ে ভোজন প্রস্তুত করছিলেন, তাঁদেরকে ডেকে আনলেন। মোহান্তজী সেই চারজনকে একে একে পূর্বোক্ত সকল মন্ত্র পাঠ করিয়ে আহুতি দেওয়ালেন। তারপর পূর্ণাহুতি সমর্পণ করা হল।

এই না হলে দলনেতা! যিনি দলনেতা হন, তাঁকে সব সময় সকল দিকে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি দিতে হয়। ঐ চারজন নাগা নীরবে আমাদের জন্য কাজ করছিলেন। যজ্ঞকুণ্ডে এসে আহুতি অর্পণের সময় তাঁদের ছিল না। তাঁদের গুরু ভক্তিকেও বলিহারি! ভক্তি প্রভাবে তারা এই সার কথা বুঝে নিয়েছেন যে গুরুর আদেশ পালন করা এবং নতমস্তকে গুরু বাক্য পালন করাই সকল দৈবকর্ম, যাগযোগ, ধর্মকর্মের সার কথা এবং শেষ কথা। প্রকৃত গুরু, যিনি পিতা স্বরূপ, তিনিও তাঁর অনন্য ভক্তকে, নীরব কর্মী

এবং নীরব সেবককে কখনও ভুলতে পারেন না। মোহান্তজীর দ্বারা উচ্চারিত ও নির্বাচিত ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি আজ মনে আমার দোলা দিয়েছে, বিশেষ মন্ত্রের শেষ দুটি শব্দ। প্রতিটি মন্ত্রের শেষে আমরা বললাম—বয়ং তব অর্থাৎ হে প্রভু! আমরা তোমারই, আমরা তোমারই। এতে মন্ত্রাংশের গভীর ও গূঢ় ব্যঞ্জনা সুপরিস্ফুট হয়েছে। ভক্ত যখন সর্বান্তঃকরণে এই সার সত্য বুঝে প্রেমের দাবীতে বলতে পারে, 'প্রভু! আমি তোমার', তখন আর তার চাওয়া পাওয়ার কিছু থাকে না। 'বয়ং তব', নিত্যসিদ্ধ বেদমন্ত্রের এই সিদ্ধ বাণীতে শুধু সাধনার শেষ কথাই নেই, এতে সাধনার নিত্যসিদ্ধ প্রণালী ও পন্থার সঙ্কেতও রয়েছে।

শিবমন্দিরের বারান্দায় সকলেই রুটি ও গুড় নিয়ে ভোজনে বসে গেলাম। মোহান্তজীও আমাদের সঙ্গে বসে আহার করলেন। বেলা ৩টার সময় যতীন্দ্রজী এসে জানালেন যে মোহান্তজী আমাকে ডাকছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলাম। তিনি বললেন—'সকালে আমি কালেশ্বর ভৈরবজীর সামনে কথা দিয়েছিলাম, যত প্রকার শিবলিঙ্গের কথা আমি জানি, তোমাকে আমি তা জানাব। বলছি শোন। বর্ধমানলিঙ্গ, অর্ধনারীশ্বরলিঙ্গ, শিবইয়ানী বিরাট, ওঁকারলিঙ্গ, জ্যোতির্লিঙ্গ, ধারালিঙ্গ, সর্পলিঙ্গ, মুখইয়ানি (য়ানী) মুখ্যলিঙ্গ, সহস্রলিঙ্গ (য্যায়সা সামনে মেঁ কালেশ্বর ভৈরবজী), চন্দ্রভাল ইয়ানি চন্দ্রমৌলীলিঙ্গ, আর্মকলিঙ্গ, স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ, পুষ্পলিঙ্গ, নর্মদেশ্বর, শিখরলিঙ্গ, ভৈরবলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, কৈলাসলিঙ্গ, তিলকলিঙ্গ, ঊর্ধ্বলিঙ্গ, দৈবিকলিঙ্গ, গাণপত্যলিঙ্গ, গুডীমল্লমলিঙ্গ, কাষ্ঠলিঙ্গ, কর্পূরলিঙ্গ, পারদলিঙ্গ, স্ফটিকলিঙ্গ, ইস্ অষ্টবিংশ প্রকার কী লিঙ্গ হোতা হৈ। শিবশাস্ত্র কী অনুসার 'মানুষলিঙ্গ' নামক ঔর একপ্রকার শিবলিঙ্গ হোতা হৈ। উন মেঁ ফিন্ বিভিন্ন ভেদ হৈ—যথা, সর্বসম, স্বাস্তিক, সার্বদেশিক, ত্রৈরাশিক আদি। বৃহৎ সংহিতা ঔর শৈবশাস্ত্রমেঁ শিবলিঙ্গকো ভেদ কা বর্ণন হৈ। মিট্টি সে ইয়া পত্থর সে মনুষ্য নির্মিত যো শিবলিঙ্গ হোতা হৈ উন্‌কো 'মনুষ্যলিঙ্গ' কহা যাতা হৈ। 'কাষ্ঠলিঙ্গ' প্রাচীনতম প্রকারোঁকে শিবলিঙ্গ হৈ। ইহ্ মৌর্যকালমেঁ চন্দনকো লকড়ী সে বনায়া যাতা থা।

'কর্পূরলিঙ্গ' পত্থরকে বনে শিবলিঙ্গকে অভাবমেঁ কর্পূরসে তুরন্ত পূজা কে লিয়ে বানা লিয়া যাতা হৈ। পত্থরোমেঁ গহরা সফেদ রং কা শিবলিঙ্গ

যিস্‌কো কর্পূরকী দানা কী তরহ দেখাই দেতা হৈ, উস্‌কো 'কর্পূরলিঙ্গ' কহা যাতা হৈ।

'ক্ষণিকলিঙ্গ' কুছ ভী পাসমেঁ ন হোনে পর পুষ্প ব মিট্টিসে তুরন্ত বনা লিয়া যাতা হৈ। সমুদ্র পার কর লঙ্কা জানে সে পহলে রামচন্দ্রজী নে সমুদ্রতটপর পুষ্পকা শিবলিঙ্গ বনাকর ভগবান শিবকী পূজা কী থী। রামচন্দ্রজীকী ভক্তিকা প্রতাপসে পশ্চাৎ ওহি শিবলিঙ্গ প্রস্তরময় হো গয়া। লেকিন্ উন্ পত্থরকা উপর পুষ্পকা প্রকাশ হৈ। উনীকা নাম সেতুবন্ধকা 'রামেশ্বর'জী। অতঃ পত্থর মেঁ যিস্ শিবলিঙ্গ পর পুষ্পোঁকা প্রাকৃতিক রূপ সে চিত্রণ হোতা হৈ, উসে উসী পুষ্পলিঙ্গকা প্রতীক মানকর পুষ্পলিঙ্গ কহা যাতা হৈ।

পঞ্চাশ সাল পহেলে মেরে গুরুজী এক দফে বাংলা মুলুকমেঁ গয়ে থে। উস্ বখৎ উনোনে তুমহারা দেশমেঁ বর্ধমান নামক স্থানমেঁ 'বর্ধমানেশ্বর' শিবলিঙ্গ দেখেঁ থে। উহ্ শিবলিঙ্গ বাড়তা যাতা হৈ। কাশীমেঁ তিলভাণ্ডেশ্বর মহল্লেমেঁ যো শিবলিঙ্গ হ্যায়, উহ্ তিল তিল বাড়তি যাতী। ওহি দোনো শিবলিঙ্গ "বর্ধমান শিবলিঙ্গ" হৈ।

'অর্ধনারীশ্বর' উহ হৈ, যিন্ শিবলিঙ্গকো আধিভাগ সফেদ আধিভাগ কৃষ্ণবর্ণ ইয়া পিঙ্গলবর্ণকা হোতী হৈ। ইয়ে নর্মদামেঁ উদ্ভূত হোতা হৈ। "নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ" কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, দুধকা তরহ সফেদ, স্ফটিকবর্ণ ইয়া গাঢ় পীলা বর্ণ কী হোতি হৈ। হরবখৎ নর্মদামেঁ কুদরতী কা খেল হৈ, ইহ সদৈব জাগ্রৎ ঔর চিৎশক্তি সম্পন্ন হৈ।

'বাণলিঙ্গ' শালগ্রাম কী তরহ্ কালে পত্থর কে হোতে হৈ ঔর নর্মদা তথা রেবা নদীয়োঁ কী ভঁবর ইন্ হে তৈয়ার করতী হৈ। নর্মদা কী ধাবড়ী-কুণ্ড মেঁ কঈ ভঁবর হৈ। উহাঁ নর্মদা নদী 'হকীক' নামক পত্থর কো আপনে বহাব (স্রোত) কে সাথ লাতী হৈ ঔর ইন্ কুণ্ডোমেঁ গিরা দেতী হৈ। ইন্ কুণ্ড মেঁ তেজী ভঁবর হৈ যো ইন্ পত্থর কো ঘুমা ঘুমা কর শিবলিঙ্গ কা রূপ দে দেতী হৈ। 'বাণলিঙ্গ' য়হীঁ সে নিকালে গয়ে শিবলিঙ্গ কহলাতে হৈ। মান্যতা হৈ কি স্বর্গীয় ইয়া ঐশীশক্তিয়োঁ হী প্রকৃতি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার কে শিবলিঙ্গো কা নির্মাণ করাতি হৈ।

শিব কা এক নাম শশিভূষণ য়া চন্দ্রমৌলী য়া চন্দ্রভাল ভী হৈ অর্থাৎ

মস্তকপর চন্দ্রমা কো ধারণ করনে বালে। প্রকৃতি দ্বারা নির্মিত ইস্ তরহ 'চন্দ্রমৌলী' লিঙ্গ কভী কভী প্রাপ্ত হো যাতে হৈ কোঈ কোঈ শিবভক্ত সাধক।

ইসী তর্হ শিবকো কৈলাসপতি ভী কহা যাতা হৈ। যিস্ তর্হ চন্দ্রভাল ইয়া চন্দ্রমৌলীশ্বর লিঙ্গকে উপরী হিস্সেমেঁ প্রকৃতি দ্বারা চন্দ্রমা চিত্রিত কর দিয়া যাতা হৈ, ইসী তর্হ 'কৈলাসলিঙ্গ' বিল্কুল সফেদ দুধিয়া রং কা হোতা হৈ ঔর উপরী হিস্সেমেঁ বর্ফ (বরফ) জমনে জৈসা প্রাকৃতিক চিত্র হোতা হৈ, ঐসা হৈ। কুল মিলাকর 'কৈলাসলিঙ্গ' এায়সা দিখতা হৈ যৈসে বরফ কা অণ্ডাকার টুকড়া রখা হৈ। ইস্ তরহ কে শিবলিঙ্গ ধাবড়ীকুণ্ড তথা খাম্বাত খাড়ীঁ (যহাঁ নর্মদা সমুদ্রমেঁ মিলতী হৈ) দোনো স্থানো দৈববশাৎ প্রাপ্ত হোতে হৈ।

'মুখলিঙ্গ' উহ্ হৈ যিন্ পর প্রকৃতি দ্বারা শিবলিঙ্গ পর আঁখ নাক মুঁহ আদি চিত্রিত কর দিয়া যাতা হৈ। প্রকৃতি দ্বারা স্বয়মেব নির্মিত ইস তরহ কে 'মুখলিঙ্গ' বেহদ কম প্রাপ্ত হোতা হৈ। খাম্বাত খাড়ী ছোড়কে ঔর কাহী নেহি মিলতা। বাপাবীয়োঁ হরদ্বার ঔর বারাণসীমেঁ মুখলিঙ্গকা নামমেঁ যো দো চারঠো বেচতা হৈ, উহ্ বানাউটি চীজ্ হৈ। 'মুখলিঙ্গ' আপ্নে ঢংগ কা দুর্লভ শিবলিঙ্গ হৈ।

'দৈবিকলিঙ্গ' উহ্ হৈ জিনহে দেবতায়োঁ নে স্থাপিত কিয়া থা। দৈবিকলিঙ্গোপর নন্দনকানন কী ছবি রহতী হৈ। 'আর্ষকলিঙ্গ' ঋষিয়োঁ দ্বারা স্থাপিত কিয়া থা। ইন্ লিঙ্গকোঁ পুষ্প চড়ে হুয়ে অবশ্য দিখাই দেতি হৈ। 'গাণপত্যলিঙ্গ' জিন্কা পর গণেশজী সম্বন্ধিত কুছ্ চিহ্ন জরুর অঙ্কিত রহেগা।

অন্ধ্রপ্রদেশকে গুডীমল্লম নামক স্থানমেঁ ভারতকা প্রাচীনতম শিবলিঙ্গ বিরাজমান হৈ। ইহ্ শিবলিঙ্গ পাঁচফুট উঁচা হৈ ঔর গহরে (গাঢ়) ভূরে রংগ কে হৈ। যিন্ শিবলিঙ্গ ঐসাই উঁচা ঔর ঐসাই গহরে ভূরে রংগ কী হোতা হৈ, উন্কো 'গুডীমল্লম' শিবলিঙ্গ কহা যাতা হৈ।

'উর্ধ্বলিঙ্গ' বহ হৈ যহ নীচে সে জ্যাদা ঔর উপরসে কম ব্যাস বালা হোতা হৈ। শিবকী অন্য প্রতীক ভী ইসমেঁ চিহ্নিত হোতে হৈ জৈসে চন্দ্রমা, ত্রিশূল সর্প, নন্দী যোনি আদি। সিন্ধুঘাটীকে লোগ (সিন্ধুনদের

তীরবর্তী বাসিন্দারা) সমস্ত পৃথ্বী কো হি উধ্বর্লিঙ্গ মানতে থে ঔর উনকো মান্যতা থী কি 'উধ্বর্লিঙ্গ'সে জীবন কা সৃজন হুয়া হৈ ঔর জীবনধারা ভী ইসী কী বদলিত চল রহী হৈ। উত্তরভারত কে অনেক স্থানো পর জো উধ্বর্লিঙ্গ মিলে হৈ, উন্‌মে উপরী হিস্‌সে কা ব্যাস অধিক হৈ। পর উপর কোঈ শিবচিহ্ন হোনা উধ্বর্লিঙ্গ কী আবশ্যক সর্ত হৈ। লক্ষ্মৌ তথা মথুরা সংগ্রহশালয়োঁ মেঁ ইস তরহ কে অনেক শিবলিঙ্গ সংগ্রহীত হৈ। কুশানযুগ-মেঁ 'উধ্বর্লিঙ্গ' কী উপাসনা বহুৎ লোকপ্রিয় হো গঈ থী ঔর ইস্ যুগমেঁ ইন্‌কা নির্মাণ ভী ব্যাপক রূপমেঁ হুয়া থা।

'জ্যোতির্লিঙ্গ কো পহচানকে লিয়ে কোঈ তক্‌লিফ্ নেহি। উনকা অন্দরমেঁ ক্ষুদ্ জ্যোতি চমকাতে হ্যায়। জ্যোতির্লিঙ্গকে রূপমেঁ হি ভগবান শিবজী পহলী বার ইস্ সৃষ্টিমেঁ প্রগট হুয়ে। সবহি নর্মদেশ্বর লিঙ্গমেঁ জ্যোতিঃ ইয়া চিদ্‌শক্তি তো হ্যায়ই হ্যায় লেকিন জ্যোতির্লিঙ্গমেঁ ইয়ে জ্যোতিঃ জ্যাদা সে জ্যাদা প্রগট্ হৈ। ইস্ নর্মদাতটমেঁ যাঁহা বিমলেশ্বর জী বিরাজমান হৈ উধর্ কভী কভী কোঈ কোঈ ভাগ্যবান জ্যোতির্লিঙ্গ প্রাপ্ত হোতা হৈ। হর নর্মদে। অভি চলিয়ে বাহারমেঁ। মন্দিরমেঁ বৈঠেগা।'

তাঁকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর তাঁবু হতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তাঁর নাগা শিষ্যরা যে যাঁর কর্তব্য করে যাচ্ছেন। প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করে এনে রেখেছেন। যতীন্দ্রজী মন্দিরের এককোণে বসে পুঁথি পাঠ করছেন আপন মনে। মোহান্তজীকে দেখে সবাই তাঁকে ঘিরে বসলেন। সূর্যাস্তের আর বেশী দেরী নেই। একজন নাগা মন্দিরের অভ্যন্তরে সান্ধ্য আরতির আয়োজন করছিলেন। তিনি এসে মোহান্তজীকে বললেন—আরত্রিককো সব ইন্তেজাম করকে রাখা।

—সাম হোনে দিজিয়ে বেটা। আজ ভাদ্র মাহিনাকা আঠাইশ্ তারিখ হৈ। প্রতিপদা। সাম হোনেকা করীব দেড় দো ঘন্টা কা বাদ চন্দ্রমা কী রোশনী নিকালেঙ্গে। পাহারা জোরদার রাখিয়ে গা। ভুলো মৎ হমলোগ শূলপাণিকী ঝাড়িকা নজদিগ্ আ গয়া।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—ওঁকারেশ্বরসে খলঘাট করীব ষাট মিল হোগা। খলঘাটসে ভি হমলোগ ঔর ভি ষোল মিল আগে চলা আয়া। খলঘাটসে হমলোগ খরগোন জিলামেঁ ঘুষ গয়ে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। মন্দিরের চারকোণে চারটি ধূনি জ্বেলে চারজন নাগার ত্রিশূল হাতে পাহারা বসে গেল। মন্দিরে ঢুকে মোহান্তজী কালেশ্বর ভৈরবের মাথায় জল ঢেলে চন্দনের গাঢ় প্রলেপ মাখিয়ে দিলেন। শিঙ্গা ডম্বরু বাজাতে বাজাতে নাগারা বোল তুললেন—

যোগী শিবশংকর ভোলাদিগম্বর জয় শিব রাম।
চিরশ্মশানচারী অনাদি সমাধিধারী রেবা শিবরাম॥

আজ নাগারা যেন স্থান মাহাত্ম্যে মেতে উঠেছিলেন। তাঁদের শিবকীর্তন ও মোহান্তজীর আরতি যখন শেষ হল, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। প্রতিপদের অন্ধকার কেটে গেছে। চারদিক ভরে গেছে জ্যোৎস্নার আলোতে। সহসা বহুদূর হতে বাঘের গর্জন ভেসে এল। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সেই গর্জন। মোহান্তজী বললেন—বেকার ডর করকে ক্যা করেগা। হিঁয়াসে চার পাঁচ মিল দূরমেঁ বন ত হ্যায়ই হ্যায়। রেবা মাইকো শরণ লেকর শিবনাম করতে রহো। নিদ্ আনেসে লেট যাও। কালেশ্বরজীকা দরবার মেঁ পড়া হ্যায়।

হে প্রভু কালেশ্বর ভগবন। রাখত মারত যো ইচ্ছা তুহারা।
হমলোগ্ তুমহারা দাস হৈ, দাসকো উপর তুয়া অধিকারা॥

এইবলে তিনি কালেশ্বরকে প্রণাম করে যাঁরা ধূনি জ্বেলে পাহারা দিচ্ছেন, তাঁদের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তিনি তাঁবুর ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। যতীন্দ্রজী এসে আমার পাশেই কম্বল পেতে জপে বসলেন। অন্যান্য নাগাদেরকেও দেখলাম কেউ মন্দিরের প্রাঙ্গণে কেউ বা বারান্দায় যে যাঁর কম্বল পেতে কেউ জপে, কেউ বা গাঁজায় দম দিতে লাগলেন।

আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ব্রহ্মর্ষি তণ্ডিকৃত সেই বিরাট শিবস্তবের যতখানা মুখস্ত হয়েছে, তা মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলাম। কখন যে শিবনাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। বহুক্ষণ পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই দৃষ্টি যেন ঝলসে গেল অকস্মাৎ, চন্দ্রোদ্ভাসিত সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির উপর যেন রূপালী ধারা ঝরে পড়েছে। এ কোন্ রহস্যভরা রৌপ্যময় জগৎ? আমি উঠে পড়লাম, বিছানা থেকে কাছেই বারান্দা থেকে উঠোনে নামবার সিঁড়ির ধাপ। আমি ধাপের উপর বসে চাঁদের দিকে তাকালাম। বাবার কথা

মনে পড়ল। তিনি বলতেন, চঞ্চল মনকে বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় আকাশের দিকে, চাঁদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদের উপর দৃষ্টি স্থির করলাম। ধীরে ধীরে সমগ্র আকাশ জুড়ে এমন এক বিহ্বল করা বিস্ময়ভরা রূপ ফুটে উঠল, মনে হল যেন সমগ্র বিরাট মূর্তিটি জ্যোতির্লিঙ্গের মত দীপ্যমান। আকাশের চাঁদ যে তাঁরই আয়ত ললাটে শোভা পাচ্ছে।

আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। আমার যখন চেতনা এল, তখন দেখি আমি বারান্দার নিচে পড়ে আছি। ধড়মড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করতেই দেখি মাথার পেছনটা এমন ব্যথা যে ঘাড় তুলতে পারলাম না। যতীন্দ্রজীকে ডাকতেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে বিছানার উপর তুলে নিয়ে গেলেন। যতীন্দ্রজী বলতে লাগলেন—'হায়, হায়, এরকম অবস্থা আপনার কি রকম করে হল'? আমি সংক্ষেপে বললাম—'আমি প্রস্রাব করতে যাব বলে উঠোনে নামতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেছি।'

—ভোর হয়ে আসছে, আমি মোহান্তজীর কাছ হতে ঔষধ আনছি। আপনার মাথার পিছনে রক্ত থুবে (জমাট) গেছে। বোধহয় উল্‌টে পড়ে গিয়ে সিঁড়ির ধাপে চোট খেয়েছেন। আমি এখুনি আসছি, চুপ করে শুয়ে থাকুন। এই বলে তিনি দৌড়ে মোহান্তজীর তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এক টুকরো গাছের শেকড় এনে আমাকে চিবিয়ে খেয়ে নিতে বললেন।

—চুপ করে ঘুমাবার চেষ্টা করুন, সকাল হতে, সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরী।

বেলা বোধহয় আটটা বা সাড়ে আটটার সময় আমার ঘুম ভাঙল, উঠে দেখি, মোহান্তজী আমার কম্বলের পাশেই বসে আছেন, তাঁর ভস্মবিভূষিত দেহ এবং কপালে ত্রিপুণ্ড্র দেখে বুঝলাম, তাঁর স্নান পূজা সমাপ্ত; আমি কুণ্ঠিত ভাবে বললাম—রাত্রে আমি পা পিছলে পড়ে গেছলাম। চোট লেগে-ছিল, এখন কিন্তু আপনার ঔষধে আমি সম্পূর্ণ সেরে গেছি। তিনি কোন মন্তব্য করলেন না, খল্‌খল্ করে হাসতে লাগলেন।

আমি যতীন্দ্রজীকে সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে গেলাম। সত্যিই নিজেকে খুবই সুস্থ মনে করছি। মাথার পেছনে যে স্থানটা ফুলে উঠেছিল, তা মিলিয়ে

গেছে, কোথাও কোন ব্যথা নেই। যতীন্দ্রজীকে বললাম—সত্যিই আপনার গুরুদেবের সেই শেকড়টা ধন্বন্তরী প্রদত্ত ঔষধের মত কাজ করেছে? আপনি কি এসব শিখতে পেরেছেন?

কিছু কিছু শিখেছি বৈকি? তবে গুরুজীর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। ছিলাম মতি মাইতি, মাহিষ্য কুলে জন্ম, হয় চাকরী, না হয় চাষবাস করে জীবন কাটাতে হত আর রোগে শোকে ভুগে মরতে হত। কিন্তু গুরুজীর দয়ায় আমি নূতন জীবনের স্বাদ পেয়েছি। শিবকে ভক্তি করতে শিখেছি। মতি মাইতি থেকে হয়েছি যতীন্দ্র ভারতী। মহাত্মা কমলভারতীজীর সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হতে পারাটাও মহাগৌরবের বিষয়। ৺ঈশান মাইতির পুত্র মতি মাইতি, জাতি মাহিষ্য, পেশা চাকুরী বা কৃষিকার্য,—এই ধরণের পরিচয়ের চেয়ে শ্রীশ্রীনগেন্দ্রভারতীজীর মন্ত্রশিষ্য যতীন্দ্রভারতী, এই পরিচয় নিশ্চয়ই অনেক গৌরবের। যদি মা নর্মদা ও গুরুদেবের দয়ায় সিদ্ধিলাভ করতে পারি, তাহলে ত আর কোন কথাই নাই, আমার মনুষ্যজীবন ধন্য হয়ে যাবে।

—তাঁর কথা শুনে আমি মনে মনে ভাবলাম, যে পিতৃপরিচয়ে গৌরব বোধ করে না, মাতার পিতার অফুরন্ত স্নেহকে যে ভুলে যায় তার মত বেইমান, শুধু এই জন্মে কেন, কোন জন্মেই শিবকৃপা পাবে না, সিদ্ধিলাভ ত দূরের কথা! প্রকাশ্যে বললাম—আপনার মুখ থেকে এই কথা শুনব, আশা করিনি। আপনি শ্রী ১০৮, ১০০৮ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মবিদবরিষ্ঠ, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য, অনন্তশ্রীবিভূষিত ইত্যাদি যত বিশেষণেই বিশেষিত হন না কেন, আপনি ঈশান মাইতির পুত্র মতি মাইতি, এইটাই আপনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বলে আমি মনে করি। এই পরিচয়েই আপনার মনে শ্লাঘাবোধ জন্মানো উচিত ছিল। বেদের নির্দেশ—মাতৃদেবোভব, পিতৃদেবোভব, তারপর আচার্যদেবোভব, তারপর আত্মদেবোভব। পিতাই শিব। নিজের পিতাকে শিব বলে ভাবতে পারলে শিবসুন্দরের কৃপা ত্বরিৎগতিতে লাভ করা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি। বেদ এবং অন্যান্য প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র থেকে আমি এই শিক্ষাই পেয়েছি।*

* আগ্রহী পাঠক পিতাই যে শিব এই তত্ত্ব জানতে চাইলে লেখক প্রণীত 'পিতরো' গ্রন্থ পড়ুন।

আর তাঁর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে আমি নর্মদার জলে নেমে পড়লাম। মনে মনে ভাবছি, এমনিতে কমলভারতীজীর গদী টুটুকরো হয়ে গেছে। পরে এই লোক যদি তাঁর মত মহাত্মার পুণ্য গদীতে বসে, তাহলে তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? যাইহোক মা নর্মদাকে প্রণাম করে প্রলয়দাসজীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বললাম—তুমি যে বলেছিলে 'হাস বোল, খাপা ন হো কিসীসে।' তোমার সেই বাক্য কেমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি দেখ; নতুবা যে কুলাঙ্গার পুত্র অবজ্ঞার সুরে নিজের বাবার সম্বন্ধে মন্তব্য করে, তাকে আমি যৎকিঞ্চিৎ গরম গরম কথা শুনিয়ে ছাড়তাম। যথারীতি স্নান তর্পণ সেরে আমি মতীন্দ্রের সঙ্গে নীরবে ফিরে এলাম মন্দিরে। কালেশ্বর ভৈরবকে প্রণাম করে দেখি, মোহান্তজী মন্দিরের উত্তরদিকের বারান্দায় বসে নিজের হাতে অতি যত্নে একটা থলি সেলাই করছেন। আমাকে বললেন—কাল সুবে হমলোগ যাত্রা করেঙ্গে। হিঁয়াসে যায়েগা গাঙ্গলীফেরি, গাঙ্গলীফেরি সে চিখলদা। হিঁয়াসে তিন চার মিল জানে সে জঙ্গল পড়েগা। চিখলদা সে আসলী শূলপাণি কী ভয়ঙ্কর ঝাড়ি সুরু হো যাবেগা। বিচমেঁ পড়েগা বড়খেড়ীকা জঙ্গল। উস্‌কো হম্ লুটপাটকী খেড়ী বলতে হেঁ। ওহি জঙ্গলমেঁ ঘুসনেসে হি ভীল লোগ লুটপাট সুরু কর দেতে হেঁ। ইসীওয়াস্তে গাঙ্গলী ফেরিমেঁ যিধর ব্যাপারীয়োঁ কো বহুৎসা নাও সারবন্দী কর খাড়া হ্যায়, উধর দো চার ব্যাপারীয়োঁ কা সাথ মেরে জান পয়চান হৈ। উনলোগোঁ কা পাশ কুছ্ কুছ্ সামান রাখকে জাবেগা। ফিন্ লোটনেকা বখৎ উন্‌সে উহ্ সামান আপোষ লে লেঙ্গে। নর্মদাতটমেঁ এ্যায়সা বন্দোবস্ত্ বহুৎ দিনোঁসে চালু হ্যায়। তুমহারা পাশ কোঈ রূপেয়া পয়সে ইয়া কিমতী চীজ হোগা তো উহ্ চীজ রাখনে কা ইন্তেজাম হো জাবেগা। উহ্ লোগ বহুৎ সজ্জন হ্যায়। পরকরমাবালে কো উপর উহ্ লোগোনেঁ বহুৎ শ্রদ্ধা রাখতে হেঁ।

—মহারাজ! আমার কাছে টাকা পয়সা নেই, কোন মূল্যবান জিনিষই নেই। এই আলখাল্লা, কম্বল চার-পাঁচখানা বই, আর এক মহাত্মার দেওয়া একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ এবং একটা মালা আছে। আমি ত আর এই রাস্তায় ফিরব না। দক্ষিণতটও পরিক্রমা করার ইচ্ছা রয়েছে।

এইবলে তাঁকে শাঁখ এবং শঙ্খ স্ফটিকের মালাটি দেখালাম। তিনি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খটিকে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন—এ জিনিষের কদর ওরা বুঝবে না। ভীল লুটেরাদের চোখে এর কোন দাম নেই, তবে এই মালাটি দেখতে বড় মুক্তার মালার মত। মুক্তা ভেবে এটিকে ওরা ছিনিয়ে নিতে পারে। মালার সূতো ছিঁড়ে দিয়ে তিনি একটি দুটি করে কম্বলের উপর নীচে ২৮টি শঙ্খ স্ফটিক কম্বলের উভয় প্রান্তে গুঁজে গুঁজে এমনভাবে সেলাই করে দিলেন যে দৃষ্টি দিলেই মনে হবে কম্বলটা অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, তাই সেলাই করা হয়েছে। ছেঁড়া কম্বলের আর দাম কি?

মোহান্তজী আমার জন্য অনেক মেহনত করলেন। এইসময় খাবার ডাক পড়ল। মোহান্তজীর সঙ্গে আমরা খেতে বসলাম। কালকের মতই আমরা রুটি গুড় খেয়ে মন্দিরের বারান্দায় সবাই মিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলাম। মোহান্তজীও আজ তাঁবুতে না গিয়ে আমাদের কাছে বসে মন্দিরের দেওয়ালে গা ঠেকিয়ে বিশ্রাম ও বিশ্রম্ভালাপে মেতে রইলেন। একসময় হাসতে হাসতে বললেন—হম্ মতীন্দর কা পাশ বাংলাভাষা থোড়া বহুৎ শিখনেকে লিয়ে কোসিস্ কর রহা। বাংলা হরফমেঁ অ আ ই ঈ বগেরা ম্যায়নে শিখ লিয়া, শুনিয়ে কবিতা—

'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।' ক্যা মতীন্দর উস্‌কা বাদ ক্যা?

মতীন্দ্রজী 'কাননে কুসুম কলি' বলা মাত্রই তাঁর পদ্যটি মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি খুব তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন (পাছে মতীন্দ্র পুরো লাইনটা বলে ফেলেন এইজন্য)—

কাননে কুসুম কলি সকলই ফুটিল।

কহিয়ে, ঠিক হুয়া কি নেই? আমি হাসতে হাসতে বললাম—বিলকুল ঠিক বলেছেন। তাঁর হিন্দী টানে বাংলা পদ্য শুনে অন্যান্য নাগারাও তখন হো হো করে হাসছেন। তিনি মতীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে নিয়েই আমাকে চোখ টিপে বললেন—হমারা মাষ্টারজী বহুৎ আচ্ছা টিচার (Teacher) হৈ। উন্‌কা পাশ ম্যাঁয়নে বহুৎসা বাংলা লফজ্ শিখ লিয়া, আপ্ দোনোমেঁ যব বাৎচিৎ করতে হো, হম্ থোড়া থোড়া সমঝ্ লেতে হেঁ।

এইসময় একজন নাগা দৌড়ে এসে জানালেন—অনেক দূরে জঙ্গলের পাশ দিয়ে একদল নেকড়ে দৌড়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

—কোঈ ডর নেহি, কোঈ ডর নেহি। হমলোগ কালেশ্বর ভৈরবজী কা আশ্রয়মে হৈ। জঙ্গলমে জানোয়ার দৌড়েগা নেই ত ক্যা এক পায়েরমে খাড়া হোকর, ধ্যান লাগায়গা?

নাগা লজ্জা পেয়ে চলে গেলেন। মোহান্তজী আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন—উস্ তরফ যো জঙ্গল দেখাই দেতে হৈ, উহ্ রামায়ণ কা যুগমে জনস্থান থে, উধর খর ঔর দূষণ রাজত্ব করতে থে। ওহি স্থান সে সূর্পনখা পঞ্চবটিমে যা কর, সীতাজীকা উপর হামলা কিয়ে থে। লক্ষণজী উন্‌কা নাস (নাক) ঔর কান কাট ডালা। উস্ বখৎ জনস্থানমে বিকট রাক্ষস লোগোনে নিবাস করতে থে, উহ্ লোগ নরখাদক থে, আভি জনস্থান কা কুছ অংশ খরগোঁন জেলা হুয়া। আভি রাক্ষস নেহি হ্যায় নর-খাদক লেকিন্ জানোয়ার বহুৎ হ্যায়। বিকট জীব রাক্ষসোঁকা স্থানমে হিংস্র জানোয়ার হৈ। বহুৎকাল বীত গয়ে, তবভি স্থান মাহাত্ম্য নেহি বদল হুয়ে!

আমি বিনীতভাবে মোহান্তজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি খর-দূষণ রাবণ সূর্পনখা প্রভৃতিকে নরখাদক বিকট জীব বলেই মনে করেন? আমার ত মনে হয়, পুরাণকারদের কাল্পনিক বর্ণনানুসারে বানর, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, নাগ ও দৈত্য প্রভৃতি জাতির লোকেরা কোন বিকটদর্শন বীভৎস আকৃতির জীব ছিলেন না। তাঁরা আমাদের মতই মনুষ্যদেহধারী জীবই ছিলেন।* মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে—'পরদারাভিগমনে অভিলাষ, পরের ধনে লিপ্সা, বেদাভ্যাস এবং শংকরে ভক্তি'—এই হল রাক্ষসের ধর্ম।

দৃষ্টা তু বিকলান্ ব্যঙ্গানাথান্ রোগিনস্তথা।
দয়া না জায়তে যস্য স রক্ষ ইতি মে মতিঃ॥

অর্থাৎ বিকলাঙ্গ, অনাথ ও রোগীদেরকে দেখে যাদের মনে দয়ার উদয় হয় না, তারাই রাক্ষস।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই যতীন্দ্রজী ফোঁস করে উঠলেন। স্নান করতে গিয়ে তাঁকে যে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করেছিলাম, সে তাপ তাঁর মনে

---

* লেখক প্রণীত 'অলোক-তীর্থ' নামক পুস্তকে যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব কিন্নর, নাগ প্রভৃতিরা যে মনুষ্যদেহি সভ্যজাতি ছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা আছে।

জমে ছিল। তিনি এই সুযোগে সেই মনের ঝাল মেটানোর জন্য আমাকে প্রতি আক্রমণে উদ্যত হলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে মোহান্তজী বললেন--হাঁ হাঁ আপকো কুছ বক্তব্য হ্যায় ত উস্‌কো উগার দো। আপলোগ্ দোনো বাঙ্গালী হৈ। আপনা ভাষামেঁ সওয়াল জবাব করিয়ে। হম্ সমঝ লেগা। শাস্ত্রকা বারেমেঁ যাতনা সওয়াল জবাব হোতা হৈ, উস্ বিচারমেঁ সত্য উদ্‌ঘাটিত হোতা হৈ।

তাঁর এই আশ্বাস ও পরোক্ষ উৎসাহ পেয়ে যতীন্দ্রজী আমাকে বললেন, এইমাত্র আপনি গুরুজীকে রাক্ষসদের সম্বন্ধে যা বললেন, তাতে রাক্ষসরা যে স্বভাবধর্মে রাক্ষস এই কথাই স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাদের যে মনুষ্যদেহ ছিল, একথা কিভাবে যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়! বিশেষতঃ রাবণের কথা ভাবলে রাক্ষসরাজকে ত কিছুতেই মনুষ্যদেহধারী বলে মনে হয় না। আমরা ছোট-বেলা হতেই শুনে আসছি, রাবণ দশানন, তাঁর দশমুণ্ড, কুড়িহস্ত, বিংশতি-লোচন।

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যে কৃত্তিবাস-রামায়ণ পাঠ হয়, তাতে কৃত্তিবাস স্পষ্টভাষায় লিখেছেন—

বিশপাটি দাঁত মেলি রাবণ রাজা হাসে।
অশোক কিংশুক যথা ফুটে ভাদ্র মাসে॥

দশটা মুণ্ড না হলে কি কুড়িপাটি দাঁত সম্ভব হয়? কুড়িপাটি দাঁত কি কোন মানুষের থাকে? আপনি হয়ত বলবেন মহাকবি কৃত্তিবাস সর্বদা বাল্মীকির রামায়ণকে অনুসরণ করেন নি। কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকি কৃত রামায়ণেরই উত্তরকাণ্ডে যেখানে অগস্ত্য রামচন্দ্রকে রাবণের জন্ম-বৃত্তান্ত বলছেন, সেখানেই তিনি বলেছেন—

দশগ্রীবং মহাদংষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
তাম্রোষ্ঠং বিংশতিভুজম্ মহাস্যং দীপ্তমূর্ধজম্॥

অর্থাৎ রাবণের দশটি মাথা, ভীষণ দাঁত, কুড়িখানি হাত, বর্ণ নীলমেঘের মত, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, মুখ ভয়ঙ্কর এবং কেশ প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় ছিল। এরপরও কি বলবেন যে রাক্ষসরা আমাদের মত মনুষ্যাকৃতি ছিল? মানুষের মধ্যে কখনও কি কারও দশটা মাথা এবং কুড়িখানা হাত দেখেছেন? ঐ রকম

বিকলাঙ্গ বিকৃত কিম্ভূতকিমাকার জীব বিশেষকে মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত বলে চিন্তা করা কি করে সম্ভব?

যতীন্দ্রজীর কথা শেষ হতেই মোহান্তজী বলে উঠলেন—কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! ইস্‌কো কোঈ জবাব নেহি।

আমি যতীন্দ্রজীকে সম্বোধন করে বলতে লাগলাম—রামায়ণের উত্তর-কাণ্ড হতে যে সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্ধৃত করে আপনি রাবণকে 'দশগ্রীবং বিংশতিভুজম্‌' বলে সাব্যস্ত করতে চাইছেন, আপনার এই আপাতগ্রাহ্য প্রমাণের মূলেই ভুল আছে। উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির লেখা নয়, পরবর্তীকালে এই অংশটি মূল বাল্মীকিতে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। 'উত্তরকাণ্ড' শব্দটির মধ্যেই তার ইঙ্গিত আছে। উত্তর মানে পরবর্তী। যেমন—উত্তরকাল, উত্তর-পুরুষ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি; অর্থাৎ রামায়ণ রচিত হওয়ার পরবর্তীকালে এটি সংযোজিত। সংস্কৃত রামায়ণে ভাল করে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, লঙ্কাকাণ্ড শেষ হবার পরে সমগ্র রামায়ণ পাঠের ফল এবং ফলশ্রুতির কথা লেখা আছে। আমাদের দেশে গ্রন্থরচনার রীতি অনুসারে এটি গ্রন্থ-পরিসমাপ্তির সূচক। কাজেই নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা চলে যে মূল বাল্মীকি-রামায়ণে উত্তরকাণ্ড ছিল না। সাধারণের বিশ্বাস অনুযায়ী বাল্মীকি রামায়ণ সপ্তকাণ্ড-বিশিষ্ট নয়; অযোধ্যাকাণ্ড হতে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি কাণ্ডে এই মহাকাব্য সমাপ্ত।*

বাঙালী মহাকবি কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখে মৃত্যুঞ্জিৎ কীর্তির অধিকারী হয়েছেন, বাংলা মুলুকের সর্বত্র তাঁর বই-এর সমান আদর। আমি নিজেও তাঁর বই পড়ে রামায়ণের রস আস্বাদন করেছি, তবুও সত্যের খাতিরে একথা বলতে বাধ্য যে, বাল্মীকি রচিত উপাখ্যানের সঙ্গে পদ্মপুরাণ এবং বাংলাদেশের কথক ঠাকুরদের বর্ণিত লোকপ্রিয় অনেক কল্পিত রসালো কাহিনী মিশিয়ে তাঁর ঐ অপরূপ ও অনুপম কাব্যটি রচনা করেছেন। তাই তাঁর বই-এ দশমুণ্ড, কুড়িহস্ত, বিংশতি লোচনের ছড়াছড়ি। কোন শাস্ত্রীয়

* উৎসাহী পাঠক লেখক প্রণীত 'আলোক বন্দনা' নামক গ্রন্থে প্রদত্ত যুক্তিগুলি পড়লেই উত্তরকাণ্ড যে বাল্মীকির লেখা নয়, এটি যে পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবেন।

বিচারে ঐসব কাল্পনিক কবি কাহিনী বা লোকশ্রুতিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা যায় না।

একথা সবাই জানেন যে রাবণ পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র, বিশ্রবাঃ ঋষির পুত্র। শৌর্যে বীর্যে তিনি শুধু দেব দৈত্যজয়ী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বেদজ্ঞ। তাঁর রচিত বেদভাষ্য দুর্লভ হলেও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। রাবণের যখন মুমূর্ষু অবস্থা তখন স্বয়ং রামচন্দ্রও তাঁর কাছে উপদেশ-প্রার্থী হয়েছিলেন! এইরকম শৌর্য বীর্য পরাক্রমশালী এবং ধুরন্ধর পণ্ডিত একজন ঋষিপুত্রকে কি মনুষ্যেতর জীব বলে মনে হয়? সাধারণ বুদ্ধিতে কি মনে হয়? আসল কথা, তিনি পণ্ডিত হলেও তাঁর প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তাঁর ভয়ে এবং বিক্রমে দশদিক প্রকম্পিত হত বলে 'দশানন' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল—ঠিক যেমন সিংহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলে সিংহকে পঞ্চবদন, পঞ্চবক্ত্র, পঞ্চাস্য প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়, তাই বলে কি সিংহের পাঁচটা মুখ? না, পাঁচটা মাথা?

মূল রামায়ণ থেকে কিছু উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হবে। সুন্দরকাণ্ডে দেখা যায়, রামের চররূপে হনুমান গভীর রাত্রে রাবণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন,

কাঞ্চনাঙ্গদসন্নদ্ধৌ দদর্শ সঃ মহাত্মনঃ।
বিক্ষিপ্তৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য ভূজাবিন্দ্রধ্বজোপমৌ॥

—সুন্দরকাণ্ড, সর্গ ১০, শ্লোক ১৫

অর্থাৎ সুবর্ণময় অঙ্গদে ভূষিত মহাকায় রাক্ষসরাজ রাবণের বাহুদুটি ইন্দ্রধ্বজের মত শয্যার উপর ছড়ানো রয়েছে।

এখানে ভুজৌ ইন্দ্রধ্বজোপমৌ—শব্দ দুটি দ্বিবচনান্ত। রাবণের প্রকৃত-পক্ষে কুড়িটা হাত থাকলে বহুবচনান্ত শব্দের প্রয়োগ থাকত। বলুন, নিদ্রাকালে রাবণের বাকী আঠারখানা হাত কোথায় গেল? তা কোন কালেই ছিল না বলেই হনুমান স্বাভাবিক মানুষের মত দুটি হাতই দেখেছিলেন। হনুমান আরও দেখেছিলেন,

তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশ্চক্রাম মহামুখাৎ।
শয়ানস্য বিনিশ্বাসঃ পূরয়ন্নিব তদ্‌গৃহম্॥ ২৪

মুক্তামণিবিচিত্রেণ কাঞ্চনেন বিরাজতা।
মুকুটেনাপবৃত্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম॥ ২৫

—সুন্দরকাণ্ড, ১০ম সর্গ, শ্লোক ২৭

অর্থাৎ মণিমুক্তাখচিত কুণ্ডলের উজ্জ্বল আভায় রাবণের মুখখানাও উজ্জ্বল; তাঁর মুখবিবর হতে বহির্গত ভুক্তান্ন এবং পানের গন্ধপূর্ণ নিঃশ্বাসে ঘরখানা ভরে রয়েছে।

লক্ষ্য করুন, ঐ শ্লোক দুটিতে 'মহামুখাৎ' এবং 'আননম্' শব্দ দুটিও একবচনান্ত। অর্থাৎ রাক্ষসরাজ রাবণের মুখ আমাদের মত একটাই ছিল, দশটা নয়; আরও কিছু প্রমাণ দিচ্ছি। পঞ্চবটি বন হতে সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার সময় রাবণ আস্ফালন করে সীতাকে বলেছিলেন—'দেখ সীতা, আমি আকাশ পথে (শূন্যে) থেকেই আমার এই দুখানা হাত দিয়েই পৃথিবীকে উত্তোলন করতে পারি, সমুদ্রকে পান করে ফেলতে পারি, এমন কি যুদ্ধে যমকেও সংহার করতে পারি'—

উদ্বাহেয়ং ভুজাভ্যাস্তু মেদিনীমম্বরে স্থিতঃ।
আপিয়েয়ং সমুদ্রঞ্চ মৃত্যুং হন্যাং রণে স্থিত॥

—অরণ্যকাণ্ড, ৪৯ সর্গ

এখানেও দেখুন, ভুজাভ্যাম, দ্বিবচনান্ত শব্দ, বহুবচন নয়। নিজের বল বিক্রমের আস্ফালন করতে গিয়ে এখানেও রাবণ নিজ মুখে দুখানা হাতের কথাই বলেছেন। কুড়িখানা হাতের অধিকারী হলে নিশ্চয়ই ঐ সময় তিনি বড়াই করতে ছাড়তেন না।

ঐ অরণ্যকাণ্ডেই দেখা যায়, অশোকবনে সীতাকে নানারকম ভয় ও ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখিয়েও কামার্ত রাবণ যখন কিছুতেই তাঁকে বশীভূত করতে পারলেন না, তখন তিনি সীতার পায়ে পড়ে বলেছিলেন—রাবণ কখনও স্ত্রীলোকের চরণে মস্তক অবনত করে নতি জানায়নি—

নেমাঃ শূন্যা ময়া বাচঃ শুষ্যমানেন ভাষিতা।
ন চাপি রাবণঃ কাঞ্চিৎ মূর্দ্ধনা স্ত্রীং প্রণমেত হ॥

—ঐ, ৫৫ সর্গ, ৩৬ শ্লোক

এখানেও 'মূর্দ্ধনা' তৃতীয়ার একবচন অর্থাৎ রাবণের মুণ্ড একটাই ছিল।

রামায়ণ ছাড়া অন্যত্রও আমার সিদ্ধান্তের অনুকূলে অনেক প্রমাণ পাচ্ছি। বেদব্যাস রচিত মহাভারতে আছে, মহামুনি মার্কণ্ডেয় যখন রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে রাবণের জন্মকথা বর্ণনা করছিলেন, সেখানেও তিনি রাবণের দশটি মাথার কথা বলেননি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা অর্বাচীন পুরাণ প্রভৃতিতে যেমন রাবণের 'দশ মুণ্ড ও কুড়ি হস্ত' নিয়ে জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐরকম বিকট শিশুকে দেখে জল স্থল অন্তরীক্ষে সর্বত্র হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল বলে নানা বল্গাহীন বর্ণনা আছে, মা নর্মদার কৃপাসিদ্ধ মার্কণ্ডেয় সেইরকম কোন হৈ চৈ এর উল্লেখ করেননি। তিনি স্বাভাবিক মানব-শিশুর মত করেই রাবণের জন্মকথা বর্ণনা করেছেন। বাল্মীকির বর্ণনার সঙ্গে মার্কণ্ডেয়ের বর্ণনার মিল আছে, কেবল রাবণের মায়ের নাম নিকষার পরিবর্তে তিনি বলেছেন পুষ্পোৎকটা।

আমি মোহান্তজীকে শুনিয়ে যতীন্দ্রজীকে অন্য ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ হতেও কিছু প্রমাণ শোনালাম। জৈনদের পদ্মপুরাণ নামে একটি গ্রন্থ আছে। এটি প্রায় দু' হাজার বছর বা তারও পূর্বে বিমলাচার্য দ্বারা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে রবিসেনাচার্য সংস্কৃত ভাষায় ঐ বই অনুবাদ করেন। ঐ বই-এ রামায়ণের আখ্যায়িকা আছে। জৈনদের মতে পদ্ম রামচন্দ্রেরই একটি নাম। জৈন পদ্মপুরাণে রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে কিম্ভূতকিমাকার ভয়াবহ নরখাদক রূপে বর্ণনা করা হয়নি। 'রাক্ষস' নামে এক পূর্বপুরুষের নামানুসারে ঐ গোষ্ঠী, clan বা জাতির নাম রাক্ষস। বিশাখদত্তের লেখা বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক 'মুদ্রারাক্ষসে' যেমন দেখা যায় মহারাজ নন্দের একজন মন্ত্রীর নাম রাক্ষস, তেমনি ঐ গোষ্ঠীপতিরও নাম ছিল রাক্ষস। নন্দবংশের মন্ত্রী রাক্ষস যেমন হিংস্র নরখাদক ছিলেন না, তেমনি রাক্ষস জাতির পূর্বপুরুষ 'রাক্ষস' বা তাঁর বংশধররাও প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সর্বজীবভক্ষক মারাত্মক কোন জীব ছিলেন না। জৈন পদ্মপুরাণে বরং এই কথাই বর্ণিত আছে যে রাক্ষসরা হিংস্র ছিলেন না। তাঁরা কোন জীবকেই কষ্ট দিতেন না (জৈন পদ্মপুরাণ, সংস্কৃত অনুবাদ ৫।৩৭৫ শ্লোক)

জৈন পদ্মপুরাণে বালী সুগ্রীব হনুমান নল নীল প্রভৃতি বানরদেরও বর্ণনা আছে। কিন্তু তাদেরকে 'পশু' বা লেজবিশিষ্ট শাখামৃগরূপে বর্ণনা

করা হয়নি, মানুষ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। বানর ছিল তাদের 'টোটেম (Totem)' তাঁদের মুকুট উষ্ণীষ এবং ধ্বজায় 'বানর' চিহ্ন ছিল বলে তাঁদেরকে বানর বলা হত।

নাগদের সম্বন্ধেও একই কথা। রাক্ষস বানরদের মত নাগজাতি সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা বদলানো উচিত। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল Journal of the Bihar and Orissa Research Society হতে প্রকাশিত History of India from 150 A.D. to 350 A.D. নামক একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন—কুশান সাম্রাজ্যের পতনের পরে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বে 'নাগ' নামে পরিচিত একটা সুসভ্য জাতি ছিল। নানা মুদ্রা ও প্রশস্তির (Inscriptions) পাঠ উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিদিশা নগরীতে ভারশিবনাগ, ভবনাগ, নবনাগ, বীরসেন নাগ, হয় নাগ, ত্রয় নাগ, বর্হিন নাগ, চর্য নাগ প্রভৃতি প্রতাপশালী রাজারা রাজত্ব করতেন, ক্রমে তাঁরা বিস্তারলাভ করে পদ্মাবতী, কান্তিপুরী এবং মথুরাতেও রাজধানী স্থাপন করেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক Fleet তাঁর Corpus Inscriptionum Indicarum নামক প্রামাণ্য গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (Vol III) যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন।

আপনারা কি বলবেন, নামের শেষে নাগ উপাধিটি ছিল বলে প্রাচীন নাগজাতিরা সরীসৃপ জাতীয় কোন বিষধর প্রাণী ছিলেন?

এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য হল, সুসভ্য দ্রাবিড় জাতি Tolemestic ছিলেন। রাক্ষস বানর নাগ প্রভৃতিরা ছিলেন ঐ দ্রাবিড় জাতিরই শাখা। ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায়, তাদের দুটি শাখা ছিল—(১) অজ (২) সিগ্রা। বঙ্গদেশ ও মগধে পক্ষী নামেও একটি জাতি বাস করত। যেহেতু অজ মানে ছাগল, সিগ্রা মানে সজিনা গাছ আর পক্ষী মানে পাখী, এজন্য কি ভাবতে হবে যে তাঁরা মনুষ্যেতর প্রাণী ছিলেন? কাজেই রাক্ষস বা রাক্ষসরাজ রাবণকেও কিম্ভূতকিমাকার জীব বলে ভাবার কোন কারণ নেই, ভাবলে তাতে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে।

রাবণ সম্বন্ধে আর দু' একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণ তাঁর মৃতদেহ দর্শনে বিলাপ করতে করতে বলেছিলেন—

নিক্ষিপ্য দীর্ঘৌ নিশ্চেষ্টৌ ভুজাবঙ্গদভূষিতৌ।
মুকুটেনাপবৃত্তেন ভাস্করাকার বর্চসা॥

—৩, লঙ্কাকাণ্ড, ১১১ সর্গ

—হায়, হায়, আপনার সূর্য করোজ্জ্বল মুকুট এবং অঙ্গদভূষিত বাহু দুখানি আজ নিশ্চেষ্টভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে।

এখানে 'নিশ্চেষ্টৌ ভুজাবঙ্গদভূষিতৌ' দ্বিবচনান্ত। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে রাবণের দুখানি মাত্র হাত ছিল, তাঁর বিংশতি হস্ত ছিল না, মস্তকও ছিল একটি।

রাবণের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীরা রণক্ষেত্রে তাঁর মৃতদেহ দেখতে এসে কেউ তাঁর মুখখানির দিকে তাকিয়ে, কেউ তাঁর মস্তকটি কোলে তুলে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করছিলেন। স্বয়ং মহাকবি বাল্মীকি সেই মর্মন্তুদ দৃশ্যের কি রকম ছবি এঁকেছেন দেখুন—

বহুমানাৎ পরিষজ্য কাচিদ্দেহং রুরোদ হ।
চরণৌ কাচিদালম্ব্য কাচিৎ কণ্ঠেঽবলম্ব্য চ॥ ৮
উৎক্ষিপ্য চ ভুজৌ কাচিদ্ ভূমৌ স্ম পরিবর্ততে।
হতস্য বদনং দৃষ্ট্বা কাচিন্মোহমুপাগমৎ॥ ৯
কাচিদঙ্কে শিরঃ কৃত্বা রুরোদ মুখমীক্ষতী।
স্নাপয়ন্তী মুখং বাষ্পৈস্তুষারৈরিব পঙ্কজম্॥ ১০

(লঙ্কাকাণ্ডম্, ১১২ সর্গ)

রাবণ পত্নীদের এই বর্ণনাতেও রাবণের চরণৌ (দুটি পা-দ্বিবচনান্ত শব্দ), বদনং (একটি মুখকে দ্বিতীয়ার একবচন) এবং শিরঃ (একটি মাথা-এক বচনান্ত শব্দ) প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ পাচ্ছি।

আমার শেষ সাক্ষ্য রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী কর্তৃক তাঁর স্বামীর রূপ ও আকৃতির বর্ণনা। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে মন্দোদরী কপালে করাঘাত করতে করতে রণস্থলে এসে কাঁদতে কাঁদতে যে কথাগুলি বলেছিলেন, মহাকবির অনুময় কাব্যময় ভাষায় তা অমর হয়ে আছে। মন্দোদরী রাবণের কুণ্ডল-কিরীট-শোভিত মুখমণ্ডল এবং সূর্য কিরণে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত সুন্দর কান্তির বর্ণনা করতে করতে বলেছিলেন—

'হায়, তোমার সুন্দর মুখখানি আজ রামচন্দ্রের বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হতশ্রী হয়ে পড়ে আছে:

কান্তিশ্রীদ্যুতিভিস্তুল্যমিন্দুপদ্ম দিবাকরৈঃ।
কিরীটকূটজ্বলিতং তাম্রাসং দীপ্তকুণ্ডলম্ ॥ ৩৫
মদব্যাকুললোলাক্ষং ভূত্বা যৎ পানভূমিষু।
বিবিধস্রগ্ধরং চারুবল্গু স্মিতকথং শুভং ॥ ৩৬
তদেবাদ্য তবেবং হি বক্ত্রং ন ভ্রাজতে প্রভো।
রামশায়কনির্ভিন্নং রক্তং রুধিরবিস্রবৈঃ ॥ ৩৭

(লঙ্কাকাণ্ড, ১১৩ সর্গ)

এই শ্লোকেও বাল্মীকি আস্যং (একটি মুখ) এবং বক্ত্রং (একটি মাথা), এই দুটি এক বচনান্ত শব্দ প্রয়োগ করে রাবণের যে একটি মুখ ও একটি মাথা ছিল, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

এইবার আপনারা বিচার করে দেখুন, কৃত্তিবাস তুলসীদাস বা পুরাণ বর্ণিত কাহিনী মতে রাবণের দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত বিংশতিলোচন ছিল বলে মনে করবেন, না স্বয়ং বাল্মীকির বর্ণনানুসারে তাঁকে আমাদের মতই এক মুখ, এক মাথা এবং দুই হস্ত-বিশিষ্ট নরপুঙ্গব বলে মানবেন? অলমিতি।

আমার কথা শেষ হতেই মোহান্তজী মন্তব্য করলেন—আপনে বহুত যুক্তিসঙ্গত শোচনেকা লায়েক বাত্ বাতায়া। ইসমে গহেরা তথ্য ভি হ্যায়। মঁায় তু বহুৎ প্রসন্ন হুঁ। হম্ ত নর্মদা মাতাকী পাশ এহি বিনতী করতা হুঁ, সন্ন্যাস লেনে কী লিয়ে আপকো কভি মতি ন হো। আপ্ জিন্দেগী ভর ভারতীয় কৃষ্টি কো লিয়ে জীবন বীতা দেনেসে আচ্ছাই হোগা। ভারতে ভাতু ভারতী, ভারতে ভাতু ভারতী। বৈদিক সংস্কৃতিকে উদ্ধার ঔর প্রোজ্জল করনেকে লিয়ে আপ্ জীবন উৎসর্গ কর দেঁ। ভগবান শংকর ঔর নর্মদামাতা আপ্‌কো সাধনাকো সম্ভালেংগে। আভি চলিয়ে কালেশ্বর ভৈরবজীকো আরত্রিক করেঙ্গে।

রাত্রি তখন বোধহয়, সাতটা বা সাড়ে সাতটা হবে। যথারীতি মন্দিরের চারদিকের চারকোণে ধুনি জ্বেলে নাগারা ত্রিশূল হস্তে পাহারা দিচ্ছেন, দুজন নাগা মন্দিরের চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে আসছেন। মোহান্তজী

মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে কালেশ্বরজীর আরতি সুরু করলেন। শিঙা ডম্বরু বাজতে থাকল। আরতির শেষে শিবলিঙ্গকে ভাল করে ধুয়ে পর্যাপ্ত চন্দন নিয়ে শিবলিঙ্গের মস্তকদেশ ঢেকে দিয়ে বেরিয়ে এলেন; একে বলা হয় মহাদেবের হিমচন্দন। সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম কালেশ্বর মহাদেবকে।

যেহেতু কাল সকালেই যাত্রা করতে হবে, সেইজন্য মোহান্তজীর নির্দেশে. যাঁরা প্রহরায় রত, তাঁরা বাদে বাকী সকলেই শুয়ে পড়লাম। শেষরাত্রে সহসা ঘন্টা ধ্বনি হতে উঠে পড়লাম। একজন নাগার উপর নির্দেশ ছিল রাত্রি চারটে বাজলেই সকলকে জাগিয়ে দিতে হবে। মোহান্তজীও তাঁর তাবু থেকে বেরিয়ে এসে প্রাতঃকৃত্য সারতে গেলেন। নাগা সন্ন্যাসী সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর মত অবিশ্বাস্য দ্রুততায় চুটো তাঁবু, চাঁদোয়া, সংরক্ষিত কম্বলাদি এমন কি; রান্না করা, পূজা করা এবং খাওয়া দাওয়ার বর্তনাদি সব গুছিয়ে বেঁধে ফেললেন।

যে যার সামান কাঁধে তুলে সারিবদ্ধভাবে যখন শিববন্দনা করে যাত্রারম্ভ হল, তখন সকাল ৬টা। তখনও সূর্যোদয় হয়নি। কালেশ্বর ভৈরবটিলার তলদেশে যে বর্ষার সময় নর্মদার জল উজান বেয়ে এসেছিল, সেই জল সবাই মাথায় ছিটিয়ে নিয়ে অতি সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে প্রস্তরাবৃত জলমগ্ন কঠিন দহ অতিক্রম করা হল।

মোহান্তজী হুঙ্কার তুললেন—সনাতন হিন্দু ধর্মকা জয় হো, অধর্মকা বিনাশ হো, হর হর শংকর মহাদেও। ধর্মপুরী হতে অগ্নিকোণ ধরে আমাদের যাত্রা হল সুরু।

সুন্দরের ঘাট হতে যে রাস্তা ধরে ধর্মপুরীর মন্দিরে এসেছিলাম, সেই রাস্তায় না হেঁটে মোহান্তজী একটা কোণাকুনি রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। সমগ্র দল তাঁকেই অনুসরণ করে এগোতে লাগল। নাগারা মাঝে মাঝেই শিঙা ডম্বরু বাজাতে লাগলেন। প্রায় ঘন্টাখানেক পার্বত্য পথে হাঁটার পরেই আমরা ক্রমশঃ ঘন জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম। গাছপালার ফাঁক দিয়ে অতিকষ্ট করে নর্মদার ধারাকে লক্ষ্য করতে হচ্ছে। এই যাত্রায় দেখছি, মোহান্ত মহারাজ যতীন্দ্রকে পাশে রাখেন নি। তাঁর পাশে আছেন একজন বৃদ্ধ নাগা, নাম লক্ষ্মণভারতী। শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ শরীর, দীর্ঘ দেহী, উচ্চতা সাড়ে ছ'ফুটের কম নয়। ধর্মপুরীর মন্দিরে থাকতেই শুনেছি যে,

ইনি মাত্র বার বছর বয়সে নগেন্দ্রভারতীজীর গুরুদেবের কাছে আশ্রয় পেয়েছেন। জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা হিসেবে এঁকে মোহান্তজী খুবই আদর ও সম্মান করে থাকেন। নর্মদা পরিক্রমা বিষয়ে এঁর অভিজ্ঞতা অনেক বেশী।

হঠাৎ মোহান্তজী তাঁকেই সম্বোধন করে বলে উঠলেন—লছমন ভেইয়া সামনেমে উহ্ কোন্ জানোয়ার বা? লক্ষ্মণভারতীজী কোন উত্তর দেবার আগেই যতীন্দ্রজী বললেন-বাঘ!

অন্য একজন নাগা বললেন—বহুৎ বড়া হিরণ (হরিণ)! লক্ষ্মণজী বললেন—নেহি। উহ্ হ্যায় রাউট্যা।

গোটা দলটাই তখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাতের শিঙা ডম্বরু থেমে গেছে। সবাই জীবটাকে লক্ষ্য করছেন। আমাদের কাছ হতে প্রায় ২০০ গজ দূরে বিরাট কলেবরের জানোয়ারটা আমাদের দিকে পেছন ফিরে পাথরের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। মোটা থলথলে একডোল মাংসপিণ্ড যেন! গায়ে ভালুকের মত ঘন লোম, মুণ্ডমহারণ্য বা ওঁকারের ঝাড়িতে যত ভালুক দেখেছি, তাদের লোমের রং দেখেছি কালো বা ধূসর। সাদা রঙের ভল্লুকও হয় বলে শুনেছি কিন্তু এখনও পর্যন্ত চোখে দেখিনি। কিন্তু ঐ জানোয়ারটার গায়ের লোম দেখছি পিঙ্গল বর্ণের। ফিস্ ফিস করে লক্ষণজী বলছেন—উস্কা আঁখ হোতা হৈ একঠো! ইহ্ ভল্লুকজাতীয় লেকিন ভল্লুকসে ভি হিংস্র হোতা হৈ। জঙ্গল ভেদ করে যেখানে যেখানে সূর্যরশ্মি পড়েছে, তার লক্ষ্য দেখছি সেই সূর্যরশ্মির উপর! গড়িয়ে গড়িয়ে কখনও সোজা দাঁড়িয়ে থপথপ করে হেঁটে, লাফিয়ে যেখানেই একটু আধটু সূর্যকিরণ দেখতে পাচ্ছে, সেখানেই গিয়ে সে গড়িয়ে পড়ছে। একবারও পেছন ফিরে দেখছে না। ছিটে ফোঁটা সূর্যরশ্মি তার গায়ের উপর যেখানেই পড়ছে, সেখানেই লোমগুলো ঝকমক করে উঠছে। মোহান্তজী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অর্থাৎ pin drop silence! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। মিনিট পনের পরে দেখলাম, সে আমাদের চলার পথের উপর দিয়েই সামনের দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়াতে লাগল! মোহান্তজীর সঙ্গে আমরাও গুটিগুটি হাঁটতে লাগলাম। প্রায় আধমাইলটাক শান্তিতে হাঁটা গেল। মোহান্তজী আবার ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর অঙ্গুলি সঙ্কেত লক্ষ্য করে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি,

সেই রাউট্যাটা আবার সূর্যকিরণ যেখানে একটু বেশী জায়গা জুড়ে পড়েছে, সেখানে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কোন ষ্টেশনে ট্রেন ছাড়লে. ট্রেন প্রথমে যেমন ঘ্যাসট্ ঘ্যাসট্ শব্দের সঙ্গে হুস্ হুস্ করে, তেমনিভাবে জানোয়ারটার মুখ দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে—ঘ্যাসট্ ঘ্যাসট্ হুস্ হুস্ !

আমরা সকলেই ভয়ে তখন রেবা রেবা, কেউ বা হর নর্মদে হর নর্মদে জপ করে চলেছি। হঠাৎ একজন নাগা সন্ন্যাসী সশব্দে হেঁচে উঠলেন—হাঁচ্চো ! সেই প্রচণ্ড হাঁচির শব্দে জন্তুটা আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েই আক্রমণের জন্য উদ্যত হল। সে মুখব্যাদন করতেই দেখতে পেলাম তার প্রকাণ্ড লাল হাঁর মধ্যে রক্তের মত লাল জিহ্বাটা লক্ লক্ করছে। নাসিকা মূলে একটা বড় চোখ ভাটার মত জ্বলছে। প্রাণপণে সকলে 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' আকাশ ফাটানো চিৎকারের সঙ্গে শিঙা ডম্বরু বাজাতে লাগলেন। নির্জন বনের মধ্যে সেই হট্টরোলে চমকে গিয়ে কিংবা যে কোন কারণে হোক লক্ষণভারতীজী কথিত সেই ভয়ঙ্কর কদাকার রাউট্যা হঠাৎ লাফ মেরে বনের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এতক্ষণে সকলের ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। মোহান্তজীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা সকলেই 'জয় নর্মদা মাতাজীকী জয়' বলে জয়ধ্বনি দিলাম।

যে পথ ধরে বনের মধ্যে আমরা হাঁটছিলাম, সে পথ থেকে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে মোহান্তজী হাঁটবার নির্দেশ দিলেন। বললেন—হিংস্র জানোয়ারকে বিশ্বাস নেই। কোথাও হয়ত ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে, কাজেই এ পথটা এড়িয়ে একটু বেঁকে গেলেই ভাল। আমি ভাবছি, সেই ত জানোয়ারটা শেষ পর্যন্ত বনের মধ্যে অন্তর্হিত হল, এর আগেও ত সে যেতে পারত, তাহলে আমাদেরকে অনর্থক এতক্ষণ পথের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে হত না। কেন যে সে গেল না, তাই সেই বলতে পারে।

পাহাড়ী পথ জোরে হাঁটা যায় না। সদ্য বর্ষা শেষ হয়েছে। ছোট-বড় পাথরের চাঙড়গুলো নানা লতাগুল্মে ঢেকে গেছে। মোহান্তজী দুবার হোঁচট খেলেন। ভিজে ভিজে শ্যাওলা ধরা চাঙড়গুলো বড় পিছিল হয়ে গেছে। তাই দেখে লক্ষ্মণভারতী এবং আর একজন বলিষ্ঠ দেহধারী নাগা ত্রিশূল ও লাঠি হাতে মোহান্তজীর সামনে গিয়ে অগ্রদূতের কাজ করতে লাগলেন।

এখন গাছের পত্রান্তরাল হতেই অনুমান করতে পারছি, রোদ খুব চনমনে হয়ে উঠেছে। এই বনে কেঁদ গাছই বেশী। আবলুষ, পিপল্, সেগুন, বেল, সাজা এবং সালাই গাছেরও অভাব নেই। বড় বড় গাছে বুনো মোটা মোটা লতা জড়িয়ে উঠেছে এবং তাতে অজস্র বুনোফুল ফুটে আছে। এই পথের গম্ভীর সৌন্দর্য বলে বোঝানো যাবে না।

প্রায় আরও দু'মাইল হাঁটার পর মা নর্মদাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আমরা তাঁর কিনারায় এসে গেছি। বিন্ধ্যপর্বতের যতটুকু চোখে পড়ছে, সবদিকেই ঘন বনে ঢাকা। তটরেখা ধরেই আমরা হাঁটছিলাম, কিন্তু বেলা দশটা নাগাদ আমরা এমন জায়গায় এসে ঠেক খেলুম যে আর তট ধরে এগুনো অসম্ভব। কেন না এ বছর অতিরিক্ত বর্ষার জন্য নর্মদার জল উছলে তটরেখার কিছু অংশ প্লাবিত করেছিল। সে জল এখনও সম্পূর্ণ শুকোয় নি। তাই আবার আমাদেরকে ডানদিকে ঘন বনের মধ্যে ঢুকতে হল। আমরা বনে ঢুকে ক্রমে এমন একটা উঁচু জায়গায় উঠে এলাম যে আমরা আমাদের সামনে সাপের মত আঁকাবাঁকা সমস্ত পথটা দেখতে পাচ্ছি—কখনও শৈল-গাত্র বেয়ে, কখনও সংকীর্ণ উপত্যকায় নেমে আবার কখনও দূর দিকচক্রবালে অদৃশ্য হয়ে পথটা বরাবর চলেছে আগে আগে। বাঁদিকে কিছুটা দূরে নর্মদাকে দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে প্রায় আধমাইলটাক লম্বা বন্য বাঁশের বন, শালবন, বাঁশবনের ধার দিয়েই বয়ে চলেছে একটা ঝর্ণা কুলুকুলু শব্দে। কিন্তু খর রৌদ্রের তাপে একদল বলিষ্ঠ নাগার দলের মধ্যে থেকেও সেই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা এবং ঝর্ণার কুলুকুলু তান হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার সুযোগ পেলাম না, একদল বন্য কুকুরের বিকট ডাক শুনে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেশ কিছুটা দূর থেকেই কুকুরগুলো চিৎকার করছে, আমরা বুঝতে পারছি, তাই একটুখানি দাঁড়িয়েই আমরা মন্থর গতিতে এগোতে লাগলাম। শংকরভারতীজী সকলকে স্থির হয়ে দাঁড়াবার ইঙ্গিত জানিয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুততালে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ফিরে এলেন। মোহান্তজীর কানে কানে কিছু বলে যে নাগার হাতে কেরোসিনের টিন ছিল, তাঁর কাছ থেকে বড় এক টুকরো নেকড়া চেয়ে নিয়ে যেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন, আবার দ্রুতপদে ফিরে গেলেন সেখানে। সেখানে গিয়ে কেরোসিনে ভেজানো নেকড়াটাতে দিয়াশলাইয়ের কাঠি জেলে ছুঁড়ে দিলেন

একঝাড় বুনো বাঁশঝাড়ের তলায়। তলায় জমে থাকা বাঁশপাতায় আগুন ধরে যেতেই তিনি আমাদেরকে ইঙ্গিত করলেন তাঁর কাছে এগিয়ে যেতে। কৌতূহলে আমরা অস্থির হয়ে পড়েছি, ব্যাপারটা কি তা কিছুই অনুমান করতে পারছি না, তবুও মোহান্তজী হাঁটতে শুরু করতে আমরা সবাই তাঁকে অনুসরণ করলাম। যতই এগোচ্ছি, কুকুরের ডাকও তত উগ্রতর ও নিকটতর হয়ে উঠছে। শংকরজীর কাছে পৌঁছতেই তাঁকে আর দেখাতে হল না, আমরা নিজেরাই বাঁশপাতার লেলিহান অগ্নিশিখা এবং বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দেখলাম একটা নেকড়েকে ঘিরে ধরেছে একদল বুনো কুকুর ; নেকড়েটা একটা কুকুরকে দাঁতে কেটে মেরে ফেলেছে, তাই নেকড়েটাকে আক্রমণ করেছে বাকী আট-দশটা বুনো কুকুর। নেকড়ের অবস্থা কাহিল ; বুনো কুকুররা নেকড়েটার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। তাদের চোখগুলো ধক্ ধক্ করে জ্বলছে ভাঁটার মত। আমাদের দলকে বাধাদানকারী ভেবে তেড়ে আসতে চায় কিন্তু আগুনের শিখার ভয়ে তারা এদিকে এগোতে পারছে না। শংকর ভারতীজীর ইঙ্গিতে আমরা প্রাণপণ দৌড়ে সেই বুনো কুকুরের দলকে এড়িয়ে নর্মদা কিনারে পৌঁছে গেলাম। মনে মনে ভাবছি, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা যত বলশালীই হোক না কেন, মানুষের বুদ্ধির কাছে সবাইকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। হিংস্র বন্যপশু ত দূরের কথা, দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গম প্রকৃতির করাল ভ্রূকুটিকেও অগ্রাহ্য করে বুদ্ধিমান মানুষ তার জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। মানুষের জয় হোক।

একবার পেছন ফিরে তাকালাম, তখনও আগুন জ্বলছে। হয়ত বাঁশবনের খানিকটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বন্যপ্রকৃতির বুকে আগুনের এই তাণ্ডব জ্বালিয়ে কি ভাল কাজ করা হল? ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্যের বিচার করার সময় এখন নয়। সূর্য এখন মাথার উপরে। আমরা সবাই এখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, ঘর্মাক্ত কলেবর। সামনে দুর্গম পথ পড়ে আছে, সেই দুর্গম পথে পাড়ি দিতে হবে। মোহান্তজী নর্মদা স্পর্শ করে জল খেলেন; আমরাও নর্মদা স্পর্শ করলাম। এক কমণ্ডলু জল ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে আমরা কমণ্ডলুতে নর্মদার জল ভরে নিলাম। আবার হাঁটা সুরু হল। নর্মদার ওপারের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম নর্মদার দক্ষিণতটে বহু জনবসতি ও মন্দির চোখে পড়ছে। কিন্তু এই উত্তরতটে বন ও নির্জনতা ছাড়া আর

কিছু চোখে পড়ছে না। নর্মদার বুক দিয়ে দু-চারটে নৌকোকে পাল তুলে যেতে দেখলাম। আরও ঘন্টা আড়াই নর্মদার কিনারা ধরে হেঁটে হেঁটে পৌঁছলাম এমন এক স্থানে যেখানে আট-দশটা বড় বড় নৌকো ও খান পনের মাঝারি নৌকো নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। কাছেই একটা পাথরের শিবমন্দির। যতীন্দ্রজী আমাকে বললেন—'এই স্থানের নাম গাঙ্গলীফেরী। এখানেই মনে হয় আজ রাত্রিবাস করা হবে। ঐ মন্দিরে আছেন নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব।' এখানে পৌঁছেই নর্মদার দিকে মাথা নুইয়ে মোহান্তজী তিনবার—'হর নর্মদে' বলেই বসে পড়লেন। এইটা এখানেই যাত্রাবিরতির ইঙ্গিত। নর্মদার পার্বত্যতটে সবাই বসে পড়লেন। মোহান্তজী একজন নাগা সন্ন্যাসীকে ডেকে বললেন—কিঙ্করলাল নাও-ৱালাকো দো-ঘন্টাকা বাদ হমারা সাথ ভেট করনেকে লিয়ে বুলাওজী! সেই নাগা চলে গেলেন কিঙ্করলালকে খুঁজতে। মোহান্তজী, আমাকে এবং যতীন্দ্রজীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন নর্মদায় স্নান করতে। অন্যান্য নাগারা কেউ কাঠ ও শুকনো ডালপালা আনতে গেলেন রাত্রে ধুনি জ্বালার প্রয়োজনে। দশজন নাগা একসঙ্গে রুটি তৈরীর জন্য উদ্যোগী হলেন। কেউ কেউ প্রথমেই স্নানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। আমি পূর্বেই বলেছি, নাগারা মিলিটারী ডিসিপ্লিনের সঙ্গে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়ে দ্রুত আপন আপন কর্তব্য সমাধা করে থাকেন। নর্মদায় স্নান-তর্পণ সেরে আমরা কমণ্ডলুতে জল ভরে নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরে গেলাম পূজা করতে। ছোট পাথরের মন্দির। দরজা খোলাই আছে। মন্দিরে ঢুকে দেখি শিবলিঙ্গ নানা-রকম বনফুলে ঢাকা পড়ে গেছেন। এখন আমরা ছাড়া পরিক্রমাবাসী আর কেউ নেই। আশপাশে কোন বসতিও দেখা যাচ্ছে না। অনুমান করলাম, নৌকার মাঝিমাল্লারাই পূজা করেছেন। শিবসুন্দর ছাড়া এমন দেবতা আর কে আছেন যাঁর কাছে শুচি অশুচি নেই, পাপতাপের বিচার নেই, ব্রাহ্মণ-শূদ্র চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিভেদের বালাই নেই; যে বর্ণবৈষম্য এবং জাতি-ভেদের বিষবাষ্পে হিন্দুধর্ম ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হচ্ছে, সেই গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ শিবপূজা করে ঠিকই কিন্তু একবার যদি গভীরভাবে শিবসুন্দরের আদর্শ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে তাহলে আমাদের সমাজ সত্যই দেবসমাজ হয়ে উঠবে। মাত্র একদিন আগে ধর্মপুরীর

মন্দিরে যতীন্দ্র যে গানটি গেয়েছিলেন তার দুটি লাইন আমার মনে পড়ে গেল—

বেলপাতা নেন মাথা পেতে; গাল বাজালে হন খুশী।
মান-অপমান সমান ত তাঁর, তাঁর কাছে নয় কেউ দোষী।

নীলকণ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গটি প্রায় দেড়ফুট দীর্ঘ। বর্ণ ঘন নীলাভ। লিঙ্গ মধ্যে আর কোন চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। দেখতে বড় সুন্দর। মোহান্তজী মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে শিবের মাথায় জল ঢালতে আরম্ভ করলেন, আমাদের দুজনকেও ইঙ্গিত করলেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জল ঢালতে। তিনি যুক্তকরে নতজানু হয়ে যে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে লাগলেন—

ওঁ ভবঃ শর্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহান্
তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টক মিদম।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেবশ্রুতিরপি
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রণিহিতনমস্যোঽস্মি ভবতে।

অর্থাৎ হে প্রভো! ভব শর্ব রুদ্র পশুপতি উগ্র মহাদেব ভীম এবং ঈশান—এই যে তোমার আটটি নাম, এগুলির প্রত্যেকটি অর্থ প্রকাশের জন্য বেদও সম্পূর্ণরূপে সচেষ্ট। আমি কায়মনোবাক্যে সেই আনন্দরূপ এবং অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি।

তিনজনেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। পূজা করে তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে আসতে আসতে বললেন—এ মন্ত্রটি আমি কোথা হতে বললাম বলত? শিবের যে আটটি নাম উচ্চারণ করলাম সেইসব নামের পৃথক পৃথক অর্থ জান কি? আমি বিনম্রভাবে উত্তর দিলাম—পুষ্পদন্ত নামক গন্ধর্ব কৃত প্রসিদ্ধ শিবমহিম্নঃ স্তোত্রের শ্লোক এটি। ভব শব্দের অর্থ জগতের উপাদানস্বরূপ, শর্ব মানে প্রলয় কর্তা, রুদ্র শব্দের অর্থ যিনি কর্মমল নাশ করে সর্ব দুঃখের সংহার ঘটান, পশুপতি অর্থাৎ জীব মাত্রেরই পতি বা ঈশ্বর, উগ্র শব্দের অর্থ বিশ্বাতীত, মহাদেব অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, ভীম মানে অন্তর্যামীরূপে নিয়ন্তা এবং ঈশান শব্দে যিনি অনুগ্রহ ও

নিগ্রহে সমানভাবে সমর্থ পুরুষ। আমার বাবার এটি নিত্যপাঠ স্তব ছিল, তাঁর কাছেই এই অর্থ শিখেছি।

তিনি আমার চিবুক নাড়িয়ে বলে উঠলেন—সাবাশ বেটা! জিতা রহো।

ডেরায় এসে পৌঁছে গেলাম। যতীন্দ্রজী নিজের হাত ঘড়ি দেখে বললেন—এখন সাড়ে তিনটে। লক্ষ্মণভারতীজী মোহান্তজীকে হাতজোড় করে বললেন—পহেলে আপ পা লিজিয়ে ভগবন্। ঔর পন্দর মিনিটমেঁ সমুচা লিট্টি হো জাবেগা। মোহান্তজী হেসে বললেন—এরকম কখনও হয়েছে কি? সকলে একসঙ্গে না বসে দাদাগুরুজী, গুরুজী কখনও পৃথক-ভাবে সবার আগে খেতে বসেন নি। আমিও যতদিন এই সন্তের সেবা করছি, আমাকে সবার আগে কখনও খাওয়াতে পেরেছেন, আরও আধঘন্টা যাক্ না। সন্ধ্যা হতে এখনও অনেক দেরী।

যাইহোক, চারটে বাজতে না বাজতে খাবার প্রস্তুত হয়ে গেল। সকলে একসঙ্গে বসে লিট্টি ও গুড় পরমানন্দে খাওয়া হল। মিনিট পনের পরেই কিঙ্করলাল নৌকোওয়ালা এসে মোহান্তজীর সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন—এ দাস আপনার সেবায় সদাই প্রস্তুত। যেসব জিনিষপত্র রেখে যাবেন, তা কি দক্ষিণতট দিয়ে যখন যাবেন, তখন কোন্ ঘাটে পৌঁছাতে হবে? কিংবা ভরোচে পৌঁছে দিতে হবে?

—নেহি জী, পৌঁছানে নেহি হোগা, হম্ দো মাহিনাকে অন্দর ইধরই লোটেঙ্গে। দক্ষিণতট যাউঙ্গা নেহি। ইস্ বখৎ যাত্রা ভৃগুক্ষেত্র ভরোচ্ তক্।

—বহুৎ আচ্ছা মহারাজ।

মোহান্তজীর ইঙ্গিতে নৌকোতে যেসব জিনিষ রাখা হবে, যা তিনি ধর্মপুরীর মন্দিরে বসে বেঁধে-ছেঁদে রেখেছিলেন, সেইসব ঝোলা বোরা তাঁবু চন্দ্রাতপ ইত্যাদি নাগারা সবাই মিলে নিয়ে গিয়ে রেখে এলেন, কিঙ্করলালের বড় নৌকোতে। সাধুদের জিনিষ পত্রের বোঝা অনেক হাল্কা হল। প্রত্যেকের ঝোলায় কিছু কিছু আটা এবং কৌপীন ইত্যাদি ভরে নেওয়া হল। কিঙ্করলাল প্রদত্ত প্রায় ১০টা ছোট টিনের কৌটায় কেরোসিন ভরে নেওয়া হল। এই কেরোসিন রুটি তৈরীর জন্য কাঠ ধরানোর জন্য নাগাদের দরকার হয় না, তাঁরা কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করে কিংবা একটা দিয়াশলাই-এর কাঠি জ্বেলেই রান্নার কাজ বা ধুনি জ্বালার কাজ সেরে নিতে পারেন।

তবে আজ নিজের চোখেই ত দেখলাম মহেশগিরির জমাতে থাকার সময় ওঁকারের ঝাড়িতেও দেখেছিলাম, কেরোসিন এই ঝাড়ি পথে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য দুর্লঙ্ঘ্য ও অব্যর্থ অস্ত্রের কাজ করে। আগুনের মশাল দেখলে বাঘও ভয় পায়, অন্যে পরে কা কথা।

কিছুক্ষণ পরেই চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তটের উপরেই যে যার কম্বল বিছিয়ে নর্মদামুখী হয়ে যে যার জপে বসলেন। চারদিকে সাতটা ধুনি জ্বালা হয়েছে। যথারীতি পালা করে পাহারা দেবার ব্যবস্থাও করা হল। অদূরেই ঘন বন, চোখের নিমেষে রাত্রির কুয়াশা নেমে চারধার ঢেকে ফেলেছে, পাহাড় দেখা যাচ্ছে না, জঙ্গলের গাছপালাও অন্ধকারে ঢেকে গেছে। সামনে নর্মদার ধারে কিঙ্করলালদের নৌকোগুলোতে টিম্‌টিম্ করে যে লণ্ঠন জ্বলছে তাও স্পষ্ট নয়। সামনে পেছনে সব যেন ঘষা পয়সার মত লেপে মুছে একাকার হয়ে গেল।

ধর্মপুরীতে মোহান্তজী তবুও একটা ছোট তাঁবুর মধ্যে থাকতেন, কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে এই মুক্ত আকাশের তলায় তিনিও আসন বিছিয়ে বসে আছেন। প্রত্যেকেই আত্মকর্মে, ধ্যান জপে মন দিয়েছেন। আমি চুপচাপ বসে আছি নর্মদার দিকে তাকিয়ে। ওপারে দক্ষিণতটের দু'একটা আলো দেখতে পাচ্ছি। আমার সহসা মনে পড়ে গেল গুলজা গ্রামের খাড়েশ্বরী মহারাজের কথা। নর্মদাতটের সেই অদ্ভুত কর্মা কঠোর তপস্বী বোধহয় আজও একপায়ে খাড়া থেকে কৃচ্ছ্রসাধন করে চলেছেন! জানি না, তাঁর চরমপ্রাপ্তি অভীষ্ট সিদ্ধি হয়েছে কি না, কিন্তু এই নর্মদাতটে যত সাধু মহাত্মকে দেখেছি, তাঁদের কাউকে এঁর মত কঠোর তপস্যা করতে দেখিনি, নর্মদার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দিনরাত্রি একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, এ যে কত বড় তপস্যা, তা সাধারণের ধারণার বাইরে!

আজ ৩০শে ভাদ্র, কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া। রাত্রি প্রভাত হলেই ১৯৫৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সুরু হবে। কালই ভাদ্রমাসের ষড়শীতি সংক্রান্তি এখান থেকে যাত্রা করার কথা। '১৬' তারিখের কথা মনে পড়তেই মনটা দমে গেল। জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে, বিশেষতঃ চেরো যিনি সুদূর ইউরোপ হতে হরিদ্বারে এসে এক হিন্দু মহাত্মার কাছে হিন্দুজ্যোতিষের কিছু গুহ্য সূত্র আয়ত্ত করে সারা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ ও বিখ্যাত

বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা সম্বন্ধে নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেই চেরোর (Cheiro) এবং Sepharial নামক আর একজন সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতানুসারে সাত তারিখটা [৭, ১৬=(১+৬)=৭, ২৫=(২+৫)=৭] বিষম ঝঞ্ঝাটের দিন। তিনি সংখ্যাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে (Neumerology) এই অভিনব কথা বলেছেন যে '৭' হচ্ছে কেতুগ্রহের নম্বর আর কেতু মানেই রহস্য (Mystry); কেতু মানুষের জীবনে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বিপদ ডেকে আনে। কিন্তু আমি ত একটা জমায়েতের সঙ্গে আছি, জমায়েতের নেতার ইচ্ছানুসারে চলতে হবে, উপায় নেই। কাজেই যা ঘটার ঘটুক। বাবার কথা স্মরণ করে মনে সান্ত্বনা ও ভরসা আনলাম। তিনি বলতেন—'ভূত এবং গ্রহের উপর যারা বড় বেশী আস্থা রাখে, তারা ভগবদ্-বিশ্বাসী নয়। যা কিছু ঘটছে তার মূলে আছে ভগবদ্-ইচ্ছা, এক বিশ্বনিয়ন্তাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন, এই বিশ্বাসের বদলে কেউ যদি কেবলই ভাবে এটা গ্রহবলে হচ্ছে, মঙ্গল এখন খারাপ, এখন রাহুর দশা, শনির দৃষ্টি পড়েছে বৃহস্পতির মাসীর উপর কিংবা শনির ক্রূর দৃষ্টি শুক্রগ্রহের পিসীকে লটপট খাওয়াচ্ছে, এইসব চিন্তা যদি কাউকে গ্রাস করে অর্থাৎ কেউ যদি মনে প্রাণে গ্রহফলে বিশ্বাসী হয় তাহলে বুঝতে হবে, সেই লোকের সত্তার গভীরে ভগবদ্-বিশ্বাস বেঁধে উঠেনি।'

যাইহোক আমি বাবার কথা স্মরণ করে নর্মদা-শংকরের করুণার উপর নির্ভর করলাম। মুহূর্তে জ্যোতিষবিদ্যার বিড়ম্বনা মন থেকে মুছে গেল। মন শান্ত হল। আমি শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখলাম ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না, আমি কম্বলের উপর উঠে বসলাম। ভাদ্র মাসের ভ্যাপসা গরমের তাপ নদীতীরে শুয়ে বসে মোটেই অনুভব করছি না। ঘুমিয়ে খুব তৃপ্তিবোধ করছি। মুক্ত আকাশের তলায়, এই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির, এই নৈশ প্রকৃতির শোভা নিজের চোখে দেখবার জিনিষ, কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। লোকালয় হতে বহু দূরে, পাহাড়ের মাথায় ঘন বন, নর্মদা-তটে জ্যোৎস্না আমরা এই জনা ত্রিশেক প্রাণী শুয়ে বসে আছি, যেকোন মুহূর্তে বাঘ বা যেকোন বন্যজন্তু বন থেকে বেরিয়ে এসে অতর্কিতে আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে, এসব বনে বাঘ ত আছেই, বন্যহস্তী

এবং ভালুকেরও অভাব নেই। আজই ত এখানে আমরা পথে 'রাউট্যা' নামক অত্যদ্ভুত একচক্ষু বিশিষ্ট ভল্লুকজাতীয় একটা হিংস্র জানোয়ার দেখে এলাম।

তা হোক, বিপদের মধ্যেই ত ভ্রমণের আসল আনন্দ। অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে, সে জায়গা যতই সুন্দর করে মহার্ঘ আসবাবপত্রে সাজানো হোক না কেন সেখানে বেড়িয়ে শুয়ে বসে রাত কাটিয়ে এইরকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, ভয় বা উত্তেজনার সন্ধান মেলে না। অনুভূতির নূতনত্বই মানুষের জীবনে বড় সম্পদ।

দু চারজন নাগা সাধুও জেগেছেন বলে মনে হল। পাহারাও বদল হয়েছে। অন্য চারজন নাগা এখন পাহারা দিচ্ছেন ত্রিশূল হাতে, ধুনিগুলো যথারীতি জ্বলছে। আমার পাশেই কম্বল বিছিয়ে ঘুমাচ্ছেন যতীন্দ্রজী, গভীর ঘুমে অচেতন। তাঁর নাকের 'ফরর্-ফরৎ' শব্দ সমান তালে বেজে চলেছে। রাত্রি কত হয়েছে বুঝতে পারছি না। যতীন্দ্রজীর কাছে ঘড়ি, দেখবার উপায় নেই। আবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। একটা বিরাট হৈ চৈ এবং কোলাহলের মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল। কেবলই 'মার ডালো, মার ডালো' শব্দ। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। আচমকা ঘুম ভাঙায় কিছুই বুঝতে পারলাম না। যতীন্দ্রজী পাশে নেই। কেবল মোহান্তজী এবং তাঁকে ঘিরে জনা চারেক নাগা ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। নৌকোগুলোর দিক থেকেই 'মার ডালো' শব্দ ভেসে আসছে। বাকী সব নাগারা সেখানেই চলে গেছেন। ভোর হয়ে আসছে কিন্তু ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে রাত দুপুর। মোহান্তজী সংক্ষেপে আমায় জানালেন যে নোঙরের জিঞ্জির বেয়ে একটা চিতাবাঘ নৌকোর উপর উঠতে চেষ্টা করছিল, মাঝি মাল্লারা সময়মত জেগে ওঠায় বর্শা ও লাঠির ঘায়ে তাকে কাবু করে জলে ফেলে দিয়েছে। তারই উপর চলেছে মার ডাণ্ডা!

—মহারাজ! হম্ যাউঙ্গা?

—চলিয়ে ম্যয় ভি আপ্‌কা সাথমেঁ যাতে হেঁ।

সকাল হয়ে আসছে বলে ধুনি নিভিয়ে দেওয়া হল। সকলে মিলে নৌকোয়ালাদের কাছে গেলাম। মোহান্তজীকে দূর থেকে যেতে দেখে যতীন্দ্রজী এবং আর একজন নাগা কাছে দৌড়ে এসে জানালো যে পাঁচটা

বর্শা ফুঁড়ে চিতাবাঘটাকে জলের তলায় জেঁকে রাখা হয়েছে। 'মারা গেছে' নিশ্চিন্ত হলে তাকে জল থেকে তোলা হবে।

মোহান্তজী নৌকোর কাছে পৌঁছুতেই কিঙ্করলাল তার নৌকো থেকে নেমে এসে জানাল, দিন পনের আগে দুজন শিকারী রোশনলালের নৌকোতে করে ওপার থেকে আসছিল হরিণ শিকার করতে। শিকারী দুজন জঙ্গলের মধ্যে যখন ঢোকে, তখন রোশনলালও বর্শা হাতে নিয়ে তাদের সঙ্গে গিয়েছিল। তারা গিয়ে এই চিতাবাঘটাকে দেখতে পায়। চিতাবাঘটা আক্রমণোদ্যত হতেই রোশনলালের চোখে পড়ে। সে বর্শা ছুঁড়ে মারে। একজন শিকারীও গুলি ছোঁড়ে। পায়ে গুলি লাগায় তখন চিতাবাঘটা বনের মধ্যে পালায়। রোশনলাল সে সময় লক্ষ্য করেছিল সেই চিতাবাঘটার একটা কান কাটা। সেই এক কান কাটা বাঘটাই এতদিন পরে রোশনলালের নৌকোয় হামলা করতে এসেছিল! আশ্চর্য এদের আততায়ীকে চিনে রাখার ক্ষমতা! যে গুলি ছুঁড়েছিল সে ত চলে গেছে ওপারে, রোশনলালকে ঠিকই চিনে রেখেছিল। জিঞ্জির বেয়ে উঠেছিল বলে নৌকোতে দোলা লেগেছিল, তাই নৌকোর মাঝি-মাল্লারা জেগে উঠেছিল, তা না হলে কি যে ঘটত, তা মা নর্মদাই জানেন। মা নর্মদাই বাঁচিয়ে দিয়েছেন রোশনলালকে।

মোহান্তজী বললেন—এ লেকিন শোচিয়ে বাঘকা প্রতিহিংসা ক্যাতনা ভয়ঙ্করী হোতা হৈ।

এই সময় কিঙ্করলাল দৌড়ে এসে জানাল, চিতাবাঘটাকে জল থেকে টেনে তোলা হয়েছে। বর্শার খোঁচায় খোঁচায় চিতাবাঘটার সর্বাঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে, তার মাথাও ফেটে গেছে। সত্যিই তার একটা কান কাটা। রোশনলাল হায় হায় করছে এই বলে যে, চিতাবাঘটার চামড়াটায় বর্শার ঘায়ে এত ফুটো হয়েছে বলে সে বেশী দামে চামড়াটা বিক্রী করতে পারবে না। মোহান্তজী সকল নাগা সন্ন্যাসীকে হেঁকে বললেন—এক ঘণ্টাকী অন্দর সব তৈয়ার হো যাও। যাত্রা করেঙ্গে। কিঙ্করলালকে বললেন—তুম্‌হারা মালিককো হমারা বারেমেঁ বোল দেনা, হমলোক ভরোচ যা রহেঁ। উধারসে যব্ লোটেঙ্গে, উহ্ ইধর রহেঙ্গে তব ভেট হবেগা। কিঙ্করলাল চলে যেতেই আমাকে যা বললেন—এইসব নৌকো একজন

গুজরাটি ভদ্রলোকের। তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, তাঁর বহুবিধ কারবারের মধ্যে নৌকোর কারবারও একটি। নর্মদার কৃপায় তাঁর ঐশ্বর্য হয়েছে বলে তিনি তাঁর নৌকোয় সন্ন্যাসীদের জিনিষপত্র রেখে এবং সেগুলি সন্ন্যাসীদের অভীষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে পরিক্রমাকারীদেরকে সাহায্য করে থাকেন। এই বলে তিনি স্নান করতে গেলেন। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ নাগা নিজেদের 'সামান উষান লোটা কম্বল' বেঁধে ছেঁদে নর্মদাতে স্নান করতে নেমে পড়েছেন। আমিও নর্মদাতে নেমে স্নান তর্পণ সেরে এলাম। এ অঞ্চলে সূর্যোদয় হয় অনেক দেরীতে। সকাল সাতটা নাগাদ যখন সূর্যোদয় হচ্ছে, তখন আমরা 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' ধ্বনি দিয়ে যাত্রা সুরু করলাম। রাস্তা বলে কিছু নেই, জঙ্গল ক্রমশঃ নর্মদার কিনার পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। নাগা সন্ন্যাসীরা শিঙা ডম্বরু বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছেন। এইভাবে ঘন্টা দুই যতটা সম্ভব দ্রুততালে হেঁটে আমাদেরকে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। অগ্রবর্তী শংকরভারতীজী চেঁচিয়ে জানালেন—সামনেমেঁ বুনো মহিষ ও নেকড়ের পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের এবং আমাদের মাঝখানে শুধু একটা ছোট্ট ঝর্ণার ব্যবধান। ঝর্ণাটা ঝিরঝির করে অতি দ্রুত বেগে বয়ে চলেছে। ঝর্ণার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রুতিমধুর সন্দেহ নেই কিন্তু তখন ঝর্ণার সংগীত শোনার মত মনের অবস্থা নেই। আমরা সবাই তখন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রেবা রেবা জপ করছি। মনে মনে ভাবছি এই বুঝি নেকড়ে ও বুনো মহিষের দল ঝর্ণাটা পার হয়ে এসে যুগপৎ আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিংবা নেকড়ে ও বুনো মহিষে লড়াই বেঁধে যায়। বুনো মহিষগুলো নেকড়েদেরকে ফোঁস ফোঁস করছে, গাঁ গাঁ রবে গর্জন করছে, পাথরের উপর পা আছড়াচ্ছে কিন্তু নেকড়েরা অত বোকা নয়, তারা শেয়ালের মতই ধূর্ত, তারা বুনো মহিষের দিকে হিংস্র চোখে তাকাচ্ছে, তাদের চোখ দিয়ে হিংস্র ও লোভের ভাব ঝরে পড়ছে, লকলকে জিহ্বাগুলো একবার বের করছে, একটু একটু করে গাছের আড়ালে সরে যাচ্ছে, কিভাবে বুনো মহিষগুলোকে এগিয়ে পেছিয়ে ঘিরে ফেলা যায় এবং তাল বুঝে পেছন দিক দিয়ে আচমকা তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়া যায় (অন্ততঃ আমার মনে হল) তারা যেন তারই তাল খুঁজছে। এমন সময় দেখা গেল ঝর্ণার ওপারে হিংস্র জন্তুগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের তাল ঠুকছে, তাদের পেছন দিকের জঙ্গলে

বড় বড় যত গাছ কড় কড়্ মড় মড়্ শব্দে দুলে উঠছে, অনেক শাল সাজা সালাই এবং ছোট ছোট অশ্বত্থ গাছ মড়াৎ মড়াৎ করে ভেঙ্গে পড়ছে। কি ব্যাপার! বনের জানোয়ারদের যেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের চেয়ে অধিকতর সজাগ! চোখের নিমেষ ফেলতে না ফেলতেই বুনোমহিষ ও নেকড়ের দল উধাও! যে যেদিকে পারল দৌড়ে পালাল! আমরা দেখতে পেলাম প্রায় গোটা ত্রিশেক কালো কালো বুনোহাতী তাদের বিরাট কলেবর নিয়ে শুঁড়ে ছোট গাছের ডাল নিয়ে চারদিক যেন 'দল-মাদল' করে বন থেকে ছুটে আসছে। সকলেই রেবা রেবা জপ ত করছি কিন্তু ভয়ে সকলের বাক্‌রোধ হওয়ার উপক্রম! মোহান্তজী থেকে সুরু করে কারও কণ্ঠে স্পষ্টতঃ রেবা নাম শোনা যাচ্ছে না। সকলেরই যেন গলায় কফ বসে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। মনে হল পেছনদিকে আমাদের সারিতে দু'তিন-জন ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দে পড়ে গেলেন কিংবা ভয় পেয়ে বসে পড়লেন। দূর থেকে দেখাচ্ছিল যেন কাল কুজ্ঝটিকাময় তাল তাল মেঘ বনের মধ্য থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে। এদেরকে দেখলে বুনোমহিষ বা নেকড়ে ত দূরের কথা, আমাদের সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগারও ভয় পেয়ে দৌড়াবে। একেই বলে দৈবকৃপা। হস্তীর 'বৃংহন' শুধু বইয়েই পড়েছিলাম, আজ নিজের কানেই শুনলাম। হাতীর দল ঝর্ণা পেরিয়ে এদিকে এল না, আমরা রক্ষা পেলাম। সকলেরই যেন ঘাম দিয়ে কালজ্বর ছেড়ে গেল। কাঁপা কাঁপা বসা গলায় সহর্ষে সকলেই বলে উঠলেন, 'নর্মদা মাতা কি জয় হো।' তাঁদের এই জয়ধ্বনিকে বিকৃত কণ্ঠস্বরের জন্য কান্নার রোল বলে মনে হল। হাতীর দল দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই পেছন ফিরে দেখি যতীন্দ্রজীসহ আমাদের সঙ্গী দুজন পণ্ডিত পাথরের উপর চিৎপাত হয়ে পড়ে আছেন। তাঁরা ঘেমে নেয়ে গেছেন একেবারে। কয়েকজন নাগা তাঁদের মুখে-চোখে কমণ্ডলুর জল দিয়ে ঝাপটা মারছেন। মোহান্তজী বললেন—বেচারীয়োঁ ডর কা তরাস সে কিঞ্চিৎ বেহোঁস হো গয়া! কিন্তু তাঁরও হালৎ (অবস্থা) ভাল দেখলাম না। তিনি রেবামন্ত্র জপ করার তাড়নায় তাড়াতাড়ি গলা থেকে রুদ্রাক্ষমালা নিতে গিয়ে তাঁর গলায় যে গুরুকবচটি কালো ডুরিতে ঝুলছিল, সেটাই অজান্তে তুলে নিয়ে জপের মালা হিসেবে ঘুরিয়ে চলেছেন। সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তিনি লজ্জা পেয়ে ভুল সংশোধন করে নিলেন।

বুনো হাতী দেখে যাদের ক্ষণিক আচ্ছন্নভাব এসেছিল তাঁরা পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠতেই আবার যাত্রা আরম্ভ হল। ঝর্ণার জল যে পাথরের চাটানের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল তা আমরা সকলে অতি সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে পা টিপে পেরিয়ে গেলাম। একজন পণ্ডিতজী ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—ঐদিকের জঙ্গলের ভেতর থেকে বুনো হাতীর দল বেরিয়ে এসেছিল, ঐ জঙ্গলের ভেতর ঢোকা কি উচিত হবে? লক্ষণভারতীজী তাঁর দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন—হাতী উধর আপ্‌কো লিয়ে বৈঠা হ্যায় থোড়ি। অর্থাৎ কতদূরের জঙ্গল হতে হাতীর দল আসে, এখানে দেখা গেল বলে যে এই জঙ্গলেই তাদের আস্তানা এটা ভাবা ঠিক নয়। পণ্ডিতজী তবুও ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—নর্মদামায়ীকী ঔর থোড়া নজ়দিক্ কিনারসে কিনারসে চল্‌না ঠিক সমঝতে হৈঁ। এবার শংকরভারতীজীর উত্তর—নেহি, এহি পরকরমাকী পথ হৈ। ইস্ রাস্তেমেঁই চলেঙ্গে। আপনা আঁখমেঁ দেখা ত, ক্যায়সে নর্মদামায়ী হমলোগকো বাঁচা দিয়া।

কেউ আর কোন উচ্চবাচ্য করল না। কারও মুখে শব্দ নেই। নীরবে সবাই রেবামন্ত্র জপ করতে করতে হাঁটতে লাগলাম। চলার পথ নানারকমের ঘন গাছপালায় ঢেকে আছে বলে কখনও ঝাপসা অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে, কখনও বা সূর্যের আলো পড়ায় যেখানে গাছপালার তত ভীড় নেই সেখানে রৌদ্রালোকিত হয়ে উঠেছে। এক জায়গায় দেখলাম অজস্র হনুমান গাছের ডালে লাফাচ্ছে, তাদের কিচির-মিচির শব্দ এবং অজস্র সুন্দর সুন্দর পাখীর কলতানে সমস্ত বনভূমি মুখর হয়ে আছে। এই বনে এক ধরণের পাখী যার মুখটা সাদা, দেহটা কালো, লেজ প্রায় ছয়-সাত ফিট লম্বা। ডালে বসে আছে লেজ তার মাটি ছুঁই ছুঁই। আমরা অনেক সময় তার ঝুলে থাকা লেজের পাস দিয়েই হাঁটছি, বড়জোর তিন-চার ফুট-দূর দিয়ে। তাদের কিন্তু হেলকম্প নেই। কেবল হনুমানগুলো যখন হুঁপ্ হাঁপ শব্দে ডাল হতে ডালে লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে, তখনই পাখীগুলো উড়ে পালাচ্ছে। পাখীগুলো যখন একগাছ হতে অন্যগাছের ডালে সড়াৎ সড়াৎ করে উড়ে যাচ্ছে, তখন সে দৃশ্য বড় সুন্দর! অতবড় লম্বা লেজ দিয়ে তারা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছের ডালের ভেতর দিয়ে উড়ছে অথচ তাদের লেজ কোনমতেই কোন ডালে আটকাচ্ছে না। একবার একটা বাইসন এবং একটা সম্বর হরিণকে দৌড়ে

যেতে দেখলাম, আর কোন বন্যজন্তুর দর্শন পেলাম না। বেলা বারটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম চিখলদায়। চিখলদার ঘাটে পৌঁছেই আমরা প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট বিশ্রাম করলাম। হাতমুখ ধুয়ে সকলেই পেটপুরে জল খেলাম। সাধুরা মোহান্তজীকে আড়াল করে এককাঁকে মতীন্দ্রজী ও মোহান্তজী ছাড়া আর প্রায় সকলেই এক ছিলিম করে গাঁজা টেনে নিলেন। সেই অবসরে মোহান্তজী দক্ষিণতটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—উস্‌তরফ্‌ রাজঘাট হ্যায়। উধর, মন্দির, অন্নসত্র বগেরা হ্যায়। ইস্‌তরফ বহুৎ আদমী কহতা হৈ, চিখলদাসেই শূলপাণিকা ঝাড়ি সুরু হো যাতা হৈ। লেকিন, আপ্‌না আঁখমেঁই আগে দেখ্‌চুকা গাঙ্গলীফেরিসেই ক্যায়সা জঙ্গল হ্যায়। হিংস্র জানোয়ারকা ভি কোঈ কমতি নেহি।

মতীন্দ্রজী মোহান্তজীকে জানালেন—হম্‌লোগ্‌ সব তৈয়ার হৈ। যাত্রা করুঁ?

—হাঁ হাঁ চলিয়ে। আবার সকলে যে যার তল্পীতল্পা নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কী নিবিড় বন সুরু হল চলার পথের দু'দিকে! কোথাও কোথাও নিভৃত ছায়া বিতান রচনা করেছেন প্রকৃতিদেবী আপন হাতে। বেলা বোধ হয় সাড়ে বারটা বেজে গেছে, মাথার উপরে খর রৌদ্রের তাপ কিন্তু গাছপালায় ঘেরা নিবিড় বন বলে আমরা কেউ রৌদ্রের তাপ অনুভব করছি না। পথ ক্রমশঃ উঁচু হতে উঁচু হচ্ছে, কিন্তু আমরা যে আমাদের অজান্তেই কিঞ্চিৎ চড়াই পথে উঠছি, তা আমাদের অনুভবে জাগছে না। নিচে তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের থরে থরে কতকগুলো কুঁড়ে ঘর। শংকরভারতী সকলকে সেই কুঁড়েঘরগুলি দেখিয়ে সংক্ষেপে জানালেন—'ভীল! অর্থাৎ ভীলদের বস্তি দেখা যাচ্ছে। মোহান্তজীর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল কোন অজানা আশংকায়। কিন্তু আমি তখন ভাবছি, ভীলদের বাড়ীঘরের যা নমুনা দেখছি, তাতে সহজেই বোঝা যাচ্ছে ওরা নিতান্ত গরীব, অভাবের তাড়নায় তাই ওরা লুটপাট করে, কিন্তু এটা ত ঠিক যে তারা এক রমনীয় পার্বত্য দৃশ্যের মধ্যে সর্বদাই থাকে; ওদের কুটীরের দাওয়ায় বসলে নীল শৈলমালা এবং বনকান্তারের কী শোভন রূপটিই না চোখের সামনে ফুটে উঠে! কিন্তু এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কল্পনা আমার মাথায় উঠল, হঠাৎ দেখলাম কালো কালো সাজা এবং আবলুষগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কালো মিশ্‌মিশে

লোহাপেটা শরীর নিয়ে পাঁচজন ভীল, পরনে নেংটি, হাতে কামট (মাংস-কাটা খড়্গের মত ধারাল অস্ত্র), কাঁধে ধনুক, পিঠে পাতার তৈরী তূণে-ভরা বিষাক্ত তীর নিয়ে। তারা এসেই পথরোধ করে দাঁড়াল। মুখে এক ধরণের অদ্ভুত শব্দ—মুক্ মুক্ মুক্।

লক্ষণভারতীজী এগিয়ে গেলেন তাদের কাছে। তিনি অল্পস্বল্প ভীলভাষা জানেন। যতীন্দ্র চুপি চুপি মোহান্তজীকে বললেন—গুরুজী আমরা ত্রিশজন আছি, ওরা মোটে পাঁচজন! আমরা মেরে তাড়িয়ে দিতে পারব। মোহান্তজী চুপি চুপি বললেন—বেকুব! বেয়াদবি করো না, সাবধানে তাকিয়ে দেখ কালো কালো গাছের গুঁড়ির আড়ালে প্রায় আরও ৬০জন ভীল সংগোপনে দাঁড়িয়ে থেকে (আপ্‌না ছিপাকর্) লক্ষ্য করছে। লক্ষণ ভারতীজী চেঁচিয়ে বললেন—এরা বলছে মুক্ মুক্ মুক্ অর্থাৎ যার কাছে যা আছে রেখে দাও। আমি হাতজোড় করে বিনতী জানিয়েছি, আমরা পরিক্রমাবাসী সাধু, তোমাদের দেশের অতিথি। আমাদের কাছে একটা ছোট বস্তায় বাজরার আটা আছে, আমাদের খাওয়ার মত রেখে তোমরা সব নিয়ে যাও। কমণ্ডলু ছাড়া আর কোন্ বর্তন (থালা বাটি ইত্যাদি) নেই। এরা সূঁচ চাচ্ছে, বলছে, তুমহারা-মৌসী কাপড়া কাঁথা সিঁয়াইয়েগা (অর্থাৎ তোমার মাসী ছেঁড়া কাপড় এবং কাঁথা সেলাই করবে)। মোহান্তজী নিজেই এগিয়ে এলেন ঝোলা থেকে এক বাক্স সূঁচ এবং সূতোর বাণ্ডিল নিয়ে। আর একজন নাগা গেল বাজরার বস্তা হাতে নিয়ে। প্রায় পাঁচ ডজন সূঁচ ও সূতোর বাণ্ডিল পেয়ে তারা বেজায় খুশী। বাজরার বস্তা থেকে প্রায় সিকি ভাগ পাথরের উপর ঢেলে রেখে তারা আনন্দে কোলাহল করতে করতে অন্তর্হিত হল বনপথে।

তারা চলে যেতেই মোহান্তজী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—যাক্ মা রেবার দয়ায় অল্পের উপর দিয়েই রেহাই পাওয়া গেল। এইজন্যই আমি বার ডজন সূঁই (সূঁচ) এবং প্রচুর সূতো সঙ্গে এনেছি, এইজন্যই আমি আধমন বাজরার আটা আলাদা একটা বস্তায় ভরে গেঁওকী আটা আলাদা আলাদা ভাবে তোমাদের প্রত্যেকের ঝোলায় রেখেছি। যাক্ ঐ বাজরার আটাগুলো একটা নেকড়ায় বেঁধে নিয়ে এগিয়ে যাই চল।

নিবিড় বনের মধ্য দিয়েই আমাদের পথ, সদ্য সদ্য একটা বিপদ হতে

আগাদের মুক্তি ঘটায়, পাহাড়ী রাস্তা খারাপ হলেও আমাদের চলার গতি বেড়ে গেল। বেলা বোধহয় আড়াইটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম বড়বানীতে। এখানেও দেখছি গভীর বন। ঘন বন নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়ে উঠে গেছে বিন্ধ্যপর্বতের উপর দিকে। বনের মধ্যে নর্মদার ধারে একটা পাথরের ব্যারাকবাড়ী চোখে পড়ল। গুণে দেখলাম বারখানা ঘর, প্রত্যেকটাই মনে হয় ১২ ফুট × ১০ ফুট করে। প্রধান দরজা মজবুত, মোটা শাল কাঠের, প্রত্যেক ঘরের উপরের দিকে একটা করে ছোট ছোট ফোকর। সেই ফোকর দিয়েই আলো বাতাস ঢোকে। প্রত্যেকটা ঘরের ভেতর দিয়েই অন্যান্য ঘরে যাতায়াত চলে। মোহান্তজী বললেন, আজ এখানেই রাত্রিবাস করা যাক্। নাগারা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়ে দ্রুত যে যার কাজ করতে লেগে পড়লেন। কতকগুলো শালগাছের কচি কচি ডাল একসঙ্গে বেঁধে নিয়ে চারজন সেই ঝাঁটি ডাল দিয়ে ঘরগুলো ভাল করে ঝাড়ু দিতে লাগলেন। একজন পাথরের সমতল চাথালে জল ঢেলে ভাল করে সাফ করে ভীলদেরকে দিয়ে যে বাজরার আটা পড়েছিল, তার সঙ্গে কিছু আটা মিশিয়ে আটজন নাগা সন্ন্যাসী তাই দিয়ে লিট্টি পাকাতে বসলেন। মোহান্তজী আমাকে দক্ষিণতটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন—ওপারেই বড়বানী রাজ্যের রাজা বাস করেন নর্মদাতট হতে প্রায় তিনক্রোশ দূরে। ওখানকার রাজা ভীলালা। নর্মদার ঐ তটের নামও যেমন বড়বানী, উত্তরতটের এই অংশটাকেও বড়বানী বলা হয়। বড়বানীর রাজাই পরিক্রমাবাসী সাধুদের জন্য এই ব্যারাকবাড়ী তৈরী করে দিয়েছিলেন। ওপারের বড়বানীতে বহুলোকের বাস আছে; পরিক্রমাকারী সাধুদের রাত্রিবাসের জন্য থাকার বন্দোবস্ত আছে, অন্নসত্র আছে, দোকান পসরাও আছে। পূর্বে এখানে পরিক্রমাবাসীদের জন্য ওপার থেকে নৌকোয় খাদ্যসরবরাহ করা হত। এখন রাজার রাজত্ব চলে যাওয়ায় আগেকার সব ব্যবস্থাই লোপ পেতে বসেছে।

এখানে নর্মদার বিস্তার এবং ওপারের শোভা দেখতে দেখতে নর্মদা থেকে কিছুদূরে পাহাড়ের উপর ঘনবনের মধ্যে একটা রঙ-চঙে বিশাল মন্দির চোখে পড়ল। মন্দিরের চূড়ায় হরিদ্রাবর্ণের একটা পতাকা উড়ছে বলে মনে হল। মোহান্তজীকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন—

ঐটা বাবলাগঙ্গার পাহাড়। মন্দিরটা জৈনদের। জৈনরা বিশ্বাস করেন, ঐখানে নর্মদার দক্ষিণতটে ঋষভদেব তপস্যা করেছিলেন। ঋষভদেব তাঁদের মতে স্বয়ং শিব। আমার গুরুদেব এবং অন্যান্য হিন্দু মহাত্মা একথা মানেন না। গুরুদেবের মতে, রাজা অগ্নিধ্রের পুত্র নাভির ঔরষে মেরুদেবীর গর্ভে মহাত্মা ঋষভের জন্ম হয়। তিনিই পরমহংস ব্রতের পথপ্রদর্শক। তাঁর একশত পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে একানব্বইজন কঠোর বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করেন এবং অবশিষ্ট ভরত প্রভৃতি ন'জন পুত্র ভারতবর্ষের নয়টি দ্বীপের অধীশ্বর হন। এই মহারাজ ভরতের নামানুসারেই আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। সেই ভরতের পিতৃদেব পরমযোগী এবং পরম বৈরাগী ঋষভদেবের তপস্যাস্থল ঐ বাবলাগঙ্গা। দক্ষিণতট দিয়ে যাঁরা পরিক্রমা করেন তাঁরা বাবলাগঙ্গা থেকেই শূলপানির ঝাড়িতে প্রবেশ করেন, কারণ এই তটে চিখলদা থেকে প্রকৃত শূলপানির ঝাড়ি আরম্ভ হলেও ঐ তটে বাবলাগঙ্গা থেকেই শূলপানির ঝাড়ি সুরু। শূলপানির ঝাড়ির গভীর অরণ্য উভয় তটেই বিস্তৃত।

—আপনি ঋষভদেবকে জৈনদের মতানুসারে স্বয়ং শিব বলে মানতে চাচ্ছেন না, কিন্তু শিবেরও ত অপর নাম ঋষভ?

—তা হবে না কেন? হিমালয়ের উত্তরে কৈলাসের নিকট ঋষভ নামে একটি পর্বত আছে। প্রাচীন যুগের লোকেরা বিশ্বাস করতেন যে, ঐ ঋষভ পর্বতে বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, সন্ধিনী, সুবর্ণকরণী প্রভৃতি ওষধি পাওয়া যায়। সে স্থান ছিল শিবের বিচরণ ক্ষেত্র, তপস্যার ক্ষেত্র। সেইজন্য শিবের অপর নাম ঋষভ। তাই বলে বাবলাগঙ্গার ঋষভদেব স্বয়ং শিব ছিলেন না। তবে একথা সর্বথা মান্য যে, তপোবলে মহারাজ নাভির পুত্র পরমহংস শিরোমণি ঋষভদেব শিবত্ব অর্জন করেছিলেন, সে ত শ্রেষ্ঠ যোগীন্দ্র মাত্রই তপস্যা প্রভাবে শিবত্ব অর্জন করতে পারেন, তাই বলে তাঁরা কেউ স্বয়ং মহাদেব নন।

এইভাবে জঙ্গলের মধ্যে পাথরের উপর বসে আলোচনা করছি, এমন সময় যতীন্দ্র এসে জানালেন—ভোগ প্রস্তুত। এখন অপরাহ্ন ৪টা বেজে গেছে। ঘরের মধ্যে গিয়ে সকলে একসঙ্গে বসে বাজরার লিট্টি গুড় দিয়ে খেয়ে ভোজনপর্ব শেষ করা গেল। আমি একটামাত্র লিট্টি কোনমতে একটু

একটু করে খেতে পেরেছিলাম কিন্তু নাগা সন্ন্যাসীদের ৫টা, ৭টা করে লিট্টি অবলীলাক্রমে ভক্ষণ করতে দেখে আমার চক্ষু কপালে ওঠার উপক্রম!

খাওয়ার পর মোহান্তজী ঘরের মধ্যেই বসে রইলেন, আমরা প্রায় সকলেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে নর্মদাতে নেমে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। এই বারখানা ঘরের এগারখানা ঘরেই নাগাদের কম্বল পাতা হয়েছে। শেষ প্রান্তের ঘরখানা খালি রাখা হয়েছে মোহান্তজীর মুখ হাত এবং প্রকৃতির দাবী মেটানোর জন্য। তিনি বাইরে না আসায় নাগাদের খুবই সুবিধে হল। তাঁরা মনের আনন্দে গঞ্জিকা সেবনে রত হলেন। কেউ কেউ নিজের শরীরে ছাই রগড়িয়ে ভস্মভূষিত হলেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্যের রঙিন রশ্মির বর্ণালী ছটা এসে পড়েছে নর্মদার জলে এবং পাহাড়ের গায়ে। এমন সময় একজন নাগাকে দেখলাম গাঁজাতে দম দিয়ে নাক মুখ দিয়ে ধূম্রজাল বের করতে করতে চোখ মিটি মিটি করে হাসছেন। তাঁর মুখ চোখে গাঁজার আবেগের সঙ্গে যে আনন্দের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। আরও চার পাঁচজন নাগার দৃষ্টি তাঁর উপর পড়েছে কিন্তু তাঁর এই আকস্মিক স্ফুর্তির কারণটা গঞ্জিকা সেবন প্রসাদাৎ না অন্য কিছু তা কেউ ধরতে পারছেন না। অবশেষে তাঁর নিজেরই কৃপা হল। তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে প্রায় পাঁচশ গজ দূরে বনের মধ্যে গাছের ফাঁকে একটা সমতল স্থানের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমরা দেখতে পেলাম একপাল হরিণ হরিণী পরস্পরের গায়ে পড়ে গলায় গলা ঠেকিয়ে মৃদু মৃদু তালে নেচে চলেছে। কী মনোহর। কী সুন্দর দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। তাদের সেই আনন্দলীলার ছবি কালিদাস ভবভূতি কিংবা রবীন্দ্রনাথের মত কোন মহাকবি হলে হয়ত আঁকতে পারতেন। আমাদের কারও সে সাধ্য নেই। মা নর্মদার দয়ায় আমরা যে এ দৃশ্য খোলা চোখে দেখতে পেলাম এইটাই যথেষ্ট। এই রমনীয় মন-মাতানো দৃশ্য আর একবার দেখবার জন্য, অন্তত আমার কথাই বলি, বাঘের পেটে যেতেও রাজী আছি।

—সাম হো গিয়া। সব আদমী অন্দরমেঁ আইয়ে—মোহান্তজীর কণ্ঠস্বর!

—'জী হুজুর!' বলে একজন নাগা এমন বাজখাঁই গলায় উত্তর দিলেন যে, সেইটুকু শব্দেই নিমেষের মধ্যে হরিণের দল অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এই গম্ভীর মহারণ্যে গাছপালার মধ্যে শুধু জীবন্ত মৃত্যুই ওৎ পেতে নেই এই শান্তশ্রীমণ্ডিত শ্যামশোভার মধ্যে সঙ্গীতও আছে। কিন্তু তা শোনার জন্য নীরবে কান পেতে থাকতে হয় কিন্তু আমি যে দলের সঙ্গে পরিব্রাজন করছি, তাঁরা এক একজন মূর্তিমান নীরস গদ্য! মনের বিরক্তি চেপে রেখে আমরা সবাই একে একে ঘরের মধ্যে কিংবা পাথরের খাঁচার মধ্যে ঢুকে এখনকার মত অন্তরীণ হলাম।

প্রধান দরজা সশব্দে বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রত্যেক ঘরে চার পাঁচজন করে আসন পেতেছেন। আমি যে ঘরটায় কম্বল বিছালাম সে ঘরে শংকরভারতীজী এবং যতীন্দ্র রইলেন। পাশের ঘরটায় মোহান্তজী থাকলেন। শেষ প্রান্তের ঘরখানাতে একটা ধূনিও জ্বালা হয়েছে। ব্যারাকবাড়ীর ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাসও আসছে তবুও খুব গরম লাগছে। মোহান্তজী এবং আমাদের ঘরখানার মাঝখানে পাথরের গোবরাট বা চৌকাঠের উপর একটা প্রদীপও জ্বালা হয়েছে। অধিকাংশ নাগাসন্ন্যাসী যে যাঁর কম্বলের উপর শুয়ে পড়েছেন। দু'চারজন বসেও আছেন। মোহান্তজী আমাদের ঘরের তিনজনকে কাছে ডাকলেন। তিনি বলতে লাগলেন—আগামীকাল সকালে উঠেই আমরা লোহাচার পথে যাত্রা করব। ঐ লোহাচায় রেবাকুণ্ড আছে। ভানুমতী নাম্নী কোন রাণীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে নর্মদা ঐ কুণ্ডে কোন সুদূর অতীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সম্প্রতি কুণ্ডটি ধারা ষ্টেটের মধ্যে পড়েছে। সেই ভানুমতী রাণীরও আগে ওঘবতী নামে এক ব্রাহ্মণী স্বয়ং ধর্মের দর্শন পান এবং তাঁর বরে মৃত্যুর পর তাঁর অর্ধাংশ নর্মদার ধারার সঙ্গে মিশে যায়। সেই ধারা ওঘবতী নদী নামে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে রেবাকুণ্ডের পাশেই যে মাণ্ডবগড় কেল্লা আছে, তা নাকি ঐ ভানুমতী রাণীর। সত্য মিথ্যা জানি না। ঐখানে আল্হা উদ্দালেরও কেল্লা আছে। নর্মদাতটে প্রাচীন ভারতবর্ষের কত যে মহিমা, প্রাচীন সভ্যতার কত যে ইতিহাস ছড়িয়ে আছে তার শেষ নেই। আমরা সাধুবর্গ মহাতপস্যার অঙ্গ হিসেবে পরিক্রমা করেই ক্ষান্ত; নর্মদার কৃপায় কেউ কেউ সিদ্ধিলাভ করেই কৃতার্থ বোধ করছেন। কিন্তু ভারতের এই প্রাচীন মহিমা বা ইতিবৃত্ত নিয়ে কোন বিদ্বান পুরুষকেই গবেষণা করতে দেখা যাচ্ছে না। বহুকাল পরে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার এ বিষয়ে যদি কোনদিন উদ্যোগ নেন ভাল, নতুবা কালক্রমে সবই বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবে। এই এখনই যদি যতীন্দ্র বা এই বাঙ্গালীবাবা আস্থা উদ্দালের কেল্লা সম্বন্ধে কে তার নির্মাতা জানতে চায়, আমি আগে থেকেই বলে রাখছি, ঐ সম্বন্ধে আমি আর কিছু জানি না। কেবল মহাভারতে ওঘবতীর উপাখ্যান আছে, সেইটুকু আমি পড়েছি। এখন থাক সে কথা, আমি যে জন্য তোমাদের ডেকেছি সেই কথাই বলি। ভারতীজী। আপনি একথা জানেন যে, আমার পরমারাধ্য গুরুজী শ্রীশ্রীচৈতন্যভারতী ঐ রেবাকুণ্ডের ধারেই নর্মদাশংকরের দর্শন পেয়েছিলেন। তাঁর সিদ্ধিক্ষেত্র হিসেবে আমাদের কাছে ঐ স্থানের গুরুত্ব সর্বাধিক। তাই আমি সংকল্প করেছি, কাল সকালে উঠে আমরা ঐ পথেই যাত্রা করব। তারজন্য নর্মদার তীর হতে আমাদেরকে গভীর জঙ্গল ও চড়াই পথে পাহাড়ের উপর দিকে উঠে যেতে হবে বটে কিন্তু ঐ রেবাকুণ্ডকে প্রত্যেক পরিক্রমাবাসীই পরিক্রমা করে থাকেন। এটা নর্মদা পরিক্রমারই অপরিহার্য অংশ।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই শংকরভারতীজী এবং অন্যান্য ঘরের নাগারাও এক সঙ্গে বলে উঠলেন—পরম গুরুদেবকা সিদ্ধিক্ষেত্র অবশ্যমেব হম্‌লোগ্ দর্শন করেগা।

—কাল সবেরে পহলা আশ্বিন হ্যায়। অগস্ত্য যাত্রা কী দিন। ক্যা জানে, শূলপাণিকী ঝাড়িমেঁ এহি যাত্রা অগস্ত্য যাত্রা হোগা কি নেহী! নর্মদামায়ীকো যো ইচ্ছা হোগা, ঐসাই ঘটে গা। এই বলে মোহান্তজী হাসতে লাগলেন। আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন—আপ জ্যোতিষ জানতে হো?

—নেহি জী! আমার যা কিছু শিক্ষা বাবার কাছে। তিনি বলতেন—ভূত বিশ্বাস ও গ্রহগণের কার্যকারিতায় যাদের বিশ্বাস বেশী, তাদের ঈশ্বর বিশ্বাস কম। যা কিছু ঘটছে, তা গ্রহগণের দশা অন্তর্দশার ফল হিসেবেই ঘটছে, এই বিশ্বাস যাদের, সর্বনিয়ন্তা ভগবানের ইচ্ছেতেই সব ঘটছে, এই রকম বিশ্বাস তাদের শিথিল হতে বাধ্য। বাবার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বতন্ত্র ধরণের। জ্যোতিষশাস্ত্র যে বেদাঙ্গ তা বাবা ভাল করেই জানতেন। যাঁরা জীবনে কোনদিন বেদ চোখে দেখেন নি, সাধনার দ্বারা জ্যোতিঃদর্শন ঘটে নি,

অংকশাস্ত্রে যাঁদের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি নেই, তাঁরা কিভাবে এবং কোন সাহসে গ্রহগণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্যকারিতা বিচার করে মানুষের দুর্বোধ্য ও রহস্যময় ভাগ্যলিপি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করবেন। বাবার মতে, মানুষের জন্মান্তরীণ কর্মচক্রই গ্রহচক্র নামে অভিহিত হয়ে আসছে। অন্তঃদৃষ্টি সিদ্ধ যোগী ছাড়া এই কর্মচক্র দর্শন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। পাঁজি-পুঁথি এবং কয়েকটা জ্যোতিষের বই নিয়ে মানুষের ভাগ্যে কি লেখা আছে তার পাঠ উদ্ধার করা এক প্রকার অসম্ভব বললেও চলে। নিতান্ত গ্রহবিশ্বাসী ও ভাগ্য বিশ্বাসী লোকেরা কর্মকুণ্ঠ, অলস ও নিরুদ্যম হয়।

—ক্যায়সে? শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু, মঙ্গল, কেতু, বগেরা গ্রহফল নেহি দেতা হৈ?

আমি বললাম—ফল দিচ্ছেন ঠিকই তবে বাবা তাঁদেরকে পৃথক পৃথক গ্রহ হিসেবে দেখতেন না। জন্মকুণ্ডলীতে যে বিভিন্ন রাশিতে গ্রহগুলি বসানো থাকে, বাবার মতে সেইসব গ্রহের অবস্থান মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, কর্মের সূচক মাত্র। তাঁর মতে সূর্য (রবি), চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি নবগ্রহ জনার্দনেরই নবরূপ। ঈশ্বর এই হিসেবে মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করিয়ে থাকেন।

আবার ঘোর বিস্ময়ের সঙ্গে মোহান্তজী বলে উঠলেন—ক্যায়সে? সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল ইত্যাদি গ্রহবর্গ ক্যায়সে ঈশ্বরকা নামরূপ হো গয়া?

আমি বিনম্রভাবে উত্তর দিলাম, আপনি বেদ মানবেন ত? বেদমূলক পাণিনিতে ঐসব নামের যে ভাবে ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে তাতে যে ঐগুলি ঈশ্বরেরই বিভিন্ন গুণ হিসেবে বিভিন্ন তা স্পষ্টতই বোঝা যায়। যেমন ধরুন সূর্য। যজুর্বেদে বলা হয়েছে—'সূর্য আত্মাজগতস্তস্থুষশ্চ।' এর অর্থ হল, জগৎ অর্থাৎ চেতন প্রাণীর ও জঙ্গম বা যারা গতিশীল তাদের এবং 'তস্থুষ', অপ্রাণী অর্থাৎ স্থাবর জড় যেমন পৃথিবী আদি ঐ সকলের আত্মা বলে এবং স্বপ্রকাশরূপে সকলকে প্রকাশ করেন বলে পরমেশ্বরের নাম সূর্য বা রবিগ্রহ।

চন্দ্র—(চদি আহ্লাদে), এই ধাতু হতে চন্দ্র শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যশ্চন্দতি চন্দয়তি বা স চন্দ্রঃ।' যিনি আনন্দস্বরূপ এবং যিনি সকলের আনন্দদাতা, সেই ঈশ্বরের নাম চন্দ্রগ্রহ।

মঙ্গল—(মগি গত্যর্থক) ধাতু হতে 'মঙ্গেরলচ্' এই সূত্রানুসারে মঙ্গল

শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যো মঙ্গতি মঙ্গয়তি বা স মঙ্গলঃ।' যিনি স্বয়ং মঙ্গলস্বরূপ এবং সর্বজীবের মঙ্গলের কারণ, সেই পরমেশ্বরের নাম মঙ্গল গ্রহ।

বুধ—(বুধ অবগমনে) এই ধাতু হতে বুধ শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যো বুধ্যতে বোধয়তি বা স বুধঃ।' যিনি স্বয়ং বোধস্বরূপ এবং সকল জীবের বোধের কারণ, সেই পরমেশ্বরের নাম বুধগ্রহ।

বৃহস্পতি—বৃহৎ শব্দপূর্বক (পা রক্ষণে) এই ধাতুর উত্তর 'ডতি' প্রত্যয় বৃহৎ শব্দের ত-কারের লোপ এবং সুডাগম হওয়াতে বৃহস্পতি শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যো বৃহতামাকাশাদীনাং পতি স্বামী পালয়িতা স বৃহস্পতিঃ।' যিনি মহানদের অপেক্ষাও মহান্ এবং যিনি আকাশাদি ব্রহ্মাণ্ডসমূহের অধিপতি, সেই পরমেশ্বরের নাম বৃহস্পতিগ্রহ।

শুক্র—(ঈশুচির পূতিভাবে) এই ধাতু হতে শুক্র শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যঃ শুচ্যতি শোচয়তি বা স শুক্রঃ।' যিনি অত্যন্ত পবিত্র এবং যাঁর সংসর্গে জীবও পবিত্র হয়ে যায় সেই পরমেশ্বরের নাম শুক্রগ্রহ।

শনি—(চরগতিভক্ষণয়োঃ) ; এই ধাতুর সঙ্গে 'শনৈস্' অব্যয় উপপদযোগে শনৈশ্চর শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যঃ শনৈশ্চরতি স শনৈশ্চরঃ' ; যিনি সকলের মধ্যে সহজেই প্রাপ্ত অথচ ধৈর্যবান, সেই পরমেশ্বরের নাম শনৈশ্চর বা শনিগ্রহ। কাজেই শনির দশা পড়লেই শনির ভয়ে কম্পমান হওয়ার কারণ নেই।

রাহু—(রহ ত্যাগে) এই ধাতু হতে রাহু শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো রহতি পরিত্যজতি দুষ্টান্ রাহয়তি পরিত্যাজয়তি বা স রাহুরীশ্বরঃ"—যিনি একান্ত-স্বরূপ, যাঁর স্বরূপে অন্য পদার্থের সংযোগ নেই, যিনি দুষ্টদেরকে পরিত্যাগ করেন এবং করান, সেই পরমেশ্বরের নাম রাহুগ্রহ।

কেতু—('কিত নিবাসে রোগাপনয়নে চ') এই ধাতু হতে কেতু শব্দ সিদ্ধি হয়। 'যঃ কেতয়তি চিকিৎসতি বা স কেতুরীশ্বর'—যিনি সমস্ত জগতের নিবাস স্থান, যিনি সর্বরোগরহিত এবং যিনি মুমুক্ষুদেরকে মুক্তিসময়ে সকল রোগ হতে মুক্ত করেন, সেই পরমাত্মার নাম কেতুগ্রহ।

আমার কথা সকলেই নীরবে শুনছিলেন গভীর মনোযোগ সহকারে। আমার কথা শেষ হবার পরেও কারও মুখে কোন কথা নেই। মোহান্তজী প্রায় মিনিট পাঁচেক স্থির গম্ভীর মুখে নীরবে বসে থাকার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'তোমার বাবার মত মহাপুরুষের সঙ্গে আমার যৌবনকালে

দেখা হলে কত ভালই না হত! বেদজ্ঞানের অভাবে এ জীবনে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। মা নর্মদা সেই বিদেহী আত্মার আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করুন।" তিনি যতীন্দ্রজীকে একটা গান গাইতে হুকুম করলেন। এক নাগা সন্ন্যাসী সোৎসাহে বলে উঠলেন—'লেকিন্ হিন্দীমে'। যতীন্দ্র গান ধরলেন। তাঁর গলা পূর্বেই বলেছি অত্যন্ত দরাজ ও মিষ্টি। তিনি গান ধরলেন অত্যন্ত ভক্তিবিগলিত উদাত্ত কণ্ঠে—

বর দে, রেবা, বরদে!
প্রিয় স্বতন্ত্র-রব, অমৃত-মন্ত্র নব ভারত মে ভর দে।
বর দে, রেবা, বরদে!
কাট অন্ধ-উরকে বন্ধন স্তর। বহা জননী,
জ্যোতির্ময় নির্ঝর;
কলুষ-ভেদ-তম হর প্রকাশ ভর জগমগ জগ কর দে!
নবগতি, নবলয়, তালছন্দ নব, নবলকণ্ঠ,
নব জলদ মন্দ্র রব;
তট তটমে নব সাধকবৃন্দকো, নব বর, নব স্বর দে!
বর দে মাগো, বরদে!

গান শুনে আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর মোহান্তজীর আদেশে সকলেই শুয়ে পড়লাম। গানের আবেশে সকলের মনই আচ্ছন্ন, মন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। 'রেবা রেবা' জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। বাইরে বনের মধ্যে একটা প্রবল হুঙ্কার শুনে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, আমাদের দরজায় কেউ যেন আঁচড়াচ্ছে, দরজাকে সজোরে ঠেলছে, সবাইকে ডেকে তুলব কিনা ভাবছি, এমন সময় দুড়দাড় শব্দে ব্যারাকবাড়ীটার পেছন দিক দিয়ে কেউ যেন দৌড়ে এল দরজার কাছে। কিছুক্ষণ হুটোপুটির শব্দ, তারপরেই সব চুপচাপ, আমি উঠে সন্ন্যাসীদেরকে অতি সাবধানে এড়িয়ে এড়িয়ে শেষপ্রান্তের শেষ ঘরটায় পৌঁছলাম প্রস্রাব করতে। প্রস্রাব করে এসে আবার শুয়ে পড়লাম। সন্ন্যাসীদের নাসিকাগর্জন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। সেই শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে বনের শব্দ। বাতাসের সোঁ সোঁ

সাঁ সাঁ শব্দের সঙ্গে আরও নানারকমের অদ্ভুত শব্দ মিশে সমগ্র বনভূমি যেন মুখর হয়ে উঠছে। গভীর রাত্রে নির্জন গম্ভীর বন সাধারণতঃ শান্ত থাকে, কিন্তু এখানে দেখেছি সবই বিচিত্র। যাই হোক, আবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি সকাল হয়ে গেছে। মোহান্তজী এবং আরও অনেক নাগা স্নান সেরে এসে কৌপীনাদী বদলে গায়ে ভস্ম মাখতে সুরু করেছেন। প্রত্যেকের ঝোলাকম্বলও বাঁধা হয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি নিজের গাঁঠরী ইত্যাদি বেঁধে ছেঁদে নর্মদায় গেলাম স্নান করতে। ঘাটে নামতে নামতে দেখলাম প্রায় জনা পনের নাগা, লক্ষ্মণভারতীর নেতৃত্বে নানারকম গাছের সরু সরু ডাল ছেঁটে এক জায়গায় চূড় করে রাখছেন। স্নান ও সূর্যার্ঘ্যাদি সেরে এসে দেখি, সেই ডালগুলিতে নেকড়া জড়িয়ে শংকরভারতীজী সেগুলির অগ্রভাগ কেরোসিনে ডুবিয়ে নিচ্ছেন। বুঝতে পারলাম এগুলি ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র জন্তুদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করবে। অনুমান করলাম, আজ আমাদের গন্তব্যপথ নিশ্চয়ই ভয়াবহ ও বিপদসঙ্কুল। ঘি-এর প্রদীপ জেলে মোহান্তজীর সঙ্গে গিয়ে সকলে মিলে মা নর্মদার আরতি বন্দনা সেরে এলাম।

নিজেদের জিনিষপত্র ছাড়াও প্রত্যেকের হাতেই চার পাঁচখানা করে সেই মশাল কাঠি। 'হর নর্মদে হর' বলতে বলতে আমরা রওনা হলাম।

সূর্যোদয় হচ্ছে। বালসূর্যের উদয়রশ্মি এসে পড়েছে সুউচ্চ পর্বতের উপর। তার অরুণ-কিরণমালায় শুধু বড় বড় গাছের চূড়া নয়, সমগ্র দিকচক্রবাল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জঙ্গলের গাছের ডালে কত রকমের এবং কত জাতের যে পাখী উড়ে উড়ে যে বসছে এবং বিচিত্র সব কলকল ধ্বনি তুলছে, তার ইয়ত্তা নেই। পাখীদের কলকাকলি শুনতে শুনতে হেঁটে চলেছি মনের আনন্দে। সন্ন্যাসীরা শিঙা-ডম্বরু বাজাবার উপক্রম করতেই মোহান্তজী হাত তুলে সকলকে নিরস্ত করলেন। বললেন শিঙা ডম্বরু বাজিয়ে এ বনের শান্ত বাতাবরণকে বিক্ষুব্ধ করে লাভ নেই। সন্ন্যাসী হলেই যে হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে ভোঁতা করে তুলতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যিনি সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ তাঁর সৃষ্টি কত সুন্দর ও রমণীয় তা চোখ ভরে এবং মন ভরে দেখতে দাও।

সেই একই জঙ্গলাবৃত পাহাড়ী পথ; এবড়ো খেবড়ো পাথরের চাঙড়

ডিঙিয়ে ডিঙিয়েই আমাদেরকে হাঁটতে হচ্ছে, তবুও মনে শান্তি থাকায় চলার গতি আমাদের বেড়ে গেছে। ইন্দ্রিয়ের যা অগোচর, তাতেই আমাদের ভয় ও বিস্ময় লুকিয়ে থাকে। কিন্তু দিনের আলোতে সবকিছু অল্প হলেও দৃষ্টিতে সব ফুটে উঠেছে বলে আমাদের মনে ভয় এসে দানা বেঁধে উঠতে পারছে না। দেড় ঘণ্টায় আমরা বন্ধুর পথে প্রায় আট ন' মাইল হেঁটে ফেললাম। লক্ষ্মণভারতীজী বললেন, 'নিশারপুর।' যতীন্দ্রের ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা অর্থাৎ প্রায় দেড়ঘণ্টায় আমরা এতখানা হেঁটে ফেললাম। সর্বত্র শাল, বেল, কেন্দ, আবলুষ, শিশুগাছ, জামীর, হরিতকী ও আমলকী গাছের জটলা, অর্থাৎ ঘন বনই বটে। কিন্তু এতক্ষণ এই পথের মধ্যে কোন বন্যজন্তু দেখলাম না। নিশারপুর থেকে ভারতীজী মোহান্তজীর সঙ্গে পরামর্শ করে ডানদিকে খাড়া উত্তরে চড়াইএর পথ ধরলেন। মনে হল যেন আমরা ক্রমশঃ পাহাড়ের উপর উঠছি। এই সময় পাহাড়ের ঢালে কতকগুলো ভীলদের কুটীর চোখে পড়ল। ভাবলাম কি করে যে এরা এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত স্থানে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করছে তা এক বিধাতাই জানেন। জঙ্গলও ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠছে। হঠাৎ কয়েকটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ভেসে এল। আমরা চলার গতি থামিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলাম, কি জানি কোথাও কোন ভালুক, বাঘ, বুনোকুকুর প্রভৃতি মা নর্মদার পোষ্যপুত্তুররা আমাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করছে কি না! কারও কোন শুভ আবির্ভাবের লক্ষণ চোখে পড়ল না। পরে লক্ষ্মণভারতীজীরই চোখে পড়ল চার পাঁচজন ভীল রমণী সশস্ত্র হয়ে পাহাড়ের ঢালে যেন কিছু মাটি খুঁড়ে তুলছে। লক্ষ্মণভারতী কিছু কিছু ভীলদের ভাষা বোঝেন, দু'চারটে কথা বলতেও পারেন। তিনিই তাদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—তারা ওখানে কি জিনিষ খুঁড়ে খুঁড়ে তুলছে? তাদেরই বিরাটকায় পোষা কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ শব্দ কর্ণগোচর হয়েছিল। লক্ষ্মণভারতীকে তারা যা উত্তর দিল, ভারতীজীর অনুবাদে বুঝলাম যে, তা হল কন্দমূল। কন্দমূলকে তারা বলল 'কান্দা'। কন্দ কথাটা সংস্কৃত হলেও ভীলদের ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে কান্দরূপে। একবরে স্কটিশচার্চ কলেজে বি.এ. পড়তে পড়তে পূজার ছুটিতে আমি গিয়েছিলাম হিমালয় অঞ্চলে। অলকানন্দার ধারে জঙ্গল হতে তুলে এনে এক সন্ন্যাসী আমাকে কিছু কন্দমূল

দিয়েছিলেন। আমি স্কটিশের বোটানির (Botany) প্রধান অধ্যাপক মহোদয়কে সেই কন্দমূলটিকে দেখিয়েছিলাম। তিনি নেড়ে চেড়ে বলেছিলেন এই কন্দমূলের ল্যাটিন নাম 'ডায়াস কোরিয়া।' আমাদের বাংলাদেশের মেটে আলুজাতীয় এক রকমের মূল। এই কন্দমূল খেয়েই জঙ্গলের সন্ন্যাসী, কোল, ভীল, মুণ্ডা হো প্রভৃতি বনবাসীরা বর্ষার দু'তিনমাস কাটিয়ে দেয়। লক্ষ্মণভারতী তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমাদের সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ নেই, তোমরা যে কন্দমূল তুলতে বস্তি হতে এতদূরে চলে এসেছ, বাঘের ভয় করে না? তাঁর প্রশ্ন শুনে মেয়েরা হেসেই লুটোপুটি! এটা যেন তাদের কাছে একটা অবান্তর প্রশ্ন। বাঘ আছে, আছে, তারাও আছে। বাঘের ভয়ে তারা এ বন ছেড়ে কোথায় যাবে? এই অরণ্যভূমি তাদের মা, একেই চেনে এরা। এই বনের কোলে এরা জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে বনেরই ফলমূল খেয়ে। হাতের টাঙ্গি এবং তীর-ধনুক দেখিয়ে তারা জানাল—বাঘ, ভালুক এলে তারা কাউকে সহজে রেহাই দেবে না। লক্ষ্মণভারতী না চাইলেও তারা তাঁকে সাধুভোজনের জন্য কতকগুলো কন্দমূল শ্রদ্ধাভরে দান করল।

মোহান্তজী ভীল রমণীদের এই সরল ও উদার ব্যবহার দেখে ঝোলা হতে এক প্যাকেট সূঁচ বের করে, কাছে ডেকে তাদের হাতে দিলেন। সরল বন্যদুলালীদের সে কী আনন্দ! তারা হাসিমুখে দণ্ডবৎ জানাল সাধুর দলকে। মোহান্তজী তাদেরকে হিন্দীতে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, লক্ষ্মণভারতী দোভাষীর কাজ করলেন।

প্রশ্ন—বাঘ তোদেরকে কখনও তাড়া করে নি?

উত্তর—না, বাঘ তাড়া করার ব্যাপারে নেই, সে যদি দেখতে পায়, তাহলে হঠাৎ থাবা মেরে জঙ্গলের ভেতরে টেনে নিয়ে যাবে। তোরা বেশী মানুষ একসঙ্গে আছিস। বেশী মানুষ দেখলে বাঘ পালিয়ে যায়। সবচেয়ে ছ্যাঁচড়া আর ছোটলোক হচ্ছে চিতাবাঘ এবং ভালুক। ভালুক কখন যে ঘাড়ে এসে পড়বে কেউ বলতে পারে না। চিতাবাঘ ত বিশ পঁচিশ মাইল পর্যন্ত পেছনে পেছনে, কখনও বা ঝোপের মধ্যে আড়ালে থেকে থেকে সুযোগের অপেক্ষা ধাওয়া করতে থাকে। একটিবার কাউকে একা পেলে তার আর রক্ষে নেই। বুনোহাতীও খারাপ, দেখতে পেলেই তেড়ে আসে।

সবচেয়ে বেশী খারাপ সাপ। এই বনে শঙ্খচূড় সাপ আছে, মানুষ দেখলে তেড়ে কামড়াবে। ময়াল সাপ আছে, খুব মোটা, সেও মানুষকে ধরে। ছোট ছোট হরিণ বা ছোট ছোট বাঘের বাচ্চাকে ধরতে পারলে গিলে ফেলে। আমরা ময়াল সাপের মাংস খাই। বেশ ভাল মাংস।

এইভাবে গভীর বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বনদুলালীরা হাসতে হাসতে এতসব সু-সংবাদ দিল যে তা শুনে আমরা পরম আপ্যায়িত হলাম! আমার ত বটেই, প্রায় সকলেরই শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের স্রোত বইছে। মোহান্তজীর নির্দেশে সকলেই 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে এগোতে লাগলেন। স্বর কি কারও মুখ দিয়ে বেরোতে চায়? কেবল ভয়কে চাপা দিতে কোনমতে ক্ষীণ ও চাপাকণ্ঠে ধ্বনি তুললেন মাত্র, যেন আর্তনাদের পূর্বাভাস!

আমরা এগিয়ে চলেছি, দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নীরবে রেবা রেবা জপ করতে করতে। ক্রমোচ্চ পাহাড়ী পথে এগিয়ে চলেছি। এখানে লোকজন নেই, তাই রক্ষে। মানুষজন থাকলে তারা আমাদের দলটি দেখলে নিশ্চয়ই ধারণা করে বসত যে এটি একটি নীরব শোকমিছিল। যতই এগোচ্ছি, পাহাড়ের দুই দিকে বন নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়ে উঠছে। কাছির মত মোটা মোটা চীহড়লতা বিশাল বনস্পতির সঙ্গে জড়াজড়ি করে দুর্ভেদ্য ও অন্ধকার লতাকুঞ্জের সৃষ্টি করেছে পদে পদে, অত বেলাতেও সূর্যের আলো পড়েনি।

আমাদের দলে ত্রিশজন লোক ত্রিশ জোড়া চোখ নিয়ে দুই পাশ দেখতে দেখতে চলেছি। মুখ দিয়ে যেন স্বতঃই বেরিয়ে আসছে রেবা রেবা। প্রায় মাইল দুই এইভাবে দুর্ভেদ্য জঙ্গল অতিক্রম করার পর জঙ্গল কিছুটা পাতলা হল বলে মনে হল। আমাদের চলার পথে কিছুদূরে পাহাড়ের ঢালে থরে থরে কতকগুলো শালপাতায় ছাওয়া কুটীর চোখে পড়ল। বন কিছুটা পাতলা হতে সূর্যের আলো এসে পড়েছে স্থানে স্থানে বড় বনস্পতির ডালাপালা ভেদ করে। লক্ষ্মণভারতী বললেন—ইহ্ লোগোনেঁ সব ভীল হ্যায়। বহুৎ খতারনাকী আস্থান্। এই শুনে মোহান্তজীর মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। তিনি বললেন—একদম চুপচাপ চলিয়ে। লক্ষ্মণভারতী বললেন—ক্যায়সে চুপচাপ করকে চলেঙ্গে? একটা ঝর্ণা দেখিয়ে বললেন, আমাদেরকে ঐ ঝর্ণা পেরিয়ে যেতে হবে। ভীলদের

বস্তির কাছে তারা ঝর্ণার উপর বড় বড় গাছের গুঁড়ি ফেলে পুলের মত করে রেখেছে। সেই পুল দিয়েই আমাদেরকে ওপারে যেতে হবে। আপ্‌কো ক্যা ইয়াদ্ নেহি দো দফে হমলোগ যব গুরুজীকা সাথমে আয়েথে এহি বস্তিকা পাশ ওহি পুলকা উপর চড়েথে? মোহান্তজী বললেন—গুরুজীকী বাত দুসরা থে। উন্‌কা আধ্যাত্মিক প্রভাও (প্রভাব) সে ভীল লোগ্ উন্‌কো মানতে থে। যতীন্দর! সব চীজ সামহালকে রাখো। আভি লুটেরা লোগ আয়েঙ্গে। দো-চার সুঁইকী বাক্সা দেনেকে লিয়ে তৈয়ার রাখো। যাতনা গেঁও বোরা ঔর ঝোলামেঁ হ্যায়, উহ্ সব চীজ দেনে পড়েগা।

লুটের কথায় সকলেরই মনে অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। লক্ষ্মণভারতী ডান দিকেই মোড় নিলেন। খুব শব্দ করে বয়ে যাচ্ছে ঝর্ণাটা বনের মধ্যে—দুদিকে পাষাণময় উঁচু তীর। শিলাতটে প্রতিহত হচ্ছে কুলুকুলু ধ্বনি তুলে নির্মল জলের ধারা। আমরা যে রাস্তায় আসছিলাম, সেই রাস্তা থেকে ক্রমশঃ নিচে নামছি, এগিয়ে যাচ্ছি ভীলদেরই বস্তির দিকে। বড়জোর পাঁচশ গজ বাকী আছে বস্তিতে পৌঁছতে। এমন সময় চোখে পড়ল একজন প্রৌঢ় ভীল গাছের গুঁড়ির সেই পুল পেরিয়ে একটা শুক্‌নো মোটা কাঠের গুঁড়িতে কুড়ুল দিয়ে কোপ বসাতে লাগল। পাঁচ-সাতটা কোপ বসাতে না বসাতেই আমাদের চোখে পড়ল একটা প্রকাণ্ড পাইথন (অজগর সাপ) একটা গাছ থেকে ঝপাস্ করে পড়ে গিয়ে তার একখানা পা জড়িয়ে ধরে ফেলে দিল। শংকরভারতী মোহান্তজী এবং আরও তিন চারজন নাগা একসঙ্গে সভয়ে বলে উঠলেন—পাইথন! অজগর! আমরা সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই প্রকাণ্ড সাপটা লেজের প্রান্ত দিয়ে কাঠের গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে সেই প্রৌঢ় ভীলের সর্বাঙ্গে কুণ্ডলীর আকারে জড়াতে লাগল। লোকটা তখন পরিত্রাহি চিৎকার আরম্ভ করেছে। আমরাও চিৎকার আরম্ভ করলাম। লক্ষ্মণভারতী 'সাঁপ সাঁপ' বলতে বলতে দৌড়াতে লাগলেন বস্তির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ত্রিশজন দৌড়ে বেরিয়ে এসে ছুটে গেল সেই লোকটার কাছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে বর্শা, টাঙ্গি এবং কামঠ। তারা সকলে মিলে অজগরটাকে মেরে ফেলে লোকটাকে উদ্ধার করল।

অচৈতন্য অবস্থায় লোকটাকে তারা নিয়ে গেল কুটিরে। লোকটা বাঁচবে কি না জানি না, দেখলাম তিনজন বৃদ্ধ ভীল বন থেকে অনেক জড়ি বুটি শিকড় এনে পাথরে ছেঁচতে আরম্ভ করেছে। এদের কাছে জড়ি বুটির চিকিৎসাই একমাত্র পন্থা। এরা শিকড় বাকড়ের দ্রব্যগুণে প্রচণ্ড আস্থা রাখে, এইসব ঔষধ ও ওষধি চেনেও ভালভাবে। সরলপ্রাণ পাহাড়ীদের কৃতজ্ঞতাবোধের কোন তুলনাই হয় না। প্রকৃত 'ইমান' বলতে যা বোঝায় তা আজও পাহাড়ীদের মধ্যে দেখা যায়। তাদের একটি লোককে যে সাপের কবল থেকে বাঁচাবার জন্য চেঁচামেচি করে ডাকা হয়েছিল, এজন্য তাদের সর্দার এসে তাদের ভাষায় অনেক কৃতজ্ঞতা জানাল, মেয়ে পুরুষ সবাই আমাদেরকে ঘিরে ধরে অনেক ধন্যবাদ জানাল। আমাদের কারও হাতে একখণ্ড কন্দমূল, কারও হাতে নানারকম বুনোফল, পাকা কেঁদ বা একমুঠো করে সুপক্ক মহুয়া দিল। মোহান্তজী অভিভূত হয়ে চুপি চুপি লক্ষ্মণভারতীকে বললেন—এইসব গরীব লোক কত কষ্টে এইসব ফলমূল সংগ্রহ করে। এছাড়া তাদের কোন খাদ্য নেই। আমাদের প্রত্যেকের কাছে যা আটা এবং ছাতু আছে, তার থেকে অর্ধেকভাগ এদেরকে দিয়ে দাও এবং তুমি এদের ভাষায় বুঝিয়ে অনুরোধ কর এরা যেন তা গ্রহণ করে। লক্ষ্মণভারতী সর্দারকে তাঁর ভাঙা ভাঙা ভীল ভাষায় মোহান্তজীর বক্তব্য বোঝালেন। সর্দার এবং অন্যান্য ভীলদের হাত পা নাড়ার সঙ্গে কথাবার্তার সুর ধরে অনুমান করলাম, তারা কিছুতেই নেবে না। যাইহোক শেষপর্যন্ত লক্ষ্মণভারতী কোনমতে তাদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করালেন। প্রত্যেকের ঝোলা থেকে কিছু কিছু আটা তাদেরকে দেওয়া হল। সর্দার দুজন সশস্ত্র ভীলকে আমাদের সঙ্গে দিল সহজতর জঙ্গল পথে কতকটা এগিয়ে দিয়ে আসতে।

আমরা তাদের সঙ্গে কাঠের গুঁড়ির পুল পেরিয়ে ঝর্ণাটা অতিক্রম করলাম। দেখতে পেলাম একটু দূরেই পড়ে আছে সেই বর্শা ও কামটের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত সেই মারাত্মক পাইথনটা। প্রায় আঠার বা কুড়ি ফুট লম্বা হবে। লক্ষ্মণভারতীর মাধ্যমে আমরা সেই ভীল দুজনের কাছে জানতে পারলাম যে অজগর সাপ সাধারণতঃ ঘনঘোর জঙ্গলে ঝর্ণা বা ছোট নদীর ধারে জড়িয়ে থাকতে ভালবাসে। হরিণ বা খরগোস জল খেতে এলে ঝপ্

করে তাদের উপর পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে, বজ্রপেষণে তাদের হাড়গোড় চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়, তারপর ধীরে ধীরে গিলতে থাকে। অনেক সময় এদের গ্রাসে পড়লে সম্বর হরিণও রেহাই পায় না। ভীল দুজন এও জানাল যে কুড়ি হাত লম্বা (ত্রিশ ফুট) অজগর সাপ তারা জঙ্গলে দেখেছে। প্রায় মাইল দুই রাস্তা জঙ্গল পথে আমাদের সঙ্গে এসে বলল—তোরা যে রাস্তা ধরে আসছিলি সেই পথে গেলে তোরা কুকৃসীতে পৌঁছে যেতিস্, মাণ্ডবগড় কিলাতে তোরা আজ পৌঁছাতে পারতিস্ না। এখানে শূলপাণি ঝাড়ির নিশারপুর জঙ্গল শেষ হল, তোরা ডানদিকের জংলাপথ ছেড়ে বাদোয়ানার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকে পড়। মাণ্ডবগড় কিলা কাছে হবে। মোহান্তজীকে দণ্ডবৎ জানিয়ে তারা বিদায় নিল। খুব অল্পের উপর দিয়ে ভীলদের ফাঁড়া উৎরে গেল বলে মোহান্তজী বেজায় খুশী। তিনি উচ্চৈঃস্বরে নর্মদার স্তব আরম্ভ করে দিলেন হাঁটতে হাঁটতে—

স্পৃষ্টং করৈশ্চন্দ্রমসৌর বেশ্চ
তবৈব দদ্যাৎ পরমং পদংতু।
যত্রোপলাঃ পুণ্যজলাপ্লুতাস্তে
শিবত্বম্ আয়ন্তি কিমত্র চিত্রম্ ?

অর্থাৎ মা নর্মদে, চন্দ্র এবং সূর্য কেবল তাদের কিরণ দ্বারা তোমার পুণ্যজল স্পর্শ করাতেই তাদেরকে পরম পদ দান করে বসেছ, কাজেই যে পাথর তোমার জলে নিয়তই নিমজ্জিত তার শিবত্ব পাপ্তি হবে, এতে আর আশ্চর্য কি ?

আমাদের প্রত্যেককেই কমণ্ডলুস্থিত নর্মদার জল একবার করে দর্শন করে নিতে বললেন। আপনমনেই বলতে লাগলেন, এই পথে পরমারাধ্য গুরুদেবের সঙ্গে আমি আর লক্ষ্মণভারতী তিনবার এসেছি রেবাকুণ্ডে, তাঁর সিদ্ধিক্ষেত্রে, তবুও জঙ্গলপথে সঠিক ভাবে চিনে আসা কঠিন। প্রতি বৎসর বর্ষার পরেই নূতন নূতন গাছপালা এবং ঝোপঝাড় গজিয়ে ওঠায় রাস্তার হদিশ সহজে পাওয়া যায় না। লছমন্ ভেইয়া! তোমার মনে আছে কি প্রথম বারে মাণ্ডবগড় কেল্লার পথেই বাদোয়ানের জঙ্গলে ঢুকে তুমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে গুরুদেবকে 'তু-তোকার' বলে গালি গালাজ

করছিলে? কিন্তু আমাদের গুরুদেব ছিলেন পরম দয়ালু এবং পরম প্রেমিক। তিনি রাগ করা ত দূরের কথা বুকে জড়িয়ে ধরে তোমাকে আদর করেছিলেন এবং জোর করে তোমারই ঝোলা থেকে কিস্‌মিস্‌ ও খেজুর বের করে তোমাকে খাইয়েছিলেন। তুমি এই দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছলে তোমার কাঁধের ঝোলাতে ঐসব জিনিষ এলো কোথা থেকে! কারণ তুমি ভাল করেই জানতে তোমার ঝোলাতে কস্মিনকালেও দুষ্প্রাপ্য কিস্‌মিস্‌ ও খেজুর ছিল না। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন আমাদের গুরুজীর এই রকম অজস্র যোগবিভূতি আমরা দেখেছি। ক্যা লছমন ভেইয়া! তুমহারা উহ্‌ বাত ইয়াদ্‌ হ্যায়?

কিন্তু ভারতীজী উত্তর দেবেন কি করে? আমরা দেখলাম, তাঁর দুচোখ বেয়ে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে। মোহান্তজী নিজেই বলতে লাগলেন—যৌবনকালে ভারতীজী খুব ক্রোধী ছিলেন, একবার রেগে গেলে তিনি লঘুগুরু জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। এখন কিন্তু কত শান্ত, স্থির, স্থিতধী।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ মতীন্দ্রজী মন্তব্য করে বসলেন—যৌবনকালে ভারতীজী তাহলে 'দু নম্বর আহাম্মক' ছিলেন। বলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে ভারতীজীর পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন—ময় মাফি মাংগাতা হুঁ। ভারতীজী তাঁর চিবুক ধরে নাড়িয়ে দিয়ে বললেন—কোঈ বাত নেহি, লেকিন্‌, উস্‌কো মতলব কেয়া?

মতীন্দ্রজী বললেন—ছোটবেলায় গ্রামে থাকতে থাকতে আমি একটা বাংলা ছড়া শিখেছিলাম, তাতে আছে—

আহাম্মক এক, যৌবনে নেয় ভেক!
আহাম্মক দুই, গুরুজনকে বলে তুই!
আহাম্মক তিন, আপন কড়ি পরকে দিয়ে নিজে করে ঋণ!
আহাম্মক চার, মাকে ধরে মার!
আহাম্মক পাঁচ, পরের পুকুরে ছাড়ে মাছ!
আহাম্মক ছয়, এর কথা ওকে কয়!
আহাম্মক সাত, নিচের ঘরে খায় ভাত!

আহাম্মক আট, বৌ ঝিকে পাঠায় হাট!
আহাম্মক নয়, পিছনে কথা কয়!
আহাম্মক দশ, বৌ-এর কথায় বশ!

বাংলায় বলে যতীন্দ্রজী প্রত্যেক পংক্তির ব্যাখ্যা করে দিতেই সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। সব শুনে আমি হাসতে হাসতেই মন্তব্য করলাম—যতীন্দ্র ভাই-এর ছড়ানুসারে তাহলে ত আমরা এখানে দুজন পণ্ডিতমশাই ছাড়া আর সকলেই এক নম্বর আহাম্মক। কারণ, প্রায় সকলেই সন্ন্যাসের ভেক ধারণ করেছি।

আমার কথা শুনে আবার সকলে হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়লেন। নির্জন স্তব্ধ বনভূমিতে হাসির ঢেউ প্রতিধ্বনি তুলে গাছপালার মধ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল।

সমগ্র বাদোয়ানার জঙ্গল অতিক্রম করে বাদোয়ানা মহল্লায় পৌঁছতে হল না, তার আগেই একটা বাঁক ঘুরে আমরা আর একটা পার্বত্যপথ ধরলাম। এ পথ ক্রমশঃ উঁচু পার্বত্যপথ, বন ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে বলে মনে হল। সেই চড়াই পথে মাইলখানিক হেঁটে আমরা একটা পাহাড়ের উপর উঠে এলাম। জনমানবহীন সুনির্জন যে সুনিবিড় বনানী ক্রমোচ্চ এই পাহাড়ী পথের পাশে দেখে এসেছি, পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে মনে হল যেন একটা মালভূমির উপর উঠে এসেছি। মোহান্তজী দেখালেন অদূরেই মাণ্ডবগড় কেল্লা, গভীর জঙ্গলে ঢাকা, সেখানে অনেক প্রাচীন মহল এখনও বর্তমান। কেল্লা ত কেল্লারই মত, বিশাল বিশাল নিরেট পাথরের তৈরী, মহলের পর মহল। সেই কেল্লা যে কত যুগ আগে কারা নির্মাণ করেছিলেন, তার পরিচয় কেউ দিতে পারলেন না, ভারতীজীর মতে যাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে এখানে কুণ্ডের মধ্যে নর্মদা আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই রাণী ভানুমতীই এই কেল্লায় রাজত্ব করতেন। সেই রাণীরই গড় এবং প্রাসাদ এটি। কেল্লা নামে অভিহিত হলেও এইটাই ছিল তাঁর প্রাসাদ। সেখান থেকে কিছুদূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে চারটি পাথরের গম্বুজ দেখিয়ে মোহান্তজী জানালেন—ঐটাই ছিল রাণীর প্রকৃত কেল্লা। আস্থা উদ্দাল। একাধারে সেনানিবাস এবং অস্ত্রাগার। মাণ্ডবগড় কেল্লা বা আস্থা উদ্দালের কেল্লার কাছাকাছি যাওয়ার

সাধ্য কারও নেই, তার কারণ একে ত ঘনঘোর জঙ্গল, তার উপর এখন বাঘ-ভাল্লুক, চিতা-নেকড়ে, শঙ্খচূড়, ময়াল ও পাইথন প্রভৃতির আড্ডা।

মোহান্তজীর ইঙ্গিতে নাগারা 'হর নর্মদে' ধ্বনির সঙ্গে আবেগে ও উচ্ছ্বাসে শিঙা ডম্বরু বাজাতে লাগলেন। সাশ্রুনয়নে মোহান্তজী এগোতে লাগলেন গুরুবন্দনা গাইতে গাইতে। মিনিট দশেক হাঁটার পরই আমরা বিরাট একটা কুণ্ডের কাছে এসে পৌঁছলাম। কুণ্ডে প্রচুর স্বচ্ছ জল থৈ থৈ করছে। সেই জল কুণ্ড থেকে বেরিয়ে তির্‌তির্ করে বেয়ে চলেছে পাহাড় বেয়ে। কুণ্ডের পাশেই একটা বাঁধানো পাথরের বেদী। বেদীর উপর একটা সিঁদুর মাখানো বড় ত্রিশূল অত্যন্ত শক্ত ও মজবুত করে গাঁথা আছে। মোহান্তজীসহ সকল নাগাসন্ন্যাসীই বেদীর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন—মাতা নর্মদাকী জয় হো, গুরুদেব চৈতন্যভারতীজীকো জয় হো, জয় মাতা ভানুমতী, জয় রেবা, জয় রেবা।

আমি অনুমানে বুঝতে পারলাম যে এই কুণ্ডই তাহলে রেবাকুণ্ড, সার্থক তপস্যা রাণী ভানুমতীর। যেখানে বেদীর উপর ত্রিশূল স্থাপিত আছে ঐ স্থানেই তাহলে শ্রীমৎ চৈতন্যভারতীজী তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। যাইহোক স্থানটি বড় মনোরম, ভয়প্রদও বটে! চারদিকে অঞ্জন, সালাই, ধাওয়া, আমলকী ও রুদ্রাক্ষের গাছ, তাদের ফাঁকে ফাঁকে ধূসর বর্ণের মেহরীন্ ধাওয়া ও সেমর গাছ যেন প্ল্যান করে লাগানো হয়েছে কুণ্ডকে মাঝখানে রেখে সারি সারি গোলাকৃতি করে। সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে বিরাট বিরাট কতকগুলি গাছ, দেখতে আমাদের দেশের তেঁতুল গাছের মত। পাতাও সেই রকম। তেঁতুলের মতই লম্বা লম্বা পাকা ফল ঝুলে আছে কিন্তু সেগুলোর আকার অনেক বড়। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে মোহান্তজী বললেন—ওগুলো ইম্‌লি (তেঁতুল) গাছ, বড় বড় যে ইম্‌লি কাঁঠালের মত ফলে আছে দেখেছ, ওর ভেতরের শাঁস বের করে নিয়ে সন্ন্যাসীরা জলপাত্র কমণ্ডলু প্রস্তুত করেন। এখানকার ইম্‌লি ভারতপ্রসিদ্ধ।

বলতে ভুলে গেছি, কুণ্ডের কাছে পৌঁছেই প্রণামাদি সেরেই যতীন্দ্রের ঘড়িতে বেলা তিনটে বেজেছে জেনে নিয়েই লক্ষণভারতীজী প্রায় পঁচিশজন নাগাকে সঙ্গে নিয়ে কুড়ুল ও কাঘোট হাতে বেরিয়ে গেছলেন কাঠ কাটতে, তাঁরা এখনও ফিরে আসেন নি। যতীন্দ্রও তাঁদের সঙ্গে গেছেন। সেইজন্য

মোহান্তজী খুব চিন্তা করছেন, তিনি কেবলই চঞ্চল হয়ে পায়চারী করছেন —করীব একঘণ্টা বীত গয়া, অভি উন্ লোগনে লৌটতা নেই কোঁও। এ বহুত খতারনকী জ্যাগা (জায়গা) হ্যায়। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই দেখলাম পূর্বদৃষ্ট সেই সব তেঁতুল গাছের গোড়া দিয়ে প্রত্যেকেই শুকনো ঝাঁটি কাঠের ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। মুখে তাঁদের চলেছে রেবা রেবা ডাক। 'জয়গুরু' বলে কাঠের ঝোলাগুলো ফেলে দিয়েই শংকরভারতীজী কুণ্ডের ধার পর্যন্ত বেশ কতকটা ছেড়ে দিয়ে রাত্রে ধূনি জ্বালাবার জন্য কাঠের ঝোলা সাজাতে লাগলেন। আমরা সকলেই সেই কাজে হাত লাগালাম। একটা বিরাট ধনুকের আকারে ধূনির প্রাকার সাজানো হয়ে গেল। আমি তখন মনে মনে ভাবছি, এইসব ধূনিতে যখন আগুন জ্বলবে, তখন অদ্ভুত একটা দৃশ্য হবে। এই অগ্নিপ্রাকার পেরিয়ে কোন বন্যজন্তুর সাধ্য নেই আমাদেরকে আক্রমণ করে। কিন্তু এই ভ্যাপসা গরমের মধ্যে আগুনের তাপে আমরা জর্জরিত হয়ে পড়ব সন্দেহ নেই। মাথার উপর তখনও বেশ চনমনে রোদ আছে। এ অঞ্চলে দেখে আসছি বিকেল সাড়ে ছটার আগে সন্ধ্যা নামে না। মোহান্তজী বললেন—সারাদিন কারও পেটে কিছু পড়েনি। আমাদের কাছে ভীলদের দেওয়া কান্দা প্রভৃতি যেসব ফল মূল আছে, আমি প্রত্যেকের হাতে দিচ্ছি, ধূনি সাজাতে সাজাতে সকলে খেয়ে নাও। খেয়ে এই কুণ্ডোত্থিত নর্মদার পবিত্র জল খেয়ে নাও। এই ভাবেই আজ ক্ষুন্নিবৃত্তি কর। এই ভয়ঙ্কর স্থানে আজ রাত্রে ঘুমানো চলবে না! যে যার বসবার মত আসন পেতে গুরুজীর এই সিদ্ধস্থানে জপ-তপ ভজন করে কোনমতে আজকের রাত কাটাতে হবে। মোহান্তজীসহ সকলেই আমরা ফলমূল চিবিয়ে খেয়ে পেটভরে জলপান করলাম কিন্তু লক্ষ্মণভারতীর খাওয়ার ফুরসুৎ নেই। সমস্ত ধূনিগুলোর নীচে উপরে কোথায় মোটা কাঠ এবং কোথায় ঝাঁটি কাঠ থাকবে, কিভাবে কাঠ রাখলে আগুন দীর্ঘস্থায়ী হবে, তারই স্তরবিন্যাসে তিনি ব্যস্ত! মোহান্তজী ফল নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর মুখে গুঁজে দিতে লাগলেন। তিনি একবার করে হাঁ করছেন, আর মোহান্তজী একটুকরো করে ফলমূল তাঁর মুখে দিচ্ছেন। শেষে দেখলাম, মোহান্তজী কমণ্ডলু ভরে এক কমণ্ডলু জলও তাঁর মুখে একটু একটু করে ঢেলে দিলেন। এই দৃশ্য আমার খুব ভাল লাগল। গুরুভ্রাতাদের মধ্যে

এই রকম আন্তরিক এবং আত্মিক টান, এই সংঘ চেতনা প্রত্যেক বড় সম্প্রদায়ের একটা বড় সম্পদ। মহাত্মা কমলভারতীজীর মত ভারতপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষের এই শাখায় যে এখনও তা বর্ত্তমান রয়েছে তাতেই অনুমান করতে পারি, এই শাখা এখনও যেমন বড় আছে, পরে আরও বড় হবে।

অপূর্ব এই বনস্থলী, প্রাচীন তপোবনের মতই দেখাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, কলকাতা, পুরাতন দিল্লী প্রভৃতি বড় বড় শহরের এঁদো গলির মধ্যে আলোবাতাসশূন্য একতলা ঘরে যারা বাস করে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, যারা কোনদিন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখবার সুযোগ পায় না, মুক্তরূপা ধরণীর সৌন্দর্য, প্রসারতা অপরাহ্নের ছায়া নেমে আসা বিরাট প্রান্তরের ছবি যারা কখনও দেখেনি, নির্জন পাহাড়ের সমতল শিলাসনে বসে দূরের গিরিমালার দিকে চেয়ে থাকেনি কখনো যারা, তাদেরকে এখানে নিয়ে আসি, তাদের সব দেখাই।

আমার চিন্তাসূত্রে ছেদ পড়ল লক্ষ্মণভারতীজীর কণ্ঠস্বরে। তিনি আমাকে বললেন—বাঙ্গালী বাবা, আপ্ ক্যা শোচতে হো? আমি বললাম—এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়। আচ্ছা, আপনি ধনুরাকারে এই ধুনি সাজালেন, জলের ধারার দিকটা বাদ রেখে, ঐ দিক দিয়েও ত বন্যজন্তু এসে আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে?

—নেহি জী। উপর থেকে দেখছেন কুণ্ড থেকে নর্মদার জল বেরিয়ে তিরৃতির্ করে বয়ে চলেছে, কিন্তু জলের নিচেই রয়েছে পাথরের বড় খাদ বা দহ। সেখানে পড়লে বাঘ, ভালুক, হাতীকে আর বাঁচতে হবে না। আমাদের চেয়ে ঐসব জানোয়াররা বেশী চালাক। ওদের ষষ্ঠেন্দ্রিয় এ-বিষয়ে বেশী ক্রিয়াশীল। জলের মধ্যে এবং জঙ্গলের মধ্যে কোথায় ওদের বিপদ আছে, তা তারা ভালভাবেই চেনে। কাজেই জল পেরিয়ে কোন জানোয়ারই আসবে না।

—আমি ভাবছি মূল নর্মদা এতদূরে, এত উপরে পাহাড় ভেদ করে উঠে এলেন কিভাবে?

—ইহ্ মূল নর্মদা থোড়ি হ্যায়। মূল নর্মদা কিনার ছোড়্কে হম্লোগ করীব বিশমিল দূরমেঁ আগয়া গুরুজীকা সিদ্ধিক্ষেত্র দর্শন কে লিয়ে। ভানুমতীজীকা তপস্যাকা প্রভাও (প্রভাব) সে মাতা নর্মদা এহি কুণ্ডমেঁ

প্রগট হুয়ে থে। ইসীওয়াস্তে তুসরা তুসরা সম্প্রদায়কী পরিক্রমাবাসী সাধু ভী ইধর এহি রেবাকুণ্ডকো পরকরমাকে লিয়ে আতে হেঁ।

আমরা তুজনে এইভাবে কথা বলছি, এমন সময় মোহান্তজী চুপি চুপি এসে লক্ষ্মণভারতীজীর কাঁধে হাত রাখলেন। তাঁকে ইশারা করে দেখালেন জলধারার ওপারেই একটা জানোয়ার একটা ঝোপের মধ্য থেকে তার কালো লম্বাটে মুখটা বের করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। জলজল করছে তার চোখ তুটো। আমার মনে হল একটা বুনো কুকুর! কিন্তু দলের সকলেরই দেখছি মুখ শুকনো হয়ে গেছে। মোহান্তজী এবং লক্ষ্মণভারতী তুজনেরই কণ্ঠস্বর হতে ফিস্‌ফিস্ শব্দে ধ্বনি উঠল—কালো চিতা। যতীন্দ্র আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে জানাল—বন্য কুকুরীর গর্ভে চিতা-বাঘের ঔরষে কালো চিতার জন্ম। সাক্ষাৎ যম দূরে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করছে! আসল বাঘ, হাতী, নেকড়ে, চিতাবাঘদের চেয়ে এরা শতগুণ হিংস্র এবং ভয়ংকর। জয় মা রেবা, জয় মা রেবা। লক্ষ্মণভারতীজী সহসা শুয়ে পড়ে তাঁর ঝোলাটা কাছে টেনে নিয়ে দিয়াশালাই বের করে জ্বালবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কাঠির পর কাঠি ঠুকেও আগুন জ্বালতে পারলেন না। তাঁর তুটো হাত থরথর করে কাঁপছে! সহসা দেখলাম, সেই জন্তুটা গর্-গর্-গর্ কোঁয়া-কোঁ শব্দে লাফিয়ে উঠেই তীর বেগে ছুটে চলল একটা ইমলি গাছের দিকে, তার চোখগুলো যেন জ্বলছে, লক্‌লক্ বেরিয়ে এসেছে তার লাল টকটকে জিহ্বাটা! আমরা পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি তার লেজে একটা তীর এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গাঁথা আছে! একটা ইমলি গাছের গোড়ায় গিয়েই উপর দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠল, তারপর একটা কাঠবিড়ালী যেমন তর্‌তর্ করে গাছে উঠে যায় তেমনি দ্রুতবেগে গাছে উঠতে লাগলো। ইমলি গাছের উপর দিকে যেখানে ডালপালা ঘন হয়ে ঝোপের মত সৃষ্টি করেছে, সেইখানে সে ঝাঁপ দিয়ে কামড়ে ধরল একটা মানুষের ঘাড়, এবং তাকে হিড়হিড় করে টেনে এনে ফেলল গাছের তলায়। লোকটা ভীলজাতীয়, তার হাতের তীরধনুক ঝড়ঝড় করে এসে তলায় পড়ল পাথরের উপর। কালো চিতাটা লোকটার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। লোকটা তু'একবার মাত্র আর্তনাদ করতে পেরেছিল। কী বীভৎস এবং লোমহর্ষক সেই দৃশ্য! আমরা সকলেই চোখ ঢাকা দিয়ে বসে

রইলাম। সবাই তখন ভয়ে অল্পবিস্তর কাঁপছি! ইংরাজীতে 'Horrible' বললে এ দৃশ্যের অল্পই বর্ণনা করা যায়। ভয়ে আর সেই বীভৎস পৈশাচিক দৃশ্যের দিকে আমরা কেউ তাকালাম না।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মণভারতীজী নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে একটা মশাল-কাঠি জেলে ফেলেছেন, তিনি এক একটি করে ধুনিতে সেই মশাল জেলে আগুন ধরাবার ব্যবস্থা করলেন। সূর্যাস্ত না হলেও পাহাড়ের আড়ালে পড়ায় অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসছে সেই বনভূমিতে। সমস্ত ধুনিগুলো জ্বলে উঠতেই আমরা কতকটা নিশ্চিন্তবোধ করলাম। আমরা যে যার আসনে বসে, যে যার ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলাম। কারও মুখে কোন সাড়া নেই। ক্রমে রাত্রি গভীর হতে থাকল, আমি মনে মনে ভাবছি আর একটি বিয়োগান্তক দৃশ্যের কথা। পোয়াখেড়ীর জঙ্গলে যেদিন বাঘ এসে সন্ত পাতিরামকে টেনে নিয়ে গেল, সেদিনও খুবই বিচলিত হয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু সে ঘটনা ঘটেছিল দিনের বেলায় মধ্যাহ্নের কিছু পরেই; পাতিরামের রক্তাক্ত দেহকে পিঠে ফেলে বাঘটা মুহূর্তে চলে গেছল চোখের আড়ালে, পরে দূর হতে ভোজনে পরিতৃপ্ত বাঘের সহর্ষ হুঙ্কার বা গর্জন শুনতে পেয়েছিলাম। ঠিক চোখের সামনে এইরকম বীভৎস রক্তারক্তি কাণ্ড দেখতে হয়নি।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে জমাট হয়ে গেল, আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষযোজন দূরে দু'একটা নক্ষত্র চোখে পড়ছে, চারদিকে শুধু অন্ধকার অন্ধকার। এই অন্ধকার আর রেবাকুণ্ডের জলধারার কুলকুল শব্দ মনের মধ্যে একরকমের গা ছমছম করা ভয়ের বিচিত্র অনুভূতি জাগিয়েছে। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বলে গেছেন—অন্ধকারেরও একটা রূপ আছে। সে রূপ আমি নর্মদাতট পরিক্রমা করতে করতে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি এবং তন্ময়ও হয়ে গেছি অনেকবার কিন্তু আজ সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই কালো চিতাটার দাঁতের কামড়ে যেভাবে ভীলটার শোচনীয় মৃত্যুর মর্মান্তিক দৃশ্য দেখেছি, তাতে সকলেরই মনে এমন ভয় ঢুকেছে যে এইরকম মন নিয়ে অন্ধকারের রূপ অনুভব করা যায় না।

লক্ষ্মণভারতীজীর অক্লান্ত চেষ্টায় ধুনিগুলো ধীরে ধীরে ধিকিধিকি করে জ্বলে উঠছে। এতক্ষণ ধোঁয়ার জ্বালায় অস্থির হচ্ছিলাম, সবারই চোখ মুখ

লাল হয়ে উঠেছিল। প্রায় সকলেরই চোখে জল ঝরছে। ধুনিগুলোও ভালভাবে জ্বলে উঠতে ধোঁয়ার যন্ত্রণা থেকে বাঁচলাম। এইবার মোহান্তজী আরতি করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। লক্ষ্মণভারতী পঞ্চপ্রদীপে বাতি সাজিয়ে দিতেই মোহান্তজী আরতি সুরু করলেন রেবাকুণ্ডে এবং তাঁর গুরুবেদীকে। ভারতীজী স্তবগান করতে লাগলেন—

হর গুরু গুরু হর মূঢ় ভোলা।
ভূতনাথ বম্ বম্ ববম্ বম্ ভৈরব অম্বু উথালা।
ধা ধা ধা ধা ধু ধু বম্।
হর গুরু গুরু হর বম্ বম্ বম্।
মন্মথ শাসন নয়ন-হুতাশন, ফণীমালা গলে দোল দোলা।
তমাল নিন্দিত কণ্ঠে হলাহল, জলদজাল জিনি জটাজুট দল,
ঢল ঢল কল কল রেবা বিলোলা।
হর গুরু গুরু হর মূঢ় ভোলা।
বম্ বম্ বম্॥

খুব ভক্তি ও আবেগের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে মোহান্তজী আজ আরতি করলেন। আরতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভারতীজীও একই স্তবকে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাথরের উপর তাল ঠুকে গেয়ে গেলেন। আরতির শেষে আমরা যে যার আসনে সবেমাত্র বসেছি, এমন সময় মাণ্ডবগড় কেল্লার ভেতর থেকে বাঘের বিকট গর্জন ভেসে এল, ভয়ে আমরা আড়ষ্ট হয়ে পড়লাম। মোহান্তজী ধীরে ধীরে বললেন—আজ এই কালরাত্রি কিভাবে কাটবে আমি জানিনা। সকাল পর্যন্ত সকলে বেঁচে থাকব কি না, তা একমাত্র মা নর্মদাই জানেন। তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা শরণ ও সম্বল। আজ আমরা জেগে জেগেই রাত কাটাবো। একটা কথা! যতক্ষণ দ্বৈতবোধে আছি ততক্ষণ পূর্ণ শরণাগতি আমাদের কোথায়? যদি সত্যিকার শরণাগত হতে পারতাম, তাহলে কোন ভয়ের কিছু ছিল না; কেননা এবিষয়ে গীতামুখে স্বয়ং শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞাবাক্য—সর্বতোভাবে আমার শরণাগত হও, 'শরণং ব্রজ।' তাহলে আমি তোমাকে রক্ষা করব,

'মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।' কাজেই আজকের এই ভয়ংকরী রাত্রিটা তোমরা শুধু জেগেই কাটাবে না, মশালগুলোও হাতের কাছে রাখবে। যদি রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্বেই ধূনিগুলো নিভে যায় এবং সে সময় সহসা কোন হিংস্রজন্তুর আক্রমণ ঘটে তাহলে মশালের আগুন জেলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে। তোমরা কেউ ভুল বুঝো না, আমার একথার মানে এই না যে মা নর্মদা তাঁর এই অসহায় সন্তানদেরকে বাঁচাবেন না। যদি রক্ষা করেন, সে তাঁর অহৈতুকী কৃপা! আমি এখনও যে নিজে তাঁর রাতুল চরণে পূর্ণ শরণাগত হয়ে উঠতে পারিনি!—এইবলে তিনি কাঁদতে থাকলেন। তাঁর গুরুর বেদীতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলেন—গুরুদেব! হে দীনদয়াল! আমি সাধনভজনহীন, অকৃতি অধম, দাদাগুরু এবং তোমার মত পতিতপাবন মহাত্মার গদীর ভার বহন করা আমার পক্ষে অসম্ভব একথা আমি ভালভাবেই জানি। ভরত যেমন রামচন্দ্রের চরণ পাদুকা বুকে নিয়ে রাজ্যশাসন করতেন তেমনি আমিও তোমার চরণ কমল চিন্তা করতে করতে তোমার দয়াপ্রদত্ত সংঘভার বহন করে চলেছি। আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, কেবল আমাকেই তুমি মৃত্যুদণ্ড দাও আমার সঙ্গীদেরকে তুমি রক্ষা কর।

তাঁর কান্নার আর বিরাম হল না, রাত্রিও যত বাড়তে থাকে, তাঁর কান্নাও তত বাড়তে থাকে। তাঁর কান্না দেখে আমাদের সকলেরই চোখ আর্দ্র হয়ে উঠেছে। রাত যে কত হয়েছে বুঝতে পারছি না, তবে আকাশের দিকে তাকিয়ে অনুমান করলাম, আজ কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি, এইবার আকাশে চন্দ্রোদয় ঘটবে, জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে ফুটে বেরোবে। সত্যিই, একটু পরেই চাঁদ উঠল, চারিদিক জ্যোৎস্নাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতেই আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, মাণ্ডবগড় কেল্লার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেদিকে একটু আগে যে বাঘের গর্জন শুনেছিলাম, সেদিক থেকে আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। জঙ্গলের বিরাট বিরাট বনস্পতি, বড় বড় ইমলি গাছ সব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; নিশুতি রাতের নির্জনতা, খাঁ খাঁ করছে চারধার। লক্ষ্মণভারতীজী এবং অন্যান্য নাগারা মাঝে মাঝেই ধূনির উপর অল্প অল্প করে কাঠ যোগান দিয়ে চলেছেন। মোহান্তজী একই অবস্থায় পড়ে আছেন। প্রাণের ভয়ে নাগারা ধূনিকে মাঝে মাঝেই খুঁচিয়ে আগুনকে

গনগনে রেখেছেন, সেই তাপে আমরা কাতর হয়ে পড়ছি, শুধু আমাদের পিঠের দিকটা খোলা, সেদিকে রেবাকুণ্ডের ধারা, মাঝে মাঝেই এলোমেলো-ভাবে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসছে কিন্তু আমাদের সামনে, বাঁয়ে ডানে চারদিকেই আগুনের জাঙ্গাল ধনুকের আকারে ঘিরে আছে তারই অসহ্য তাপে আমরা কাতর হয়ে পড়েছি। সন্ন্যাসীরা মাঝে মাঝেই ঠাণ্ডা গরমে কেউ হেঁচে ফেলছেন, কেউ বা কেশে উঠছেন। সকলেই চারদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন, এই বুঝি কোন হিংস্রজন্তুর আবির্ভাব ঘটে। ঘণ্টা দুই পরে মোহান্তজী বসলেন। শেষরাত্রে আমাদের অধিকাংশই ঘুমে ঢুলতে লাগলেন, কেউ কেউ বা কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে নিজের আসনের উপরেই ঘুমে ঢলে পড়লেন, কেবল মোহান্তজী এবং লক্ষ্মণভারতীজীকেই দেখলাম ত্রিশূল হাতে একবার দাঁড়াচ্ছেন, একবার বসছেন। আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানতে পারিনি।

সকলের অতি চাপা কণ্ঠস্বরে আমার হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি সকলেই ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, সকলেরই মুখ ভয়ে শুকনো ও কালো হয়ে গেছে। সহসা ঘুম ভাঙায় আমি কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না, কেবল দেখলাম সকাল হয়ে গেছে, ধুনিগুলোও নিভে এসেছে। লক্ষ্মণ-ভারতীজী এবং অন্যান্য নাগারা নিভন্ত ধুনিতে আগুনে ফুঁ দিয়ে মশালগুলো জ্বেলে ফেলবার চেষ্টা করছেন। যতীন্দ্রজী ইশারা করে আমাকে দেখালেন, জলের ধারার ওপারেই দেখলাম কতকগুলো বুনো কুকুর কেউ শুয়ে আছে, কেউ বা থাবা গুটিয়ে বসে আছে, মাঝে মাঝেই তাদের লকলকে লাল জিহ্বাগুলো বের করছে। যতীন্দ্র আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ করে উচ্চারণ করলেন—কালো চিতার দল। অদূরেই কালকের সেই ভীলটার কঙ্কালটা পড়ে আছে, তার কাছেই একটা কালো চিতা মরে পড়ে আছে। বুঝলাম ভীলটার সেই তীরের মারাত্মক বিষে তার মৃত্যু ঘটেছে। আমিও তাড়াতাড়ি উঠে একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে তুলে নিলাম। জীবন-মৃত্যু ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কেউ মশাল হাতে নিয়েই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মোহান্তজী 'হর নর্মদে, হর নর্মদে', ধ্বনি দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে স্পষ্টভাবে শব্দগুলো বেরোচ্ছে না।

আমি মোহান্তজীকে কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠেই বললাম, এভাবে আগুনের ঘেরার মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কালো চিতার মুখে প্রাণ দিতে প্রস্তুত নই। হয় এখান থেকে সকলে বেরিয়ে গিয়ে তিন-চারজন মিলে এক-একটা কালো চিতাকে আক্রমণ করি চলুন হাতের ত্রিশূল ও জ্বলন্ত মশাল নিয়ে; চৌদ্দটা চিতা দেখছি শুয়ে বসে আছে। আমরা দলে আছি ত্রিশজন, আমরা আগে ভাগে মশাল ও ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে গেলে নিশ্চয়ই ওরা পিছু হটতে বাধ্য হবে। নতুবা দাঁড়িয়ে জানোয়ারের পেটে যাবার মধ্যে কী পৌরুষটা আছে? বিপদ যেখানে অনিবার্য, সেখানে একটু বেপরোয়া হতেই হবে! আমার কথা শেষ হতে না হতেই মোহান্তজী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমাকে জোর করে ধরে বসিয়ে দিলেন।

আমার মনে পড়ে গেল মহাত্মা প্রলয়দাসজীর কথা। তিনি মণ্ডলেশ্বরের অগস্ত্যি-গুহা থেকে নামতে নামতে হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি সিদ্ধ বেদমন্ত্র শিখিয়েছিলেন, সেই মন্ত্র প্রয়োগ বলে একঝাঁক মারাত্মক বোলতার গতি স্তব্ধ হতেও আমি দেখেছি। কাজেই এই চরম বিপদের ক্ষণে সেই কালো চিতাদের প্রয়োগ করার জন্য আমি নর্মদার জল স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করার জন্য উদ্যোগী হলাম কিন্তু কিছুতেই ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৮৯ সূক্তের সেই ৫ নম্বর সিদ্ধ বেদমন্ত্রটি স্মরণ করতে পারলাম না। কী আশ্চর্য! আমার ৪ নম্বর মন্ত্রটি মনে পড়ছে—ওঁ পাহি নো অগ্নে পায়ুভিঃ অজস্রৈ উত প্রিয়ে সদন আ শুশুকান। মা তে ভয়ং জরিতারং যবিষ্ঠ নূনং বিদন্মাপরং সহস্বঃ। অর্থাৎ হে অগ্নি! তুমি অজস্র আশ্রয় দান দ্বারা আমাদেরকে পালন কর, আমাদের আজ যেন ভয় না হয়, অন্যকালেও যেন ভয় না হয়। ৬ নম্বর ঋক্‌মন্ত্রটিও মনে পড়ছে—ওঁ বি ঘত্বা বাঁ ঋতজাত যংসদ্ গৃণানো অগ্নে তন্বে বরুথন্ ইত্যাদি যার অর্থ হল—হে অগ্নি! যারা সামনে কুটিলাচরণ করে, তুমি এরূপ শত্রু দমন কর। কিন্তু মহাত্মা প্রলয়দাসজী প্রদত্ত ৫ নম্বর ঋক্‌মন্ত্রটি কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না। যতবার ঐ একই সূক্তে এক নম্বর মন্ত্র থেকে মনে মনে আওড়ে যেতে চেষ্টা করলাম, ততবারই ৪ নম্বর মন্ত্র পর্যন্ত গড় গড় করে বলতে পারলাম, ৬ নম্বর মন্ত্রও ঠোঁটের কাছে এগিয়ে এল, কিন্তু

অভীষ্ট ৫ নম্বর মন্ত্র কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। মন্ত্রগুলো ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। এইবার আমি ঘাবড়ে গেলাম, আমি ঘামতে সুরু করেছি তার মানে আমার মনে ভয় দেখা দিয়েছে। ঠিক, ঠিক এইসময় মাণ্ডবগড় কেল্লার পাশ থেকে আমরা সবাই কারও কণ্ঠস্বর শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। কেউ যেন গান গাইতে গাইতে আসছেন! তাঁর গলার স্বর গানের সুরে ভেসে আসছে—

গগনে জাগিল মহাকাল।
ঘন ডম্বরু বাজে ভীম রুদ্র সাজে
জাগে ভৈরব জাগে মৃত্যু করাল।
গগনে জাগিল মহাকাল॥
মাভৈঃ! মাভৈঃ!
তাথৈ! তাথৈ! তা তা থৈ, তা তা থৈ!
জাগে ভৈরব জাগে মৃত্যু করাল।
মরণ-আঁধার কোলে, জীবন আলোকে জ্বলে
শংকর শিব সাজে সাজিয়া দয়াল।
মাভৈঃ! মাভৈঃ! মাভৈঃ! মাভৈঃ!

কণ্ঠস্বর যতই এগিয়ে আসছে, ততই আমার মহাত্মা সোমানন্দেরই কণ্ঠস্বর বলেই মনে হচ্ছে! কিন্তু তা কি করে সম্ভব। তিনি ত এখন চব্বিশ অবতারে কিংবা সেই সীতামায়ীর বনে বসে আছেন। এখানে বসে তাঁর গলা শুনব কি করে? যাঁর কণ্ঠস্বর শুনলাম তাঁকে এখনও চোখে দেখতে পাচ্ছি না। আবার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, এবারে আরও স্পষ্ট—

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু! নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু।
সে নাচ হিল্লোলে জটা আবর্তনে সাগর ছুটে আসে
গগন-প্রাঙ্গনে!
আকাশে শূল হানি, শোনাও কৃপাবাণী, তরাসে কাঁপে প্রাণী,
প্রসীদ শম্ভু॥

পাহাড় বেয়ে দুটো ঝাঁকড়া আবলুষ গাছের পাশ দিয়ে আমাদের সামনে উঠে আসতেই মোহান্তজী এবং লক্ষ্মণভারতীজী আনন্দে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠলেন—সীতাবনকী মহাপুরুষ ইধর ক্যায়সে পধারেঁ ? আমি ত তাঁকে দেখে আনন্দে আত্মহারা ! 'বন্দে মহাপুরুষস্য চরণারবিন্দম্, বন্দে মহাপুরুষস্য চরণারবিন্দম্, নমো নারায়ণায়' বলে সবাই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে আমরা প্রণাম করলাম দূর থেকে। তাঁর আমাদের দিকে নজর পড়ল বলে মনে হল না। তাঁর পূর্বের মতই শতচ্ছিন্ন পোষাক, ঝাঁপড় ঝাঁপড় চুল এবং ছোট ছোট জটা দুলাতে দুলাতে তিনি টলতে টলতে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছেন—

ললাট-শশী টলি জটায় পড়ে ঢলি,
সে-শশী-চমকে গো বিজুলি ওঠে ঝলি,
ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মূরছে ভয়ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।
আঁধারে পথ-হারা ভকত কেঁদে সারা,
যাচিছে কৃপাধারা প্রসীদ শম্ভু !

নাচতে নাচতে পাথরের উপর পায়ের তাল ঠুকতে বলতে থাকলেন—

তাথৈ, তাথৈ, তা-তা-থৈ, তা-তা-থৈ,
মাভৈঃ ! মাভৈঃ ! প্রসীদ শম্ভু ! প্রসীদ শম্ভু !

আমার আর তর সইলো না। তাঁর সেই অবস্থাতেই আমি নিভন্ত দুটো ধুনির মাঝখান দিয়ে কোনমতে পেরিয়ে তাঁর কাছাকাছি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ত্রাস্তে ব্যস্তে বলতে লাগলাম, 'সামনের দিকে তাকিয়ে দেখুন চোদ্দটা কালো চিতা আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য বসে আছে, আমাদেরকে বাঁচান !' আমার কথায় চমকে উঠেই বসে পড়লেন সেইখানেই একটা পাথরের উপর। সঙ্গে সঙ্গে অট্টাট্ট হাসি। সে কী হাসি ! হাসির দমকে দমকে তিনি দুলতে দুলতেই বলতে থাকলেন—'চোখ মেললে সকলই পাই, চোখ মুদলে কিছুই নাই। দিনে সৃষ্টি রেতে লয়, নিরন্তর ত এই-ই হয় !'

'যম বেটা হায় দুমুখো থলি, তাই জন্ম বেটার আঁৎ খালি। বেটা কেবল খাচ্ছে, খাচ্ছে, খাচ্ছে, ওর পেটে কি কিছু থাকছে? হাঁ, হাঁ, কিছু থাকছে!'

'বলি ও বামুন ছ্যানা! তুই এখানে এলি কি করে? রাঁধুনী নাই ত রাঁধলে কে, রান্না নাই ত সবাই খাচ্ছেন কি? আরে বুঝিস্ না কেন, যে রাঁধলে সেই ত খেলে এই ত দুনিয়ার ভেল্কি!'

এইভাবে কথা বলতে বলতেই তিনি মোহান্তজীর দিকে তাকিয়ে আমাকে বলতে লাগলেন—'ওহো তুই ঐ রাত ভিখারীটার দলে ভিড়ে এখানে পৌঁছে গেছিস্! ভাল, ভাল,

*রাত ভিখারির ধামাধরা থাকে একজন
হরিনাম বলে না মুখে, চাল কড়ি কুড়াতে তার মন!

এই বলেই আবার তিনি হেসে লুটোপুটি! 'ওহে রাত ভিখারী বাবু! রাত ভোর ত গুরুর কাছে মাথা ঠুকলি আর ভিখ চাইলি, সকাল হতেই 'হর নর্মদে'! আরে গুরুশক্তি আবার পারেন না কি? আরে বেটা! যেই হর সেই গুরু, সেই নর্মদা। সঙ্কটকালে তোর মন তিনদিকে ছুটবে কেন? গুরুকে ধরে সকলেই জয়, নয়ত সব লয়! ঐ যে কথায় আছে না?

দেবতা থাকুক শত শত গুরু করব সার,
গুরুর মধ্যেই কৃপার প্রকাশ দেবী আর দেবার।

'তাই বলি মাঝি! গুরুর শরণ লও, কেন তুফান পানে চাও, হাল ধরে আছেন গুরু নিরঞ্জন! ফড়্যা যারা, মজবে তারা, বাটখারা যাদের কম, ধরে তসিল করবে যম আর গদিয়ান জহরী যারা, দেখ গে তারা বসে বসে ব্যাপার করছে গুরুর প্রেমরতন।'

'আমি বাপু স্বরূপের বাজারে থাকি। শোনরে খেপা, বেড়াস একা, চিন্তে নারলে ধরবি কি? কালার সঙ্গে বোবার কথা হয়, কালা গিয়ে শরণ

* বাংলাদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি উপদল আছে যাদের কাছে দিবাভিক্ষা নিষিদ্ধ। তারা শুক্লপক্ষের পঞ্চমী হতে পূর্ণিমা পর্যন্ত হরিনাম করতে করতে পল্লীর রাস্তা দিয়ে হাঁটে। গৃহস্থেরা তাদের সাড়া পেলেই নিজেরা এসে তাদের ধামাতে চাল কড়ি ভিক্ষা দিয়ে যায়। যে লোক ঐ ধামা নিয়ে সঙ্গে থাকে, সেই সাধারণতঃ দলের প্রধান ব্যক্তি। সে হরিনাম করে না, কেবল ধামা বয়ে বেড়ায়। এইরকম দলকে রাত-ভিখারী বলা হয়।

মাগে কে পাবে নির্ণয়! আর অন্ধ যেয়ে রূপ নেহারে তার মর্মকথা বলব কি! মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়, জীয়ান্ত ধরতে গেলে হাবুডুবু খায়। ওরে, সে মড়া নয়কো রসের গোড়া, তার রূপেতে দিয়ে আঁখি, আমি এখন রূপ দেখি।'

এই বলে পাগলা সাধু চুপ করে বসে চোখ বন্ধ করে ঢুলতে থাকলেন। তাঁর ঢুলনি আর থামতে চায় না। আমরা পড়লাম মহা ফাঁপরে। রাতভর আমরা ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি, আগুনের তাপে জর্জরিত হয়েছি, কালো চিতা-গুলো এখন দেখতে পাচ্ছি মুখ ব্যাদন করে সবাই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, মনে হচ্ছে এবারে আক্রমণের উদ্যোগ করছে, এবারে নির্ঘাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে। অমিত শক্তিধর এই মহাপুরুষকে দেখে আমাদের বুকে আশা ভরসা জেগেছিল কিন্তু ইনি ত প্রথম থেকেই ভাবের রাজ্যে বিচরণ করছেন। এখন ত একেবারে মস্ত। সবচেয়ে বিপদের কথা, এর ভাবের খেলা এতক্ষণ তন্ময় হয়ে আমরা দেখছিলাম, মশালগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখিনি, সেগুলোও সব নিভতে বসেছে। আমি মরিয়া হয়ে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বললাম—মা রেবার দোহাই, সীতামায়ীর দোহাই, আপনি আমাদের দিকে একটু নজর দিন, কালো চিতার দল আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। আমার চিৎকারে তিনি চমকে উঠেই কালো চিতাগুলোর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। তাকিয়ে তাকিয়েই বলতে লাগলেন—ওঁকারের বুড়ো যে অগস্ত্যি গুহায় তোকে যে বেদমন্ত্রটা শিখালো, সেটা একবার আউড়িয়ে দেখ না। এখনই বেটাদের নড়ন চড়ন থাকবে না।

—আমি তা আওড়াবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কিছুতেই বেদমন্ত্র স্মরণে আনতে পারিনি।

—তা হলে ত তোর বেটা রাবণের দশা! রাবণ বেটাও মরণকালে সব অস্ত্র ভুলে গেছল। অতবড় মহাবীর কর্ণ, সে বেটারও মৃত্যুকালে রথচক্র গ্রাসিল মেদিনী। পরশুরামের দেওয়া ব্রহ্মাস্ত্রও ভুলে গেল। বুঝলি রে, এ সবই সেই নিয়তি হারামজাদীর খেল!

আমার আর ধৈর্য রইল না, যে কাজ কখনও করিনি, তাঁর এতসব আদিখ্যেতায় অধীর হয়ে সেই কাজই করে বসলাম। তাঁর দুই কাঁধ স্পর্শ করে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললাম, 'তবে সেই নিয়তির মুখে আপনাকেই

ছুঁড়ে ফেলে দিব'। এতবড় উচ্চকোটির মহাপুরুষের সঙ্গে আমাকে এইরকম বেয়াদপি করতে দেখে সকলেই হকচকিয়ে গেছেন। মোহান্তজী চুপি চুপি কণ্ঠে আমাকে ধমকে উঠলেন—'ক্যা পাগলপন কর্ রহে হৈ।'

কিন্তু সেদিকে কান দিবার সময় নাই। মহাপুরুষ সবেগে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাতের বদ্ধমুষ্ঠি আস্ফালন করতে করতে কালো চিতাদের দিকে এগোতে এগোতে বললেন—কী তোদেরকে আমি বলে দিয়েছি না, বামুনের মাংস তিতা হয়। সাধুদের মাংস বিষ! বিষ! চাবল মারবি কি সঙ্গে সঙ্গে অক্কা! দেখছিস না, তোদেরই এক বড় কুটুম ইম্‌লি গাছের তলায় কেমন চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে? পালা পালা, নয়ত সকলেই চিৎপটাং হবি!

জানোয়ারগুলো কি বুঝল জানি না, আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, মহাপুরুষ যতই এগুচ্ছেন, তারা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। তারপর তারা দুড়দাড় শব্দে বন-বাদাড় ভেদ করে দৌড়ে পালাল। মহাপুরুষ কিন্তু থামলেন না, তিনি এগিয়ে চললেন। আমরা সকলেই তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলাম। তিনি কোন কথা বলছেন না। রেবাকুণ্ড হতে ক্রমে আমরা মাইল দুই রাস্তা হেঁটে পাহাড় বেয়ে নিচে নামতে লাগলাম। সেখান থেকে ঘন বনের মধ্য দিয়ে এমন একটা স্থানে এসে পৌঁছলাম, যেখান থেকে অনেক নিচে একটা বনাবৃত উপত্যকা দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা যে বনের মধ্য দিয়ে হাঁটছি, সেটা যে অনেক উঁচু পাহাড়ের উপরকার বন, নিচের উপত্যকার উপর নজর দিয়ে তা ভাল করেই বুঝা গেল। মনে হচ্ছে এ যেন একটা ভিন্ন জগৎ—সুউচ্চ সোজা খাড়া খাড়া শাল, কেঁদ, বারস্, ধাওয়া, মেহরীন্ প্রভৃতি বড় বড় গাছের সন্নিবেশ দিনের আলো আটকে দিয়েছে। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে একটা বস্তি, মনে হল সারি সারি ভীলদেরই কুঁড়ে। মোহান্তজীকে আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, রেবাকুণ্ড বা মাণ্ডবগড় কেল্লা হতে আমরা কোন্‌দিকে হাঁটছি।

দক্ষিণ-পশ্চিম—নৈঋত কোণ ধরে হাঁটছি আমরা। আরও আধ-ঘন্টাটাক হাঁটার পর একটা উঁচু পাথরের উপর এতক্ষণ পরে মহাপুরুষ বসলেন। বসেই আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন—ঐ যে দূরে সূর্যের আলোতে জলের ধারা চিক চিক করছে, সোজা ঐ ছোট নদীটার ধারে চলে যা। কোন ভয় নাই। ঐ নদীর ধার ধরে গেলে নর্মদার কিনারে পৌঁছে যাবি।

দে দোল্, দে দোল্, ঘাটে তোল্, ঘাটে তোল্। মা রেবা, বেশ আছিস্ তুই, সারাজীবনটা কি এইভাবে নাকে দড়ি বেঁধে ঘুরাবি নাকি? হঠাৎ হাততালি দিতে দিতে বলতে লাগলেন—

কৃতান্ত দূত কালভূত ভীতিহারি বর্মদে।
ত্বদীয় পাদ পঙ্কজং নমামি দেবি নর্মদে॥
জগৎলয়ে মহাভয়ে মৃকণ্ডুসূনু হর্ষদে
ত্বদীয় পাদ পঙ্কজং নমামি দেবি নর্মদে॥

ইতিমধ্যেই, তিনি যখন তাঁর ভাবের ঘোরে হাততালি দিয়ে স্তব পাঠ করছেন, মোহান্তজীর ইঙ্গিতে লক্ষ্মণভারতীজী পঞ্চপ্রদীপের বাতি সাজিয়ে ফেলেছেন। মোহান্তজী পঞ্চপ্রদীপ জেলে তার আরতি সুরু করে দিলেন। শিঙ্গা, ডম্বরু বাজাতে লাগলেন নাগারা। আরতী শেষ হতেই মোহান্তজীসহ আমরা সকলেই তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। মহাপুরুষের সর্বাঙ্গে তখন অশ্রু পুলক শিহরণ প্রভৃতি সাত্ত্বিকী বিকার ফুটে উঠেছে দেখলাম। তিনি মিনিট পাঁচেক ঐ অবস্থায় থেকে মোহান্তজীকে বললেন—ঐ নদীর ধার ছাড়বি না। তাহলেই হাতানোরা কুব্জ সংগমে পৌঁছাতে পারবি। আমি এখন রেবাকুণ্ডে ফিরে গিয়ে দু'চারদিন থাকব। বুঝলি জায়গাটা খুব জমাটি। রসও আছে, মজাও আছে। তারপর ফিরে যাবো সীতাবনে। মা রেবার চেয়ে আমার সীতাবেটিই ভাল। আমাকে কাছে ডেকে বললেন—আ মলো! তোর চোখে জল কেন? তুই ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে ভালই করে ছিলি। কালো চিতাগুলোও মা নর্মদার সন্তান। জঙ্গলে জঙ্গলে যে জানোয়ার দেখছিস্ ওরা সবাই মা নর্মদার প্রহরী। ওরাই নর্মদা তটের শুচিতা অসংযমীদের হাত থেকে রক্ষা করে। ওরে আমার বাপসোহাগে বামুন ছানা! শুধু মুখের কথায় গুরু শক্তি কি মিলে? দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে না ভাবিলে? রে মন গুরু-মুখপদ্মবাক্য, হৃদয়ে করিয়ে ঐক্য, দাসভাবে থেক পদতলে॥ চেয়ে ছাখ সড়কপানে, চেয়ে ছাখ সড়কপানে। ফুটেছে সোনার কমল, চাঁদ চেয়ে সে নিরমল, ময়লাতে তার করবে কি, আপনি আলোক ঐ বিমানে॥

এই বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের দিকে অকস্মাৎ পিছন ফিরে

দৌড়াতে লাগলেন বন ঝোপ পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। আমরা তাঁর যাত্রা-পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সকলেরই চোখে জল। নিশ্চিত মৃত্যু হতে যিনি বাঁচালেন, সেই বিপদের বন্ধু আমাদের কাছ হতে চলে গেলেন। আমার বুকের ভিতরটা যেন খাঁ খাঁ করছে। আমি সেইখানে বসে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলাম।

মোহান্তজী আমার হাত ধরে উঠালেন। আমার চোখে মুখে কতকটা জল ছিটিয়ে দিলেন নিজের কমণ্ডলু থেকে। ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম, নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। বনের মধ্য দিয়ে উৎরাই-এর পথে ক্রমশঃই নামছি। বড় বড় গাছের ধার দিয়ে অনেক ঝোপ-ঝাড় অতিক্রম করে অবশেষে আমরা মহাত্মা সোমানন্দজী কথিত সেই ছোট নদীটির ধারে এসে পৌঁছালাম। নদীর ওপারেই ভীলদের বস্তি, যা আমরা পাহাড়ের উপর থেকে দেখেছিলাম। লক্ষ্মণভারতী শিঙ্গা ডম্বরু বাজাতে বাজাতে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মোহান্তজীর নিষেধে তা বন্ধ করা হল। তাঁর ভয় ওপারের ঐ ভীল বস্তিকে। যতীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করতে ঘড়ি দেখে সময় জানালেন—বেলা ১০টা বেজেছে। মোহান্তজী আমাকে বললেন—তোমাকে কাল যে ওঘবতী নদীর কথা বলেছিলাম, এই সেই ওঘবতী। মহাভারতে ওঘবতীর উপাখ্যান পড়েছ কি?

—আমার এই মুহূর্তে কিছু মনে পড়ছে না।

—আমি বলছি শুন।

—আমার এখন শুনতে ভাল লাগছে না।

—আমি জানি মহাত্মা সোমানন্দজীর জন্য মন এখন খুবই কাতর আছে। ঐসব আত্মানন্দ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের জন্য মন খারাপ করে কোন লাভ নাই। ওঁরা দূরে থেকেও কাছে আবার কাছে থেকেও দূরে। এই যে আমরা দুর্গম জঙ্গল পথে হাঁটছি, তিনি কাছে না থাকলেও তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর, তাঁর কৃপাদৃষ্টি সততই আমাদেরকে অনুসরণ করছে। আমি ওঘবতীর গল্প বলছি, সাবধানে হাঁটতে হাঁটতে তোমরা শুনতে থাক। গল্প করতে করতে বা শুনতে শুনতে পথ হাঁটলে আমাদের পথের ক্লান্তি ততটা কষ্টদায়ক হবে না। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ রাজা নৃগের পিতামহ ওঘবানের ওঘবতী নামে এক কন্যা এবং ওঘরথ নামে এক পুত্রের প্রসঙ্গ আছে। কুরু পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের কাছে সেই

ওঘবতীর উপাখ্যান বলেছিলেন। কুরুক্ষেত্রনিবাসী সুদর্শন নামক এক স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সঙ্গে ওঘবতীর বিবাহ হয়। ঐ সুদর্শন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমি গৃহস্থ রূপে থেকেই মৃত্যুকে জয় করব—'প্রতিজ্ঞামকরোৎ ধীমান্ দীপ্ততেজা বিশাম্পতে।' অতিথির সেবা-যত্ন করা গৃহস্থের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে তিনি অতিথি সেবাকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ধর্মপত্নী ওঘবতীকেও বলে রাখলেন—তোমার দ্বারা যেভাবে অতিথি তুষ্ট হন সতত সেই চেষ্টা করবে। এমন কি শরীর দান করেও যদি অতিথিকে তুষ্ট করতে হয় তুমি তাও করবে, সে বিষয়ে কোন বিচার করবে না—

যেন তেন চ তুষ্যেত নিত্যমেবত্বয়াতিথিঃ।
অপ্যাত্মনঃ প্রদানেন ন তে কার্যা বিচারণা॥

পতিব্রতা ওঘবতী স্বামীর এই কথা শুনে সম্মতি প্রদান করলেন।

মোহান্তজীর কথা শেষ হতেই আমি বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলাম—শ্রীমতী সম্মতি ত দিবেনই। কারণ কামুকী যারা তারা আর একটা পুরুষদেহ ভোগ করার সুযোগ পেলে সে সুযোগ কি ছাড়ে? এরকম কামিনীকে আবার বলছেন পতিব্রতা!

মোহান্তজী আমার মন্তব্য কানে তুললেন না। তিনি যথারীতি গল্প বলতে বলতে হাঁটাতে লাগলেন। তিনি বললেন সুদর্শন যখন এইরকম ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলেন সেই দণ্ড হতে মৃত্যু দণ্ড হাতে নিয়ে গৃহস্থ সুদর্শনের ছিদ্রান্বেষণ করতে করতে তাঁর পিছনে হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও মৃত্যু সুদর্শনের অতিথি সৎকারের কোন ত্রুটি বের করতে পারলেন না। একদিন সুদর্শন যজ্ঞ কাষ্ঠ আহরণ করার জন্য ওঘবতীকে একা রেখে বনে গেলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই এক সুন্দর মূর্তি ব্রাহ্মণ তাঁর গৃহের দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। ওঘবতী তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে, তাঁর প্রয়োজন সম্বন্ধে জানতে চাইলে অতিথি বললেন—কল্যাণি! তোমাকেই আমার প্রয়োজন। বরবর্ণিনি! অতিথি সৎকার ধর্মে তোমার যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমাকে তোমার দেহদান করে সন্তোষ বিধান কর। ওঘবতী দু একবার অতিথিকে অন্য বস্তুর প্রলোভন দেখালেন বটে কিন্তু

অতিথি যখন সেসব বস্তুতে সম্মত হলেন না, তখন পতি-আজ্ঞা স্মরণ করে সলজ্জভাবে 'তাই হোক' বলে ব্রাহ্মণের সঙ্গে 'সহাস্যে' ওঘবতী অন্য গৃহে গমন করলেন।'

এই পর্যন্ত শুনেই আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম—Stop! Stop! আপনার এই কদর্য গল্প এখনই বন্ধ করুন। মহর্ষি বেদব্যাস কবে কোথায় কোন কামিনী নিজের যৌনক্ষুধা মিটিয়ে নিয়েছিল, সেই গল্প ধর্মের মোড়কে মুড়ে পরিবেশন করতে পারেন না! অসংযতা ব্যভিচারিণী ত চিরকাল এই স্বভাবেরই হয়। নিশ্চয়ই কোন কামাচারী ধূর্ত এইরকম যৌন বিষয়ক গল্প রচনা করে মহাভারতের মধ্যে সুকৌশলে প্রক্ষেপ করে দিয়েছে!

মোহান্তজী আমার হাত ধরে বললেন—মাঁয় বিনতী করতা হুঁ, পাঁচ মিনিটকে লিয়ে আপ্ চুপ রহে। তিনি আবার গল্পের বাকী অংশ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি বলতে লাগলেন—অন্য ঘরে ঢুকে ওঘবতী যখন ব্রাহ্মণ-অতিথির সঙ্গে সম্ভোগে মত্ত ছিলেন, সেই সময় সুদর্শন বনে থেকে কাঠ সংগ্রহ করে এনে ডাকতে লাগলেন—ওগো তুমি কোথায় গেছ! কিন্তু অতিথি তখন ওঘবতীকে আলিঙ্গন করে চুম্বনে রত ছিলেন, তাই ওঘবতী নিজেকে 'উচ্ছিষ্ট' জ্ঞানে নীরব রইলেন কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুদর্শনকে বললেন—আমি স্বয়ং ধর্ম তোমার অতিথি সেবাব্রত পালনের পরীক্ষা নিবার জন্য তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। তোমার পিছনেই লোহমুদ্গরধারী মৃত্যু অপেক্ষা করছিল। যদি তুমি ওঘবতীকে আমার সঙ্গে সম্ভোগে মত্ত দেখে উত্তেজিত হয়ে আমাদের অপমান করতে, তাহলে সেই দণ্ডে মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করত। কিন্তু তুমি ধৈর্য ধারণ করে তোমার পত্নীর অতিথি সেবায় সাহায্য করেছ। তোমার এইভাবে ব্রত পালনের ফলে তুমি মৃত্যুকে জয় করেছ। তোমার পত্নী তাঁর তপস্যা প্রভাবে অর্ধশরীর দ্বারা লোক পাবন নদীরূপে এবং অর্ধশরীরে অন্তিমকালে তোমার সঙ্গে স্বর্গ গমন করবেন। এই সেই ওঘবতী নদী, আমাদের পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে।

সীতাবনের মহাত্মার দয়ায় এতখানা রাস্তা এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে নিরুপদ্রবেই এসে পৌঁছেছি। এখন বোধহয় বেলা একটা বাজে। আমরা

এখানে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করতে করতে আহার-পর্ব সেরে নিই এস। চল, ওঘবতীতে হাত মুখ ধুয়ে নিই। আমি বলে উঠলাম—'এমন ধর্ম এবং ধর্মরাজের মুখে আগুন! আমি ওঘবতী নদীতে পাদস্পর্শও করতে প্রস্তুত নই!'

আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মোহান্তজী সশিষ্যে নদীতে নেমে গেলেন। আমি তাঁদের ঝোলা কম্বল গাঁঠরীগুলোর কাছে গুম্ হয়ে বসে রইলাম। তাঁরা সকলেই নদী থেকে উঠে এসে, সঙ্গে যা ফলমূল ছিল, তা সবাই ভাগ করে খেলেন। আমিও খেলাম। আধঘন্টা বিশ্রাম করে আবার যাত্রা সুরু হল দল বেঁধে—'হর নর্মদে, হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে।

ওঘবতী নদীর তীর হতে আমরা পূর্বদিকে বাঁক নিয়ে যে পথে চলতে থাকলাম, সেই পথে মনে হল জঙ্গল যেন নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। একটা সম্বর হরিণ এবং একদল চিতল হরিণকেও আমাদের চলার পথ হতে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে নদীতীরের দিকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। নিরীহ হরিণদলকে দেখে নাগাদের বিক্রম বেড়ে গেল। তাঁরা একসঙ্গে শিঙা ডম্বরু বাজিয়ে তাদেরকে আরও চমকিয়ে দিবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি মনে মনে ভাবছি, এই সময় একদল নেকড়ে ভালুক বা বুনোহাতি বেরোলে এই বীর পুঙ্গবদের এত উল্লাস কোথায় থাকত, দেখতে পেলে ভাল হত। রেবাকুণ্ডের ধারে একদল কালো চিতা দেখে আজ সকালেই দেখেছি, এঁরা জীবন্মৃত হয়ে গেছলেন! এঁরা যে দেখছি শক্তের ভক্ত, নরমের যম!

যাই হোক, মুখে কিছু বললাম না, মনের বিরক্তি মনে চেপে রেখে এঁদের সঙ্গে নীরবে হাঁটতে লাগলাম। ক্রমে আমরা এমন স্থানে এসে পৌঁছলাম, যেখানে আমাদের চারদিকে অনুচ্চ রুক্ষ অনুর্বর অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় —রকগুলো নানা আকৃতির, নানা ধরণের। কোনটা গম্বুজাকৃতি, কোনটা পিরামিডের মত, কোনটা মন্দিরের মত, তার মধ্যে গুহা দেখা যাচ্ছে, কোনটা বা দেখতে বিরাটাকার শিবলিঙ্গের মত। কোনটার রং কালো, কোনটা মেটে সিঁদুরের মত, কোনটা বা ধূসর রঙের। এই পার্বত্যাংশের পাথরগুলো স্বভাবতঃই মসৃণ এবং ধারালো। খালি পায়ে হাঁটতে আমাদের সকলেরই খুব কষ্ট হচ্ছে। সকলেরই পাগুলো অল্প-বিস্তর ছুঁড়ে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

এইভাবে মাইল দুই হাঁটার পর উৎরাই-এর পথে যেখানে নেমে গেলাম, সেখানের পথ জঙ্গলময় বটে তবে ধারালো নয়। গাছের পাতা ঝরে পড়ে রাস্তাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে অর্থাৎ হাঁটতে তেমন আর কষ্ট হচ্ছে না। পথ একটু ভাল হতেই মোহান্তজীর মাথায় আবার গল্পের বাতিক এসে চাপল। তিনি আমাকেই সম্বোধন করে বললেন—শৈলেন্দ্রনারায়ণজী! আমি তখন যে ওঘবতীর স্বামী সুদর্শনজীর অতিথিসেবার গল্প বলেছিলাম, সেই সুদর্শনের বাপ-মার পরিচয় শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে!

—না, না, আমি শুনতে চাই না। যে ক্লীব ও নপুংসক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে স্ত্রীকে পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতে উৎসাহ জোগায়, সেই ভজামার্কা লোকের কোন প্রসঙ্গ আমি শুনতে চাই না।

কিন্তু আমি 'না' বললে কি হবে, দলের আর সকলেই তাঁর মুখরোচক গল্প শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বাহবা পেয়ে তিনি সুরু করলেন—প্রজাপতি মনুর ইক্ষাকু নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনিই মহারাজা ইক্ষাকু, ভারতপ্রসিদ্ধ ইক্ষাকু রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর একশত পুত্র হয়েছিল, তাদের মধ্যে দশম পুত্রের নাম—দশাশ্ব। দশাশ্বের পুত্রের নাম—মদিরাশ্ব। মদিরাশ্বের পুত্রের নাম দ্যুতিমান। এই মহাবল দ্যুতিমানের পুত্রের নাম সুবীর। সুবীরের দুর্জয় নামে একপুত্র হয়েছিল। তিনি কালক্রমে সকল অস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সকল যুদ্ধেই দুর্জয় হয়ে উঠেছিলেন। এই দুর্জয়ের পুত্রের নাম দুর্যোধন, তিনি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, রাজর্ষি শ্রেষ্ঠ এবং মহারাজ উপাধি লাভ করেছিলেন। এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে, এই দুর্যোধন নাম দেখে তাকে গান্ধারী-পুত্র কৌরবরাজ দুর্যোধন বলে যেন না ভাবা হয়। দুর্জয়-পুত্র দুর্যোধন এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্যোধন দুজনেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি, দুজনের মধ্যে কাল-ব্যবধান অনেক। ইক্ষাকু বংশীয় রাজারা নর্মদা-তটের ওঁকারতীর্থে মাহিষ্মতী নগরীতে থেকে রাজত্ব করতেন। যাইহোক, মাহিষ্মতীর মহারাজ দুর্যোধনের নগর ও রাজ্য নানাবিধ ধনরত্ন পশু ও শস্যে পরিপূর্ণ থাকত। তাঁর রাজ্যে কখন কোন মানুষ কৃপণ, দরিদ্র, রোগী কিংবা কৃশ ব্যক্তি ছিল না। তাঁর আমলে মাহিষ্মতীর সকল মানুষই জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক যাগকর্তা এবং বেদ-বেদাঙ্গপরায়ণ ছিলেন। স্বয়ং মহর্ষি বেদব্যাস বলেছেন, মহারাজ দুর্যোধনের গুণে মুগ্ধা হয়ে স্বয়ং চিরপবিত্রা শীতলজলা,

সতত শুভকারিণী দেবনদী নর্মদা নিজের অনুরাগেই সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ দুর্যোধনকে একদা কামনা করেছিলেন—

তং নর্মদা দেবনদী পুণ্যা শীতলা শিবা।
চকমে পুরুষব্যাঘ্রং স্বেন ভাবেন ভারত॥

১৮, মহা, অনুশাসন, ২য় অধ্যায়।

অর্থাৎ দুর্যোধনকে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

আমার আবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল ; আমি চিৎকার করে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলাম—আপনার ঝোলাতে কি কোন মাদকদ্রব্য লুকানো আছে না কি? আপনি কি গোপনে তা খেয়েছেন? তা না হলে নেশার ঘোর ছাড়া আপনি কি করে এসব প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করতে পারছেন যে, যিনি পৃথিবীর আদি কন্যাকাশক্তি, তিনি প্রেমাসক্ত হয়ে দুর্যোধনের মত একজন রাজাকে বিবাহ করেছিলেন?

—কেন নয়? তুমি কি অমরকন্টকে নর্মদা উদ্গম মন্দিরের দক্ষিণ দিকে কর্ণমন্দিরের উত্তরপাশে 'রং মহলা' দেখে আস নি? আমি ত একথা বলছি না যে, এই কল্পেই এসব ঘটনা ঘটেছিল! কোন এক কল্পে মা নর্মদার সঙ্গে মাহিষ্মতীর মহারাজা দুর্যোধনের বিবাহ হয়েছিল এবং তাঁরা অমরকন্টকের ঐ 'রং মহলাতে' গিয়ে কিছুকাল বাস করেছিলেন।

আমি এবার আরও চটে গিয়ে বললাম—ঝুট্ ঝুট্। বিলকুল ঝুট্। 'রং মহলা' নামক বাড়ীটির যে ধ্বংসাবশেষ দেখে এসেছি, তা তিনশ বছরের বেশী আগে তৈরী হয়নি। 'কোন এক কল্পে' বললে এত নিশ্চয়ই বুঝায় যে, এই কল্পে নয়, এই কল্পের আগে। আপনাদের হিসাবে কি তিনশ চারশ পাঁচশ বা হাজার বছরে এক একটা কল্পান্ত হয়? পুরাণকারদের উর্বর মস্তিষ্কেই কেবল এইসব উদ্ভট কল্পনা আসে, তদনুযারী নানা রোচক-গল্পের সৃষ্টি হয়। বেদব্যাসের দোহাই দিয়ে এইসব উদ্ভট গল্পকে প্রামাণ্য বলে চালাবার চেষ্টা করবেন না। বর্তমানে প্রচলিত মহাভারতে লক্ষাধিক শ্লোক পাওয়া যায়। কিন্তু আদিতে বেদব্যাস রচিত মূল মহাভারত ২৪০০০ শ্লোকবিশিষ্ট ছিল। অন্যান্য গবেষক পণ্ডিতদের কথা বাদ দিলেও মূল মহাভারতেরই আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমম্।
চতুর্বিংশতি সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্ ॥

অর্থাৎ প্রথমতঃ ব্যাসদেব উপাখ্যানভাগ ত্যাগ করে ২৪০০০ শ্লোক দ্বারা ভারতসংহিতা রচনা করেছিলেন, পণ্ডিতেরা সেই ২৪০০০ শ্লোককেই ভারত নামে অভিহিত করে থাকেন।* পরবর্তীকালে নানা সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মতবাদকে পুষ্ট করার জন্য অনেক কাল্পনিক গল্প রচনা করে মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষেপ (Interpolation) করে দিয়েছে।

লক্ষ্মণভারতীজী এইসময় আমার উদ্দেশ্যে বললেন—ভেইয়া, তুমি একটু চুপ কর। আমাদেরকে গল্পটা শুনতে দাও।

রাগে গর্‌গর্ করতে করতে আমি চুপ করে গেলাম। মোহান্তজী তাঁর বর্ণিত গল্পের জের টেনে বলতে লাগলেন—হাঁ, আমি যা বলছিলাম, মাহিষ্মতী-রাজ দুর্যোধনের ঔরসে নর্মদার গর্ভে সুদর্শনা নামে এক কন্যা জন্মায়। কন্যাটি নামেও ছিলেন সুদর্শনা, রূপেও সুদর্শনা। সুদর্শনা যৌবনে উপনীত হলে একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে মহারাজের কাছে তাঁর কন্যার পাণি প্রার্থনা করে বসলেন। ব্রাহ্মণকে দরিদ্র এবং অসবর্ণ জেনে মহারাজ ব্রাহ্মণের প্রস্তাব রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাজা এক যজ্ঞের আয়োজন করলে যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নির আবির্ভাব ঘটল না। রাজা বিষণ্ণ অন্তঃকরণে কয়েকজন যোগবিদ্যা বিশারদ্ বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে অগ্নি সহসা কেন নির্বাণ ও অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তার কারণ অনুসন্ধান করতে প্রার্থনা জানালেন। ব্রাহ্মণরা যোগস্থ হয়ে জানতে পারলেন যে, স্বয়ং অগ্নিদেব ব্রাহ্মণের বেশে এসে রাজার কাছে সুদর্শনার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন। রাজা এইকথা জানতে পেরে অগ্নিদেবের কাছে অনেক প্রার্থনা করার পর অগ্নিদেব পুনরায় ব্রাহ্মণের বেশেই আবির্ভূত হলেন। মহারাজ দুর্যোধন সানন্দে ব্রাহ্মণবেশী অগ্নিদেবের সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত বিধানে সুদর্শনার বিবাহ দিলেন। সেই সুদর্শনার গর্ভে অগ্নিদেবের ঔরসে সুদর্শনের জন্ম হয়। এই সুদর্শনই ওঘবতীর স্বামী।

* কৌতূহলী পাঠক মহাভারতের প্রকৃত শ্লোক সংখ্যা এবং তার কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত জানতে চাইলে লেখক প্রণীত 'আলোক-বন্দনা' নামক গ্রন্থের ৬৬-৬৯ পৃষ্ঠা পড়ুন।

আমি আবার মন্তব্য করে বসলাম—এই না হলে দেবচরিত্র! পূর্বে অতিথিরূপে স্বয়ং ধর্মরাজের ওববতীর সঙ্গে লীলাখেলা আপনি বর্ণনা করেছেন, এখন অগ্নিদেবের দেবচরিত্রও বর্ণনা করলেন। বর্ণনার রসাবেগে আপনি এতই ডগমগ যে আদি কুমারী শক্তি মা নর্মদাকে নিয়েও কল্পিত উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। আপনাদের সঙ্গে থাকলে এইরকম ন্যক্কারজনক ক্লেদাক্ত কাহিনী শুনতে শুনতে হয়ত আমার পরিক্রমাই খণ্ডিত হয়ে যাবে, তাই আপনাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করছি। এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চলার পথ থেকে বাঁদিকে নেমে তরতর করে দৌড়াতে লাগলাম। গাঁঠরী, কমণ্ডলু, লাঠি হাতে নিয়ে মনে মনে রাগের চোটে যতটা ফুঁসছি, তত জোরে পা ছুটছে না। তবুও ঝোপ-ঝাড় পাথরের চাঙড় ভেঙ্গে, কখনও ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আমি দৌড়াতে লাগলাম। অপ্রত্যাশিত-ভাবে আমার এই কাণ্ড দেখে তাঁরা দু'এক মিনিট হকচকিয়ে গেছলেন। তারপর মোহান্তজীসহ আরও দু'চারজন নাগা তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন—ইয়ে আপ্ ক্যা কররাহা হৈ। লোটকে আইয়ে, লোটকে আইয়ে। জঙ্গলমেঁ জানোয়ারকা ডর হ্যায়। জলদি আপোষ আ যানা। আমার পিছনেই পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম, আমাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অন্ততঃ দুজন আমার পিছনে দৌড়ে আসছেন। কাঁটা এবং পাথরে ঠোকর খেয়ে আমিও আর দ্রুতবেগে দৌড়াতে পারছি না। তাই বুদ্ধি করে একটা ঝোপ দেখে আমি ঘাপটি মেরে বসে পড়লাম। একটু পরেই দেখলাম, যতীন্দ্র এবং লক্ষ্মণভারতী আমার থেকে প্রায় বিশগজ দূর দিয়ে দৌড়ে গেলেন। যেখানে নাগার দলকে সঙ্গে নিয়ে মোহান্তজী দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে একটামাত্র শিঙা ধীরে ধীরে কেউ বাজিয়ে চলেছেন। বুঝলাম, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্র ও লক্ষ্মণভারতীজী যাতে আবার পথ চিনে তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারেন সেইজন্যই এই শিঙার সঙ্কেত দেওয়া হচ্ছে। একটু পরেই যতীন্দ্রের গলা শুনতে পেলাম। তিনি লক্ষ্মণভারতীকে বলছেন—বিদ্বান্ লোক যে ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়, এই প্রথম দেখলাম। আমাদের দেশের ছেলে, তাই দুঃখ হয়, এই জঙ্গলের মধ্যে জানোয়ারদের হাতে বিদেশ-বিভুঁই-এ প্রাণটা হারাবে। বেলা তিনটা বেজে গেছে, আর ত আমাদের অপেক্ষা করা চলে না। লক্ষ্মণভারতীও তাঁকে

কি যেন বললেন, বুঝতে পারলাম না। মোহান্তজী চিৎকার করছেন—লক্ষ্মণভেইয়া হো, হো মতিন্দর! বাঙালীবাবাকো মিলা?

এঁরা চিৎকার করে উত্তর দিলেন—নেহি জী! মোহান্তজীর গলা ভেঙে গেছে বলে মনে হল। মতীন্দ্ররা আমাকে অতিক্রম করে চলে যেতেই আমি ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়ালাম। এবার চিন্তা হল কোথায় যাই? মনে ভয়ের সঞ্চারও হল। ক্রোধের বশে সহসা দল থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া উচিত হয়নি। আমার এই ক্রোধ অবরুদ্ধ অহং চেতনারই প্রকাশ। আমি বাবাকে স্মরণ ও প্রণাম করে 'রেবা রেবা' জপ করতে করতে একটা চড়াই-এর পথে উঠতে লাগলাম। এইমাত্র মতীন্দ্রের কণ্ঠে শুনলাম বেলা তিনটা বেজেছে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে মনে হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে এল বুঝি। বড় বড় গাছের তলায় ছায়া ছায়া অন্ধকার। দ্রুত পা চালিয়ে একটা উঁচু জায়গায় উঠে নিচের দিকে তাকাতে লাগলাম। সকাল থেকে হেঁটে আসছি, একটা মানুষের মুখ চোখে পড়েনি। কাজেই এই শূলপাণির জঙ্গলে এ সময় কোন লোক চোখে পড়বে—এ আশা আমি করি না। তবুও একটা কোথাও যেন মাদল বাজছে, তার শব্দ শুনতে পেলাম। সেই শব্দ অনুসরণ করে আমি নামতে লাগলাম নিচে। পাহাড়ের ঢাল ধরে যেতে যেতে প্রায় আধ মাইলটাক যাবার পর কতকগুলো কুটীর চোখে পড়ল। হয়ত ঐসব কুটীর ভীলদের, হোদের, ওয়াঙ্কি বা অন্য কোন আদিবাসী বুনোদের হতে পারে। আমার আর বিচার করার সময় নাই। আজ রাতটুকুর জন্য ওদেরই কাছে আশ্রয় নিতে হবে। এদিকে দেখছি, শাল, তেণ্ডু এবং খয়ের গাছই বেশী। ঝড়্‌ঝড়্‌ শব্দে গোটা তিনেক বুনো শিয়াল দৌড়ে গেল, একটা খরগোসকে তাড়া করে। পাহাড়ী খরগোস যে এত বড় হয়, আমার কোন ধারণা ছিল না। আমি ধীরে ধীরে সেই কুঁড়ে ঘরগুলোর কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, বড় জোর খান চল্লিশেক কুটীর হবে, গোটা পল্লীটা ঘিরে আছে বড় বড় শালবল্লী এবং আবলুব কাঠের বেড়া দিয়ে, খুব উঁচু বাউণ্ডারী ওয়ালের মত দেখাচ্ছে। মাদলের বাজনার সঙ্গে হাসির হর্‌রাও শোনা যাচ্ছে। আমি এই কাঠের পাঁচিল-ঘেরা-পল্লীর প্রধান ফাটক কোন্‌টা তা স্থির করতে পারলাম না। আমি পাঁচিলের গায়ে লাঠি দিয়ে ঠক্ টক্ করে শব্দ করতে লাগলাম। একটু পরে পাঁচিলের উপর দিয়ে তিনজন লোকের

মুখ দেখা গেল, তাদের হাতে বর্শা, কাঁধে তীর ধনুক, তারা অতি সচকিত-ভাবে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে প্রধান ফাটক খুলে দিল। আমি অনুমান করলাম, ভালুক চিতাবাঘও এসে পাঁচিলের গায়ে আঁচড়াতে পারে, থাবা দিয়ে কাঠের পাঁচিলে ঠোক্কর মারতে পারে, তাই এই সাবধানতা! আমি দরজা দিয়ে ঢোকামাত্র প্রধান ফাটক মজবুত করে আটকে দেওয়া হল। আমি যেন এক বিচিত্র জীব এসে পৌঁছেছি! মেয়ে পুরুষরা সব ভীড় করে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের মধ্যে ঠারে-ঠোরে অনেক কথা হচ্ছে, বুঝতে পারছি আমাকে নিয়েই, কিন্তু তারাও আমার কথা বোঝে না, আমিও তাদের ভাষা বুঝছি না। মেয়ে পুরুষদের কুচ্‌কুচে কালো রং, দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ শরীর। প্রায় অর্ধনগ্ন সবাই। মেয়েরা মোটা ছিন্ন-বস্ত্রের 'ট্যানা' দিয়ে কোনমতে আব্রু রক্ষা করছে। কারও কারও পরণে নূতন মোটা লাল গামছা। আমাদের দেশে বাঁকুড়াতে যে মোটা গামছা পাওয়া যায়, তাদের গামছাগুলো কতকটা সেই রকম, টানা ঠাস-বুনুনী। কুঁড়ে ঘর হলে কি হবে, কুঁড়ের দেওয়াল এবং মেঝে সব পরিষ্কারভাবে নিকানো তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। যে উঠানের উপর দাঁড়িয়েছি, সেটাও পরিষ্কার। উঠানের একদিকে অনেক-গুলো টাঙ্গি এবং বর্শা পড়ে আছে। তিন চারজন ডেকে উঠল—বুধন! বুধন! লছু!

দুজন ভীল যুবককে দেখলাম, আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। একজন বৃদ্ধ তাদেরকে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলতেই তারা ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কোনমতে উচ্চারণ করল -কৌন? তাদের কথার ধরণে বুঝলাম, তারাও হিন্দী ভাল জানে না, অনেক কথাই হয়ত জিজ্ঞাসা করতে চায় কিন্তু হিন্দী ভাষা ভাল ভাবে রপ্ত নয় বলে তাদের মুখ দিয়ে একটি মাত্র শব্দ বেরুল—'কৌন'। আমিও ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে, ইসারায় ইঙ্গিতে বুঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমি পরিক্রমাকারী। দল ছুট হয়ে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে এসে পৌঁছেছি। রাতটা এখানেই থাকতে চাই। বার কয়েক নর্মদা নর্মদা, রেবা রেবা উচ্চারণ করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আঙুল ঘুরালাম, একটা গাছের গুঁড়ি থেকে লাঠি দিয়ে রেখা টেনে বললাম 'নর্মদা নর্মদা', তারপর সেই রেখা ধরে কয়েক পাপড়ি এগিয়ে গিয়ে বললাম—'পরকরমা, পরকরমা।' যাইহোক, তারা আমার কথা বুঝল বলে মনে

হল। আমাকে সেই বৃদ্ধ ও যুবক দুটি পথ দেখিয়ে দুটো কুঁড়ে ঘরের মাঝখান দিয়ে একটা পরিষ্কার উঠানে নিয়ে গিয়ে বসতে দিল। প্রশস্ত উঠান, তাকে ঘিরে আছে সারি সারি কুঁড়ে ঘর গোলাকারে। কুঁড়ে ঘরগুলির গা ঘেঁসে তাদের সেই কাঠের বৃহদাকার বেড়া বা পাঁচিল। তার পেছনেই জঙ্গল। বুধন ও লছু দুজনে ধরাধরি করে একটা খাটিয়া এনে একটা কুটীরের দাওয়ায় পেতে দিয়ে ইঙ্গিত করল সেখানেই শুতে হবে। খাটিয়াটাও বিচিত্র। বাংলাদেশে বা সমগ্র হিন্দীভাষী অঞ্চলে যেমন জুন দড়ি দিয়ে খাটিয়া প্রস্তুত হয়, এ খাটিয়া সেরকম নয়, বট গাছের যেমন অজস্র ঝুরি নামে, সেইরকম সরু সরু লম্বা লম্বা লতাতে এই খাটিয়া বোনা হয়েছে। একজন বুড়ি মা এসে এক হাঁড়ি গরম জল আমার সামনে রেখে জোর করে পা ধুইয়ে দিতে লাগলেন রগড়ে রগড়ে। বারবার হাঁড়িটা টেনে নিবার চেষ্টা করলাম, বারণ করলাম পায়ে হাত দিতে কিন্তু কে শোনে কার কথা। জলটার রং দেখছি ঘন সবুজ। লছুর দিকে তাকাতে সে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে যা বলল, তাতে বুঝে নিলাম, আমার ক্ষত বিক্ষত পা দেখে জলের সঙ্গে কোন লতাপাতা মিশিয়ে গরম করা হয়েছে, লছু মাত্র দুটি শব্দ উচ্চারণ করল—'দরদ', 'আরাম।' ঈষদুষ্ণ গরম জলে পা ধুতে সত্যই খুব আরাম বোধ করলাম। সেই বৃদ্ধ দুটি ভুট্টা পুড়িয়ে এনে আমার সামনে রাখল। আমি আকার ইঙ্গিতে কোনমতে বুঝালাম যে, একবার মাত্র খাওয়া আমাদের নিয়ম তা খাওয়া হয়ে গেছে। লছুকে একটি আঙুল দেখিয়ে এবং পেট চাপড়িয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে একদফে খানা খা লিয়া, ঔর নেহি। দরিদ্রের স্বল্প আয়োজন, কিন্তু তাতে আন্তরিকতার উত্তাপ অপরিমেয়। মনকে সহজেই নাড়া দেয়, অভিভূত করে। দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে আসছে, তার মানে সন্ধ্যা হতে বেশী দেরী নাই। তখনও অল্প স্বল্প আলোর আভাস আছে। বৃদ্ধ ভীল হাসিমুখে আমাকে বলছে পোগা পোমা গাঢ়া আর হাতের ইঙ্গিতে তার সঙ্গে যেন কোথাও যেতে বলছে। লছুও দুটি হাত অঞ্জলি বদ্ধ করে তার নিজের মুখের কাছে ঠেকাচ্ছে এবং বৃদ্ধের সঙ্গে কোথাও যেতে বলছে। আমি উঠে বৃদ্ধের পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম। যে পথে এই উঠানে পৌঁছেছিলাম, সেই পথে বেরিয়ে গিয়ে দেখলাম আবার এইরকম এক ঝাঁক কুঁড়ে ঘর, গোলাকারে

ঘিরে আছে। নিশ্চয়ই সেগুলির মাঝখানেও প্রশস্ত প্রাঙ্গন আছে। সমস্ত জুড়ে ঘরের সারিগুলি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। আমি পশ্চিম দিকের ফাটক দিয়ে এদের পল্লীর মধ্যে ঢুকে ছিলাম, বুড়ো আমাকে পূর্ব দিকের ফাটকের কাছে নিয়ে গেল। ফাটক খুলতেই দেখতে পেলাম একটা পাহাড়ী নালা কুল্‌কুল্ করে বয়ে চলেছে। এতক্ষণে 'পোগা পোমা গাড়ার' অর্থ বুঝলাম, বুঝতে পারলাম লছুর মুখের কাছে বারবার অঞ্জলিপুটে স্পর্শ করার ইঙ্গিত। পরিষ্কার স্বচ্ছ জল। আমি অঞ্জলিপুটেই পেট পুরে জল খেলাম। আমার কমণ্ডলুতে নর্মদার জল আছে। কিন্তু তা খরচ করা চলবে না, যতক্ষণ নর্মদা থেকে দূরে আছি, ততক্ষণ ঐ জলকে মাঝে মাঝেই দর্শন করতে হবে। পরিক্রমার সেই ত নিয়ম! বুড়োর সঙ্গে আবার সেই পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এসে খাটিয়ার উপর কম্বল পেতে কমণ্ডলুর জল দর্শন করে শুয়ে পড়লাম। লছু হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলতে লাগল—মেহমান্, মেহমান্। তার দেখাদেখি বুধনও হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলতে লাগল—মেহমান্, মেহমান্। আমি শুয়ে রইলাম, অন্ধকারের মধ্যে তারা চলে গেল। কুটীর-গুলোর মধ্যে কেউ আছে বলে মনে হল না। সবাই বাইরের উঠানে জড়ো হয়ে নাচছে বলে মনে হল। ধীরে ধীরে মাদলও বেজে চলেছে। কী সুন্দর সরল অনাড়ম্বর বন্য জীবন! আমার পায়ের ক্ষতগুলো টাটিয়ে উঠেছে, সারা শরীরে ব্যথা। মোহান্তজীর কাছ হতে দৌড়ে পার্বত্যপথে পাথরের চাঙড়ে ঠোক্কর খেতে খেতে আসার ফল! আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছি—লছুর মুখে কী সুন্দর কথাটি 'মেহমান্'। সে কারও কাছে হয়ত এই উর্দু শব্দটি শিখেছে। হিন্দুস্থানীরাও এই শব্দ আকছার ব্যবহার করে থাকেন। মেহমান শব্দের অর্থ পরদেশী আত্মীয়। অতিথিকেও আত্মীয়স্থানে সমাদর করা হয়। 'অতিথি' শব্দ মনে আসতেই মোহান্তজীর ওঘবতীর গল্প মনে পড়ে গেল। ঘৃণায় মন ভরে গেল। 'অতিথিকে নিয়ে সহাস্যে পাশের ঘরে ঢুকে গেল' কামোন্মত্তা নির্লজ্জা! কামিনীর মুখের ভাষাগুলি হল— তথেতি' অর্থাৎ তাই হোক। 'ততো বিহস্য', তারপর 'সহাস্যে'—জঘন্য! মহর্ষি বেদব্যাসের কলম হতে ঐ রকম পাপকথা কখনও লেখা হতে পারে না, নিশ্চয়ই কোন পুরাণকার বা তথাকথিত পণ্ডিত নিজের যৌনবিকার হতে এই রকম খোস্ গল্প রচনা করে প্রক্ষিপ্ত করে দিয়েছে মহাভারতের মধ্যে।

আমি জপে মন দিলাম। বসে বসে সন্ধ্যাক্রিয়া সারবার জন্য উঠে বসলাম, কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারলাম না। আবার শুয়ে পড়ে জপ করতে লাগলাম। জপ শেষ করে ঘুমাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সর্বাঙ্গে যন্ত্রণার জন্য ঘুমাতে পারলাম না। বাইরে তখন নৃত্যের তালে তালে ভীল নারী-পুরুষের দ্বৈত সংগীতের মহলা চলেছে! তারসঙ্গে প্রাণখোলা হাসির লহর।

আমি ভাবছি, অথচ এই ভীলদের সম্বন্ধে কত বিকৃত তথ্যই না শুনে এসেছি! এরা নাকি লুটেরা, নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর। অভাবের তাড়নায়, নিরন্ন অভুক্ত স্ত্রী পুত্রের মুখে খাদ্য যোগাবার জন্য হয়ত কখনও কখনও ভীলরা দল বেঁধে লুটপাট করে বাধা পেলে আঘাত হানে কিন্তু সেইটাই ভীলদের একমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। কোন্ জাতের মধ্যে চোর ডাকু বা লুটেরা নাই? এ পর্যন্ত আমি যত ভীলের সাক্ষাৎ পেয়েছি তাদেরকে ত আমার তত নিষ্ঠুর বা ভয়ংকর বলে মনে হয় নি। বড়বানী পেরিয়ে আসার সময় যে ভীলরা আমাদের কাছে এসেছিল, তারা মুখে মুক্ মুক্ করেছিল অর্থাৎ 'রাখ রাখ' বলছিল। মোহান্তজী কিছু বাজরার আটা এবং কয়েকটা সুঁচ দিতেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছল, কারও অঙ্গস্পর্শ করেনি! এইসব এলোমেলো চিন্তা করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন সকাল হয়ে গেছে। উঠানে এবং প্রত্যেকটি কুটীরের দাওয়ায়, কুটীরের মধ্যেও নারী-পুরুষ ঘুমে অচৈতন্য। কত রাত্রে যে তারা ঘুমাতে এসেছিল, আমার তা জানা নাই। আমি প্রাতঃকৃত্য সেরে ফেলার জন্য গামছা নিয়ে তাদের সেই পূর্বদিকের পাঁচিলের ফাটক দিয়ে 'পোগা পোমা গাঢ়ার' ধারে গিয়ে পৌঁছালাম। পাহাড় থেকে বনের ঢল এদিকে নেমে এসেছে বটে তবে গাছপালা তত ঘন নয়। সূর্যোদয় এখনও হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম আমার শরীরের অবস্থা দেখে। শরীরে ব্যথা যন্ত্রণা কিছু নাই। মনে হচ্ছে পায়ের ক্ষত এবং সর্বাঙ্গে যে যন্ত্রণা কাল ভোগ করেছিলাম সে যেন অন্য কোন শরীরে হয়েছিল! গরম জলের সঙ্গে কি লতাপাতা যে মিশিয়ে দিয়েছিল, তার অত্যাশ্চর্য গুণ দেখে আমি অবাক হলাম। হায়, এইসব লতাপাতার গুণ এবং ক্রিয়া পাহাড়ী জংলীদেরই জানা রইল, কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যাবে, রসায়ন ও ভেষজ তত্ত্ববিদ্ গবেষক পণ্ডিতদের হাতে এই বিদ্যা পড়লে কি ভালই না হত!

আমি অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম সেই নালার স্বচ্ছ জলে। সূর্যোদয় হচ্ছে; বেশ কিছুটা দূরে দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা ঝর্ণা বয়ে আসছে। ঝর্ণার জলে প্রভাত-সূর্যের উদয় রশ্মি পড়ায় মনে হচ্ছে শ্বেতজ্যোতির লহর খেলছে। সেই ঝর্ণার জলেই সৃষ্টি হয়েছে পোগা পোমা গাঢ়া। সূর্যার্ঘ্য তর্পনাদি সেরে যখন ফিরে আসছি, তখন দেখলাম কয়েকজন মেয়ে পুরুষ একটা শালগাছের তলায় একটা ঢিপি এবং একটা পাথরকে নানারকম বুনোফুল দিয়ে সাজাচ্ছে। পাথরটা দেখতে মোটা একটা শিবলিঙ্গের মত। সিঁদুর লেপ্‌টে লেপ্‌টে তার এমন অবস্থা যে সেটি প্রকৃত শিবলিঙ্গ কিনা তা চেনার উপায় নাই। ঢিবিটাও অদ্ভুত ধরণের, দূর থেকে যেটাকে একটা ঢিবি বলে মনে হয়েছিল, কাছে গিয়ে দেখলাম তার সংখ্যা সাতটি। ঢিবিগুলির নিচে গর্ত। আমি বেশীক্ষণ দাঁড়ালাম না। দুটি কুঁড়ের মাঝখান দিয়ে আমার থাকবার স্থানে খাটিয়ার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এখন সেখানে কেউ শুয়ে নাই। যে যার কাজে ব্যস্ত। ভিজে গামছা রোদে মিলে দিয়ে খাটিয়ায় বসেছি, মনে মনে সংকল্প আঁটছি, দেখি একবার লছুকে বলে যদি জঙ্গলের পথে কতকটা এগিয়ে দেয়, তাহলে এখনই এদের কাছে বিদায় নিয়ে হাতানোরা কুব্জাসংগমের দিকে যাত্রা করব। যদি সেখানে নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ভাল নতুবা নর্মদার কিনারে একবার পৌঁছাতে পারলে একা একাই পরিক্রমা করব। এইসব ভাবছি আর গাঁঠরী বাঁধছি, এমনসময় লছু ও বুধন দুজনেই আমার কাছে এসে পৌঁছালো। তাদেরকে আমার মনের সংকল্প অনেক কষ্টে বুঝিয়ে দিতেই তারা একসঙ্গে হাতনেড়ে প্রবল আপত্তি জানাল। যাঁর বাড়ীতে আছি, সেই বুড়ো ভীলকে লছু আমার মনের সংকল্প জানাতেই সেও দৌড়ে এসে আপত্তি জানাল। লছু বারবার বলতে লাগল, দাহাঁ. দাহাঁ, জটিয়া, জটিয়া মাঙ্গরা। তার ভাঙা ভাঙা সংক্ষিপ্ত হিন্দী বাক্যে বুঝলাম যে, সে যে শব্দগুলি উচ্চারণ করল সেগুলো তাদের এক একটি দেবতার নাম। আজ তাদের দেবতার পূজা হবে। উৎসবের দিন। কাজেই আজ আমাকে তারা কিছুতেই যেতে দিবে না। পরিবর্তে তারা তখনই আমাকে বাইরে তাদের পূজার জায়গায় নিয়ে যেতে চাইল। আমি কমণ্ডলুতে নর্মদা দর্শন করে তাদের সঙ্গে বাইরে এলাম। সমস্ত প্রাঙ্গণ

মেয়ে পুরুষ বালক বালিকাতে ভরে গেছে। একজন লোককে দেখলাম মাথায় একটিমাত্র জটা, গলায় নানারকম পুঁতির মালা দুহাতে হাড়ের মালা মত্ত অবস্থাতে নিজের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা কাটছে। শুনলাম সেই নাকি পুরোহিত। তাদের প্রত্যেক দেবতার কাছে কিছু ফলমূল, বাজরার রুটি, তিলের নাড়ুর মত কতকগুলো লাড্ডু, নৈবেদ্য হিসাবে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেক দেবতার কাছেই তিনটে করে কালো পাঁঠা, তিনটে করে ভেড়া এবং তিনটে করে মুরগী বাঁধা আছে। একটা মহিষও বাঁধা আছে দেখলাম। বুঝলাম এই নিরীহ প্রাণীগুলোর আজ প্রাণ যাবে!

লছু আমাকে প্রথমেই নিয়ে গেল শালগাছের গোড়ায় সিন্দূর লিপ্ত সেই শিবলিঙ্গের কাছে। লছু পরিচয় দিল—জটিয়া, ভূতপ্রেতদের রাজা। লছুর কথায় বুঝা গেল, এই দেবতা তাদেরকে ডাকিনী ও ডাইনীদের হাত থেকে রক্ষা করে। মনে মনে ভাবলাম যে রূপেই হোক ভীলদের মধ্যে শিবই এইরূপে পূজা নিচ্ছেন। কারণ শিব জটাধারীও বটেন! সেই পুরোহিত প্রথমেই এই দেবতারই পূজা করতে বসলেন। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নানারকম দুর্বোধ্য মন্ত্রে ফুল ও সিন্দূর দিয়ে পূজা করে পুরোহিত একটা মুরগীর মুণ্ড ছিঁড়ে রক্ত ছিটাতে লাগল জটিয়ার উপর। পূজা আরম্ভ হতেই মাদল বাজতে লাগল, মেয়ে পুরুষরা নেচে নেচে ভীলদের ভাষায় গান সুরু করল।

লছু এবার আমাকে নিয়ে গেল তাদের দ্বিতীয় দেবস্থানে অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাতটি ছোট ছোট টিবির কাছে। নাম বলল দার্হা'। টিবির নিচে যে গর্ত তাতে ছোট ছোট শুকনো কাঠের টুকরো ভরা আছে। সেই পুরোহিত টলতে টলতে সেখানে এসে প্রত্যেকটি টিবির নিচে আগুন জ্বালল। এই দেবতার কালো ফুল ছাড়া পূজা হয় না। পুরোহিতকে দেখলাম টিবির উপর কালো ফুল ছড়িয়ে দিয়ে আগুনের মধ্যে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে ঘি এবং ধূনা ছড়িয়ে দিতে। পুরোহিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইভাবে পূজা এবং হোম সারল। দার্হাকে নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পূজা করতে হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা মুরগীর মুণ্ড ছিঁড়ে তার রক্ত টিবির উপর কিছুটা ছড়িয়ে দিয়ে টিবিকে বেষ্টন করেও রক্ত ছড়ানো হল। লছু ব্যাখ্যা করল, এইভাবে ভূতিনী প্রেতিনী ও ডাকিনীকে 'আটকাবন্ধনী'

দেওয়া হল। আগামী একবছর তারা আর তাদের উপর কোনমতেই 'ভর' করতে পারবে না।

দার্হার পূজা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত সেই ঢিবিগুলোর কাছ হতেই গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে পৌঁছাল তাদের তৃতীয় দেবতার কাছে। দেখলাম একটা লাঙলের মুড়া পোঁতা আছে। তাতে সিঁদুর মাখানো আছে, লাঙলের মুড়ায় ফুলের মালা ঝুলছে। লছু জানাল এই দেবতার নাম—যাঙরা। শুয়ে শুয়েই পুরোহিত এক ভাঁড় মদ হাত বাড়িয়ে লাঙলের মুড়ায় ঢেলে দিল। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে পুরোহিত উর্দ্ধবাহু হয়ে আকাশের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি সব মন্ত্র পড়তে লাগল। মাদলের বাজনার সঙ্গে নারী-পুরুষের নাচ যেন আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। আমি ইঙ্গিতে জল খাবার অজুহাতে ঘরের উঠানে খাটিয়াতে গিয়ে বসলাম। খাটিয়াতে বসে বসে পাঁঠা এবং ভেঁড়ার আর্তনাদ শুনতে পেলাম। বুঝলাম, সেগুলোর বলিদান পর্ব শেষ হল। বেলা প্রায় একটার সময় তাদের পূজা শেষ হল। পূজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভুটো ভুট্টা পুড়িয়ে সেই বৃদ্ধ ভীল আমার কাছে নিয়ে এল। তার সঙ্গে ভুটো মেটে আলুর মত ফল। আমাকে ইসারা করে জানাল যে ছাল ছাড়িয়ে খেতে হবে। শাঁকালুর মত ছাল ছাড়িয়েই আমি খেলাম। খেতে শাঁকালুর মতই মিষ্টি। ভুট্টা ভুটোও বসে বসে চিবালাম। পূজা শেষ হয়ে গেছে, কাজেই দলে দলে মেয়ে পুরুষ যে যার ঘরে ফিরতে লাগল। সবাই ফিরল টলতে টলতে। প্রত্যেকেই আকণ্ঠ মদ ও হেঁড়িয়া গিলেছে। অনেকেই পূজার স্থান হতে ফিরতে পারেনি। সেখানেই নেশার ঘোরে গড়াচ্ছে।

আমি খাটিয়াতে চোখ বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে সারা বিকেলটা কাটিয়ে দিলাম। বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় উঠে বাইরে বেরিয়ে সেই পোগা পোমা গাঢ়ার দিকে হাঁটতে লাগলাম। তিন চারজন বুড়ী বাইরের উঠানটা পরিষ্কার করছে। জল দিয়ে মুরগী, পাঁঠা ও ভেড়ার রক্ত পরিষ্কার করছে। একের পর এক কুঁড়ে ঘরগুলি পেরিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, অধিকাংশ মেয়ে পুরুষ যে যার কুঁড়ের মধ্যে থাকলেও এখনও প্রায় পাঁচজন পুরুষ হেঁড়িয়ার নেশায় ন্যাংটো হয়ে পড়ে আছে। তারমধ্যে সেই পুরোহিত মশাইও আছেন। আমি নালায় নেমে ঝর্ণার জল পেট পুরে খেয়ে বসে

থাকলাম। প্রায় ঘন্টাখানিক বসে থাকার পর দেখলাম পশ্চিম দিগন্তে সূর্যদেব ঝুঁকে পড়েছেন, তার মানে সন্ধ্যা হতে আর দেরী নাই। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম রশ্মি পাহাড় ও বনের বড় বড় গাছের চূড়ায় পড়ায় সমগ্র জঙ্গলের পরিবেশ অপরূপ মায়াময় হয়ে উঠেছে। আমি সেখানে বসেই সন্ধ্যাহ্নিকে মন দিলাম। যখন তা শেষ হল, তখন চোখ খুলে দেখি, চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেছে। আমার মনে ভয় দেখা দিল, যতই হোক, আমি এদের পাঁচিলের বাইরে আছি, চিতাবাঘ, নেকড়ে প্রভৃতি সন্ধ্যা নেমেছে দেখে এই নালায় জল খেতে আসতে পারে। আমরা সভ্য জগতের অধিবাসী, অন্ধকারময় বনানীর দৃশ্যও আমাদের কাছে গম্ভীর ও সুন্দর বটে, কিন্তু এ অনুভূতিও জাগিয়ে দেয় যে এ স্থান আমাদের পক্ষে বিদেশ। এখানে লছু বুধন প্রভৃতি বা তাদের বাড়ীর মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে ভ্রমণ করতে পারে, বন্য কার্পাস হতে মোটা কাপড় গামছা বুনতে পারে, এরা গভীর বন থেকে কন্দমূল আহরণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে, এরা কর, জতা, মহুয়া প্রভৃতি গাছের বীজ সংগ্রহ করতে পারে। মোটা চালের ভাত রেঁধে তাকে রোদে শুকিয়ে তাতে বাখর প্রভৃতি গাছড়া মিশিয়ে হেঁড়িয়া তৈরী করে, তাই খেয়ে বিশ্বভুবনের সব দুঃখ মুহূর্তে ভুলে যেতে পারে। একখানা কুড়ুল বা টাঙ্গি হাতে থাকলে এদের মেয়েরাও বাঘ, ভালুকের সঙ্গে মরণ-পণ লড়াই করতে পারে, কিন্তু আমাদের মত লোকেদের যাদের শরীরে সভ্যতা নামক রোগ-জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তাদের পক্ষে এ স্থান অন্ততঃ এই সন্ধ্যাকাল নিশ্চয়ই ভয়াবহ। আমি উঠে পড়লাম। ফাটক দিয়ে ঢুকতে যাবো, এমন সময় কারও পায়ের শব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম। 'লছু লছু হো' এই বলে লছু আমাকে সাড়া দিল। তার ভাঙা ভাঙা খাপছাড়া হিন্দী ভাষা শুনে বুঝলাম যে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে অথচ ফাটক খোলা আছে দেখে সে ফাটক বন্ধ করতে আসে এবং আমাকে দেখতে পায়। আমি চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসে আছি দেখে সে বুঝে নিয়েছে আমি নিশ্চয় জটিয়া বা মাঙ্গরা দেবতার পূজা করছি। সে এর আগে বনে বা পাহাড়ের গুহায় এইরকম অনেক সাধুকে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে দেখেছে কিনা! আর আমি যে জটিয়া বা মাঙ্গরারই পূজা করছি, তার এ ধারণার কারণ, জটিয়া বা মাঙ্গরা ছাড়া আর কোনও ত দেবতা নাই! ভূতে ধরলে ভবে ত লোকে

'দাহাকে' ডাকে! আমি তার কথার কোন জবাব দিলাম না। সে ফাটক বন্ধ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলল সেই বুড়ো ভীলের আস্তানায়। প্রত্যেকটি ঝুঁড়ের মধ্যে ছেলে, মেয়ে, নারী, পুরুষরা আনন্দে কলধ্বনি করছে। তাদের এই আনন্দ কলরবের কারণ লছু জানাল, দুপুরে যে পাঁঠা, ভেড়া, মহিষ, মুরগী প্রভৃতির বলি হয়েছিল সবাই সেই মাংসের ভাগ পেয়েছে।

খাটিয়ার কাছে এসে দেখি ভাঁড়ের মধ্যে করঞ্জার তেলে তুলো ডুবিয়ে একটা বাতি জ্বালা হয়েছে। বুধন সেখানে বসে আছে। একটু পরেই দেখলাম, কয়েকজন মেয়ে পুরুষের সঙ্গে বুড়ো ভীল আসছে টলতে টলতে। লছু ও বুধন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—বাঢ় সর্দার। দুপুরের নেশার ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বুড়ো এসেই আমার খাটিয়ার কাছে এসে মাথা ঠুকতে লাগল। সকলেরই মুখ থেকে হেঁড়িয়ার বিদ্‌ঘুটে বট্‌কা গন্ধ ভেসে আসছে। লছু তাকে ধরে আমার কাছ হতে দূরে বসিয়ে দিল। লছু তার সংক্ষিপ্ত ভাঙা ভাঙা দু-চারটি শব্দে যা বলল, তার মর্ম এই বুঝলাম যে, আমি পরদেশী মেহমান এখানে রয়েছি অথচ তারা 'নিশা' (নেশা) করেছে বলে এই ভীল পল্লীর সবাই তোর 'ছুমা' মাগছে। 'ছুমা' শব্দটা জড়িয়ে জড়িয়ে এমনভাবে উচ্চারণ করল যে আমি শুনলাম 'চুমা'! আমি ঘাবড়ে গেলাম, বেটা বলে কি? এতগুলি মেয়ে পুরুষকে চুমা দিতে হলে ত আমি গেছি আর কি? তারচেয়ে এদের যেসব নিষ্ঠুর আচরণের গল্প শুনে এসেছি, এরা যদি আজ আমার সঙ্গে সেইরকম মারপিট করে, আমার সবকিছু কেড়ে নিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে এই রাতে ফাটক খুলে দূর করে দেয়, তাও বরং সইতে পারব। আমি বিপন্ন মুখে লছু বুধনের দিকে তাকাতেই তারা দুজনে মিলে 'ছুমা' 'ছুমা' বলতে বলতে 'ছমা' শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল। আমি বুঝতে পারলাম বাঢ় সর্দার সকলের হয়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি নানারকম আকার ইঙ্গিত করে বললাম—কোঈ বাত নেহি, কোঈ বাত নেহি। অর্থাৎ পূজা এবং উৎসবের দিনে একটু-আধটু 'নিশা' করলে কোন দোষ হয় না। লছু আমার ভাব ও ভাষা ভীল ভাষায় বুঝিয়ে দিতেই বুড়ো এবং আর সকলেই আনন্দে নাচতে আরম্ভ করে দিল এবং যথারীতি নেশার টাল সামলাতে না পেরে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে পপাত ধরণীতলে।

একটু পরেই সবাই আবার ধীরে ধীরে ধাতস্থ হয়ে উঠে বসল। সুযোগ বুঝে আমি বাচ় সর্দারকে বললাম - সবেরে হাতনোরা যাত্রা করেছে। কেউ আমার সঙ্গে গিয়ে পথ কতটা এগিয়ে দিয়ে এলে ভাল হয়। লছু আমার বক্তব্য ভীল্ ভাষায় বুড়োকে বুঝিয়ে দিলেও বুড়ো কোন জবাব দিল না, চুপ করে বসে রইল। তার কপালে গভীর কুঞ্চনরেখা ফুটে উঠেছে দেখে ভাবলাম, আমি এমন কি গভীর চিন্তার কথা বললাম! আমার মনে পড়ল আমাদের গাঁয়ে সাঁওতাল পল্লীর একটি ঘটনা। আমার জন্মস্থান কালিয়াড়া গ্রামের কাছেই একটি সাঁওতাল পল্লী আছে। গ্রামটির নাম দক্ষিণ ঢেকিয়া। ছোটবেলা রোজ বিকালে সেখানে আমরা ফুটবল ও হাডুডু খেলতে যেতাম। সেখানে মাঠ ভাল, কালিয়াড়া, মুনিবগড় ও দক্ষিণ ঢেকিয়ার কয়েকটি সাঁওতাল ছেলে যারা সবাই আমাদের সহপাঠী, সবাই মিলে আমরা সেই মাঠে খেলতাম। দক্ষিণ ঢেকিয়ার চামটু সর্দারের ছেলে পাঁচুর সঙ্গে ভৈরবপুরের টুডন সাঁওতালের মেয়ের বিয়ে হবে। তার পাকা দেখা এবং পাকা কথাবার্তা বলতে এসেছে টুডন। চামটু সর্দারের বাড়ীর উঠানে সাঁওতাল পল্লীর মাতব্বররা গোল হয়ে বসে হেঁড়িয়া খেতে খেতে কথাবার্তা চলছে। পাত্রের বাবা হিসাবে চামটু বলছে মেয়ের বাপ টুডনকে—

বেহাই, মোকে দশটা মোরগ দিতে হবেক ব।

টুডন—হাঁ দিবেক বটে।

চামটু—বেহাই, দুটা হেলা গরু (লাঙল করতে পারে এমন দামড়া গরু) দিবিক।

টুডন—হাঁ দিবেক বটে।

চামটু—আমার পাঁচুকে তুই একটা সোনার আংটি আর তোর মেয়ের গলায় চাঁদির হাঁসুলী আর তোড়া দিতে হবেক। এক চুমুক হেঁড়িয়া গিলে নিয়ে গিয়ে টুডন উত্তর দিল—হাঁ দিবেক বটে।

চামটু—বেহাই রে বেহাই, তুই আমার একটা মাত্র পেয়ারের বেহাই, তুই আমাকে দশ-কুড়ি টাকা আর দুটা পাঁঠি দিবিক।

টুডন—হাঁ দিবেক বটে। তবে তোকেও একটা বাত রাখতে হবেক।

যে সমস্ত সাঁওতাল মাতব্বররা সেখানে হেঁড়িয়া খেতে খেতে উভয় বেয়াই-এর কথাবার্তা শুনছিল, তারা এবার একসঙ্গে বলে উঠল—ভাতো

চামটুকে শুনতেই হবেক। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, তুই একটা জিনিষ মাংগছিস্ বটেক। গাঁয়ে বিচার আছে না? পঞ্চায়েৎ আছে না? তুই টুডন বলেই ফেল্। চামটুকে তোর একটা কথা রাখতেই হবেক।

তখন টুডন বলে উঠল—হাঁ আমার একটা কথা। বেহাই, আমি কিছু দিতে লারব বটে!

বাঢ় সর্দারকে নীরব দেখে আমি ঐ ঘটনার কথা ভাবতে লাগলাম। কি জানি, এইসব বুনো লোকদের মতিগতির স্থিরতা নাই. যদি হঠাৎ বলে বসে কাল সকালেও যেতে দিতে 'লারব', তাহলে ত বড় মুশকিলে পড়ব। একে ত তিনদিন হয়ে গেল মা নর্মদার ধারা চোখে দেখতে পাচ্ছি না, নর্মদা কিনার থেকে অনেক দূর এসে পড়েছি, আবার যদি আটকে যাই, তাহলে আমার পক্ষে তা দুঃসহ হবে। কিন্তু আমার এ চিন্তা যে অমূলক, একটু পরেই তা বুঝতে পারলাম। বাঢ় সর্দার আগামীকাল সকালে রোদ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করবার সম্মতিই শুধু দিল না, সঙ্গে হুকুম জারী করল, লছু এবং বুধন আমাকে কাণ্ডনোরা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। আমি হাসি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলাম এবং ধন্যবাদ জানালাম।

লছু ও বুধন বাঢ় সর্দার এবং অন্যান্য সবাইকে ধরে ধরে তাদের ঘরে পৌঁছাতে গেল। তাদের চলার পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম। আমাকে চমকে দিয়েছে এদের প্রাণোচ্ছল বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য। বিনা নুনে, বিনা তরকারীতে মোটা কবড়া চালের ভাত, বাজরার আটা, জঙ্গলের কন্দমূল, মেটে আলু এবং ভুট্টা চিবিয়ে কি করে যে এমন লৌহ দৃঢ় শরীর স্বাস্থ্য হয়, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অরণ্য ও পাহাড়ের রহস্য অরণ্যের গোপন অন্তরালেই প্রচ্ছন্ন থাকুক, আমি এখন খাটিয়াতে আশ্রয় নিই।

আমি শুয়ে পড়লাম। জপ করতে করতে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেই যেন দেখছি—যেন সকাল হয়ে গেছে, আকাশে অরুণোদয় হচ্ছে। সেই লালবর্ণের সূর্য ধীরে ধীরে দিকচক্রবাল থেকে নেমে এসে আমার চোখের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল। সে কি! সূর্যের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন মহাত্মা সোমানন্দজী! সেই ঝাঁপড়া ঝাঁপড়া চুল আর ছোট ছোট জটা দুলিয়ে তিনি আমার কাছ হতে প্রায় পাঁচ হাত উঁচুতে শূন্যে দাঁড়িয়ে বলছেন—বামুন ছ্যানা! হাঁরে বোকারাম কে তোকে বলল যে, তুই নর্মদার

কোল হতে দূরে আছিস্? হাঁরে হাঁ, তিনি এখানেও আছেন। আছেন ভাবলেই আছেন, নাই ভাবলেই নাই। মা আমার সর্বপরিব্যাপ্তা।

হাঁ কহো ত হৈয়ো, নাহি কহা না যায়।
হাঁ-নাহিকে বিচ্‌মে মায়ী রহা সমায়॥

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আবার স্ফুরিত হল তাঁর কণ্ঠস্বর:

* ভালবাসার ঘাটে কোন অপরাধ করতে নাই। নিঃস্বার্থ ভালবাসার ঋণ কেউ কখনও মাপতে পারে না, কেউ তা পরিশোধও করতে পারে না। বুড়ো নাগাটা তোকে ভালবাসে। সকালে উঠেই চলে যাবি হাতনোরা।

আবার তিনি নীরবে মাথা দোলাতে লাগলেন। আবার ভেসে এল তাঁর কলকণ্ঠের ধ্বনি:

* ওরে তোর মেজাজ দেখে হলাম ভেকা, এমন করে যায় না ত রে এ কূল রাখা। দুঃখের কথা বলব কি, হারিয়ে গেলে পাবিনে ঘি, দেখে শুনে হলাম বোকা॥

* আমার এ কথাটি মনে রাখবি, মাঝে মাঝে চেয়ে দেখবি, রস পাবি মধু পাবি—ভাঙা ঘরে পাঁচিল পড়ে, জল ঝরে যায় রোখা চোখা, তা দেখে বুড়ো কাঁদে, খুকী কাঁদে, চেঁচিয়ে উঠেন কচি খোকা।

* চেয়ে দেখ্, ওরে তুই চেয়ে দেখ সড়ক্ পানে। ফুটেছে সোনার কমল, চাঁদ চেয়ে সে নিরমল, ঝাপিয়ে পড়ে ধর্ না তারে, তখন আপনি আলোক ঐ বিমানে।

ধীরে ধীরে সেই সূর্যগোলক সর্ সর্ করে উঠে গেল আকাশের মধ্যস্থলে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘেমে নেয়ে গেছি একেবারে। উঠে বসলাম। বন্য মোরগ ডাকছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে আধফালি চাঁদ কোনমতে এখনও জেগে আছে। সকাল হতেই আমি প্রাতঃকৃত্য সারবার জন্য পাঁচিলের পূর্বদিকের ফাটক খুলে পোগা পোমা গাড়াতে গেলাম। ভীলপল্লী এখনও নিঝুম আছে বলে মনে হল; অধিকাংশ নারী-পুরুষ এখনও নিদ্রিত। উৎসবের জের হিসাবে গত রাত্রেও তারা অনেক রাত্রি পর্যন্ত মাদল বাজিয়ে নেচেছে এবং হেঁড়িয়া খেয়েছে। নতুবা এইরকম ধারা তাদের নিত্যকার অভ্যাস নয়। খুব ভোরে উঠে তারা পাহাড়ের ঢালে

পাথর কেটে জমি প্রস্তুত করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে এই অনুর্বর পাথুরে জমিতে তারা বাজরা, কালো মোটা ধান, তাদের ভাষায় 'জংলী জটা' এবং ভুট্টা ফলায়। আমি খাটিয়ার কাছে গিয়ে দেখি লছু এবং বুধন একেবারে যোদ্ধবেশে তীর-ধনুক ও বর্শা হাতে নিয়ে বসে আছে। পরণে নেংটি, দুজনেরই কোমরে তালপাতার বোনা চওড়া পেটি, তাতে পিছনদিকে কোমরের কাছে একটা লোহার আংঠা, তাতে দুজনের দুটো ছোট পুটলী ঝুলছে। অনুমানে বুঝলাম পথের খাবার। আমি বাঢ় সর্দারের কাছে বিদায় নিয়ে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, কিন্তু লছু ও বুধন তখনই যাত্রা করার জন্য উদগ্রীব। তার ভাঙা ভাঙা হিন্দী বুলিতে যা বুঝলাম, তার অর্থ হল—গত রাত্রেই ত বাঢ় সর্দার এবং আর সবাই 'বিদা' জানিয়েছে. আর দেখা করার দরকার কি? আমি আর কথা বাড়ালাম না। আমাকে মাঝখানে রেখে, তারা পূর্বদিকের ফাটক দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করল 'পোগা পোমা গাঢ়ার' পাশ দিয়ে। তখন সূর্যোদয় হয় নি।

মিনিট দশেক হাঁটার পর পূর্বদৃষ্ট সেই গোলাকৃতি, মোচাকৃতি, লিঙ্গাকৃতি ঘন বনে ঢাকা পাহাড়ের চূড়োগুলো চোখে পড়ল। আমার ভয় হল এই ভীল পল্লীতে সেদিন আসার সময় যেমন মসৃণ সুঁচলো রকের উপর দিয়ে হাঁটার ফলে পা কেটে রক্তাক্ত হয়েছিল, আজও প্রায় সেইরকম দশা হবে! কিন্তু তা হল না। তারা পাহাড়ের ঢাল দিয়ে অন্য একটা পথে হেঁটে রকের উপর এমন এক জায়গায় নিয়ে এসে পৌঁছল, যেখানটা দেখতে পাহাড়ের উপর একটা সমতলভূমি, টেবিলের মত। সেখান থেকে চারদিকে চেয়ে আমার মনে হল পৃথিবীতে বন ছাড়া বুঝি আর কিছু নাই! এই সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সূর্যোদয় হয়ে গেছে, রোদের সোনালী কিরণ পড়ে সমগ্র বনভূমি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মনে হল, সত্যিকার বনের অপরূপ সৌন্দর্য কেউ যদি দুচোখ ভরে দেখতে চায়, তাহলে তার এই রকম একটি স্থানে আসা ভাল।

সেখান থেকে লছু দেখাল একটু দূরেই পাহাড় থেকে দুদিকে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। একটি ধারা চলেছে তাদের পল্লীর দিকে, এই ধারাই তাদের গাঁয়ে গিয়ে পোগা পোমা গাঢ়ার সৃষ্টি করেছে, আর একটি ধারা বয়ে চলেছে উল্টো দিকে। লছু বলল—'কুন্ডা'। উৎরাই-এর পথে বেশ

কিছুটা জঙ্গল পথে নেমে যাওয়ার পর সেই কুণ্ডা ধারা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট চওড়া হয়ে বয়ে চলেছে খরবেগে! এইটাই কুণ্ডা নদী। লছুর কথায় বুঝলাম, এই জলস্রোত ছোট পাহাড়ী নদীর আকারে বয়ে গিয়ে যেখানে নর্মদার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে সেই স্থানেরই নাম হাঁডবোয়া।

উৎরাই-এর পথে ঐ পাহাড়ী নদীর ধার ধরে আমরা হাঁটতে লাগলাম। ছোট্ট নদীর দুই ধারেই ঘন বন। প্রায় মাইল দুই যাবার পর পথে দূর থেকে দেখতে পেলাম তিনজন লোক আসছে। তাদের দৈহিক গঠন এবং সাজ-সজ্জা দেখে তাদেরকে ভীল বলেই মনে হল। কাছাকাছি হতেই লছু তাদের একজনকে তার মাতৃভাষায় জিজ্ঞাসা করল 'অকাতে বাঙ্ চালা কানা।' তাদের কাছ হতে উত্তর এল—'দহি'। লছু তাদেরকে বলল যে তারা দহি থেকেই আসছে। দহিতে কার বাড়ীতে যাবে বলতে সেই লোকটি জানাল —'মট্রা'। লছুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই লছু আমাকে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে অনেক কসরৎ করে বুঝাতে পারল যে, ঐ লোকগুলি তাদেরই স্বজাতি। তাদেরই গাঁয়ে মট্রা ভীলের বাড়ীতে যাচ্ছে। তারা মট্রার কুটুম। কাজেই লছু বুধনেরও কুটুম। পরস্পর পরস্পরকে শালপাতার 'চুটা' (বিড়ি জাতীয়) আদান প্রদান করল। চুটা ধরিয়ে খেতে খেতে দুর্বোধ্য ভাষায় পাঁচ মিনিটকাল নিজেদের মধ্যে কিসব কথাবার্তা হল, আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাদের কথায় একটি কথা আমার জানা হয়ে গেল যে লছু বাড় সর্দার প্রভৃতির গাঁয়ের নাম 'দহি'। দহিতেই আমি দু রাত পরম সমাদরের মধ্যে কাটিয়ে আসছি।

আবার আমরা চলতে সুরু করলাম নদীর ধার ধরে, আগন্তুক পথিকরা চলে গেল দহির পথে। অনুমান করলাম বেলা বোধ হয় ন'টা বেজেছে। কিছুটা যাওয়ার পরে নদীকে আর দেখতে পেলাম না, নদী বেঁকে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। লছু তার বর্শাটা আমার হাতে দিয়ে আমার লাঠিটা নিয়ে সামনের ঝোপঝাড় ঘা মেরে সরাতে লাগল। কতকগুলো ছোট ছোট গাছের ডাল ভাঙা হয়েছে দেখে বুঝলাম, এই পথেই একটু আগে মট্রা ভীলের কুটুমরা গিয়েছে। হাঁটবার সুবিধার জন্য তাদেরই এই কাজ! পাহাড়ে জঙ্গলে না ঘুরলে, একটা নদী যে তার বিরাট জলস্রোত নিয়ে সহসা এই রকমভাবে আত্মগোপন করতে পারে বা হারিয়ে

যেতে পারে গিরিসঙ্কটের মধ্যে, তা এই পথের পথিক বা পরিব্রাজক ছাড়া আর কারও পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। যাইহোক, আমরা ক্রমে একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে এসে ঢুকে পড়লাম। বুধন আমাকে ভরসা দিবার জন্য জানাল 'এক পুরা' রাস্তা মাত্র এই রকম জঙ্গল হবে তারপর জঙ্গল শেষ। ভাল রাস্তা পাওয়া যাবে। এখানে শালগাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বটে তবে সংখ্যায় অনেক কম, ধাওয়া মেহরীন এবং বড় বড় ঝোড়া মহুয়া গাছই বেশী। আমরা তখন মহুয়া গাছের তলা দিয়েই হাঁটছি সহসা বুধন পিছন থেকে 'হুঁশে হুঁশে ভাল্লু'। ফিস্ ফিস্ কণ্ঠে বলেই আমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। এই আকস্মিক ধাকায় আমার গাঁঠরী কমণ্ডলু ইত্যাদি সব হাত থেকে পড়ে গেল। লছুর দিকে তাকিয়ে দেখি, সে তখন হাঁটু গেড়ে বসে তীর চালিয়েছে, মাথার উপরে মহুয়া গাছের ডাল থেকে ঝাঁপ দিতে উদ্যত একটা বিরাট মিশমিশে কালো ভালুকের দিকে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য! তীর গিয়ে বিঁধেছে ভালুকের বক্ষস্থলে। তীর মেরেই সে সরে গেছে গাছের তলা থেকে। এদিকে মুহূর্তকাল দেরী না করে বুধনও তীর মারল ভালুককে লক্ষ্য করে, তার তীর গিয়ে বিঁধল ভালুকের পেটে। প্রচণ্ড চীৎকার করতে করতে ভালুকটা তার বিরাট দেহ নিয়ে গড়িয়ে পড়ল ঝড় ঝড় শব্দে গাছ থেকে। দু দুটো বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ হয়েও, গাছের তলায় পড়ে গিয়েই ভালুকটা চীৎকার করতে করতে দু হাত বাড়িয়ে থপ্ থপ্ করে ছুটে চলেছে লছুকে লক্ষ্য করে। পিছন থেকে তার কালো লোমে ঢাকা প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা বিশাল কলেবর দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা ঘটোৎকচ! বুধন আবার প্রাণপণ শক্তিতে বর্শা ছুঁড়ে মারল সেই ঘটোৎকচের পিঠ লক্ষ্য করে। বর্শাটা পিঠে গিয়ে বিঁধতেই ভালুকটা পড়ে গেল। তার আট দশ মণী দেহের চাপে একটা ঘন ঝোপের ছোট ছোট গাছপালা ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। লছু ওদিক থেকে বুধনকে কিছু সঙ্কেতে জানাল, বুধন আমার হাতটা চেপে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। আমি কারণটা বুঝলাম যে, আমাদেরকে লছুর কাছে যেতে হলে ভালুকটার পাশ দিয়েই হেঁটে যেতে হবে। যদি এখনও সে না মরে থাকে, তাহলে মরণকামড় দিতে পারে এবং তখন তা হবে সাংঘাতিক। তার মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে তবেই তার

পাশ দিয়ে হাঁটা ভাল। মিনিট খানিকের মধ্যেই দেখলাম, ভালুকটা পেট চেপে পড়েছিল, প্রবল ঝাঁকুনির সঙ্গে উল্‌টে গেল বিরাট হাঁ করে। বিশাল কালো মুখের হাঁয়ের লাল গহ্বর থেকে লাল জিহ্বাটা বেরিয়ে পড়ল, তার দু পাটি দাঁত চেপে বসল সেই জিহ্বার উপর। আমিও এখন তার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম। ধন্য! শূলপাণির ঝাড়ি! সমগ্র জঙ্গলটাকেই মনে হচ্ছে কালান্তক মহাকালের মৃত্যুজাল! মনে মনে ভাবছি, বাংলা মহাভারত রচয়িতা মহাকবি কাশীরাম দাস যিনি কর্ণের একাঘ্নী বাণে নিহত ঘটোৎকচের মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনা করেছিলেন, তিনি যদি এই সময় এই দৃশ্য দেখতেন, তাহলে তিনি হয়ত লিখতেন-

লছুর বিষাক্ত তীর তারা যেন ছুটে।
কণ্টক সমান যেন ভল্লুকেতে ফুটে॥
দুই বীরের অস্ত্রাঘাতে ভল্লুকরাজ পড়ে।
কানন ভাঙিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে॥

যাই হোক ভালুকের মৃতদেহ পড়ে রইল রাস্তার ধারে, আমরা তিনজনে এগিয়ে চললাম ক্রমোচ্চ চড়াই পথে। সেই কুব্জ বা কুব্জা নদীর কোন চিহ্ন চোখে পড়ছে না। লছুকে নদীর কথা জিজ্ঞাসা করতেই জানাল, 'নদীটা পাহাড়ের পর পাহাড় ফাটিয়ে এঁকে বেঁকে কখনও চড়াই কখনও উৎরাই-এর পথে চলে গেছে। একবারে নর্মদার ধারে গিয়ে দেখতে পাবি। আমরা নদীর জন্য মাথা ঘামাচ্ছি না। সহজে এবং সংক্ষিপ্ত পথে নিরাপদে যাতে তোকে নর্মদা কিনারে পৌঁছে দিতে পারি, আমরা সেই চেষ্টাই করছি। আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে দহিতে।' ঠিক কথা! কুব্জা নদী নিয়ে আমারও কোন মাথা ব্যথা নাই। আমি ফিরে যেতে চাই নর্মদার কোলে। ভালুক বধের স্থান হতে আধঘণ্টা হেঁটে যেতেই সেই ছোট জঙ্গলটা অতিক্রম করতে পারলাম। পাহাড়ের ঢাল ক্রমে সমতল হচ্ছে বলে মনে হল, বড় বড় শাল, মহুয়া, সাজা গাছ এ পথেও আছে বটে তবে একে ঠিক জঙ্গল বলা যায় না। পাহাড়ের ঢালের কোন কোন অংশে চাষ-বাসও হচ্ছে। লোকজনের কিছু কিছু বাড়ী ঘরও চোখে পড়ছে দূরে দূরে। কুব্জা নদীর রহস্যময় অন্তর্ধান তখনও মনে ঘুট ঘুট করছে। কে

জানে এই রকম আঁকা বাঁকা গতিপথে ছোট ছোট পাহাড়ের কুঁজ, পিঠে নিয়ে নদীটা আড়ালে আবডালে বয়ে চলেছে বলেই হয়ত নদীটার নাম হয়েছে কুব্জা। হয়ত হাতনোরাতে গিয়ে শুনব কোন রোচক কাহিনী, কোন পুরাণকার বা কথক ঠাকুর গল্প বানিয়ে বহু আগেই হয়ত রটিয়ে গেছে যে শ্রীমতী রাধা ললিতা ও বিশখা সখীদের লীলা-খেলাকে অহরহ যে তির্যক দৃষ্টিতে দেখত সেই কুব্জা কিংবা কৈকেয়ীর মন্ত্রণাদাত্রী কুঁজী বুড়ী এখানে নর্মদা তীরে তপস্যা করতে এসেছিল এবং দেবতার বরে ভগবতীর মত নদী হয়ে বিরাজ করছে। উদ্ভট কল্পনায় কত কিছুই না তৈরী করা যায়। কথায় বলে গল্পের ঘোড়া আকাশেও উড়তে পারে!

আমরা নীরবেই এতক্ষণ হাঁটছিলাম, হঠাৎ সামনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাল—'ওই নর্মদা।' নর্মদা দর্শন করে আমার মন আনন্দে ভরে গেল। আমি সেইখানেই নতজানু হয়ে মা নর্মদাকে প্রণাম করলাম। লছু এবং বুধনকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বুঝাবার চেষ্টা করলাম যে, 'এবারে ভাই তোমরা ফিরে যাও। নর্মদার দর্শন পেয়েছি যখন, আর কোন ভাবনা নাই। নর্মদার তীরে পৌঁছে হাতনোরাতে পৌঁছে যেতে পারব। কিন্তু তারা কিছুতেই আমার প্রস্তাবে রাজী হল না। পাহাড়ের ঢাল থেকে নামতে নামতে বলল যে, সামনে যে নর্মদার তটে কিছু কিছু বাড়ী ঘর দেখা যাচ্ছে, ঐ জায়গাটার নাম কাকরাণা। কাকরাণা হতে আরও মাইল খানিক গেলে তবে হাতনোরা। কুব্জা নদীটা এঁকে বেঁকে ঐখানে এসে নর্মদাতে পড়েছে। বাড় সর্দারকে আমরা কথা দিয়ে এসেছি, হাতনোরা পর্যন্ত তোর সঙ্গে আমরা থেকে তোর দলের দেখা হয়ে গেলেই আমরা ফিরে যাব। আমাদের বাৎটাই বাপ্। বাৎ এক না হলে বাপও এক থাকবে না। বাৎটাই আমাদের দেবতা এই আমাদের সোজা হিসাব।

লছুর যে হিন্দী জ্ঞানের পরিচয় পেয়েছি, তাতে এতগুলো কথা হিন্দীতে অনর্গল বলতে হলে কতবার যে হোঁচট খেত, তার ঠিক নাই; কিন্তু এখন দেখছি আবেগের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখে ভাঙা ভাঙা হিন্দীর খৈ ফুটছে! আমি আর এর উত্তর কি দিব? এরা পাহাড়ে জঙ্গলে থাকে, সরল আরণ্যক বলে এবং তথাকথিত সভ্যজগতের শিক্ষা এরা লাভ করেনি বলেই এদের কাছে 'বাৎ ও ইমানের' এত দাম! তাদেরকে মনে মনে

নমস্কার জানালাম আর মা নর্মদার কাছে প্রার্থনা জানালাম—'মা এদেরকে সভ্যতার কালকূট বিষ-বাষ্প হতে তুমি রক্ষা করতে পারলে ভাল হয়! তথাকথিত ভাবে সভ্য হলে হয়ত এদের ভাত কাপড়ের সমস্যা মিটবে, তবে এদের এই সহজাত মহত্ব এবং সরলতা, এই 'বাৎ ও ইমানের' সুদুর্লভ সহজ পাঠ, এই দুর্মদ প্রাণশক্তি জটীলতা ও কুটীলতার চক্রপাকে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করো।'

আমরা এখন একরকম নর্মদার তটে বা চরে পৌঁছে গেছি বললেই হয়। তবে এই চর গঙ্গা ত্রিবেণী বা কংসাবতী নদীর বালুচর নয়। নর্মদার চর প্রস্তরময় তট! দূর থেকে একটা শিবমন্দিরের ধ্বজা এবং মন্দির থেকে সামান্য কিছু দূরে কয়েকটা ছোট ছোট টিনের ঘর, কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে। আরও কিছুটা এগিয়ে দেখলাম, শিবমন্দিরের চত্বরে বেশ কিছু লোক চলা-ফেরা করছেন, পূজনীয় কমল ভারতীজীর সম্প্রদায়ের নিশানটাও দেখতে পেলাম। নিশানটা দেখা মাত্রই বুঝতে পারলাম—এইখানেই আমাদের মোহান্তজী শ্রীনগেন্দ্রভারতী ছাউনী ফেলেছেন। দূর থেকেই আমাকেও তাঁরা দেখতে পেয়েছেন। আমি চিনতে পারছি, যতীন্দ্র ও লক্ষ্মণভারতীজী আনন্দে 'হর নর্মদে' বলতে বলতে আমার দিকেই ছুটে আসছেন। মোহান্তজীও আসছেন। যতীন্দ্র এসেই আমাকে বলতে লাগলেন—বলিহারী আপনার ক্রোধকে। আজ তিন দিন আমরা এখানে আপনার অপেক্ষায় বসে আছি। মোহান্তজী তিন দিন যাবৎ মুখে কিছু তুলেননি। তাঁর কথা শেষ না হতেই মোহান্তজী এসে আমাকে সাশ্রুনয়নে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁকে এবং লক্ষ্মণভারতীজীকে প্রণাম করলাম। যতীন্দ্রজী হাসতে হাসতে আমার কাছ হতে ঝোলা গাঁঠরী কমণ্ডলু নিয়ে শিবমন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণভারতীজী ভীলদের ভাষায় কথা বলে লছু ও বুধনের কাছ হতে সব বৃত্তান্ত জেনে নিয়েছেন। মোহান্তজীকে সব সমাচার জানতেই তিনি লছু ও বুধনকে শিবমন্দিরের চত্বরে নিয়ে গেলেন। কয়েকজন নাগা আটার পুরী ভাজছিলেন। মোহান্তজী লছু ও বুধনকে পেট ভরে খাওয়াতে বললেন। শুধু তাই নয় তাদেরকে সের পাঁচেক আটাও দিতে বললেন। নর্মদামায়ী ও মহাদেবকে ভোগ নিবেদন করার পূর্বে ঐ ভীল দুজনকে খেতে দিতে লক্ষ্মণভারতীজীর আপত্তি ছিল। তিনি সে কথা

বলতেই মোহান্তজী তাঁকে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। বললেন—লছমন্ ভেইয়া, তুমি এতকাল অধ্যাত্মজীবন যাপন করছ, এখনও ধর্মের বহিরঙ্গ দিকটাই তোমার কাছে বড় হয়ে রইল। অন্তরঙ্গ দিকটা এখনও তুমি আস্বাদন করতে পারনি। নর্মদামায়ী এবং দয়ালু আশুতোষ এদের রূপ নিয়েই বাঙালী বাবাকে রক্ষা করেছে। তারা তাকে মেহমান জ্ঞানে যত্ন করেছে শুনলে ত? আমরা সাধু হয়ে যদি আজ তাদেরকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা যত্ন করতে না পারি, তাহলে সাধু-জীবনের সার্থকতা কোথায়?

লক্ষ্মণভারতীজী আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। লছু ও বুধনকে তিনি পেট পুরে পুরী ও লাড্ডু খাইয়ে দিলেন। পাঁচ সাতসের আটাও দিলেন। আমি লক্ষ্মণভারতীজীকে বললাম, আপনি দয়া করে এদেরকে, বাচ সর্দার এবং দহির সমস্ত ভীল নারীপুরুষদেরকে বিশেষতঃ প্রথমদিন পল্লীতে পৌঁছবার পর যে মায়ী নিজের সন্তান জ্ঞানে গরমজলের সঙ্গে লতাপাতা মিশিয়ে আমার রক্তাক্ত পায়ের ক্ষত ধুয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে আমার নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানাতে বলে দিন এদের ভাষায়। আমি লছু ও বুধনের হাত জড়িয়ে ধরলাম, লক্ষ্মণভারতীজী আমার বক্তব্য তাদেরকে বুঝিয়ে দিতেই তাদের মুখ চোখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাসিমুখে তারা বিদায় নিল।

তারা চলে যেতেই আমি যতীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে নর্মদায় স্নান করতে গেলাম। আমি যতীন্দ্রকে কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলাম মাণ্ডবগড়ে রেবা কুণ্ড পর্যন্ত আমি দেখেছিলাম, প্রায় সকলের ঝোলাতে কিছু কিছু আটা এবং কন্দমূল ছিল। এই তিন দিনের মধ্যে এমনকি ভাগ্যোদয় ঘটল যে, আজ সকলেরই রাজসিক ভোজনের আয়োজন দেখছি? যতীন্দ্র বলল—এই কাকরানাতে মন্দির থেকে একটু দূরেই পুলিশ চৌকী আছে। বোধহয়, মধ্যপ্রদেশের এইটাই শেষ সীমান্ত চৌকী। এখান থেকে মাত্র একমাইল দূরেই রেবা-কুব্জা সংগম। সেই পুলিশবাহিনীই আমরা এখানে এসে পৌঁছার পরদিনই সাধুদের সেবার জন্য প্রায় দু মন আটা এবং আধমন ঘি পৌঁছিয়ে দিয়েছে। গতকাল মোহান্তজী এখানে মা নর্মদার উদ্দেশ্যে কড়াই প্রসাদও নিবেদন করেছেন। তিনি আপনাকে এরই মধ্যে খুবই ভালবেসে ফেলেছেন। আমরা খুবই চিন্তা করছিলাম আপনার জন্য। আমরা ত ধরেই নিয়েছিলাম,

আপনাকে হয়ত আর ফিরেই পাবো না। এই বিদেশ বিভূঁইয়ে হয়ত বাঘ ভালুকের পেটেই আপনার জীবনান্ত ঘটবে। কিন্তু গুরুজীর দৃঢ়বিশ্বাস, মা নর্মদা সর্বাবস্থাতে আপনাকে রক্ষা করবেন। আমরা সকলে মিলে হাতনোরাতে গিয়ে কুব্জা সঙ্গম দেখে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি যেতে চাইলেন না। তাঁর সাফ্ জবাব—শৈলেন্দ্র ফিরে আসুক, তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি আর কথা বাড়ালাম না। স্নান সেরে সূর্যার্ঘ্য প্রদান ও তর্পণে মন দিলাম।

স্নান তর্পণাদি সেরে মতীন্দ্রের সঙ্গেই গেলাম শিবমন্দিরে পূজা করতে। বহু বহু পুরাতন পাথরের শিবমন্দির। মহাদেব ঢাকা পড়ে গেছেন ফুল বেলপাতার স্তূপে। মতীন্দ্র জানাল—ঢাকা পড়বেনই ত! পুলিশ চৌকীর প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন পুলিশ ছাড়াও আমাদের দলেরও সবাই পূজা করে গেছেন। আমি মহাদেবের মাথার উপর হতে স্তূপীকৃত ফুল সরিয়ে দিতেই ঘন সবুজ শিবলিঙ্গের দর্শন পেলাম। প্রায় ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ প্রায় ৫ ইঞ্চি ব্যাস পরিমিত শিবলিঙ্গে দ্যুতি দেখে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। শিবলিঙ্গ হতে যেন সবুজ রশ্মি ঠিকরে পড়ছে। 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' অনুসারে ইনি 'বামদেব' সন্দেহ নাই। যোনিপীঠটিও সবুজ পাথরের দেখলাম। আমি কমণ্ডলুর নর্মদা জলে বামদেবের স্নান ও পূজা সেরে বেরিয়ে এলাম। আমার মনের মধ্যে একটা বিহ্বলতা দেখা দিয়েছে। মতীন্দ্র নিজের থেকেই বলতে লাগল—কত হাজার বৎসর পূর্বে কে এই শিবলিঙ্গকে স্থাপন করেছিলেন, তা কেউ বলতে পারেন না। মোহান্তজী নিজেও এই শিবলিঙ্গের নাম ও পরিচয় জানেন না।

আমার পূজা হয়ে যেতেই মন্দিরের চারধারে এবং গাছের ছায়ায় সবাই মিলে 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' করতে বসা হল। মন্দিরকে ঘিরে আছে পাঁচটি বেলগাছ এবং চারটি ছোট ছোট অশ্বত্থ গাছ। আমার মনে হল, গত দশ বৎসরের মধ্যে হয়ত কোন পুণ্যার্থী এখানে নর্মদাতটে অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেইসব গাছের ছায়া পড়েছে মন্দিরের বারান্দাগুলিতে। আমি খাওয়ার পরেই মোহান্তজীর অনুমতি নিয়ে বারান্দার এক কোণে শুয়ে পড়লাম। আমার ঘুম ভাঙল বেলা চারটায়। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম, দেখলাম আমার কাছেই মোহান্তজী, নাগরা ছাড়াও আরও

৪০ জন লোক বসে আছেন চুপ করে। আমি নর্মদায় গেলাম মুখে চোখে জল দিতে। যতীন্দ্র আমাকে জানিয়ে দিল পুলিশ চৌকী থেকে লোকজন এসেছেন গুরুদেবের কাছে কিছু কথা শুনতে। কালও ওঁরা এসেছিলেন।

আমি নর্মদা থেকে ফিরে আসতে আসতেই শুনতে পেলাম, মোহান্তজী শ্রোতাদেরকে বলছেন—আপনারা যে আপনাদের কর্মজীবনে এই নর্মদাতটে নিযুক্ত হতে পেরেছেন, এ আপনাদের অসীম সৌভাগ্য বলে জানবেন। নিত্য নর্মদা দর্শন, নর্মদায় স্নান এবং মহাদেবের নিত্য পূজা করার সৌভাগ্য জন্মার্জিত পুণ্যকর্মের ফলেই ঘটে থাকে। নর্মদার তটে তটে কত যে মহাপুরুষ ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন, তার ইয়ত্তা নাই। তাছাড়া প্রতি বৎসরই সাধুরা নর্মদা পরিক্রমা করে থাকেন। তাঁদেরও দর্শনের অবারিত সুযোগ আপনারা বিনা আয়াসেই পেয়ে থাকেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। তিনি অদ্যাপি বর্তমান, সপ্ত কল্পান্ত স্থায়ী এই চিরজীবী মহাপুরুষ মা নর্মদার কৃপা সিদ্ধ। তিনিই নর্মদার মহিমা জগতে সর্বপ্রথম প্রকাশ করে গেছেন। আমাদের এই ভারতবর্ষেই গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, কাবেরী, আত্রেয়ী, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী প্রভৃতি কত পুণ্যা নদী বৈদিক যুগ হতে অদ্যাপি বর্তমান (অবশ্য সরস্বতী সম্প্রতি বিলুপ্তা) কিন্তু সেইসব নদীর পরিক্রমার বিধি নাই। কেবল নর্মদা পরিক্রমারই শাস্ত্রানুমোদিত বিধি আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। মহামুনি মার্কণ্ডেয় ও অন্যান্য সকল ঋষিই একবাক্যে ঘোষণা করে গেছেন যে, নর্মদা পরিক্রমা একটি পরিপূর্ণ তপস্যা, সদ্য সিদ্ধিপ্রদা। নর্মদাতটে তপস্যা করে কত যে মহাত্মা সিদ্ধিলাভ করেছেন তার হিসাব কারও পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। নর্মদা পরিক্রমা করতে করতেই আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীচৈতন্যভারতীজী, পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীকমলভারতীজী এবং গৌরীশঙ্কর ব্রহ্মচারীজী মা নর্মদার দর্শন পান এবং তার দয়ায় সিদ্ধিলাভ করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও এসেছিলেন নর্মদা পরিক্রমা করতে। তিনি পরিক্রমায় এসে মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের দর্শন পান। মহামুনি তাঁকে বলেছিলেন—

ইয়ং মাহেশ্বরী গঙ্গা মহেশ্বর তনুদ্ভবা।
প্রোক্তা দক্ষিণ গঙ্গেতি ভারতস্য যুধিষ্ঠির॥

জাহ্নবী বৈষ্ণবী গঙ্গা ব্রাহ্মী গঙ্গা সরস্বতী।
ইয়ং মাহেশ্বরী গঙ্গা রেবা নাত্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির, এই নর্মদা মাহেশ্বরী গঙ্গা, মহাদেবের দেহ হতে উদ্ভূতা, এজন্য ভারতে নর্মদা দক্ষিণ গঙ্গা নামে অভিহিতা হন। বস্তুতঃ জাহ্নবী বৈষ্ণবী গঙ্গা (বিষ্ণুর চরণকমল হতে উদ্ভূতা), সরস্বতী ব্রাহ্মীগঙ্গা (ব্রহ্মার দেহ হতে উদ্ভূতা), আর রেবা মাহেশ্বরী গঙ্গা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যথা হি পুরুষে দেবস্ত্রৈমূর্তিত্বমুপাশ্রিতঃ।
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাখ্যং ন ভেদস্তত্রবৈ যথা।
তথা সরিৎত্রয়ে পার্থ ভেদং মনসি মা কৃথাঃ॥

যেমন একই পুরুষরূপী দেবেশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্তিতে প্রকটিত হন, বস্তুতঃ ঐ তিন জনের মধ্যে কোন ভেদ নাই, তেমনি হে পার্থ ! গঙ্গা, সরস্বতী ও নর্মদা এই তিনটি নদীর মধ্যেও কোন ভেদ নাই।

কোটিশো হ্যত্র তীর্থানি লক্ষশশ্চাপি ভারত।
তথা সহস্রশো রেবাতীরদ্বয় গতানি তু॥
বৃক্ষান্তরিক্ষ সংস্থানি জলস্থল গতানি চ।
কঃ শক্তস্তানি নির্ণেতুং বাগীশো বা মহেশ্বরঃ॥

হে ভারত ! যেমন ইহলোকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তীর্থ বিদ্যমান, তেমনি নর্মদার দুই তীরেই সহস্র সহস্র তীর্থের অধিষ্ঠান জানবে। বাগীশই হোন আর মহেশই হোন, রেবার বৃক্ষ, অন্তরিক্ষ জল স্থল সব স্থানেই কত যে তীর্থ আছে, তা নির্ণয় করতে কেউ সমর্থ নন।

স্মরণাৎ জন্মজনিতং দর্শনাৎ চ ত্রি জন্মজং।
সপ্তজন্মকৃতং নশ্যেৎ পাপং রেবাবগাহনাৎ॥

অর্থাৎ মা রেবার স্মরণে এক জন্মার্জিত, দর্শনে তিন জন্মার্জিত আর অবগাহন স্নানে সাত জন্মের পাপ নষ্ট হয়।

দেবকার্যং কৃতং তেন অগ্নয়োঃ বিধিবৎ হুতাঃ।
বেদা অধীতাশ্চত্বারো যেন রেবাবগাহিতা॥

প্রাধান্যাচ্চাপি সংক্ষেপাৎ তীর্থান্যুক্তানি তে ময়া।
ন শক্যো বিস্তরঃ পার্থ শ্রোতুং বক্তুঞ্চ বৈ ময়া॥

যিনি রেবা নদীতে স্নান করেছেন, তাঁর যথাবিধি দেবকার্য, অগ্নিতে আহুতি প্রদান এবং চতুর্বেদ অধ্যয়নের ফল লাভ হয়ে গেছে বলে বুঝতে হবে। হে পার্থ! আমি তোমার কাছে সংক্ষেপে সকল তীর্থ মাহাত্ম্য একরকম ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি কিন্তু রেবার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণতঃ শ্রবণে বা কীর্তনে সমর্থ নই।

মহামুনি, যুধিষ্ঠিরকে আরও বললেন যে, তুমি সারকথা আমার কাছে জেনে রাখ যে, ঘূর্ণিবায়ু যেমন সহসা প্রবল বাতাসের বেগে বিঘূর্ণিত হয়ে প্রকাশ পায়, আবার সহসা শূন্যমার্গে অন্তর্হিত হয়, তেমনি আমাদের প্রাণবায়ুও একদিন না একদিন ঐ প্রাঘূর্ণিকার মত নিশ্চয় শরীর ত্যাগ করে যাবে। অতএব অনিশ্চিত শরীর দিয়ে ধ্রুব কর্মাচরণ অবশ্যই কর্তব্য। এ জগতে ধন, বাক্য, আয়ু এবং শরীর এই চারটি পদার্থই অসার, এই অসার বস্তু হতে সার বস্তু যথাক্রমে দান, সত্য, কীর্তি, ধর্ম এবং পরোপকার রূপ অক্ষয় ফল উদ্ধার করে নিতে হয়। কাল ভূতসকলকে অহরহ পাক করে চলেছে। মহামোহময় সংসার কটাহ এই পাকের পাত্র, সূর্য এই পাককার্যে অগ্নির কাজ করছেন, দিবারাত্র যেন এই পাককার্যে ইন্ধন ও মাস ঋতু প্রভৃতি দর্বী অর্থাৎ হাতার কাজ করছে। এই ত হল সংসারের বার্তা—ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা। হে যুধিষ্ঠির! তুমি সংশয় শূন্য হয়ে শাস্ত্রবিহিত কার্য অর্থাৎ এই নর্মদা পরিক্রমা, নর্মদা স্নান, ধর্মকার্যাদির অনুষ্ঠান করে যাও।

মোহান্তজী এই পর্যন্ত বলে সমবেত ভক্তদেরকে বললেন— মহামুনি মার্কণ্ডেয় এবং যুধিষ্ঠিরের এই কথোপকথন থেকে আশা করি, আপনারা বুঝতে পারছেন নর্মদার মহিমা। তাই বলছিলাম, আপনাদের নিয়োগকর্তা যে, আপনাদেরকে বেছে বেছে এই নর্মদাতটেই নিযুক্ত করলেন, এ আপনাদের জন্মান্তরীণ বহু পুণ্যকর্মেরই ফল। এই কাকরাণা থেকে মাত্র একমাইল দূরেই হাতনোরা কুব্জা সংগম। আপনারা একখণ্ড রেবাখণ্ড সংগ্রহ করে নিতে পারলে তার ২২৭-তম অধ্যায় পড়লেই দেখতে পাবেন, সেখানে ঐ কুব্জা সংগমের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে মহামুনি নিজের উপলব্ধ সত্য গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন—

এরণ্ডী সংগমে তদ্বৎকপিলায়াশ্চ সংগমে।
কেচিৎ ত্রিগুণিতং প্রাহুঃ কুব্জারেবোশ্চ সংগমে॥

অর্থাৎ ওঁকারের এরণ্ডী সংগমে ও কপিলা সংগমে স্নান করতে পারলে বহু পুণ্য। মূল ওঙ্কারে এবং কুব্জা রেবাসংগমে স্নান করলে পূর্বোক্ত পুণ্যের তিনগুণ পুণ্য লাভ হয়।

সেই কুব্জা সংগম যখন এত কাছে, তখন আশা করব, আপনারা সময় পেলেই মাঝে মাঝে ঐখানে গিয়ে সংগমে স্নান এবং নর্মদার পূজা করবেন। তাতে আপনাদের আত্যন্তিক মঙ্গল হবে। আজ এই পর্যন্তই থাক। লছমন ভেইয়া, তুমি বামদেবের আরতির ব্যবস্থা কর। এঁরা থাকতে থাকতেই বাবার আরতি সেরে নিই। কাল সকালেই আমরা এখান থেকে যাত্রা করব। শিবমস্তু।

আমি যতীন্দ্রের গায়ে খোঁচা দিয়ে জানালাম, দেখলেন ত মোহান্তজী এই শিবের নাম জানেন কিনা।

লক্ষ্মণভারতী পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে আরতির ব্যবস্থা করেই রেখেছিলেন। যতীন্দ্রের ঘড়িতে তখন ছ'টা বেজেছে। সূর্য বসেছেন অস্তাচলে। অন্ধকার তখনও নেমে আসেনি। এখনও চারদিক বেশ ফাঁকা আছে, এরই মধ্যে সান্ধ্য আরতি সেরে ফেলা ঠিক হবে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই মোহান্তজী আমাকে বললেন, তুমি বেদপাঠী, বৈদিকক্ষণ ভালভাবেই চেন, সন্ধ্যা নামার আধঘন্টা আগে থেকে সন্ধ্যার আধঘন্টা পর পর্যন্ত আরতি, পূজা এবং ধ্যানের ক্ষণ পড়ে যায়, সর্বোপরি ভক্তসমাগমে ভক্তবৎসলকে আরাধনা করাই একটা মাহেন্দ্রক্ষণ। আমি চুপ করে গেলাম। মোহান্তজী নর্মদা স্পর্শ করে আরতি করতে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। শিবলিঙ্গের উপর থেকে স্তূপীকৃত বেলপাতা ও ফুল আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মোহান্তজী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বামদেব মহাদেবকে প্রথমেই প্রদক্ষিণ করতে সুরু করলেন মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে, নাগারা শিঙ্গা ডম্বরু বাজাতে লাগলেন। মোহান্তজী ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে স্তব করছেন—

হে পার্বতী-হৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।

হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে
সংসার দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥

অর্থাৎ হে পার্বতী হৃদয়-বল্লভ (গৌরী হৃদয়ের প্রভু), চন্দ্রমৌলে (যাঁর মস্তকে চন্দ্র), হে ভূতাধিপ (জীবগণের পতি), প্রমথনাথ (প্রেতাদির প্রভু), হে গিরীশজাপ (গিরীশ অর্থ হিমালয়, তাঁ হতে জাত যিনি অর্থাৎ উমা, তাঁর প অর্থাৎ পতি) হে বামদেব, হে ভব, হে রুদ্র, হে পিনাকপাণি, হে জগদীশ্বর, এই সংসার দুঃখরূপ গহন অরণ্য হতে আমাকে রক্ষা কর।

ভগবানকে এই মন্ত্রে প্রদক্ষিণ করেই মোহান্তজী পঞ্চপ্রদীপ জেলে আরতি করতে করতে মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন—

ওঁ আত্মা ত্বং নর্মদা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণ বিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো
যদ্ যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্ ॥

অর্থাৎ হে বামদেব ! তুমিই আমার আত্মা, মা নর্মদাই আমার বুদ্ধি, আমার ইন্দ্রিয়সমূহ তোমার ভৃত্য, শরীর তোমার মন্দির, তোমার পূজা করার উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকার জন্যই আমার বিষয়ভোগ চেষ্টা, তোমাতে সমাহিত হওয়াই আমার নিদ্রা আমার পাদ সঞ্চালনের অর্থ তোমার বিধিপূর্বক প্রদক্ষিণ করা, আমার বাক্যসমূহ তোমার স্তব, আমি যাই করি, তা শুধু তোমার আরাধনার জন্যই করি।

মন্ত্র পড়তে পড়তেই দেখলাম মোহান্তজী টলে টলে পড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্মণভারতী এবং যতীন্দ্র গিয়ে তাঁর দুইদিকে দাঁড়িয়ে আলতো করে ধরে রইলেন। পঞ্চপ্রদীপ হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল, কোনমতে তিনি টাল সামলালেন ; যতীন্দ্র তাঁর হাত থেকে পঞ্চপ্রদীপটি ধরে নামিয়ে দিতেই লক্ষ্মণভারতী কর্পূর জেলে তাঁর হাতে কর্পূরদানীটি ধরিয়ে দিলেন। তিনি সেটি হাতে নিয়ে নতজানু হয়ে বসে প্রজ্বলিত কর্পূরদীপ মাথায় ঠেকিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে স্খলিত জড়িত কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন—

ওঁ নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্তে।

নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥

হে বিশ্বরূপধারী বিভু, তোমাকে বারংবার নমস্কার ; চিদানন্দরূপী তোমাকে বারংবার নমস্কার ; তপস্যা ও যোগের অধিগম্য তোমাকে বারংবার নমস্কার ; বেদজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয় তোমাকে নমস্কার।

তাঁর হাত হতে কর্পূরদানীটা পড়ে গেল, তিনি নতজানু হয়ে মুখ ঢুকে পড়ে রইলেন। সবাই আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বামদেবকে স্মরণ করতে লাগলাম। এইভাবে ১৫ মিনিট কেটে গেল, তারপর তাঁর শরীরে শিহরণ দেখতে পেলাম, তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। চন্দনপাত্র হতে চন্দন নিয়ে তিনি মহাদেবের হিমচন্দন পর্ব শেষ করে সকলের হাতে চরণামৃত দিলেন। পুলিশ ভক্তরা বিদায় নিয়ে যাত্রা করবে এমন সময়ে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের এই চৌকীই কি মধ্যপ্রদেশের শেষ সীমান্ত চৌকী?

—নেহিজী। আপনারা এখান থেকে হাতনোরা কুণ্ডা সংগম পেরিয়ে পেণ্ড্রা ও দেব্‌লিতে পৌঁছেও পুলিশ চৌকী দেখতে পাবেন নর্মদাতটে। দেব্‌লি হতে প্রায় ১২ মাইল দূরে আমটাক। সেখানেই সীমান্ত চৌকী, ঝাবুয়া জেলার মধ্যে। আমটাক নর্মদা কিনারে নয়; আমটাক অতিক্রম করেই গুজরাট প্রদেশে প্রবেশ করতে হয়।

তাঁরা নমস্কার বিনিময় করে চলে গেলেন। তাঁদের দলে দু তিনটা বন্দুক আছে দেখলাম। যতীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা যে এখানে তিনদিন থাকলেন, এরমধ্যে কোন বন্যজন্তুর উপদ্রব হয় নি?

—হয়নি, হতে কতক্ষণ? বিন্ধ্যপর্বতের কোলেই ত একরকম বাস করছি। এখানটাতে গাছপালা কম, বন নাই বললেও চলে কিন্তু কিছু দূরেই ত দিনের বেলা দেখেছেন ঘন জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। ওঁদের হাতে বন্দুক দেখেই ত আপনার বুঝা উচিত যে এখানেও যখন তখন আচম্বিতে ব্যাঘ্র মহারাজদের আবির্ভাব ঘটতে পারে।

মন্দিরের ভিতরে উঁকি মেরে দেখলাম, ইতিমধ্যে মোহান্ত মহারাজ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছেন। রাত্রি তখন আটটা। মন্দিরের বারান্দাতেই তাঁর জন্য কম্বল পাতা হয়েছে, কম্বল লম্বালম্বি দু ভাঁজ করে

পাতা। আমাদের সকলেরই শয্যা সেইভাবে, কোনমতে শরীরটা পড়ে থাকতে পারে সেইরকম সংকীর্ণভাবেই পাতা হয়েছে। কয়েকজন যাঁদের মন্দিরের বারান্দায় সঙ্কুলান হয় নি, তাঁরা গাছতলাতে মুক্ত আকাশের তলে শয্যা নিলেন। চারপাশে চারটা ধুনি জেলে প্রহরে প্রহরে চারজন করে নাগা পাহারাতে থাকলেন। ভোর পাঁচটায় প্রায় সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল, কেবল যাঁরা শেষ প্রহরে পাহারায় ছিলেন, তাঁরাই তখনো গভীর নিদ্রায় অচেতন। মোহান্তজী চুপি চুপি বললেন—'ওদেরকে এখন জাগিও না, প্রাতঃকৃত্য সেরে 'সামান-উমান' বাঁধা-ছাঁদা করে যাত্রা করতে সময় লাগবে। ততক্ষণ বেচারারা ঘুমাক। তথাস্তু; আমার গাঁঠরী বেঁধে সব গুছিয়ে নিতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগল। প্রাতঃকৃত্য সেরে আমি নর্মদার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম সূর্যোদয়কে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। যতীন্দ্র ও মোহান্তজী ছাড়া সবকেই, দেখলাম ঘাটে নেমে স্নান পর্ব সারছেন। আজ ঘুম থেকে উঠার পরেই বাবার কথা খুব মনে পড়ছে। খুব ভোরে উঠেই তাঁর সঙ্গে পূর্বদিকের মাঠে একটা উঁচু পোতায় গিয়ে দাঁড়াতে হত। তখন বেদাভ্যাসের কাল, ঐ সময় উষা ও সূর্যবন্দনা বিষয়ক সূক্তের অন্ততঃ দু তিনটি আবৃত্তি করে তাঁকে শোনাতে হত প্রতিদিনই। ঝঞ্ঝাট হত, নিখুঁত ছন্দে আবৃত্তি করতে গিয়ে। ত্রিষ্টুপ অনুষ্টুপ বৃহতী জগতী গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের তাল সুর বজায় রাখতে প্রায়ই ভুল করতাম। যে সূক্তের যে ছন্দ, তা সঠিকভাবে উচ্চারিত না হলে তিনি চুলের মুঠি ধরে তাড়না করতেন। আমার মন উদ্বেল হয়ে উঠল। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৯২ সূক্তের গৌতম ঋষি দৃষ্ট উষা ও সূর্যবন্দনা জগতী ছন্দে গাইতে সুরু করলাম—

ওঁ এতা উত্যা উষসঃ কেতুমক্রত
পূর্বে অর্ধে রজসো ভানুমঞ্জতে।
নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ
প্রতিগাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ॥ ১

প্রকাশ করে আলোক রাশি দীপ্ত উষা পূর্বাকাশে,
অন্তরীক্ষে ঐ যে তাহার মধুর জ্যোতি মধুর হাসে।
সৈন্য যথা অস্ত্র শানায়, দীপ্তি দিয়ে উষা মাতান।
জগৎমাতা উষা চলেন কিরণ দিয়ে ভুবন সাজান॥

ওঁ উদপপ্তন্নরুণা ভানবো বৃথা স্বাযুজো অরুষার্গা অযুক্ষত।
অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্বথা রুশন্তং ভানুমরুষীরশিশ্রয়ুঃ ॥ ২

অরুণ বরণ সূর্যকিরণ ঐ যে ফোটে আকাশ তলে,
কিরণ-রূপা অশ্ব যুড়ি উষাদেবী রথে চলে।
জগৎ প্রাণী জাগল জ্ঞানে উষামাতার উদ্বোধনে,
দীপ্ত শিখা ছড়িয়ে দিয়ে মিলল উষা সূর্য সনে ॥

বন্দনা শেষ করে আমি মা নর্মদাকে প্রণাম করলাম। পিছন ফিরে দেখি, মোহান্তজীসহ কয়েকজন নাগা আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন যুক্তকরে। যাঁরা নর্মদাতে নেমে স্নান করছিলেন. তাঁরাও স্নান বন্ধ করে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু এঁরা নন, আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে সমস্ত হিন্দুই বেদমন্ত্রকে এই রকম শ্রদ্ধা করে, সকলেই অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে যে, বেদ স্বয়ং পরমেশ্বরের বাণী। প্রসন্ন হাসি হেসে মোহান্তজী আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বামদেবের মন্দিরে নিয়ে এলেন। সকাল সাতটায় আমরা কাকুরাণার মন্দির হতে যাত্রা করলাম। শিঙা, ডম্বরু বাজাতে বাজাতে হর নর্মদে ধ্বনি তুললেন নাগারা। নর্মদা কিনারা ধরে প্রায় মিনিট কুড়ি হেঁটেই আমরা হাতনোরার কুব্জা সংগমে এসে পৌঁছে গেলাম। যে কুব্জা নদীকে দহি থেকে লছু বুধনের সঙ্গে আসতে আসতে হারিয়ে ফেলেছিলাম, মানে কুব্জার যে জলধারা বক্রগতিতে বক্রপথে ছোট ছোট পাহাড় ভেদ করে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছল, এখানে এসে দেখছি, সেই কুব্জা বিন্ধ্যপর্বতের একটি ছোট পাহাড়কে ফাটিয়ে প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ছে নর্মদাতে। সংগম-স্থলেই জলের মধ্যে রয়েছেন কুব্জেশ্বর মহাদেব। মোহান্তজী দেখালেন শিবলিঙ্গাকৃতি একটি প্রস্তরের উপর ঝম্‌ঝম্ শব্দে গর্জন করতে করতে পড়ছে কুব্জার জলধারা। অজস্র সাদা ফেনা উপর দিকে ছিটকে পড়ছে। সংগম-স্থলে গিয়ে ঐ মহাদেবের পূজা করা সাধ্যাতীত। তটের কাছাকাছি যেতেই অজস্র জলকণা ছিটকে এসে আমাদেরকে প্রায় ভিজিয়ে দিল। প্রপাতের মত জল পড়ছে উপর থেকে নিচে। সংগম হতে একটু দূরে দূরে অনেক বড় বড় গাছ আছে। তটের ধারে বড় বড় কেঁদ গাছই বেশী, সেইসব গাছের মাথায় জলকণা ঠিকরে পড়ে তলায় টস্ টস্ করে জল পড়ছে।

চারদিকে শুধু পাথর আর পাথর। ঠিকরে পড়া জলকণার আওতা থেকে একটু দূরে সন্ন্যাসীরা নিজেদের ঝোলা কম্বল রেখে রেবা-কুব্জা সংগমের শোভা দেখতে লাগলেন। মোহান্তজী আমি ও যতীন্দ্র সকালে স্নান করিনি, কাজেই সঙ্গম হতে কিছু দূরে আমরা স্নান করতে নামলাম। জলের ঢেউ তটে এসে আছড়ে পড়ছে প্রবল বেগে।

মোহান্তজী সবকে ডেকে বললেন, এই কুব্জা সঙ্গমে কুব্জেশ্বরের উদ্দেশ্যে তোমরা সবাই জলের অর্ঘ্য দান করে রেবা মন্ত্র জপ কর। লছমন ভেইয়া, কর্পূরদানীতে একটু কর্পূর সাজিয়ে রাখ, আমি মহাদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করব। এই বলে তিনি স্নান করতে নামলেন। যতীন্দ্র ও আমিও তাড়াতাড়ি স্নান করে সূর্যার্ঘ্য ও তর্পণাদি সেরে নিলাম। স্নান করেই মোহান্তজী কর্পূর ধরিয়ে আরতি সুরু করার আগে আমাদের সবাইকে বললেন—আমি ধীরে ধীরে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করছি, আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তোমরাও মহাদেবের উদ্দেশ্যে বলতে থাক; কর্পূর জ্বালিয়ে তিনি মণ্ডলাকারে ঘুরতে ঘুরতে বলতে লাগলেন—

ওঁ অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্॥

যিনি জন্মরহিত শাশ্বত ও কারণের কারণস্বরূপ, যিনি সদাই মঙ্গলময়, স্ব-স্বরূপে নিত্য বর্তমান, সমস্ত জ্যোতির জ্যোতিঃ যিনি, যিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন ও নিদ্রার অতীত তুরীয় স্বরূপ, যিনি অন্ধকারের অতীত এবং আদি ও অন্তবিহীন, আমরা সেই দ্বৈতবিহীন পরম পাবনের শরণ অর্থাৎ আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আমাদের মন্ত্রপাঠ শেষ হল, কর্পূরের বাতিও নিভল। আমরা পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে যাত্রা সুরু করলাম। এখানে কুব্জা নদী অতিক্রম করা সম্ভব নয়, বেশ প্রশস্তাকারে নর্মদাতে এসে মিলিত হয়েছে। লক্ষ্মণভারতীজী আমাদের পথ প্রদর্শক, তিনি ডান দিকে বাঁক নিয়ে চড়াই-এর পথে উঠতে লাগলেন। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপর মানুষের চলার দাগ লক্ষ্য করে তিনি হাঁটতে লাগলেন, গাছপালার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে

দেখলাম, ঘন বন ক্রমশঃই উঠে গেছে পর্বতের উপর দিকে। বেশ কতকটা উপরে উঠে এসে নিচে কুভাসংগমের দিকে তাকালাম। সংগমের কাছা-কাছি তটের উপরে যে কেঁদ গাছগুলি দেখে এসেছিলাম, সেগুলির ভিজা পাতায় সূর্যকিরণ পড়ায় চিক্ চিক্ করছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে! আরও কিছুটা এগিয়ে দু পাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কুভার জলধারা প্রবলবেগে বয়ে যাচ্ছে দেখতে পেলাম নর্মদার দিকে। কুভার বিস্তৃতি এখানে বেশী নয়, বড় জোর তিন বা সাড়ে তিন ফুট হবে। লক্ষ্মণভারতীজীর দেখাদেখি আমরা সবাই ডিঙিয়ে পার হয়ে গেলাম। এবার নামতে লাগলাম নীচের দিকে, প্রায় উৎরাইপথে পনের মিনিট হাঁটার পর আবার নর্মদা কিনারে এসে পৌঁছলাম। এইসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম, বন ছাড়িয়ে উঁচু নীচু মাঠ, মাঠ ছাড়িয়ে আবার ছোটখাট বন, আবার মাঠ, মাঝে মাঝে পাথর ছড়ানো গ্রাম। আমরা আবার একটা সংগমস্থলে এসে পৌঁছলাম প্রায় ঘণ্টাদেড়েক হেঁটে। লক্ষ্মণভারতী জানালেন—এই স্থানের নাম মান সঙ্গম। মান নামক একটা ছোট পাহাড়ী নদী এখানে এসে নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কুভা নদীর মত মান নদী খাড়া হয়ে জলপ্রপাতের আকারে পড়ছে না। তির্ তির্ করে বয়ে চলেছে গাছপালা প্রান্তর ডুবিয়ে। জল হাঁটুরও নীচে, স্রোতও প্রবল নয়। আমরা লাঠি ঠুকে ঠুকে জলের নিচে ছোট ছোট পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে মানসংগম পেরিয়ে এলাম। প্রায় এক ঘন্টা পাহাড়ী পথে হেঁটে আমরা পৌঁছে গেলাম বড়ালদা গ্রামে। গ্রামের মধ্যে দূরে দূরে কিছু কিছু বাড়ীঘর দেখা যাচ্ছে। ভীলদের সম্বন্ধে মোহান্তজীর allergy আছে। তা জানেন বলে লক্ষ্মণভারতী আগে ভাগেই জানালেন—এখানে ভীল নাই, এ দিকটায় এবং এর পরের মহল্লা সিমরদাতে শুধু হো এবং ওয়াঙ্কিদের বাস। এরাও অভাবী বটে কিন্তু লুটেরা নয়। হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে এরা পাথর ভেঙে মোটা মোটা কালো জংলীজটা ধান ও বাজরার চাষ করে। সরকার থেকে সম্প্রতি আদিবাসী সংরক্ষণ সমিতির মাধ্যমে এরা চাষবাসের জন্য সাহায্য পায়।

ক্রমশঃ বড় বড় শাল বারম বেল অশ্বত্থ কেঁদ প্রভৃতি গাছের প্রাদুর্ভাব যেন বেশী বলে মনে হচ্ছে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে মনে হল বেলা বোধহয় বারটা বাজতে যায়। এই মধ্যাহ্ন রৌদ্রে দেখলাম মোহান্তজীর যেন

ভাবোচ্ছ্বাস দেখা দিল। তিনি সহসা গলা ছেড়ে নর্মদা মাতার ভজন সুরু করে দিলেন। সকাল থেকেই সকলে অভুক্ত, পার্বত্য পথে খররৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত, এর মধ্যেই তাঁর কিভাবে যে ভাব জন্মালো, তা মা নর্মদাই জানেন। আর তাঁদের এইভাব কতকটা সংক্রামক রোগের মত। একজন 'রামা হো' বলে চীৎকার সুরু করলে দেশোয়ালী ভাইরা যে যেখানে আছে সবাই মিলে তারস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ করে, তেমনি এখানেও দেখলাম মোহান্তজী যেই উচ্চৈঃস্বরে আরম্ভ করলেন—হৈঁ রেবা, মাইয়া তেরা আধার, নর্মদে হৈঁ তেরে আধার', সঙ্গে সঙ্গে সবাই তান ধরলেন—হৈঁ রেবা, মাইয়া তেরা আধার, নর্মদে হৈঁ তেরে আধার!' মোহান্তজী একটি মাত্র পংক্তি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে সকলে সমস্বরে সমতালে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন, তাতে বুঝলাম, মোহান্তজী যে নর্মদা ভজনটি গাইবার উপক্রম করছেন সেটি সকলেরই জানা। মোহান্তজী ভজন আরম্ভ করলেন—

হৈঁ রেবা, মাইয়া নর্মদে হৈঁ তেরে আধার।
রূপ অনুপম ভবভয়হারা, মহিমা অমিত অপার॥
শম্ভুলোকসে ধারা আই, মেকল পর্বত তীর্থ বনাই।
অমরকণ্ঠ জগ কীরতি ছাই, হোবে জয় জয়কার॥
হৈঁ রেবা, মাইয়া নর্মদে হৈঁ তেরে আধার।

শংকর তুম্হেঁ মহাবর দান্হে, তুম কঙ্করকো শংকর সম কীন্হে।
ভক্তন্ কো নিজ সেবক চীন্হে, কিয়া জগৎ উদ্ধার॥
মাতু নর্মদে তুম্হে মনাউঁ, তুম্হরী কিরূপা বিমলমতি পাউঁ।
শিব সরিতে তেরে গুণ গাউঁ, করদে বেড়া পার॥
হৈঁ রেবা, মাইয়া নর্মদে হৈঁ তেরে আধার॥

ভজন করতে করতে সকলের মধ্যে যেন জোস্ অর্থাৎ নূতন শক্তি ও উদ্দীপনা জেগে উঠেছে, চলার গতিও যেন সকলের বেড়ে গেছে! চলতে চলতেই তাঁরা পায়ে এবড়ো খেবড়ো পাথরের উপরেই তাল ঠুকতে ঠুকতে ঝঙ্কার তুলছেন—'হৈঁ রেবা, হৈঁ মাইয়া।' শ্রমিকরা যেমন কোন কঠিন গুরুতর কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে বলে উঠে, 'হেঁই মারো মারো

টান হেঁইয়ো', তেমনি এঁরাও মাঝে মাঝে এক একটি স্তবক শেষ হলেই সমবেত কণ্ঠে গমকে গমকে ঝঙ্কার তুলছেন—হৈঁ রেবা, হৈঁ মাইয়া, মাইয়া হো! আমি এই ভজন শুনিনি, মুখস্থও নাই, রৌদ্রের তাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বলে কোনও রসও পাচ্ছি না, কিন্তু অপর বঙ্গ সন্তান যতীন্দ্রকেও দেখছি তিনিও নাগাদের সঙ্গে সমান তালে মেতে উঠেছেন। প্রায় ঘণ্টা খানিক পরে ভজনও শেষ হল, লক্ষ্মণভারতীও চেঁচিয়ে বললেন—ইহ্ জঙ্গলবাড়া হৈ। মোহান্তজী বললেন—এখানে দু-চারটে ঘর-বাড়ী দেখা যাচ্ছে, জঙ্গলও তত ঘন মনে হচ্ছে না, কাজেই আজকের মত এখানেই যাত্রা বিরতি করা হোক। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যে যার ঝোলা কম্বল রেখে মোহান্তজীকে আড়াল করে এক একটা গাছের আড়ালে বসে গাঁজাতে দম দিতে মনোনিবেশ করলেন। বেচারারা কিন্তু আরাম করে সুখটান দিবার সুযোগ পেলেন না। লক্ষ্মণভারতীজী সকলকে তাড়া দিয়ে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং কয়েকজনকে লিট্টি পাকানোর কাজে নিয়োগ করে বসলেন। মোহান্তজী, যতীন্দ্র, আমি এবং দুজন পণ্ডিত মশাই, এই পাঁচজন বাদে আর সকলেই যে যাঁর কাজে ব্রতী হয়েছেন। আমরা একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে আছি এমন সময় একজন পাহাড়ী লোক আমাদের কাছে এসে মোহান্তজীকে বললেন—গোড় লাগি মহারাজ। কাঁহাসে আরহে? মোহান্তজীর মুখ শুকিয়ে গেছল তাকে দেখে। তার মুখে হিন্দী বুলি শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে লোকটা ভীল নয়। তিনি হেসে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি জানাল যে, সে এই গ্রামেরই লোক, ওয়াঞ্চি, তার গায়ে ত্রিশখর ওয়াঞ্চির বসতি।

—ইধর, কোঈ শিবজীকী মন্দির নেহি?

লোকটি তাদের কুটীরগুলির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'আমাদের কুটীর পেরিয়ে একটি শিবমন্দির আছে, তবে বহু পুরাণো পাথরের মন্দির, তবে কতকাংশ ভেঙে ভেঙে পড়ছে, আমরা গরীব আদমী, মন্দিরের মেরামত করতে পারছি না। ঐ মন্দিরে 'করপাত্রী বাবা' থাকেন। বিলকুল নাঙ্গা, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সর্বকালেই তাঁর একই বেশ। যখন যা জোটে, তা হাতেই গ্রহণ করে ভোজন করেন। কোনদিন যদি কিছু না জোটে, তাহলে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করেন না। পৌঁছে হুয়ে মহাত্মা হৈ।'

—ইধর বাঘ, ভাল্লু, আদি জানোয়ার কা কোঈ ডর হ্যায়?

—হ্যায় ত জরুর। ইয়ে শূলপাণি ঝাড়ি মেঁ বাঘ, ভাল্লু, চিতা লেপার্ড (নেকড়ে বাঘ) সব কুছ হ্যায়। পহেলে পহেলে হররোজ লেপার্ড আতা থা। গাউ, ভৈস্, বালবাচ্চাকো লিয়ে বহোৎ খতরনাক থা, কাত্না লেড়কাকো বিনাশ ভি কিয়া। লেকিন পাঁচ সাল হো গয়া, যব সে করপাত্রী বাবা ইধর আয়া তবসে বাঘ, ভাল্লুকা উপদ্রব কমতি হো গয়া।

ধুনি জ্বালাবার মত শুকনো কাঠ নিয়ে লক্ষ্মণভারতী এবং অন্যান্য নাগারা পৌঁছে গেছেন। তাঁরা পাঁচ ছ'টা ধুনি সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যারা লিট্টি পাকানোর কাজে ব্রতী ছিলেন, তাঁরা লিট্টি তৈরী করে আগুনে সেঁকছেন ঘন ঘন উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে।

মোহান্তজী খোঁজ নিয়ে জানলেন মাত্র পাঁচটি লিট্টি তৈরী হয়েছে। তিনি সংক্ষেপে করপাত্রী বাবার পরিচয় লক্ষ্মণভারতীকে দিয়ে একটা শালপাতা ধুয়ে তাতে পাঁচটি লিট্টি নিয়ে আমাকে বললেন—তুমি তোমার কমণ্ডলুটা হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে এস। সেই পাহাড়ী লোকটি আমাদের সঙ্গে চলল। কতকগুলি বড় বড় শালগাছ মহুয়া ও কেঁদ গাছ অতিক্রম করে আমরা তাদের কুটীরগুলির কাছে এলাম। কালো মাটির দেওয়াল দেওয়া নিচু ছোট ছোট ঘরগুলি, এক কুটীরের চালার সঙ্গে অন্য কুটীরের চালা লেগে আছে, ফাঁকা ফাঁকাভাবে বাড়ী তৈরী করতে এরা জানে না; এক বাড়ীর দেওয়ালের সঙ্গে অন্য গৃহস্থ চালা বেঁধেছে অন্য দিকে মুখ করে। ছোট বড় পাথর পড়ে আছে পল্লীর সীমানা ধরে। এই তাদের গাঁ অকলবাড়া।

কুটীরগুলি পেরিয়েই ছোট্ট একতলা পাথরের শিবমন্দিরটি দেখতে পেলাম একটি বেলগাছের তলায়। পাশে একটি অশ্বত্থ গাছও আছে। মন্দিরের পাথরে পুরু শেওলা, অশ্বত্থ গাছের শিকড় মন্দির গাত্র ভেদ করে দেওয়ালের ভিতরে বাইরে চারিয়ে গেছে। মন্দির গৃহের বাইরে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের বড় বড় সাইজ করা পাথর দেখে অনুমান করলাম, কোনকালে হয়ত এখানে বিশাল শিবমন্দির ছিল, মণ্ডপ, ভোগ-গৃহ নাটমন্দির ইত্যাদি ছিল। শিবের ঘর বলে যেটি দেখতে পাচ্ছি, এইটা হয়ত ছিল সেই বিরাট শিবমন্দিরের গর্ভগৃহ। এইটুকুই শুধু টিকে আছে, আর সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

মোহান্তজী ও আমি শিবের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। উঁকি মেরে দেখলাম, ঘরের মধ্যে শিবলিঙ্গের পাশেই দিগম্বর সেই মহাত্মা বসে আছেন। নমো নারায়ণায়, নমো নারায়ণায় বলতেই সেই মহাপুরুষ ঘরের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। প্রায় সাড়ে ৬ ফুট দীর্ঘদেহী মহাপুরুষের বিশাল কলেবর দেখে আমার মনে হল, আমাদের সামনে তৈলঙ্গস্বামী এসে দাঁড়িয়েছেন, তৈলঙ্গস্বামীর মতই গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা। চোখ দুটি আপেলের মত। মাথায় বিরাট টাক। তাঁর আপাদ-মস্তক নাঙ্গা দেখে আমি স্তম্ভিত হলাম। কম্বল কাঁথা দূরের কথা এক টুকরো নেকড়াও শিবের ঘরে দেখলাম না। মন্দিরের দরজাও নাই। বৃষ্টি হলে এ ঘরে জল ঢোকে, দেওয়াল বেয়ে জলও পড়ে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সবই তাঁর শরীরের উপর ভাঙে সন্দেহ নাই।

বাইরে বেরিয়ে এসেই তিনি মোহান্তজীকে বললেন—জাকে রথ পৈ কেশো? তাকুঁ কৌন্ অঁদেশো? অর্থাৎ যাঁর রথের উপর স্বয়ং হৃষিকেশ, তাঁর আবার ভয় কাকে? তাঁর কাছে বিদেশ কোন্টা? মোহান্তজী করজোড়ে নিবেদন করলেন—আশীর্বাদ দিজিয়ে।

—য়হ্ আশীর্বাদ হ্যায় মেরী। শুভকর্ম করনে মেঁ ন করো দেরী। যো কল করোগে সো আজ কর। যো আজ করোগে সে আভি করো।

মোহান্তজী অতি বিনম্রভাবে তাঁকে ভিক্ষা দিতে চাইলেন, তিনি প্রসন্ন বদনে তখনই ডান হাতটি পাতলেন, মোহান্তজী 'নমো শিবায়' বলে একটি লিট্টি তাঁর হাতে দিলেন। একটি লিট্টিই কেবল তাঁর হাতে ধরল, এর বেশী তাঁর হাতে ধরবে না, তিনিও নেবেন না। জলদগম্ভীর কণ্ঠে 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' গীতামন্ত্র উচ্চারণ করে লিট্টিটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে লাগলেন। তাঁর খাওয়া শেষ হতেই মোহান্তজীর ইঙ্গিতে তাঁর হাতে একটু একটু করে জল ঢেলে দিলাম। তিনি জল পান করে মোহান্তজীকে বললেন, শালপাতার বাকী চারটি লিট্টি আমাদের পথ প্রদর্শক সেই 'ওয়াঙ্কি' লোকটিকে দিয়ে দিতে। মোহান্তজী লোকটির হাতে খাবার দিতেই করপাত্রী বাবা বলে উঠলেন—নমো শিবায় বলো বেটা। নমো শিবায় বলো। শিব স্বরূপাৎ অপরং ন কিঞ্চিৎ। মোহান্তজী লজ্জা পেলেন—তিনি পাহাড়ীটির কাছে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন—নমো শিবায়, নমো শিবায়।

আমরা তাঁকে পুনরায় প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলাম আমাদের সেই গাছতলার আস্তানায়। যতীন্দ্রের কাছে জানলাম সাড়ে তিনটা বেজেছে। আহার প্রস্তুত। আমরা সবাই খেতে বসলাম। মোহান্তজী সংক্ষেপে সকলকে জানালেন—আমরা একজন প্রকৃত মুক্তপুরুষকে দেখে এলাম। যেন দ্বিতীয় তৈলঙ্গস্বামী। সম্পূর্ণ দিগম্বর বেশ, একেবারে নিরাবরণ। শরীর রক্ষার কোন চেষ্টাও নাই। যখন যা অনায়াসে মিলে তাই তিনি করপাত্রে গ্রহণ ও ভোজন করেন, পিপাসা পেলে নর্মদায় গিয়ে করপাত্রেই জলপান করেন। সামান্য একটা জলপাত্রও কাছে নাই। মনে হয় সর্বদাই তিনি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন আছেন। তোমরা সন্ধ্যার আগেই শৈলেন্দ্রনারায়ণজীর সঙ্গে এই করপাত্রীজীকে দর্শন করে আসবে।

ভোজনের পর আমরা প্রত্যেকেই গাছের তলায় ছায়া খুঁজে বিশ্রাম করতে লাগলাম। বেলা বোধহয়, সাড়ে পাঁচটার সময় দেখলাম, সেই করপাত্রীজী আমাদের আস্তানার পাশ দিয়ে নর্মদার ঘাটের দিকে যাচ্ছেন। মোহান্তজীসহ আমরা সকলে শশব্যাস্ত উঠে দাঁড়িয়ে নতমস্তকে নমো নারায়ণায়, নমো নারায়ণায় বলে অভিবাদন করতে থাকলাম, মোহান্তজী করজোড়ে তাঁকে আবাহন জানালেন। কিন্তু তিনি কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। যেন জড়ের ন্যায়, বধিরের ন্যায় এবং ভূতাবিস্টের ন্যায় আপনমনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নর্মদার জলে। আমরা এতগুলি লোক একসঙ্গে জোড়া চোখ দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেও তাঁকে দেখতে পেলাম না। আমরা অগত্যা বসে পড়লাম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। লক্ষ্মণভারতীজী ধূনিগুলি জ্বালাবার জন্য উদ্যোগ করছেন, এমন সময়ে হর নর্মদে বলতে বলতে মহাপুরুষ আমাদের কাছে এসে একটা পাথরের চাট্টানের উপর বসলেন। তাঁর গা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। বসেই বললেন—
'এ্যাত্‌না গরমী মেঁ ধূনিকা জরুরৎ। কোঈ জানোয়ার ইধর ঘুষেগা নেহি।' তাঁর কথা শুনে মোহান্তজী লক্ষ্মণভারতীকে ধূনি জ্বালাতে নিষেধ করলেন। মোহান্তজী করপাত্রীজীকে করজোড়ে নিবেদন করলেন—মহারাজ উস্ বখৎ আপনে যো উপদেশ দিয়া থা উস্‌কা মতলব ক্যা, থোড়া রোশনী ডালিয়ে। তিনি বলতে লাগলেন—যো কাল করোগে সো আজ করো, যো আজ করোগে সো আভি করো, ইস্‌কা মতলব এহি হ্যায়, কাল তুমহারা দিল

মেঁ এহি ভাবনা থা, ইধর আকর সংকটনাশন ভৈরব কা পূজা করনেকে। কেঁওকী তুমহারা গুরুজী বোলতা থা, সংকটনাশন ভৈরবকো কোঈ শিবলিঙ্গমেঁ পূজা করনেসে সঙ্কট নাশ হো যাতা হৈ। ভীলোঁকা ডরসে তুম্‌লোগ হরবখৎ তড়পাতা হৈ। ভীলসে বাঁচনেকে লিয়ে তুম্ চাহ্‌তা থা সংকটনাশনজীকো পূজা করোগে। নর্মদা তটমেঁ যো সংকল্প হৃদয়মেঁ জাগতী হৈ, উস্‌কা ফৌরণ পূরণ করনা উচিৎ হ্যায়। লেকিন্ দো দফে তুম ভীল লোগোঁসে আচ্ছা ব্যাভার (ব্যবহার) পানে সে সংকটনাশন ভৈরবকো পূজা নেহি কিয়া। আভি শোচতে হো পেণ্ড্রা ইয়া কোটেশ্বরমেঁ পৌঁছকে তুম্ পূজা করোগে। শুভকর্মমেঁ এ্যায়সা টাল-বেটাল করনা উচিত নেহি হ্যায়। ইসীকা নাম দীর্ঘসূত্রতা।

তাঁর কথা শুনে আমরা সকলেই বুঝলাম, অন্তর্যামী মহাপুরুষ মোহান্তজীকে দেখা মাত্রই তাঁর সমগ্র অন্তরপট, সেখানকার ভাব-ভাবনা সবই অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছেন। আমরা একসঙ্গেই এতদূর রাস্তা এলাম, তাঁর বা যে কোন লোকের মনের মধ্যে কখন কি সঙ্কল্প জাগছে, তা বুঝব কি করে? যাই হোক, করপাত্রীজী তাঁর উপদেশের মর্ম আরও স্পষ্টতর করার জন্য রাবণের দৃষ্টান্ত টানলেন। তিনি বলতে লাগলেন—রাবণের তিনটি শুভ সঙ্কল্প ছিল। প্রথম ইচ্ছা ছিল স্বর্গ পর্যন্ত সিঁড়ি নির্মাণ করে দিবেন যাতে পাপীতাপী সকলেই অতি সহজে স্বর্গে গিয়ে স্বর্গবাস করতে পারে। তাঁর দ্বিতীয় ইচ্ছা ছিল, মেয়েদের রান্না করতে আগুনের ধোঁয়াতে কষ্ট হয় বলে তিনি অগ্নিকে ধূমশূন্য করে দিবেন এবং তাঁর তৃতীয় ইচ্ছা ছিল, সুবর্ণকে সুগন্ধিযুক্ত করে দিবেন। তাহলে মেয়েরা এক টুকরো সোনার অলঙ্কার পরলেই তাঁদের গাত্র সুগন্ধিত হয়ে উঠবে, আর কোন পৃথক প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবহার তাঁদেরকে আর করতে হবে না। 'আজ করি, কাল করি' করতে করতে দীর্ঘসূত্রতার জন্য ঐ শুভকাজগুলি তিনি করে উঠতে পারলেন না। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে গেল, তিনি নিহত হলেন। এইজন্য কথায় আছে—শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণং। রাবণ অশুভকর্ম সীতাহরণ করতে বিলম্ব করলে সবংশে এত শীঘ্র নিধনপ্রাপ্ত হতেন না। এইজন্য নীতিশাস্ত্রে উপদেশ দিয়েছেন, শুভকর্ম যতশীঘ্র সম্পন্ন করা যায় ততই মঙ্গল, আর অশুভ কর্মের অনুষ্ঠানে যত বিলম্ব করা

যায় ততই মঙ্গল, আদৌ না করলে আরও ভাল। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে এইজন্যই একটি কথা আছে—শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। শ্রেয়োকর কাজে অনেক বাধা আসে, এমনকি দেবতারাও বাধা দিয়ে থাকেন। এর উদাহরণ, দৈত্যরাজ বলির দান যজ্ঞে স্বয়ং গুরু শুক্রাচার্যও বাধা দিয়েছিলেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন বলিকে নিবৃত্ত করতে। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, স্বয়ং হৃষিকেশ বামনবটু রূপে বলির কাছে এসে দান চাইবেন এবং নির্বিচারে সর্বস্ব দানে প্রতিশ্রুত হয়ে বলি বিপন্ন হবেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের সততপরত একটি কথা চিন্তা করা উচিত যে, গুরুর চেয়ে এ জগতে মানুষের আর কেউ শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকামী নাই। গুরু তাঁর শিষ্যকে শুধু ভগবৎ প্রাপ্তিরই প্রত্যক্ষ হদিস্ দেন না, সর্বদাই সাংসারিক সমস্যা এবং ভাবী অমঙ্গল হতেও রক্ষা করে চলেন। বলির পাতাল গমন রুখবার জন্য গুরু হিসাবে শুক্রাচার্য কম চেষ্টা করেন নি।

এই বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চট্‌পট্ উঠে দৌড়ে চলে গেলেন অন্ধকারের মধ্যে। আমরা কেউ-ই প্রণাম করারও সুযোগ পেলাম না। যতীন্দ্র বলে উঠলেন—অদ্ভুত ত! পার্বত্য পথ, চারদিকে পাথরের ছোট বড় টুকরো পড়ে আছে। এখানে জঙ্গল তত ভয়ংকর না হলেও একেবারে যে জঙ্গল নাই, এমনও ত নয়। পথে হোঁচট খেয়ে পড়েও ত যেতে পারেন! ওঁর ভয় বলে কি কিছু নাই? মোহান্তজী একটি সুন্দর শ্লোকে যতীন্দ্রকে উত্তর দিলেন—

ধৈর্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিঃ প্রিয়াগেহিনী।
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃ সংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশো বিবসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনম্।
এতে যস্য কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাৎ ভয়ং যোগিনঃ॥

অর্থাৎ ধৈর্যই যাঁর পিতা, ক্ষমাই মাতা, শান্তিই প্রিয়া পত্নী, সত্যই যাঁর পুত্র, দয়াই যাঁর ভগিনী, মনের সংযমই যাঁর ভাই, ভূমিই যাঁর শয্যা, দিশাই বস্ত্র এবং জ্ঞান রূপ অমৃতই যাঁর ভোজন, এইসকল যাঁর কুটুম্ব সেই বিবেকী-যোগী কাকে বা কোন জিনিষকে ভয় করবেন?

আজ ৭ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি। চারদিক ঘুরঘুট্টি

অন্ধকার। মুক্ত আকাশের তলায় নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে আছি এতগুলি প্রাণী। একান্ত অসহায় অবস্থায় না পড়লে মানুষের মধ্যে ভগবদ্ নির্ভরতা জাগে না। আমি নিজের কথাই বলতে পারি, আমি স্বভাবতঃই Sceptic প্রকৃতির লোক। ঋষি-পিতা শৈশব থেকে আমার মধ্যে আস্তিক্য বুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য কত রকমভাবে চেষ্টা করেছেন। মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, বেদ পাঠ প্রভৃতি করিয়েছেন, সর্বোপরি চোখের সামনে দেখেছি তাঁর ঋষি জীবন। তবুও সর্বাবস্থায় ঐকান্তিক ভগবদ্ নির্ভরতা যে জাগেনি, একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে। তবে অন্যান্য তীর্থভ্রমণে যা হয় নি, এই নর্মদা পরিক্রমায় বেরিয়ে যখন দুর্গম মহারণ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি, তখন একবার দুবার নয়, বহুবারই অভাবনীয় রূপে আমি রক্ষা পেয়েছি। তারফলে নিজ গুরু ও ইষ্টে আমার অচলা ভক্তি জন্মেছে। তাই আজও এই নির্জন পরিবেশে আমার মনে কোন ভয় আসছে না। অন্ধকারে কেউ কাউকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তবুও অনুমান করলাম, সকলেই নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র জপে নিরত আছেন। রাত্রি প্রায় ন'টা সাড়ে ন'টা হবে, সেই জপ সেরে লক্ষণভারতী মোহান্তজীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন—এত অন্ধকারের মধ্যে কাছেই জঙ্গল, ধূনি না জেলে আমার মনে খুব অস্বস্তি হচ্ছে। মনে এত উদ্বেগ নিয়ে ঘুমাতে পারছি না। এখানে একটা শিবমন্দির থাকলেও বুকে ভরসা থাকত। আপনি অন্ততঃ দুটো ধূনি জ্বালার অনুমতি দিন, স্বয়ং গুরুজীও পরিক্রমায় বেরিয়ে ধূনি না জেলে কোথাও থাকতেন না।

মোহান্তজী কোন উত্তর দিবার পূর্বেই অন্ধকারের মধ্য থেকেই কেউ যেন বলে উঠলেন—'নেহি জী, নেহি জী। আপ লোগোকেঁ লিয়ে হম্ হুকল-বাড়ামেঁ মঁ্যয় জিম্মাদার হুঁ। কোঈ ডর নেহি। আপলোগ্ নিশ্চিন্ত হোকর লেট্ যাইয়ে।' এ যে করপাত্রীজীর কণ্ঠস্বর! তিনি বলে চললেন—আরে লছমন ভেইয়া, সাধু ভেসমেঁ হ্যায়, বুঢ্ঢাভি হো গয়ে। আভি তক্ মা নর্মদাকী উপর ভরোসা কেঁও ন রাখতে হো। আপলোক তো মাঈয়াকো গোদমেঁই হো। কোই লোগ তো নিরাকার ব্রহ্মাকা উপাসনা করতে হৈঁ, ঔর কোই রাম কৃষ্ণ নৃসিংহ আদি অবতারোঁ ঔর গুরুকে রূপমেঁ নিরাকার ব্রহ্মকো উপাসনা করতে হৈঁ, কিন্তু হম্ তো ত্রিতাপোঁ সে সন্তপ্ত হৈঁ। তাপ

সে সন্তপ্ত প্রাণীকে লিয়ে নীর হি একমাত্র আশ্রয় হৈ, অতঃ হম্ অপনে তাপোঁ কো শান্ত করনে নীরাকার ব্রহ্ম কো জো দ্রব রূপমেঁ বহা রহে হৈঁ, উন্হীকো উপাসনা করতে হৈঁ। ক্যা সমঝা কি নেহি সমঝা? শোচিয়ে, শ্রীগঙ্গাজী বিষ্ণু পাদাব্জ সম্ভূতা হৈঁ। উনকে চরণো সে নিকলী হৈঁ। নারদজীকে সুমধুর সঙ্গীতকো শুনকর স্বয়ং সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম হী পিঘলকর দ্রবীভূত রূপমেঁ গঙ্গাজী বনগয়ীঁ। ইসী প্রকার স্বয়ং সাক্ষাৎ শংকর ভগবান জব্ তাণ্ডব নৃত্যমেঁ লল্লীন হো গয়ে তো উনকে শ্রীঅঙ্গসে স্বেদরূপমেঁ ভগবতী নর্মদাজী প্রগট্ হো গয়ী। অতঃ নর্মদাজীমেঁ ঔর শংকরজীমেঁ কোই ভী ভেদ নহী। নর্মদাজীকো উপাসনা শংকরজীকো হি উপাসনা হৈ। ইধর নর্মদাজী হ্যায় তো সমঝ লো শংকর ভগবান ভী বিরাজমান হৈ।

অদৃশ্য পটভূমি হতে কণ্ঠস্বর নীরব হতেই আমি এবং লক্ষ্মণভারতী একসঙ্গে টর্চ টিপে চারদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। মোহান্তজী অদৃশ্য বক্তার উদ্দেশ্যে নতজানু হয়ে প্রণাম নিবেদন করতে আমরাও প্রত্যেকে নতজানু হয়ে প্রণাম করলাম। মোহান্তজী বললেন— লছমন ভেইয়া শুনলে ত করপাত্রীজী বলছেন উনি আমাদের 'জিম্মেদার' রইলেন আজকের রাতের মত। তাঁর দিব্য কণ্ঠস্বর শুনেও কি বুঝতে পারছো না, উনি কতবড় অলৌকিক যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ! ওঁর অনুজ্ঞা না মানলে স্বয়ং গুরুজীই হয়ত আমাদের উপর বিরূপ হবেন। এই বলে 'জয় গুরু', 'হর নর্মদে' বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন। একে একে সকলের সঙ্গে আমিও শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, নর্মদাতটে এইরকম কতই না জানি সিদ্ধ মহাযোগী বাস করছেন। আজ এঁর কাছে এক নূতন তত্ত্ব শুনলাম, এতদিন সকলের মুখেই শুনে এসেছি, শিবের স্বেদ সম্ভূতা মা নর্মদা শিবপুত্রী। অমরকণ্টকে নর্মদা-উদ্গম মন্দিরে দেখে এসেছি, নর্মদা প্রকট হয়েই সামনে অমরকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শিবতপস্যা, শিবধ্যানেই মগ্ন। অর্থাৎ শিব উপাস্য, নর্মদা তাঁর উপাসিকা। এইমাত্র দিগম্বর করপাত্রীজী শোনালেন যে শিব ও নর্মদার মধ্যে কোন ভেদ নাই। নর্মদার পূজা করলেই শিবের পূজা হয়। নিরাকার পরব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবের নীরাকার রূপ হলেন নর্মদা। এই অভেদ দৃষ্টি ও অদ্বৈত বোধই সাধনার চরম অনুভূতি সন্দেহ নাই। আমি

নর্মদাতটবাসী সকল মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, তখন দেখি, অধিকাংশ নাগাই প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে পুনরায় যাত্রার উদ্যোগপর্ব করছেন। আমিও তাড়াতাড়ি ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে প্রাতঃকৃত্য সারতে গেলাম। ঘাটে গিয়ে দেখি মোহান্তজী স্নান করতে নেমেছেন। এত সকালে স্নান করতে ইচ্ছা হল না। আমি নর্মদাকে প্রণাম ও স্পর্শ করে ফিরে এলাম গাছতলায়।

মোহান্তজী নর্মদাঘাট হতে স্নানান্তে ফিরে আসার পরেই আমাদের যাত্রা সুরু হল। শিঙ্গা, ডম্বরুর বাজনার সঙ্গে মোহান্তজী জয়ধ্বনি দিলেন—গুরু মহারাজ চৈতন্যভারতীজীকো জয় হো, পরমগুরু কমলভারতীকো জয় হো, অবধূত স্বামী করপাত্রী বাবাকো জয় হো। আমরা সকলেই তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জয়ধ্বনি দিলাম। হঠাৎ মোহান্তজী করপাত্রীজীর জয়ধ্বনি দিতে আমি আশ্চর্য হলাম। তিনি তাঁর গুরু ও পরমগুরুর জয়ধ্বনি দিবেন এটা স্বাভাবিক; কিন্তু তাদের সঙ্গে সমমর্যাদায় অকলবাড়ার মহাত্মার শুধু জয়ধ্বনিই দিলেন না, তাঁর বিশেষণরূপে ব্যবহার করলেন, 'অবধূত'। চতুরাশ্রমের যিনি অতীত, যিনি সর্বদা তুরীয়াতীত ভূমিতে বিচরণ করেন সেই উচ্চতম কোটির যোগীকেই সাধারণতঃ অবধূত বলা হয়। কাল রাত্রিতে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্যলোক হতে তাঁর উপদেশবাণী শুনেই বোধহয় তিনি করপাত্রীজীর যোগস্থিতি নির্ণয় করতে পেরেছেন। আমরা কিন্তু ক্রমশঃ একটু একটু করে জঙ্গল পথে প্রবেশ করছি বলে মনে হচ্ছে। পার্বত্যপথ ক্রমেই কঠিন হতে কঠিনতর হচ্ছে। বড় বড় শাল, সালাই, কেঁদ, হরিতকী গাছের সংখ্যা আমাদের সংকীর্ণ চলার পথকে ক্রমশঃই ঢেকে ফেলছে বলে মনে হল। তবে ইতিপূর্বে যেসব ভীষণ জঙ্গল অতিক্রম করে এসেছি তার তুলনায় একে জঙ্গলপথ বলা চলে না। পথে বড় বড় পাথর অজস্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সন্দেহ নাই। এইরকম পথে প্রায় তিনঘণ্টা হেঁটে আমরা পেণ্ড্রাতে এসে পৌঁছলাম। যে তটরেখা ধরে আমরা হাঁটছি নর্মদার মূলধারা সেখান থেকে অনেক নিচে। বাঁদিকে পায়ে চলার অস্পষ্ট দাগ লক্ষ্য করে মোহান্তজী বললেন—'এই রাস্তা ধরে আমরা নর্মদা কিনারে নেমে গেলে কোটেশ্বর ঘাটে পৌঁছে যাব। কোটেশ্বর শিব খুবই জাগ্রত। চল ঐখানে আমরা কোটেশ্বরের পূজা ও ভোজনাদি সেরে দেবলির দিকে যাত্রা করব। ক্যা

লছমন্ ভেইয়া তুম রাজী হ্যায় ত? কাল দুপহর বীত জানেকা বাদ দো লিট্টি ভোজন করায়া। দো লিট্টিসে ক্যাতনা তাগদ হোগা?

—তব চলিয়ে কোটেশ্বরমেঁ।

চলার রাস্তায় পাথরের উপরে পলিমাটির আস্তরণ পড়ে আছে। গাছের গোড়াতে দু'তিন হাত পর্যন্ত এখনও পলিমাটির দাগ। বর্ষাকালে নর্মদার জল এসে যে এসব স্থান ডুবিয়ে দেয় বুঝতে পারলাম। প্রায় মাইলখানিক পথ এই রকম রাস্তায় হেঁটে এসে জঙ্গলের মধ্যে কোটেশ্বরের মন্দির চোখে পড়ল। বড় বড় গাছপালায় ঢাকা বলে কোটেশ্বরের প্রস্তর নির্মিত সুপ্রাচীন মন্দির তট থেকে চোখে পড়ে না। মন্দিরের গর্ভগৃহের আয়তনের চেয়ে মন্দিরের বারান্দা অনেক বেশী প্রশস্ত। বারান্দা থেকে প্রশস্ত বাঁধানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে। আমি ভাবছি, কাল যেমন অকলবাড়াতে ছিলাম, আজ যদি এখানেই মোহান্তজীর রাত্রিবাসের মর্জি হয়, তাহলে এই সিঁড়ির ধাপেই স্বচ্ছন্দে আমরা ত্রিশজন শুয়ে থাকতে পারব। পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখলাম নর্মদার কিনারে কিনারে ঘনঘোর জঙ্গল চলে গেছে মাইলের পর মাইল ব্যেপে। আমরা যে রাস্তা ধরে অকলবাড়া থেকে পেণ্ড্রাতে এলাম, সেই রাস্তা বরং অপেক্ষাকৃতভাবে কম জঙ্গলাকীর্ণ। আমি মোহান্তজীকে সেই জঙ্গল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আমাদেরকে ঐ ঘনঘোর জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হবে, না, পেণ্ড্রা এসেছি যে রাস্তা ধরে, সেই পথে উঠে গিয়ে হাঁটতে হবে। মোহান্তজী হেঁসে বললেন—হাতনোরার কুন্তাসঙ্গম, মালসঙ্গম, বড়ালদা, সিমরদা, অকলবাড়া প্রভৃতি অতিক্রম করে যে পেণ্ড্রা পর্যন্ত এলাম, তাকে নর্মদার তট বলে বললেও আসলে আমরা বিন্ধ্যপর্বতের ঢাল দিয়ে এসেছি। তাই জঙ্গল দূরে দূরে ছিল। এখানে বিন্ধ্যপর্বতের অংশ ছোট ছোট পাহাড়শ্রেণী নেমে এসেছে নর্মদার কিনারা পর্যন্ত। জঙ্গলও তাই ঘন হয়ে ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। পেণ্ড্রা হয়ে গেলে বড় জোর আর পাঁচমাইল সেই পথে দেবশিলা পর্যন্ত যেতে পারব, দেবশিলা থেকে পুনরায় এই ভয়ংকর জঙ্গলের রাস্তাই ধরতে হবে। ঐ যে দুর্গম ভীষণ জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, এই জঙ্গলেরই নাম হাপেশ্বরের জঙ্গল। আসলে হাপেশ্বরের জঙ্গলও শূলপাণির ঝাড়িরই অন্তর্গত; বরং বলা যায় শূলপাণির ঝাড়ির দুর্গমতম এবং ভয়ংকরতম অংশ। পরিক্রমাবাসীদের শতকরা পঁচানব্বই জনই অমরকণ্টক থেকে দক্ষিণ তট

দিয়ে পরিক্রমা করে থাকেন। বিভিন্ন নাগা সম্প্রদায়ের যেসব নাগারা শত শত সংখ্যায় 'খাড়ি পল্টন' গঠন করে নর্মদা পরিক্রমা করেন, তাঁরাও দক্ষিণ-তট ধরে পরিক্রমা করেন।

এই শূলপাণির ঝাড়ি যেমন উত্তরতটে আছে, তেমন দক্ষিণতটেও আছে। উভয় তটেই এই জঙ্গল সুবিস্তৃত। দক্ষিণতটের শূলপাণির ঝাড়ি অতিক্রম করে তাঁদের অধিকাংশ ওপারে বিমলেশ্বরে এসে পরিক্রমা সমাপ্ত করেন। যাঁরা জলেহরি পরিক্রমা করতে চান, তাঁরাই কেবল বিমলেশ্বরের কাছে সমুদ্র অতিক্রম করে উত্তরতটে হরিধামে এসে পৌঁছান এবং সেখান থেকে হাপেশ্বরের জঙ্গল অতিক্রম করে উত্তরতট ধরে পুনরায় অমরকণ্টকে পৌঁছে নর্মদা-উদ্‌গম মন্দিরের মধ্যে কোটিতীর্থের ঘাটে গিয়ে কড়াই প্রসাদ অঞ্জলি দিয়ে পরিক্রমা সমাপ্ত করেন। এই রকম কোন কোন পরিক্রমাবাসী বলে গেছেন যে এই কোটেশ্বরে এসে শূলপাণির ঝাড়ি শেষ হয়। দুঃখের কথা, তাঁদের একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। তুমি ত নিজের চোখেই দেখেছ লোহাচ্যার রেবাকুণ্ড, মাণ্ডবগড় কেল্লা, দহি প্রভৃতি জঙ্গল কী ভীষণ দুর্গম ও ভয়াবহ। যদি এখানেই শূলপাণির জঙ্গল শেষ হয়, তাহলে সে সব ভয়ঙ্কর জঙ্গল কি জঙ্গল নয়? সে সব স্থান কি শূলপাণির ঝাড়ির বাইরে কোন অঞ্চল, না আলাদা কোন জঙ্গল? আর একটা কথাও শুনে রাখ, এই নর্মদা কিনারে পাঁচটি কোটেশ্বর পড়ে। এক—এইটি, দুই—দক্ষিণতটে সিনোদরা গ্রামের নিকট অনুসূয়া মাতার সম্মুখে, তৃতীয়—কোটেশ্বর মশানিয়া, চতুর্থ—ওঁকার-তীর্থের সন্নিকটে কাবেরী সংগমের কিছু নিম্নে কোটেশ্বর, পঞ্চম—এই উত্তর-তটেই গুজরাটের মধ্যে ব্যাসতীর্থের কাছাকাছি মালথা গ্রামের কোটেশ্বর। এখন চল, আমাদের লছমন ভেইয়া তার খাড়ি পল্টন নিয়ে কি করছে দেখি। তুমি যতীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে স্নান করে এসে কোটেশ্বরের পূজা কর।

আমি যতীন্দ্রের সঙ্গে স্নান করতে গেলাম। যেতে যেতে দেখলাম, লক্ষ্মণভারতীজী ইতিমধ্যেই কাঠকুটো সংগ্রহ করে ফেলেছেন। লিট্টি পাকানোর আয়োজন চলছে। আমাদের সঙ্গে আরও আটজন নাগা স্নান করতে চললেন। এঁরাও আমার মত অকলবাড়াতে স্নান করেননি। স্নান তর্পণাদি সেরে আমি মন্দিরে ঢুকলাম পূজা করতে। ফুল বেলপাতা নাই, যতীন্দ্র চন্দন-পিঁড়ি বের করে চন্দন ঘুটে দিলেন। শিবলিঙ্গ দেখে আমি

স্তম্ভিত। গৌর লাল বর্ণের শিবলিঙ্গ, এখানে কোন গৃহী এসে নিত্যপূজা করে যান বলে মনে হল না। এই ঘোর জঙ্গলের ধারে গৃহ কোথায় যে গৃহী এসে পূজা করবে? কচিৎ কদাচিৎ বৎসরে একবার দুবার হয়ত পরিক্রমাবাসীরা এসে পড়লে হয়ত তাঁরাই পূজা করেন। সূক্ষ্ম লোকাচারী কোন দেবতা বা মহাপুরুষ যদি সূক্ষ্ম দেহধারণ করে পূজা করে থাকেন, তাহলে স্বতন্ত্র কথা, নতুবা কোটেশ্বর মহাদেব অপূজিত অবস্থাতেই পড়ে থাকেন বলে মনে হয়। তবুও তাঁর লিঙ্গের জেল্লা চেয়ে দেখবার মত; ঝকমক করছেন। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মন্ত্রপাঠ করে শিবলিঙ্গের মাথায় নর্মদার জল ঢাললাম। লিঙ্গগাত্র মার্জনা করতে গিয়ে হাত দিয়েই হাত সরিয়ে নিলাম, হাতে 'ছ্যাঁক্' করে তাপ লাগল! পাথরের মন্দিরের ভিতরে আছেন. এখানে সূর্যের কিরণ এসে পড়ছে না, তবুও তাপ এলো কোথা থেকে? আমি আবার কমণ্ডলুর জল ঢাললাম। আবার হাত দিতে গিয়ে দেখি সেই একই রকম তাপ! আমি মোহান্তজীকে ডাক দিলাম, তিনি গর্ভগৃহের বাইরেই বারান্দায় বসেছিলেন! আমি ডাক দিতেই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁকে শিবলিঙ্গের উষ্ণতার কথা বলতেই তিনি বললেন—আমি গুরুজীর সঙ্গে একবার পরিক্রমার সময় এই কোটেশ্বর মহাদেবের পূজা করেছি। তাঁর মুখেই শুনেছি, এই শিবলিঙ্গ আগ্নেয় লিঙ্গ। আগ্নেয় লিঙ্গের লক্ষণ হল—

আরুণং হিত্যা কীলালমুষ্ণস্পর্শং করোত্যলম্।
আগ্নেয়ং তচ্ছক্তিনিভমথবা শক্তিলাঞ্ছিতম্।
ইদং লিঙ্গবরং স্থাপ্য তেজসাধিপতির্ভবেৎ॥

অর্থাৎ আগ্নেয় লিঙ্গ অরুণ বর্ণের মত লাল হয়, করতলে উষ্ণস্পর্শ লাগে, লিঙ্গের মধ্যে হয় অর্ধনারীশ্বর বা শক্তির চিহ্ন স্পষ্টতঃ অঙ্কিত থাকবে। এই লিঙ্গ স্থাপন করে স্থাপয়িতা তেজের অধীশ্বর হন। কত হাজার বা লক্ষ বৎসর পূর্বে কে এই আগ্নেয় লিঙ্গ স্থাপন করে তেজসাধিপতি হয়েছিলেন, তা আমার জানা নাই, তবে একথা তুমি নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে নর্মদা পরিক্রমায় এসে এত কিছু জানছ এবং জানতে পারছ, অন্য কোন স্থান পর্যটন করে এত বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারতে না। একটা

সার কথা জেনে রাখ, কেউ যদি আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের সুবিপুল মহিমা জানতে চায়, তাকে নর্মদা তটে আসতেই হবে। তুমি ভগবান কোটেশ্বরকে চন্দন মাখিয়ে প্রণাম করে বাইরে এস। এই দুর্গম বন পথে প্রণামই আমাদের পূজা।

তিনি বাইরে বারান্দায় বসে জপ করতে লাগলেন। আমি ভাল করে চন্দন মাখিয়ে প্রণাম করতে করতে বললাম—

ওঁ শম্ভো শিব শিবাকান্ত শান্ত শ্রীকণ্ঠ শূলভৃৎ।
শশিভূষণ সর্বেশ শংকরেশ্বর ধূর্জটে॥
পিণাকপাণে গিরিশ শিতিকণ্ঠ সদাশিব।
মহাদেব নমস্তুভ্যং দেবদেব নমোঽস্তুতে॥
স্তুতিকর্তুং ন জানামি স্তুতিপ্রিয় মহেশ্বর॥
তব পদাম্বুজ দ্বন্দ্বে নির্দ্বন্দ্বা ভক্তিরস্তু মে॥

হে শম্ভো! শিব, শিবাকান্ত, শান্ত, শ্রীকণ্ঠ, শূলভৃৎ, শশিভূষণ, সর্বেশ, শংকরেশ্বর, ধূর্জটে, পিণাকপাণে, গিরিশ, শিতিকণ্ঠ, সদাশিব, হে মহাদেব! তোমাকে প্রণাম, হে দেবাদিদেব। তোমাকে প্রণাম। হে স্তুতিপ্রিয় মহেশ্বর! আমি স্তব করতে জানি না। হে ভগবান! তবুও আপনি যদি প্রসন্ন থাকেন তাহলে আপনার চরণকমলে আমার অবিচল ভক্তি উৎপন্ন হোক, এইমাত্র প্রার্থনা।

আমার প্রণাম শেষ হয়েছে এমন সময় লক্ষ্মণভারতীজী কতকগুলি শাল-পাতা পেতে লিট্টিভোগ রেখে গেলেন মহাদেবকে নিবেদন করার জন্য। মোহান্তজী বারান্দা থেকেই হেঁকে বললেন—আভি সাড়ে বার বজা। এক বাজনেসে মতীন্দ্র ভগবানকো ভোগ নিবেদন করেগা।

আমি দরজাটা আলতো করে টেনে দিয়ে মোহান্তজীর কাছে এসে বসলাম। মন্দিরের পিছনে এবং আশেপাশে নাগারা গাছের ছায়ায় বসে আছেন। এমন সময় পেণ্ড্রা হতে যে উৎরাই-এর পথে এই কোটেশ্বরের মন্দিরে নেমে এসেছিলাম, সেই দিক দিয়ে একদল লোককে নেমে আসতে দেখা গেল। আমরা মন্দিরের বারান্দায় বসেছিলাম নর্মদার দিকে মুখ করে, কাজেই আমাদের চোখে পড়ে নি। মন্দিরের পিছনে গাছ তলায় যে তিন

চারজন নাগা বসেছিলেন, তাঁরাই প্রথম দেখতে পায় তাদেরকে নেমে আসতে। তাঁরাই ছুটে এসে মোহান্তজীকে খবর দেয় যে একদল সশস্ত্র ভীলকে এদিকে আসতে দেখা যাচ্ছে। সংবাদ শুনেই মোহান্তজীর মুখ গেল শুকিয়ে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণভারতী উঁকি মেরে দেখেই মৃদু কণ্ঠে বললেন—'ভীল লোগ আ গয়ে। জয় কোটেশ্বর! হর নর্মদে, হর নর্মদে।' মন্দিরের পিছনে পৌঁছেই তারা হুঙ্কার তুলল মুক্ মুক্ মুক্। সমস্ত নাগাই তখন বারান্দায় এবং সিঁড়িতে জড় হয়েছেন। ভীলরা এসেই লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠেই এলোপাতাড়ি লাঠি চালাতে লাগল। কয়েকজন নাগা ত্রিশূলের খোঁচা মেরে বাধা দিবার চেষ্টা করেছিলেন, মোহান্তজী হাত জোড় করে তাদেরকে বলতে লাগলেন—হমারা যো কুছ হ্যায় লে যাও, হম দে দেতে হেঁ। লেকিন মার ডালো মৎ। লক্ষ্মণভারতীজী যেটুকু ভীল ভাষা জানেন তারই সাহায্যে চেঁচিয়ে বললেন মোহান্তজীর বক্তব্য। কিন্তু কে শুনে কার কথা! লক্ষ্মণভারতীকে ধরে তাঁর কাঁধের ঝোলা ছিনিয়ে নিয়ে তা উল্‌টিয়ে দেখতে লাগল। ঝোলার মধ্যে ছিল তাঁর একটি কৌপীন, একটা নেকড়াতে বাঁধা আধসেরটাক আটা এবং উনুন ধরানোর জন্য দুটো শুকনো ঘুঁটে। যে নাগারা তাদেরকে ত্রিশূলের খোঁচা মেরেছিল তাঁদেরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে সিঁড়ির ধাপ থেকে নিচে। ইতিমধ্যে প্রত্যেক নাগাই তাঁদের ঝুলি ঝেড়ে প্রত্যেকের সঞ্চিত সেই আধসেরটাক করে আটা তাদের পাতা একটা ময়লা কাপড়ে উপুড় করে ঢেলে দিতে লাগলেন। যে ভীল দস্যুটা লক্ষ্মণভারতীর ঝোলা উপুড় করে দেখছিল, সে তাঁর সেই ঘুঁটে দুটো ভেঙে গুঁড়ো করতে আরম্ভ করতেই তার ভিতর থেকে ঠং করে পড়ল দুটো গিনি। আর যায় কোথায়? প্রচণ্ড উল্লাসে মুক্ মুক্ শব্দে হুঙ্কার দিতে দিতে তারা তাঁকে চড়-চাপড় দিতে লাগল। যে ভীল দুজনকে ত্রিশূলের খোঁচা মারা হয়েছিল তাদের শরীরে রক্ত ঝরছে। তারা ক্রুদ্ধ আক্রোশে যাকেই হাতের কাছে পাচ্ছে তাকেই এলোপাতাড়ি লাঠিপেটা করছে। চারদিকে হৈ হৈ শব্দ, আর্তনাদ, 'হর নর্মদে হর নর্মদে' শব্দে পরিত্রাহি চীৎকার। দুজন ভীল এসে আমার গাঁঠরী খুলে আমার ঋগ্বেদ ও রেবাখণ্ড প্রভৃতি বই চারখানাকে পাতা উলটিয়ে দেখতে লাগল তাতে কোন টাকা লুকানো আছে কি না। যতীন্দ্রের কোর্তা ঘেঁটে পেয়ে

গেল তার হাতঘড়ি। মোহান্তজীর ঝোলা ঘেঁটে পেল কিছু টাকা এবং একটি পকেট ঘড়ি। একজন সেগুলি তাদের সর্দারের কাছে জমা দিল, একজন তাঁর মাথায় যে জটার কুণ্ডলী চূড়ার আকারে কুণ্ডলিত ছিল, তা ধরে টান দিয়ে খুলে ফেলতেই আবার ঠং ঠং করে পড়ল তিনটি গিনি। সর্দার সেগুলি কুড়িয়ে নিয়েই কিছু ইশারা করল। দুজন তাঁকে কিল ঘুষি লাগাতে লাগাতে জটা ধরে টান দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে লাথি মারতে লাগল। এ দৃশ্য আমাদের সহ্য হল না। জয় 'মা নর্মদে' বলে আমি এবং যতীন্দ্র এক সঙ্গে ত্রিশূল উঁচিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে যে মোহান্তজীকে লাথি মারছিল তাকে আঘাত করলাম। লোকটা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে গেল ঠিকই কিন্তু প্রায় দশজন ভীল দৌড়ে এসে আমাদেরকে পিছন থেকে জাপ্‌টে ধরে নিরস্ত্র করে টেনে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলল দুটো থাম্বায়। সর্দারের আদেশে দুজন দুটো টাঙ্গি নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের উদ্যত টাঙ্গির সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু সন্নিকট জেনে ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছি।

এমন সময় মন্দিরের ভিতরটা এমন প্রবল হুঙ্কার এবং অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল যে, আমি ত কেঁপে উঠে চোখ খুললামই, আমাদের সামনের দুজন ঘাতকও এমন কেঁপে উঠেছে যে তাদের হাত থেকে টাঙ্গি খসে পড়ল। দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই সাড়ে ছ'ফুট দীর্ঘদেহী দিগম্বর করপাত্রীজী। তাঁর বিরাট কলেবর ক্রোধে রক্তবর্ণ, হুঙ্কার তুলছেন—অ-মুক্ রগড়্যা, অ-মুক্ রগ্যড়া! চকমকি ঠুকলে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরোয়, তেমনি তাঁর রক্তবর্ণ বড় বড় চোখ দুটি থেকে অগ্ন্যুদ্‌গীরণ হচ্ছে। তিনি দরজার চৌকাঠ পেরিয়েই দড়াম্ শব্দে বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীলরাও যে যেখানে যে যে অবস্থায় ছিল দড়াম্ দড়াম্ শব্দে পড়ে যেতে লাগল। ভীলরা পড়েই থাকল, মহাত্মা উঠে দাঁড়িয়ে একটি হাত ঊর্ধ্বে তুলে হুকুম দিবার ভঙ্গীতে গর্জন করে বলে উঠলেন—অকাতে ভাগ বাকেকানা।*

---

* আমি জানি এ ঘটনা সাধারণ পাঠক-পাঠিকা বিশ্বাস করতে পারবেন না। মন্দিরের মধ্য হতে করপাত্রীজীর সহসা আবির্ভাব আমারও বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু পরিক্রমাবাসী হিসাবে নর্মদা তীরে যা ঘটেছিল, তা লিখতেই হবে বলে, আমি লিখে ফেললাম। যাঁরা আমার লেখা আলোকতীর্থ ও আলোকবন্দনা পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই ধারণা করবেন যে এই লেখকও যথেষ্ট যুক্তিবাদী। বর্তমান যুগমানস এবং তার জটিল ও সন্দিগ্ধ গতি-প্রকৃতি

ভীলরা তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কেবলই মাথা ঠুকে চলেছে মহাত্মার উদ্দেশ্যে। তবুও তাঁর জ্বলন্ত চক্ষু দেখে মনে হল, তিনি এখনও শান্তভাব ধারণ করেন নি। মহাত্মা স্বয়ং এগিয়ে এসে আমার আর যতীন্দ্রের বন্ধন মোচন করলেন।

ভীলদের সর্দার পাঁচটি গিনি এবং দুটি ঘড়ি মেঝের উপর রেখে, এমন কি তাদের অস্ত্র-শস্ত্রও ফেলে রেখে বিষন্ন বদনে শূন্য হাতে ফিরে যেতে লাগল। মোহান্তজী মহাত্মার পদতলে পড়ে সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা জানালেন—ভগবন! এই ভীললোক বড়ই অভাবী, অভাবের তাড়নায় লুটপাট করে। আপনি দয়া করে এদেরকে আটাগুলি নিয়ে যাবার অনুমতি দিন। বনে-জঙ্গলে হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে লড়াই করেই এদেরকে বেঁচে থাকতে হয়, কাজেই তাদেরকে অস্ত্র-শস্ত্রও নিয়ে যেতে আজ্ঞা দেওয়া হোক। মহাত্মা মাথা নেড়ে সম্মতি দিতেই ভীলরা আটা এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে মন্দিরের পিছন দিকে নেমে গিয়ে পেণ্ড্রার দিকে চড়াই এর পথ ধরল। মহাত্মাও দ্রুত মন্দির থেকে নেমে তাদের পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। আমরা করজোড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাঁকে পিছন ফিরে দেখতে পেয়েই ভীলরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগালো।

করপাত্রীজী অনেকখানি চড়াই-এর পথে উঠে গিয়ে হেঁকে বললেন—সামকা বখৎ ভেট হোগা। আভি আরাম করিয়ে।

কোটেশ্বরের মন্দিরে এখন পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রের দৃশ্য! যে কেউ বাইরে থেকে এসে এখানকার অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারবে যে কিছুক্ষণ আগেই এখানে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। আমাদের জিনিষপত্র সব এলোমেলো ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় পড়ে আছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কম্বল কৌপীন ঝোলা ইত্যাদি আমরা যে যার গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হলাম। আমাদের দলে যে দুজন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন আয়ুর্বেদে বিশেষজ্ঞ, তাঁর ঝোলাতে কিছু শুকনো লতাপাতার শিকড় ও বটিকা ছিল। তিনি আঘাতপ্রাপ্ত

বুঝবার বিদ্যা ও বয়স দুই-ই এই লেখকের রয়েছে ও হয়েছে। বর্তমান যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সকলেই মনে করেন তাঁরা সর্বজ্ঞ! সেই সবজান্তা পাঠক-পাঠিকা যদি আমার জীবনের এই প্রত্যক্ষ ঘটনাকে অবিশ্বাস করে বসেন তাতে আমার কিছু যাবে আসবে না। শুধু এই কারণেই যদি কেউ এই বই না পড়েন, তাতেও কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না। শুধু মা নর্মদা জানেন আমি সত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি।

প্রত্যেককেই একটি করে বটিকা সেবন করিয়ে, দুজন নাগাকে সঙ্গে নিয়ে বনের ধারে চলে গেলেন, কিছু লতাপাতা খুঁজতে। যাঁরা কোন বিশেষ আঘাত পান নি, তাঁদের পাঁচজনকে মন্দিরে রেখে মোহান্তজী আর সবাইকে নিয়ে গেলেন নর্মদায়। সবাই-এর সঙ্গে আমিও স্নান করে এলাম। সকলেই বলছেন গায়ে হাতে প্রচণ্ড ব্যথা। ভীলদের লাঠির ঘায়ে সকলেরই গায়ে হাতে কারও বা পায়ে কালসিটে দাগ পড়েছে। অনেকে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন; স্নান করে এসেই যতীন্দ্র ভোগ নিবেদন করতে মন্দিরে ঢুকলেন। ইতিমধ্যে সেই পণ্ডিত কবিরাজও হাজির হলেন এক বাণ্ডিল পাতা হাতে করে। তাঁর সাথী দুজন নাগার হাতেও পাঁচ বাণ্ডিল একই ধরণের পাতা। যে ভীলটাকে আমি ও যতীন্দ্র ত্রিশূলের ঘা মেরেছিলাম, তার শরীর হতে খুবই রক্ত ঝরেছিল, সেই রক্তের দাগ পড়েছিল মন্দিরে। আমরা স্নান করে এসে এই রক্তের দাগ ধুয়ে মুছে সবাই খেতে বসলাম। তখন বেলা সাড়ে চারটা। কোনমতে খাওয়া সেরে আমরা গায়ের যন্ত্রণার চোটে বসে বসে উঃ আঃ করতে লাগলাম। কবিরাজ মশাই-এর নির্দেশে তাঁর সংগৃহীত পাতাগুলি মন্দিরের মেঝেতে ছেঁচে প্রত্যেকের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে লাগানো হল। ঐ পাতাগুলি আমাদের বাংলাদেশেও প্রচুর পরিমাণে দেখেছি। তার নাম—আয়াপান। আমাদের দেশেও এগুলি রক্তরোধক ভেষজরূপে ব্যবহৃত হয়। আমরা বসে বসে করপাত্রীজীর অপার করুণার কথাই স্মরণ ও আলোচনা করছিলাম। মোহান্তজী অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বলতে লাগলেন—'আজ মহাত্মার আবির্ভাব ঘটতে বিন্দুমাত্র দেরী ঘটলেই যতীন্দ্র ও শৈলেন্দ্রকে হারাতাম।' বিপদবারণ মহাদেবের মহিমা আজ আর একবার প্রত্যক্ষ করলাম, তাঁর সঙ্কটনাশন নাম সার্থক। এই ঘোর কলিযুগেও যে দেবতা সাড়া দেন, আর্তকে রক্ষার জন্য সহসা প্রকট হন, মন্দিরের মধ্যে করপাত্রীজীর বিস্ময়কর দিব্য আবির্ভাবই তার প্রমাণ। আমরা সাধনভজনহীন বলে আশুতোষ আমাদের পরিচিত সাধুর দেহ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সাধন সম্পদ ও প্রকৃত ভক্তি থাকলে তাঁর স্ব-স্বরূপের আবির্ভাবও আমরা দেখতে পেতাম। জয় কোটেশ্বর, জয় মা নর্মদা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে লক্ষ্মণভারতীজী আরতির আয়োজন করতে

গিয়ে দেখেন পঞ্চপ্রদীপ ও তুলার বাণ্ডিল কোথায় যে লুঠেরারা ফেলে দিয়ে গেছে, তা পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর বাঁ হাতের বাহু খুব ফুলে উঠেছে। অপর দুজন নাগা খুঁজে দেখতে লাগল সিঁড়ি ধাপের দুই দিকে। দুটো ঘি-এর শিশিও উধাও। কর্পূরও নাই। তুলা কর্পূর ঘি-এর শিশি সবই পরে দেখা গেল দলা পাকানো হয়ে পড়ে আছে মন্দির থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট দূরে। সব নষ্ট হয়ে গেছে। আরতি আর হবে না। দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এল। কোটেশ্বর বা হাপেশ্বরর জঙ্গলে পরিক্রমা করতে করতে আর যেসব শিবমন্দির চোখে পড়বে, সেখানেও আরতি করা, বা মা নর্মদার আরতি করা আর সম্ভব হবে না বলে মোহান্তজী খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। এমন সময় শোনা গেল হর নর্মদে, হর নর্মদে, ধ্বনি। নর্মদার ঘাটের দিক দিয়ে আসছেন করপাত্রীজী, গতকাল অকলবাড়াতে যেমন দেখেছিলাম, আজও দেখছি স্নান করে তিনি এলেন, তাঁর গা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। এসেই তিনি নমো নারায়ণায়, নমো নারায়ণায় বলতে বলতে আমাদের মাঝখানে বসে পড়লেন; মোহান্তজী-সহ আমরা সবাই দাঁড়িয়ে উঠে আবাহন জানালাম আমাদের এই বিপদের বন্ধুকে। মোহান্তজীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে করজোড়ে আমরা তাঁর বন্দনা করতে লাগলাম—

ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং বিপন্নানং সদা শরণ্যম্।
ভৃত্যার্থিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

শরণাগতের পালক হে মহাপুরুষ! তুমি ইন্দ্রিয়গ্রামের তাড়না ও কুটুম্বাদির অধীনতা নাশক, সর্বাভীষ্টপূরণকারী, তুমি আমাদের সর্বদাই ধ্যানযোগ্য; তীর্থমাত্রের আশ্রয়-স্বরূপ বিপন্ন ভক্তদের দুঃখনাশকারী হে মহাত্মন্! ভব সমুদ্রের তরণীস্বরূপ তোমার চরণ কমলকে আমরা বন্দনা করি। বন্দনা করে আমরা সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানিয়ে তাঁকে ঘিরে চুপ করে বসে রইলাম। মহাপুরুষও নীরবে বসে রইলেন। অন্ধকারের মধ্যে বসে থেকে থেকে সেই অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করার জন্য আমিই শেষ

পর্যন্ত তাঁকে বিনম্র ভাবে একটা প্রশ্ন করে বসলাম। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আবার সেই শ্বাসরোধকারী অখণ্ড নীরবতা। কোথা থেকে যেন সুগন্ধ ভেসে আসছে। ভাবলাম, কাছেই জঙ্গল, জঙ্গলে সুগন্ধি বনফুলের অভাব নাই। সেই গন্ধই হয়ত ভেসে আসছে। কিন্তু গন্ধ ক্রমশই উগ্র থেকে উগ্রতর হচ্ছে। এইরকম অভূতপূর্ব পুষ্পসৌরভ এর আগে কোথাও পাই নি। সবাই দেখছি শ্বাস টেনে টেনে ঘ্রাণ নিচ্ছেন। ঘ্রাণের মাদকতাতেই মত্ত ছিলাম হঠাৎ দেখলাম মহাপুরুষের শরীর ঘিরে জ্যোতির ছটা পড়েছে, সেই ছটা দেখতে দেখতে বেশ উজ্জল হয়ে উঠল। আমি সাহসে ভর করে আবার জিজ্ঞাসা করলাম—মহারাজ! যোগসিদ্ধির পূর্বভাবী লক্ষণ কি কি, দয়া করে বলবেন কি? কৃপা করে আমার এই পরিপ্রশ্নের উত্তর দিলে আমি কৃতার্থ বোধ করব।

এইবার তাঁর শরীর কিঞ্চিৎ কেঁপে উঠল। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর দিতে লাগলেন—কেঁও তুম্ ত তুমহারা পিতাজীকা পাশ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ আচ্ছিতরসে মনন কিয়া হ্যায়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ কা দ্বিতীয় অধ্যায় মেঁ একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ মন্ত্র মেঁ ইসকা জিকর আয়া।

এইসময় একটা জিনিষ আমাদের সকলেরই চোখে পড়ল, তিনি কথা বলতে সুরু করতেই তাঁর শরীরকে ঘিরে যে জ্যোতির ছটা প্রকট হয়েছিল তা অন্তর্হিত হল। অন্ধকারের মধ্যে তাঁর দেব শরীর অস্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন—যোগাভ্যাসকালে ব্রহ্মের অভিব্যক্তি সূচক তুষার ধূম সূর্য বায়ু অগ্নি খদ্যোৎ (জোনাকি পোকা) বিদ্যুৎ স্ফটিক ও চন্দ্র—এই সকলের রূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্বে নিমিত্তস্বরূপ প্রথমে আবির্ভূত হয়।

নীহারধূমার্কানিলনলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥ ২।১১

অর্থাৎ প্রথমে তুষার প্রভার ন্যায়, পরে ধূমপ্রভার ন্যায়, তারপর সূর্যপ্রভার ন্যায় চিত্তবৃত্তি হয়, পরে বাহ্য বায়ুর মত প্রবলভাবে সংক্ষুভিত হয় এবং তারপরে অগ্নির ন্যায় অত্যুষ্ণ হয়ে উঠে। কখনও খদ্যোত-খচিত আকাশ মণ্ডলের মত মনে হয়, কখনও বা তা বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল হয়,

কখনও স্ফটিকের মত আবার কখনও বা চন্দ্রবৎ সমুজ্জ্বল হয়। ঐ সকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হলে বুঝতে হবে যোগসিদ্ধির পথে সাধক এগিয়ে যাচ্ছেন।

পৃথ্বী-অপ্-তেজঃ-অনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥ ২।১১

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত অভিব্যক্ত হলে যোগীর ধ্যানবলে ঐগুলির গুণ স্ব স্ব কারণে বিলীন হয় অর্থাৎ পৃথিবীর গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শ এবং আকাশের গুণ শব্দ, এইসকল যোগীর নিকট প্রকাশিত হতে থাকে। এইভাবে যোগীর দেহ যোগাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হয় এবং বিমল শরীরপ্রাপ্ত ঐ যোগী তখন জরা ব্যাধি মৃত্যুকে জয় করতে পারেন অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা মৃত্যু হন।

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগ প্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি॥ ২।১৩

শরীরের লঘুতা, শরীর ও মনের রোগহীনতা, লোভহীনতা, দেহের উজ্জ্বলকান্তি, স্বরমাধুর্য, দেহের মধুর সুগন্ধ, মলমূত্রের অল্পতা—এইসকলকে যোগিগণ যোগের প্রথম সিদ্ধি বলে উল্লেখ করে থাকেন। অলমিতি।

আভি হম্ চল্ পড়ে। কালভি ইধর ঠার জানেসে আচ্ছাই হোগা। সবকা ভবিষ্যৎ ঠিক হো যাবেগা। কাল ফিন্ ভেট করেঙ্গে। এই কথা বলেই তিনি নর্মদার ঘাটের দিকে অন্ধকারের মধ্যেই টল্‌তে টল্‌তে চলে গেলেন। তাঁর টল্‌টলায়মান অবস্থা দেখে আমার মনে হল, সিঁড়ির ধাপ দিয়ে নামবার সময় উঁচু-নীচুতে পা ফেলতে গিয়ে কোথাও না কোথাও পড়ে যাবেন। আমি তাড়াতাড়ি ঝোলা থেকে টর্চটা বের করে তাঁকে সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত পথ দেখানোর জন্য টর্চ টিপতে টিপতে গেলাম। লুণ্ঠনের সময় ভীল ডাকাত আমার টর্চটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল বলে তার কাঁচটা ফেটে গিয়েছে। তবুও তাতে আলো জলছিল, সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে তিনি আমার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়েই হেসে বললেন—'সাবাস্ বেটা! শিশা ফুট গিয়া তব্‌ভি রোশ্‌নী ডালনেমেঁ কৌশিস্ কর রহে, জিতা রহো, রোশ্‌নী ডালতে রহো।' বলেই তিনি নর্মদার ঘাটের দিকে তীরবেগে

দৌড়াতে লাগলেন। কি বোকা আমি! এই লোকের সম্বন্ধে আমি ভাবনা করছিলাম সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে এই লোক নাকি পড়ে যাবেন! কিন্তু তাঁর শেষ কথায় আমি ধাঁধায় পড়লাম, তিনি যে বলে গেলেন 'রোশ্‌নী ডালতে রহো', আমি টর্চ টিপে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার তিন সেলের টর্চের আলোদানের ক্ষমতাও কম, আর তিনি ত দৌড়ে কতদূর চলে গেছেন অন্ধকারের মধ্যে, তাঁর কোন দিক্‌-দিশা পাচ্ছি না, অথচ টর্চ বন্ধ করে মন্দিরে ফিরে গেলে তাঁর আদেশ অমান্য করা হবে! এমন সময় মোহান্তজী হাঁক দিলেন—লৌটকে আইয়ে, উন্‌কা বাণী হম্‌ লোগনে শোনা হ্যায়। উস্‌কা মতলব দুসরা। আ যাইয়ে। আমি ফিরে এলাম মন্দিরে। অন্ধকারের মধ্যেই মন্দিরের বারান্দায় বসে বসে আমরা কিছুক্ষণ এই রহস্যময় মহাপুরুষের সম্বন্ধে প্রশস্তিমূলক চর্চা করলাম। করপাত্রীজী মন্দিরে বসে থাকাকালে যে সুগন্ধ পাচ্ছিলাম, এখন আর সেই গন্ধ পাচ্ছি না। কবিরাজ পণ্ডিত আমাদের প্রত্যেককে আর একটা করে বড়ি খেতে দিলেন। লক্ষ্মণভারতীজী এবং আরও চারজন নাগারই আঘাত গুরুতর। তাঁদের কম্বল পেতে দেওয়া হল, তাঁরা শুয়ে পড়লেন। আমরাও কেউ শুয়ে, কেউ বসে জপে মন দিলাম। করপাত্রীজীর উপর ভরসা করে সবাই নিশ্চিন্ত মনে নিরুপদ্রবেই রাত্রিটা কাটালাম। ঊষাকালেই আমার ঘুম ভেঙেছে। শরীরে আর কোন ব্যথা-অনুভব করছি না। মোহান্তজী এবং আরও কয়েকজনকে দেখলাম উঠে পড়েছেন। তাঁরা তাঁদের কম্বলের উপর বসে বসে জপ করছেন। হয়ত তাঁরা এইভাবেই গোটারাত্রি জপেই কাটিয়েছেন। আমি জঙ্গলের ধারে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদার ঘাটে গেলাম স্নান করতে। স্নান তর্পণ সেরে মন্দিরের দিকে ফিরছি, তখন দেখলাম, নাগারা একে একে ঘাটে যাচ্ছেন স্নান করতে। লক্ষ্মণভারতীজীর সঙ্গেও দেখা হল, তিনি দু'বাহুতে মালসাট্‌ মেরে এবং ডিগ্‌বাজী খেয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁর ব্যথা-বেদনা সেরে গেছে।

আমি মন্দিরে ঢুকে কোটেশ্বর মহাদেবের পূজা করে, মন্দিরের মধ্যে এককোণে বসে মহর্ষি তণ্ডিকৃত মহাদেবের সুপ্রসিদ্ধ স্তব পাঠ করতে লাগলাম। স্তব পাঠ করতে করতেই দেখলাম, বিচিত্র বিচিত্র বনফুল সংগ্রহ করে এনে একে একে সব সন্ন্যাসীই ভগবান কোটেশ্বরের পূজা করে যাচ্ছেন।

তাঁদের সকলের পূজা প্রার্থনাদি শেষ হওয়ার পর আমারও স্তব পাঠ শেষ হল। আদ্যের লিঙ্গকে পুনরায় স্পর্শ ও প্রণাম করে আমি বাইরের বারান্দায় এসে বসলাম। যতীন্দ্রের ঘড়িতে তখন বেলা ১১টা বেজেছে। কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন নাগা জঙ্গল থেকে অনেকগুলি কন্দমূল তুলে আনলেন। মোহান্তজী তাদেরকে বললেন, সেগুলি নর্মদার জলে ধুয়ে আনতে। আমাদের প্রত্যেকের ঝুলিতে পথের সম্বল হিসাবে কিছু কিছু কমবেশী কন্দমূল ছিলই কিন্তু ভীলরা সে সব ফেলে ছড়িয়ে পায়ে দলে তছনছ করে গিয়েছে। একমুঠো আটাও মজুত নাই। মোহান্তজী হাসতে হাসতে বললেন—শুধু আজ কেন, এখন থেকে হাপেশ্বরের জঙ্গল অতিক্রম করা পর্যন্ত আমাদেরকে কন্দমূল ও নর্মদার জল খেয়েই জীবন ধারণ করতে হবে।

কভি দুধ ছানা কভি শক্করপানা।
পুরী লাড্ডু কভি চানা চিবানা॥

এই ত সাধুদের জীবন! পরিক্রমাবাসী এই রকম জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে তবেই নর্মদা পরিক্রমার মত দুশ্চর কঠিন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে।

আমরা সবাই কন্দমূল খাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় দেখতে পেলাম, কিছুদূরে নর্মদা ঘাটের দিক হতে করপাত্রীজী আসছেন। আমরা সবাই হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালাম। কাছাকাছি আসতে দেখতে পেলাম তাঁর হাতে একটা বড় জামবাটি, এক টুকরো গেরুয়া বস্ত্র দিয়ে তার মুখ ঢাকা। হাতের ইসারায় সকলকে প্রণাম করতে নিষেধ করে তিনি কোটেশ্বরের সামনে বাটিটা রাখলেন। বাটিটার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দেখে আমাদের মনে হল, ঝকঝকে নূতন রূপার বাটি। তিনি মোহান্তজীকে ডেকে বললেন —এক এক করকে সবকে বুলাও। বাটিকা ঢাকনা মৎ খুলিয়ে, কাপড়া খোলকে মৎ লখিয়ে, থোড়াসা কাপড়া উঠাকর যিসকা যতঠো রোটিকা জরুরৎ হ্যায়, সবকো দে দেও! ইয়ে পঞ্চকলিকা আটাসে (বুট, জোনেরা, অড়হর, জোয়ার ঔর বাজরা পাঁচ শস্যকো মিলাকর) বানা হুয়া হ্যায়, ইয়ে নর্মদা মাইয়াকো খাস পরসাদী হ্যায়, জরুর বহুৎ স্বাদিষ্ট হোগা।

তিনি কোটেশ্বর লিঙ্গের কাছে বসে রইলেন। মোহান্তজীও মন্দিরের মধ্যে বাটির কাছে বসে এক একজনকে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। তিনি প্রথমেই ডাকলেন লক্ষ্মণভারতীজীকে। করপাত্রীজী জিজ্ঞাসা করলেন —কয়ঠো?

—দশঠো।

মোহান্তজী ঈষৎ বাটির ঢাক্‌না খুলে গুণে গুণে দশখানা রুটি লক্ষ্মণভারতীর হাতে দিলেন। দেওয়ার পরেই বাটির মুখ সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে দিলেন। আর একজন ঢুকলেন। করপাত্রীজী জিজ্ঞাসা করলেন—কয়ঠো? তিনিও বললেন, 'দশঠো'। মোহান্তজী বাটির ঢাকনা মানে সেই গেরুয়া কাপড়টা ঈষৎ তুলে গুণে গুণে দশখানা রুটি তাঁর হাতে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে বাটির মুখ ঢেকে দিলেন। এইভাবে প্রায় প্রত্যেকেই দশখানা করে রুটি চেয়ে নিলেন, যতীন্দ্রও দশখানা নিলেন, কেবল আমি নিলাম পাঁচখানা। সবার ক্ষেত্রে সেই একই পদ্ধতি, ঢোকা মাত্রই করপাত্রীজী জিজ্ঞাসা করেন, 'কয়ঠো'? আর মোহান্তজী কাপড়টা ঈষৎ উঠিয়ে গুণে গুণে রুটি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেন। সর্বশেষে মোহান্তজীকে মহাত্মা জিজ্ঞাসা করলেন— 'কয়ঠো?' মোহান্তজী বললেন—'আটঠো।' করপাত্রীজী কাপড়টা সম্পূর্ণ তুলে ফেলে বললেন—গিন্‌তি করলো আটঠোই হ্যায়। পা লেও বেটা! মোহান্তজী রুটি হাতে নিয়েই বাইরে বেরিয়ে এলেন। এতক্ষণ সবাই রুটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মোহান্তজী খেতে আরম্ভ করতেই আমরা সবাই খেতে আরম্ভ করলাম। 'পঞ্চকণিকার' এই রুটি খেতে সত্যই খুব স্বাদিষ্ট। সবার খাওয়া শেষ হলে করপাত্রীজী মোহান্তজীকে বললেন—যাও বেটা এ বর্তন ও কাপড়া নর্মদামেঁ ডুবাকর আইয়ে। মাইয়াকা চীজ মাইয়াকো দে দেও। মোহান্তজী বাটি এবং কাপড়ের টুকরো হাতে নিয়ে নর্মদাতে গেলেন। সেই সময় বাটিটি দেখে বুঝলাম, বাটিটি সত্যই রূপার, তাতে বড় জোর একসের জল ধরবে, যে সাইজের রুটি আমরা খেলাম, তা সেই বাটিটিতে বড় জোর পনের ষোলখানা ধরবে। কিন্তু আমরা ত্রিশজন লোক গড়ে দশখানা করে রুটি খেলেও প্রায় ৩০০ খানা রুটি ঐ বাটি থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা আমাদের সকলেরই চোখের সামনে ঘটল। ধাবড়ীকুণ্ডেও একদিন একলিঙ্গস্বামী তার কমণ্ডলুতে পর পর হাত ঢুকিয়ে

প্রায় ৩০০টি ফল ৩০০ জন লোককে দিয়েছিলেন। এই রকম অত্যাশ্চর্য ঘটনাকে আমরা miracle বলে সহজেই উড়িয়ে দিতে পারি, সবজান্তার ভান করে খুবই লঘু দৃষ্টিতেও দেখতে পারি, কিন্তু তাতে ঐসব প্রত্যক্ষ ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা হয় না। একাধিকবার ঐরকম ঘটনা চোখের সামনে ঘটল বলে magic বা হাত সাফাই-এর খেলা বলে বালখিল্যের হাসি হেসে ফুৎকারে উড়িয়েও দিতে পারছি না। আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। কারও কোন বাক্যস্ফূর্তি হল না। করপাত্রীজী সহসা শিবের ঘর থেকে বেরিয়ে 'হম্ জেরা আতে হেঁ' বলে চলে গেলেন নর্মদার দিকে।

তিনি চলে যেতে আমরা কেউ মন্দিরের বারান্দায় কেউ বা মন্দিরের পিছনে বিভিন্ন গাছের ছায়ায় কম্বল বিছিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম। আমি ত ঘুমিয়েই পড়লাম। বেলা পাঁচটা নাগাদ আমার ঘুম ভাঙল। প্রায় ৬টা নাগাদ আমরা দেখতে পেলাম করপাত্রীজী মন্দিরের দিকে আসছেন। যথারীতি তাঁর গা থেকে জল ঝরে পড়ছে, তার মানে তিনি এইমাত্র স্নান করে উঠে আসছেন। এসেই শিবের ঘরে ঢুকে বসে পড়লেন। আমরা সবাই প্রণাম করে উঠতেই তিনি মোহান্তজীকে ডেকে বললেন—রতনলাল ভারতী কিস্‌কা নাম হৈ, উন্‌কো হমারা সামনেমেঁ আনে বলো। ঐ নাগা বসেছিলেন বারান্দার নিচে সিঁড়ির ধাপে, মোহান্তজী ডাকতেই তিনি কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে মহাত্মার সামনে উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমরা এর কারণ কিছু বুঝলাম না, ঘটনা কোন দিকে গড়ায় তা জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। করপাত্রীজী মোহান্তজীকে বলতে লাগলেন—তোমার এই চেলা, আমি যখন নর্মদার দিকে যাচ্ছিলাম, সে সময় সবার অলক্ষ্যে আমাকে অনুসরণ করে নর্মদার ঘাটে গিয়ে পৌঁছেছিল। ওর কুৎসিত মনে এই সন্দেহ জন্মেছিল যে 'চাঁদিকা বর্তন' তুমি নর্মদাতে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলে, আমি নিশ্চয়ই সেটা জল থেকে খুঁজে পেতে সংগ্রহ করতে যাচ্ছি। ওর কাছে ঐ বর্তন বহোৎ 'কিমতী চীজ।' যাদের মনে সন্দিগ্ধতা, খলতা বা ঈর্ষা থাকে তারাই জগতের চিহ্নিত পাপিষ্ঠ। তোমাদের সংঘে কি বিনা পরীক্ষায় যাকে তাকে সন্ন্যাসদানের প্রথা আছে? এইরকম কদর্য মন যাদের, তারা কি আধ্যাত্মিক জীবন-

যাপনের উপযুক্ত? রতনলাল তুমি গুরুর সামনেই বল, আমার পিছনে গুপ্তচর বৃত্তি করতে গিয়ে আমাকে নর্মদার ঘাটে গিয়ে কি অবস্থায় দেখলে?

রতনলাল নাগা কাঁদতে কাঁদতে লজ্জায় মাথা হেঁট করে জানাল যে, তিনি নর্মদার ঘাটে পৌঁছে দেখেছিলেন যে মহাত্মা নর্মদা কিনারে গিয়েই 'হর নর্মদে' বলে তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং আধঘন্টা অপেক্ষা করেও তিনি মহাত্মার কোন চিহ্ন দেখতে পান নি। সব শুনে মোহান্তজী খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি লক্ষণভারতীকে বললেন—লছমন ভেইয়া! রতনলালকো চুটকি ছাঁট্ দো। সন্ন্যাসী সমাজে 'চুটি কাটা' একটা মস্ত দণ্ড। শিখা সূত্র কমণ্ডলু কেড়ে নেওয়া বা চুটি কাটা অর্থাৎ একটা জটা কেটে নিলে নাগারা সন্ন্যাসী সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে, তাকে 'পতিত' বলে ধরে নেওয়া হয়। তখন কোনও সন্ন্যাসী তাকে সঙ্গে নিয়ে একত্রে পংক্তি ভোজন করেন না, গৃহীরাও তাকে ভিক্ষা দেন না। মোহান্তজীর আদেশ পাওয়া মাত্রই লক্ষণভারতী রতনলালের চুটি কাটতে উদ্যত হয়েছেন এমন সময় করপাত্রীজী হাত তুলে তাঁকে নিষেধ করে বললেন—ইস্ অপরাধকো সাজা এহি হ্যায়, উন্‌কা মন্ত্র হম্ হরণ কর লেতা হৈ। উন্‌কো ইষ্টবীজকা বিস্মরণ ঘটেগা।

রতনলাল এই নিদারুণ দণ্ডের কথা শুনে জোরে জোরে মাথা ঠুকতে লাগলেন এবং কাঁদতে থাকলেন। মহাপুরুষ বললেন—যো একদফে বোল দিয়া, ওহি ঘটেগা। কিসীসে ইসকা রদ নেহি হোগা তুম্ হর নর্মদে হর নর্মদে জপ করতে রহো। তুম্‌হারা বিবেককা নিরন্তর কষাঘাতসে তুম্‌হারা মনকা সাফাই হোগা। হাপেশ্বর মহাদেবকা মন্দরমেঁ তুম্‌লোগোঁকো সাথ হমারা ফিন্ ভেট হোগা। উস্ বখৎ তুম্‌হারা গুরুদত্ত ত্র্যক্ষর বীজ ফিন্ স্মরণমেঁ স্ফুরিত হোগা। স্ফূরণ না হোনেসে হম্ আপকো একান্তমেঁ উস্ মন্ত্র ফিন্ প্রদান করেগা। রোণা মৎ।

এই কথা শুনেই মোহান্তজী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন—রতনলাল উঠে পড়, শান্ত হও। আমাদেরকে এঁর পবিত্র সঙ্গ করতে দাও। তুমি একথা কেন বুঝছ না যে, সাজার অজুহাতে মহাপুরুষ তোমাকে আশীর্বাদই করলেন। ভেবে দেখ তোমার কী অপরিমেয় সৌভাগ্যের উদয় হবে যখন ইনি স্বয়ং তোমাকে ইষ্ট মন্ত্র শোনাবেন, আমি নিশ্চিন্ত যে তখন তোমার নবজন্ম ঘটবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মন্দিরের মধ্যে যেখানে মহাপুরুষ বসে আছেন সেখানটায় ত আরও জমাট অন্ধকার। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কেবল তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—আপ্‌কো কুঁছ পুছনা হৈ ত পুছ লিজিয়ে! কারও মুখে কোন কথা নাই। দু তিন মিনিট অপেক্ষা করে আমিই তাঁকে প্রশ্ন করলাম—গীতাতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর একান্ত ভক্ত ও শিষ্য অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে বলছেন—

তপস্বিভ্যোধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎযোগী ভবার্জুনঃ॥ ৬।৪৬

অর্থাৎ 'হে অর্জুন! যোগী তপস্বীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, পুঁথিগত বিদ্যালাভ করে যাঁরা জ্ঞানী হয়েছেন কিংবা সকাম কর্মে পটুতা দেখিয়ে কর্মী রূপে খ্যাতিলাভ করেছেন, যোগী তাঁদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও।' এখন আমার প্রশ্ন যোগী কিভাবে হওয়া যায়? যোগীদেরকে যে অসাধ্য সাধন করতে দেখি, সেটাই বা কি ভাবে সম্ভব হয়?

তিনি হাসতে হাসতে বললেন—তুমি আমার সামনে এগিয়ে এস, তোমার পেটে কোঁৎকা মেরে তোমাকে যোগী বানিয়ে দিব!

—আমাকে কোঁৎকা মারা আপনার মত মহাযোগীর পক্ষেও সহজসাধ্য হবে না। কারণ, মা গান্ধারীর হস্তস্পর্শে দুর্যোধনের অঙ্গ যেমন বজ্রদৃঢ় হয়েছিল, আমার ইহজীবনের ইষ্ট ও উপাস্য বাবার করস্পর্শেও তেমনি আমার সর্বাঙ্গও বজ্রদৃঢ় হয়ে গেছে।

আমার কথা শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—বাচ্চা, তুমহারা বাৎ শুনকে হম বহুৎ প্রসন্ন হুয়ে। যোগ ঔর যোগীকা বারেমেঁ হম থোড়া কুছ বাতাতা হুঁ, ধ্যান দেকর্ অবধান করিয়ে।

এই বলে তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম হল—যোগীগুরুর কৃপা ভিন্ন কেউ কখনও যোগী হতে পারে না। প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে হলে অনুক্ষণ গুরুদত্ত সাধনাকে আশ্রয় করে পড়ে থাকতে হয়। একবার স্বভাবের যোগপথে পড়তে পারলে আর কোনো চিন্তা নাই। কোন বস্তু স্রোতে ভাসিয়ে দিলে তা যেমন স্রোতের বেগেই স্বতঃই ভেসে যায় তেমনি গুরুশক্তির বেগে পড়ে গেলে গুরুশক্তিই সাধককে চরম স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। এরজন্য চাই গুরুর উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

লক্ষ্য কর আমার একটি কথা, আমি বলেছি 'স্বভাবের যোগপথে পড়তে পারলে।' স্বভাব কি? স্ব-এর ভাব স্ব-ভাব। মহামুনি বশিষ্ঠ, রামচন্দ্রকে যোগের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—

স্বভাব কারণং নাম সংসারোত্তরণং প্রতি।
অসংসক্তং মনো যস্য স তীর্ণো ভবসাগরাৎ॥

যোগবাশিষ্ঠ, ৬।২।১৯১৩২

অর্থাৎ এই দুঃখময় সংসার হতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় স্ব-ভাব অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের জ্ঞান। যাঁর মন সংসারে আসক্ত নয়, কেবলমাত্র তিনিই স্ব-ভাব, স্ব-এর অর্থাৎ আত্মার ভাব ধরতে পারেন, স্বভাবের যোগপথে এগিয়ে যেতে পারেন।

নিমেষাদৰ্দ্ধভাগেন দেশাৎ দেশান্তরস্থিতো।
সদ্রূপং সংবিদো মধ্যে স স্বভাব উপাস্যতাম্॥

৬।২।৩৪।৪৭

বশিষ্ঠের মত গুরু পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের মত শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন, এক বিষয় হতে অন্য বিষয় চিন্তার মধ্যভাগে জ্ঞানের যে মুহূর্তমাত্র বিষয় বিহীন অবস্থায় স্থিতি বা বিশ্রান্তি, তারই নাম স্বভাব, তুমি তারই উপাসনা কর।

দেশাৎ দেশান্তরং দূরং প্রাপ্তায়াঃ ক্ষণাৎ।
যদরূপং অমলং মধ্যে পরং তদ্রূপমাত্মনঃ॥ ৬/২।৩৫।১

এক স্থানের বিষয় চিন্তা করতে করতে মুহূর্তমধ্যে অন্য স্থানের চিন্তা করলে, এই উভয় চিন্তার মধ্যবর্তী কালে জ্ঞানের যে চিন্তাশূন্য অবস্থা হয় তাই আত্মার শ্রেষ্ঠরূপ অর্থাৎ তারই নাম প্রকৃত স্বভাব। এই স্বভাবকে ধরতে পারলে আর কোন অভাব থাকে না। প্রকৃত যিনি সদ্গুরু তিনি দীক্ষাকালে শিষ্যকে এই স্বভাবের যোগপথ ধরবার কৌশলটি শিখিয়ে দেন। কি সেই কৌশল? কি ঘটনা ঘটলে শিষ্য বুঝবেন যে সদ্গুরু তাঁকে স্বভাবের যোগপথে স্থাপন করে দিলেন? এর উত্তর—

দেশ দেশান্তর প্রাপ্তৌ সংবিদো মধ্যমেব যৎ।
নিমেষেণ চিদাকাশং তদ্বিদ্ধি মুনি পুঙ্গব॥

মুহূর্তমধ্যে এক স্থানের চিন্তা হতে অন্য স্থানের চিন্তা করলে মধ্যবর্তীকালে জ্ঞানের যে নিরাধার অবস্থা হয় তারই নাম চিদাকাশ। চিদাকাশেরই অপর নাম স্বভাব। স্বভাবের যোগপথে উত্তোলন করার অর্থ চিদাকাশে স্থিতি। সদ্‌গুরু যখন শিষ্যের মধ্যে চিদাকাশ প্রকট করে দেন তখনই বুঝতে হবে যে গুরু শিষ্যকে স্বভাবের যোগপথে স্থাপন করে দিলেন।

এই পর্যন্ত বলে করপাত্রীজী চুপ করে গেলেন। প্রায় ১৫ মিনিটকাল নীরব থাকার পর তিনি পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন—যাঁরা যোগমার্গের সামান্য কিছুও অনুশীলন করেছেন, তাঁরা জানেন প্রত্যেক মানব দেহে প্রাণবায়ু নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস রূপে দিনে রাত্রে চব্বিশ ঘন্টায় ২১৬১০ বার সঞ্চরণ করে থাকে। নাসিকা পথে বায়ু গ্রহণের নাম প্রশ্বাস এবং বাইরে নির্গমনের নাম নিঃশ্বাস। এই বায়ু সাধারণতঃ ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী এবং পিঙ্গলা বা সূর্যনাড়ী দ্বারা প্রবাহিত হয়। ইড়া বামে ও পিঙ্গলা দক্ষিণে। এই উভয় নাড়ীর মধ্যস্থলে আর একটি অতি সূক্ষ্মনাড়ী আছে, যা যোগীদের কাছে সুষুম্না নাড়ী নামে পরিচিত। সুষুম্না নাড়ীরও আবার দুটি ভাগ আছে। মূলাধার থেকে মস্তিষ্ক প্রদেশের তলদেশে পর্যন্ত সুষুম্নার যে অংশ তার নাম অপরা সুষুম্না এবং মাথাকে পিছনের দিকে উল্‌টিয়ে দিলে যেখানে টোল খায় সেখান থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রের যে স্থানে বৈদিক পরিভাষায় বিদৃতিদ্বার, সেই স্থান পর্যন্ত সুষুম্নার যে বিস্তৃতি তার নাম উত্তরা সুষুম্না। উত্তরা সুষুম্নার পথই স্বভাবের যোগপথ। ঐ পথ গুরু কৃপায় জানতে পারলে তবেই স্ব-ভাব যোগের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। নতুবা আর সব যোগপথই উল্টোরথের যাত্রা!

মানব শিশু মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানেরও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা দ্বারা সুষুম্না মার্গটি রুদ্ধ হয়ে যায়। যোগীর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় কুণ্ডলিনী মহাভুজঙ্গিনী সুষুম্নাদ্বারে মুখ গুঁজে মূলাধারে নিদ্রিতা হয়ে পড়েন। এইটি মানব শিশু বা পূর্ণবয়স্ক মানবের বদ্ধ অবস্থা; সুষুম্না পথ না খুললে অর্থাৎ সুষুম্নাপথে প্রাণবায়ুর গমনাগমন না হলে কেউ কখনও যোগী হতে পারে না। তাই এই পথটি খুলবার বহুবিধ উপায় যোগী ঋষিরা আবিষ্কার করেছেন। তীব্র ভাবনার দ্বারা, শিব কথিত বিশিষ্ট

কৌশলে জপের দ্বারা, প্রাণায়ামের দ্বারা আবার অন্যান্য কতকগুলি গুহ্যাতিগুহ্য যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যেও এই সুষুম্না মার্গের বন্ধ দ্বার উন্মোচন করা যায়। সদ্‌গুরু শিষ্যের যোগ্যতা ও আধার বিচার করে বিভিন্ন প্রণালী নির্দেশ করে থাকেন।

এ কথা বোধহয় তোমরা সকলেই জান যে, পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা এবং ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের বৈষম্য হতেই সৃষ্টি। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা ঘটলে আর সৃষ্টি থাকে না। প্রকৃতি ক্ষুব্ধ বা চঞ্চল হলে সত্ত্ব, রজঃ তমো গুণের মধ্যে ন্যূনাধিক তারতম্য ঘটে থাকে। এই পুরুষ-প্রকৃতিকে শিবশক্তি বা প্রাণ-অপানও বলা যেতে পারে। প্রতি জীব দেহে প্রাণ ও অপানরূপে বিরুদ্ধ অথচ পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত দুইটি শক্তির প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাণ ও অপান উভয় উভয়কে আকর্ষণ করে আবার সাথে সাথে একে অপরকে বিকর্ষণও করে থাকে। এই আকর্ষণ বিকর্ষণের (Attraction Repulson) এর কারণ উভয়ে এক হতে চায় কিন্তু হতে পারে না। তার একমাত্র হেতু প্রাণ যে অনুপাতে জেগে উঠে সেই অনুপাতে অপান সুপ্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অপানের জাগৃতির অনুপাতে প্রাণ নিদ্রিত বা নিষ্ক্রয় হয়ে পড়ে। সুতরাং কোন সময়েই প্রাণ অপান উভয় শক্তি সমানভাবে জাগ্রত না থাকার ফলে পরস্পর মিলিত হতে পারে না। অপান বা প্রাণকে জাগিয়ে যদি যথাক্রমে প্রাণ বা অপানকে উদ্বুদ্ধ করে উভয়কে উভয়ের সঙ্গে মিলিত করে দেওয়া যায় তাহলে অবশ্য উভয়ের সমতা ঘটতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ তা ঘটে না। একে এভাবেও বলা যেতে পারে, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের গতি দ্বারা প্রাণ যখন নাসিকা দ্বার দিয়ে নাভিতে পৌছায়, অপান তখন নাভি হতে মূলাধারে নেমে যায়; আবার অপান যখন মূলাধার হতে নাভিতে উঠে, প্রাণ তখন নাভি হতে নাসিকা দ্বার দিয়ে বের হয়ে যায়। এইরকম-ভাবে জীব দেহে প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া বা টানাপোড়েন অষ্টপ্রহরই চলছে। প্রাণ ও অপান কখনও মিলিত হয় না। যদি অপানকে মূলাধার হতে নাভিতে উঠিয়ে কোন কৌশল সেখানে স্থির রেখে যদি প্রাণকে নাভিতে নামিয়ে আনা যায় তাহলে উভয়ে মিলিত হতে পারে; কিংবা প্রাণকে নাভিতে নামিয়ে কোন কৌশলে সেখানে স্থির রেখে যদি

অপানকে মূলাধার হতে নাভিতে উঠিয়ে নেওয়া যায়, তাহলেও উভয়ের মিলন হতে পারে। এই মিলন কণ্ঠে ও ভ্রূমধ্যেও ঘটানো যেতে পারে। উভয় বায়ু মিলিত না হলে সাম্যাবস্থা লাভ হয় না। যতক্ষণ নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলে ততক্ষণ ইড়া পিঙ্গলামার্গ ক্রিয়াশীল থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস মিলিত না হলে সাম্যাবস্থা কখনই লাভ হয় না আর সাম্যাবস্থা লাভ না হলে সুষুম্নামার্গ খোলে না।

এই প্রাণ অপানের মিলনের সঙ্কেত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে দিতে গিয়ে বলেছেন—

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ৪।২৯

যোগীগণ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুর হবন করে (পূরক প্রাণায়ামের সাহায্যে) এবং প্রাণবায়ুতে অপান বায়ুকে আহুতি দিয়ে (রেচক প্রাণায়াম করে) প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধ পূর্বক (কুম্ভক রূপ প্রাণায়াম পূর্বক) প্রাণায়াম পরায়ণ হন। তারপর এইরকম মোক্ষ পরায়ণ মুনি "প্রাণেপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ" (৫।২৭) অর্থাৎ নাসাভ্যন্তর-চারী প্রাণও অপান সমান করতে তৎপর হয়ে থাকেন।

যোগের পথ লাভ করার জন্য এইসব ক্রিয়া প্রক্রিয়া থাকলেও স্বভাবের যোগপথে অভ্যুত্থান কোন ক্রিয়া সাপেক্ষ নয়। এটি সম্পূর্ণ কৃপা সাপেক্ষ। এই কৃপা গুরুর বা গুরুরূপী পরমেশ্বরের। জীবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাবের মধ্যেই ভগবান এই কৃপার ধারা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। জীব যখন মাতৃগর্ভে বাস করে তখন সে স্বতঃই যোগী অবস্থায় থাকার দরুণ পূর্ব পূর্ব বহু জন্মের ঘটনা সকল তার স্মৃতি পথে ভেসে উঠে। সেইসময় একটি অতি সূক্ষ্ম শক্তি মূলাধার হতে আরম্ভ করে স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রার পর্যন্ত একটানা প্রবাহিত হতে থাকে। এই অবিচ্ছিন্ন শক্তির প্রভাবে জীবের প্রকৃত বিবেক বৈরাগ্য ও বিচারের উদয় হয়। সে তখন উর্ধপদ ও হেটমুণ্ডে শ্রীভগবানের নিকট অতি কাতরভাবে প্রার্থনা জানায়—গর্ভবাসে মহৎকষ্টং ত্রাহি মাং মধুসূদন! হে ভগবন্! আমি পূর্ব পূর্ব জন্মে বহু অপকর্ম করেছি যার ফলস্বরূপ মাতৃগর্ভের এই ঘোর যন্ত্রনা আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে। এই মলমূত্রের ভাণ্ডে অবস্থানের

ফলে কৃমিদংশনে আমার সর্বশরীর ব্যথায় জর্জরিত। তোমার দয়ায় যদি এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন মাতৃগর্ভরূপ কারাগার হতে একবার নির্গত হতে পারি, তাহলে হে দয়াল! আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি আর এমন কর্ম করব না যাতে পুনরায় মাতৃগর্ভে আসতে হয়। কায়মনোবাক্যে তখন তোমারই ভজনা করব। এইরকম প্রবল আকুতি উদিত হলেই ভগবৎ কৃপায় মাতৃগর্ভস্থ প্রসূতি নামক বায়ু ধাক্কা দিয়ে গর্ভস্থ শিশুকে জননীজঠরের বাইরে নিঃসৃত করে দেয়। এই ধাক্কা বা আঘাতের ফলে সেই যে একটানা সূক্ষ্মশক্তি যা মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল তা তিন স্থানে ছিন্ন হয়ে যায়। প্রথম ছিন্ন হয় নাভিস্থানে, দ্বিতীয় কণ্ঠে এবং তৃতীয় ভ্রূমধ্যে। তিন জায়গায় ছিন্ন হওয়ার ফলে চারটি খণ্ডে পরিণত হয়। এই অখণ্ড শক্তি প্রবাহের মাধ্যম খণ্ডিত হয়ে যাওয়ার ফলে গর্ভস্থ জীবের কাতর প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা ও স্মৃতি সব বিলুপ্ত হয়ে যায়, ফলে সে মহামায়ার মায়ারূপ মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এখন এই চারটি ছিন্ন অংশকে যদি কোনভাবে এক করে ফেলা যায়, তাহলে পুনরায় পূর্ণজ্ঞানের উদয় এবং বহু প্রকার যোগজশক্তির বিকাশ সম্ভবপর হয়। এই শক্তির প্রভাবেই যোগী নানাপ্রকার অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হন, অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রাকাম্য যত্রকামবশায়িতা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি অষ্টাদশ সিদ্ধিও তাঁর করায়ত্ত হয়। ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান সবই প্রকৃত যোগীর কাছে হস্তামলকবৎ। অনেক যোগীকে যে দেখা যায়, নিজের বা অপরের মৃত্যুর দিন সময় ও স্থান নির্ভুলভাবে পূর্ব হতেই বলে দিচ্ছেন সেও এই যোগজ শক্তির ফল।

কথা শেষ করেই তিনি শিবের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। বুঝলাম, আর তিনি কোন কথা বলতে নারাজ। মতীন্দ্র টর্চ টিপে তাঁর ঘড়ি দেখে বললেন—রাত্রি সাড়ে ন'টা বেজেছে। আমি মোহান্তজীকে বললাম—এবার সবাই শুয়ে পড়লে কেমন হয়? সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ তিনি যোগ সম্বন্ধে 'থোড়া কুছ' বলতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর সেই 'থোড়া কুছ' শেষ করতে তিন ঘণ্টা সময় লাগল। মোহান্তজী বললেন—হ্যাঁ আমরা এবার শুয়ে পড়লেই ভাল হয়। কাল সকালে আমাদেরকে যাত্রা করতে হবে। অতবড় শক্তিধর মহাযোগী যখন আমাদের কাছেই রইলেন তখন নিশ্চিন্ত মনেই আমরা ঘুমাতে পারব।

—তাঁর কাছে থাকা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। আমি মন্দির খুলে টর্চ টিপে একবার দেখে নিই?

—রতনলালের দুর্দশা দেখেও তোমার জ্ঞান হল না? সে বেচারা ইষ্টমন্ত্র একদম ভুলে গেছে। দীর্ঘকাল নিষ্ঠা সহকারে জপ করার ফলে তার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জপের ধারা চলত, অজপার মত। সে ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। সে কেঁদে কেঁদে এর মধ্যেই কেমন আধখানা হয়ে গেছে দেখ। তুমি আর সাধুর ক্রোধ বহ্নিকে উদ্দীপ্ত করে তুলো না।

মোহান্তজীর কথা শেষ হতে না হতেই আমি দরজা খুলে মন্দিরের ভিতরে টর্চ টিপলাম। শিবের ঘরে ঢুকেই আমি মোহান্তজীকে ডেকে হাসতে হাসতে বললাম—দেখবেন আসুন আপনার মহাযোগী কেমন সমাধিস্থ হয়ে গেছেন, এ এমনই সমাধি যে শূন্যে মিলিয়ে গেছে তাঁর দেহ। কা কস্য পরিদেবনা! মোহান্তজী লক্ষ্মণভারতী যতীন্দ্র প্রভৃতি সবাই উঁকি মেরে দেখলেন। তাঁদের মুখ চোখ দেখে বুঝতে পারলাম, সবাই হতচকিত। ভগবান কোটেশ্বরের আগ্নেয় লিঙ্গ ছাড়া আর কোথাও কিছু নাই। মহাদেবকে প্রণাম করে আমরা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

যে যেখানে পেরেছেন শুয়ে পড়েছেন, আমিও শুয়ে পড়লাম অল্পক্ষণের মধ্যে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মধ্যরাত্রে। আমার মনে হল কেউ যেন শুয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মোহান্তজী তাঁকে ফিস্ ফিস্ করে বলছেন—অত অধীর হয়ো না। শান্ত হও, মহাপুরুষতো বলেইছেন, হাপেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছেও যদি তোমার স্মৃতিপথে মন্ত্রের জাগরণ না ঘটে তাহলে তিনি তোমাকে ইষ্টবীজ পুনরায় দান করবেন। আমি ত দেখছি, এ ঘটনা তোমার পক্ষে শাপে বর। অতবড় উচ্চকোটির মহাত্মার কাছে মন্ত্রপ্রাপ্তির সুযোগ, সে ত তোমার অপার সৌভাগ্য, এ কথাটা তুমি কেন যে বুঝতে পারছ না, তা আমার মাথায় ঢুকছে না!

আমি বুঝতে পারলাম রতনলাল ভারতীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন মোহান্তজী। কিন্তু তাঁর এই প্রবোধ বাক্যে রতনলালজী মোটেই শান্ত হলেন না। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন—কে তাঁর পায়ে ধরে সাধছে মন্ত্র প্রাপ্তির জন্য? তিনি যতবড় উচ্চকোটির মহাত্মা হোন না কেন, এমন কি স্বয়ং শিব হলেও আপনার কাছ ছাড়া আর কারও কাছে আমি মন্ত্র নিচ্ছি না। মৎগুরুঃ

শ্রীজগদ্‌গুরু। রাখবি মারবি যো ইচ্ছা তুহারা। নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা। কাল এখান থেকে যাত্রা করার পূর্বে আপনি যদি আমাকে পুনরায় মন্ত্র না স্মরণ করিয়ে দেন, আমি সোজা দৌড়ে গিয়ে নর্মদায় ঝাঁপ দিব।

উত্তরে মোহান্তজী বললেন—করপাত্রীজীর মত অতবড় মহাত্মার রোষ-দৃষ্টিতে আমি পড়তে চাই না। আমি নিতান্ত সাধন ভজনহীন লোক। আমাকে অকৃতী অধম জেনেও গুরু আমার হাতে গদী সমর্পণ করে গেছেন। আমি গদীর মর্যাদা রক্ষার জন্য তোমার মত যারা উপযাচক হয়ে আমার কাছে সন্ন্যাস প্রার্থনা করে গুরুদেবকে স্মরণ করে কেবল তাদেরকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিই। আমি মনে মনে জানি আমি কারও গুরু হবার যোগ্য নই। কাজেই অবোধ বালকদের মত কোন টেক্ (জিদ্) ধরে বসে থেকো না। এখন ঘুমাবার চেষ্টা কর, আমাকেও ঘুমাতে দাও। সকাল হোক, তখন মা নর্মদা যা করবেন তাই মাথা পেতে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও।

তাঁদের আর কোন কথা আমি শুনতে পেলাম না। গুরুকে ঘুমানোর সুযোগ দিবার জন্যই বোধহয় ভক্ত রতনলাল নীরব হলেন। 'মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ' এই কথায় রতনলালের যে অব্যভিচারিণী ভক্তির পরিচয় পেলাম, তাতে আমি অভিভূত হলাম। গুরু বলছেন—'আমি সাধন-ভজন হীন লোক, আমার প্রদত্ত মন্ত্র ভুলে গিয়েছ, সে তোমার পক্ষে শাপে বর কারণ হাপেশ্বরে পৌঁছে তুমি ঐ একই মন্ত্র শুনতে পাবে করপাত্রীজীর মত একজন মহাসিদ্ধ মহাযোগীর শ্রীমুখ হতে' আর শিষ্য বলছেন গুরুকে তোমার যোগস্থিতি ও সাধন সম্পদ আমার বিচার্য নয়, তুমি আমার গুরু, মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ, হৃত মন্ত্র আবার যদি ফিরে পেতে হয়, তোমার মুখ দিয়েই শুনব, স্বয়ং শিব প্রকট হয়ে বলতে চাইলেও আমি শুনব না, জোর করে তিনি বললেও তা শুনে আমার তৃপ্তি হবে না, তুমি আমার একমাত্র গতি শরণং সুহৃৎ!' গুরু মহাযোগীর রোষদৃষ্টিতে পড়তে চাচ্ছেন না, ভয়ে কেঁপে মরছেন আর শিষ্য মহাযোগীর সর্বনাশা শক্তির পরিচয় পেয়েও গুরু নিষ্ঠায় অবিচল!

রতনলালের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল! হায়! রতনলালের মত

যদি ঐ রকম গুরু ভক্তি আমার থাকত, তাহলে এতদিনে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে যেতাম! এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোর হতে না হতেই সকলে উঠে পড়েছেন, আমিও জাগলাম। মোহান্তজী সবকেই বললেন—'আজ ভয়ঙ্কর হাপেশ্বরের জঙ্গলে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি। দুর্গম জঙ্গলে কোথাও উপযুক্ত স্নানের ঘাট পাবো কিনা ঠিক নাই। কাজেই প্রাতঃকৃত্য সেরে এইখানেই চল স্নানপর্ব সেরে নিই।' তাঁর ইচ্ছানুসারে সবাই চলে গেলাম নর্মদার ঘাটে। আমরা স্নান সেরে এসে যে যার ঝোলা কম্বল গুছিয়ে নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় মন্দিরের দরজা হঠাৎ খুলে গেল। করপাত্রীজীর মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি মন্ত্র পাঠ করছেন—

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥

যা কিছু জাগতিক বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, সেই সমস্তকে অন্তরে ও বাইরে ব্যাপ্ত করে নারায়ণ বর্তমান আছেন।

অনন্তমব্যয়ং কবিং সমুদ্রেঽন্তং বিশ্ব-শং-ভুবং।
পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ং চাপি অধোমুখম্॥

দেশকালপরিচ্ছেদশূন্য, বিনাশ রহিত, সর্বজ্ঞ, সংসার সাগরের অন্ত-স্বরূপ এবং সকল সুখের কারণকে উপাসনা করি। সকল জীবেরই হৃদয় দেশ পদ্মের মধ্যস্থলের মত; কিন্তু সেটা অধোমুখ।

অধো নিষ্ট্যা বিতস্ত্যান্তে নাভ্যাম্ উপরি তিষ্ঠতি।
হৃদয়ং তৎ বিজানীয়াৎ বিশ্বস্য আয়তনং মহৎ॥

গ্রীবা সংযোগের নিম্নে এবং নাভি হতে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান উর্ধ্বে উক্ত হৃদয় বিদ্যমান আছে বলে জানবে। ঐটিই বিশ্বের মহৎ আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়।

সন্ততং শিলাভিস্তু লম্বত্যাকোশ সন্নিভম্।
অস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥

পদ্মমুকুল সদৃশ ঐ হৃদয় নাড়ী সমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে লম্বমান রয়েছে ; তার কাছেই একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্রের মধ্যেই এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সর্ব জগৎ কারণ ব্রহ্ম ঐখানে অনুভূত হন।

তস্য মধ্যে মহানগ্নিঃ বিশ্বার্চ্চিঃ বিশ্বতোমুখঃ।
স অগ্রভুক্ বিভজন্ তিষ্ঠন্ অন্নাহারম্ অজরঃ কবিঃ।
তির্যক্ ঊর্ধ্বমধঃশায়ী রশ্ময়স্তস্য সন্ততাঃ ॥

ঐ ছিদ্রের মধ্যেই বহু শিখাযুক্ত বহু রূপযুক্ত বিশাল অগ্নি বিদ্যমান আছেন। সেই অগ্নি সম্মুখে প্রাপ্ত সকল প্রকার অন্ন পরিপাক করেন। তিনি ভুক্ত অন্নকে সর্বয়বে প্রসারিত করে অবস্থিত হলেও স্বয়ং জীর্ণ হন না ; সুতরাং তিনিই দেহের সর্বত্র প্রসারিত জ্ঞাতা এবং তাঁরই চৈতন্য দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

সন্তাপয়তি স্বং দেহং আ-পাদ-তল-মস্তকং।
তস্য মধ্যে বহ্নি শিখা অণীয়োর্ধ্বা ব্যবস্থিতা ॥

তিনি (অর্থাৎ ঐ দেহ মধ্যস্থ অগ্নি) দেহকে আপাদমস্তক উত্তাপিত করেন। উক্ত অগ্নির একটি অতি সূক্ষ্ম শিখা ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত প্রসারিত আছে।

নীলতয়োদমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।
নীবারশূকবৎ তন্বী ভাস্বত্যণূপমা ॥

উক্ত শিখা নীল মেঘের মধ্যস্থ বিদ্যুৎরেখার ন্যায় উজ্জ্বল, নীবার বীজের শিষের ন্যায় সূক্ষ্ম, পীতবর্ণ, দীপ্তিমান এবং অতিসূক্ষ্ম অণুর তুল্য।

তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
স ব্রহ্মা স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ
পরমঃ স্বরাট্ ॥

সেই শিখার মধ্যে পরমাত্মা বিশেষরূপে প্রকটিত ; তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই মহাদেব, তিনিই হরি, তিনিই দেবরাজ, তিনিই অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং মায়াতীত স্বপ্রকাশ।

করপাত্রীজীর মন্ত্রপাঠ শেষ হতেই মোহান্তজী মন্দিরের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁর দেখাদেখি সকল নাগা সন্ন্যাসীও

প্রণাম করলেন। আমি যখন প্রণাম করলাম, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কহিয়ে ত হম্ যো মন্ত্রপাঠ কিয়া, আপ্ কভী আপকা পিতাজীকা পাশ ইয়ে মন্ত্রকা পাঠ লিয়া? কোন্ কিতাবমেঁ ইয়ে মন্ত্র হ্যায় আপ্ জানতে হেঁ?

—বেদপাঠি মাত্রেই এই মন্ত্র ও মন্ত্রের রহস্য অবগত আছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (১০।১১।১২) মন্ত্রগুলি 'নারায়ণ সূক্ত' নামে সুপ্রসিদ্ধ। এই মন্ত্রের মধ্যে আন্তর সাধনার গুহ্যতম ক্রম রহস্য ভাষায় বিবৃত আছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে হলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে হলে এই সাধন রহস্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে জানতেই হয়।

—সাবাস্ বাচ্চা। হম্ বহৎ খুশ্ হুঁ।

—আপনি খুশী হয়েছেন জেনে পরম আপ্যায়িত হলাম। গতকাল স্বভাব-যোগের বিষয় ব্যাখ্যা করে সহসা দরজা বন্ধ করে আপনি মন্দিরাভ্যন্তর হতে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর কি ঘটেছিল তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন।

—উহ্ মুঝে পতা হ্যায়। মোহান্তের নিষেধ বাক্য কানে না তুলে তুমি দরজা খুলে টর্চ টিপতে টিপতে মন্দিরের মধ্যে আমাকে খুঁজেছিলে। তোমার অল্প বয়স তাই কৌতূহল বেশী।

—না, কৌতূহলবশে আমি খুঁজিনি। সন্দেহবশে খুঁজেছিলাম। আপনার ঘন ঘন সহসা আবির্ভাব এবং সহসা অন্তর্ধানকে আমি বিষম সন্দেহের চোখে দেখেছি। আমার ঘোরতর সন্দেহ হয়েছিল, নিশ্চয়ই এই শিব মন্দিরে কোথাও গুপ্তকক্ষ বা গুপ্তদ্বার আছে, সেই পথ দিয়ে আপনার আগমন ও নির্গমন ঘটছে। আপনি মহাযোগী না মহা ঐন্দ্রজালিক তার সূত্র উদ্‌ভাবনের চেষ্টায় ছিলাম! এখন বলুন, আমার এই সন্দেহের জন্য আপনি আমার জন্য কি দণ্ডের বিধান করবেন?

—নেহি বেটা, আপকা কোঈ কসুর নেহি হুয়া। কৌতূহল সে জ্ঞান পয়দা হোতা হ্যায়, হীন সন্দেশা সে (সন্দেহ) নেহি।

—রতনলালজীও কৌতূহলবশেই গতকাল আপনাকে অনুসরণ করে-ছিলেন নর্মদার ঘাট পর্যন্ত। সাধুর হাতে রূপার নূতন বাটি বা সোনা দেখলে কার না সন্দেহ হয়? মোহান্তজী আপনার আদেশানুসারে সেই রূপার বাটি নর্মদার জলে ফেলে দিয়ে আসার পরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপনি ছুটে ছিলেন

নর্মদার ঘাটে। আপনার মনে কী গূঢ় ভাব বা কারণ আছে, তা বাইরের লোকের জানা সম্ভব নয়, সবাই আপনার মত সর্বান্তর্যামী বা সর্বজ্ঞ নয়, কাজেই রতনলালজীর মনে যদি সন্দেহ জন্মেই থাকে, যদি তাঁর মনে হয়েই থাকে যে আপনি নর্মদার জলে নিক্ষিপ্ত বাটিটি খুঁজে উদ্ধার করতে যাচ্ছেন, তাহলে তাঁর মত সন্ন্যাসীর পক্ষে অনুচিত হলেও আপনার মত মহাত্মারও কি উচিত হয়েছে, তাঁর এতকালের সাধনার ধনকে মুহূর্তে হরণ করা? আপনার ক্ষমতা আছে বলেই কি সেই যোগশক্তির অপব্যবহার করবেন! রতনলালজীর শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাঁর মন্ত্রের প্রবাহ স্তব্ধ এবং বিস্মরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রায় জীবন্মৃত হয়ে পড়েছেন! আপনি এত জানেন অথচ আপনি কি তাঁর অগাধ গুরুনিষ্ঠা অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন না? রতনলালজী এবং আমি দুজনেই সমান অপরাধে অপরাধী। আমার অপরাধকে লঘু দৃষ্টিতে দেখছেন কেন? আপনার মত মহাপুরুষ পক্ষপাত দুষ্ট হবেন কেন? আপনি যেমন তাঁর মন্ত্র হরণ করে নিয়েছেন তেমনি আপনার সাধ্য থাকে, আমার মন্ত্রও হরণ করে নিন।

এই বলে আমি চৌকাঠ পেরিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। চৌকাঠ পেরিয়ে যাবার জন্য যখন এক পা বাড়িয়েছি, তখনই মোহান্তজী আমার হাত ধরে টানবার চেষ্টা করলেন কিন্তু আমি তাঁর হাত সরিয়ে মহাত্মার সামনে গিয়ে বলতে লাগলাম—যোগীরাজ! আমি পুনরায় বলছি, আপনার সাধ্য থাকে আমার ইষ্টমন্ত্র হরণ করুন নতুবা রতনলালজীর স্মৃতিতে তাঁর ইষ্টমন্ত্র পুনর্জাগ্রত করে দিন। শরাপ (অভিশাপ) দেনা ঔর সরাব পিনা একই বরাবর পাপ হৈ।

আমার উত্তেজনা সত্ত্বেও মহাপুরুষের দিকে তাকিয়ে দেখলুম তিনি মিটিমিটি হাসছেন। আমি চুপ করতেই তিনি লক্ষ্মণভারতীর দিকে তাকিয়ে বললেন—লেও ভেইয়া মুঝে দো চারঠো ছোটাসা লকড়ি দেও। লক্ষ্মণভারতী কয়েক টুকরো ঝাঁটি কাঠ ভেঙে এনে তাঁর কাছে রাখতেই তিনি জোরে শ্বাস টেনে প্রায় পাঁচ মিনিট কুম্ভক অবস্থায় বসে রইলেন, তারপর রেচকের ভঙ্গীতে শ্বাস ফেললেন সেই কাঠের উপর। দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। শুনতে পেলাম, তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—'অগ্নিম্ ঈলে......।'

ওদিকে রতনলালজী উল্লসিত কণ্ঠে লাফিয়ে উঠলেন—মিল গিয়া, মুঝে মিল গিয়া। মোহান্তজীর পা দুটো জড়িয়ে আনন্দ ও আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—গুরুজী মেরে ত্র্যক্ষরবীজ স্মরণমেঁ আগিয়া। মোহান্তজী তাঁকে হাত ধরে উঠিয়ে করপাত্রীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে বললেন। রতনলালজী নত হওয়ার উপক্রম করতেই মহাত্মা হাতের ইসারায় কোটেশ্বর মহাদেবকে দেখিয়ে বললেন—যো কুছ হ্যায় সব উন্‌হি হ্যায়। উনোনে হি একমেব সদ্‌গুরু, জগদ্‌গুরু, বিশ্বগুরু, মহাগুরু হ্যায়।

পূর্ণানন্দ স্বরূপায় পূর্ণানন্দ প্রদায় চ।
নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমো নমঃ॥

মহাত্মা মোহান্তজীর দিকে তাকিয়ে বললেন—আজ মহালয়া হৈ। অমাবস্যা। আশ্বিন মাহিনাকা দশ তারিখ। পিতৃপুরুষকা পার্বণ শ্রাদ্ধকা শুভমুহূর্ত আগয়া। হম্ আপলোগোঁকো লিয়ে থোড়াসা কুশ, তিল যব বগেরা লে আয়া। আজ যাত্রা করণা ঠিক নেহি হ্যায়। পরশোঁ সে নবরাত্রিকা ব্রত সুরু হোগা। আজ ইধরই ঠার যাইয়ে। হম দেখতা হুঁ উসপারমেঁ বেদবতী মাতাজীকে আশ্রম সে শাশ্বতী মাতাজী আরহে হৈ। আভি আট বাজ গিয়া হোগা। করীব এগার সাড়ে এগারোকে অন্দর উনোনে ইধর পধারেঙ্গে। উনোনে নাওসে আরহে।

করপাত্রীজী যে যোগসিদ্ধির খেলা পর পর দেখিয়ে যাচ্ছেন, তাতে মোহান্তজী একরকম মোহিত অবস্থায় আচ্ছন্ন আছেন (under hypnotic spell) দেখছি, কাজেই আমি বুঝতে পারলাম, আজ ইনি কিছুতেই এ স্থান ছেড়ে যাবেন না। আমি মহাত্মাকে বললাম—শংকরাচার্য প্রভৃতি সন্ন্যাস ধর্মের প্রবর্তকরা এঁদেরকে পিতৃপুরুষদের প্রতি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের দায় হতে অব্যাহতি দিয়ে গেছেন। বিরজা হোমের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা সবাই স্বয়মেব ব্রহ্ম স্বয়ংসিদ্ধ সেজে বসে আছেন। এদের আর তিল কুশাদির দরকার নাই। ঐগুলি বরং আমাকে দিন। আমার কাছে পিতা এবং পিতৃপুরুষ প্রিয় পরম, পরমারাধ্য সত্যকার দেবতা। সঙ্গে পাঁজি পুঁথি নাই, আজ যে পার্বণশ্রাদ্ধের পবিত্রতম দিন, তা আপনি স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় আপনাকে নতজানু হয়ে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করছি। আপনার কাছে যদি তিল কুশাদি

থাকে তাহলে সেগুলি ভিক্ষা দিন আমাকে। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, এই বলে তাঁর কাছে দুই হাত পাতলাম। তিনি উঠে গিয়ে মন্দিরের এক কোণ থেকে একটি ঝক্‌ঝকে নূতন তামার কোশায় কিছু টাটকা কুশ, তিল ও যব এনে দিলেন। মোহান্তজীর অনুমতি নিয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে চললাম নর্মদার ঘাটে। আমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করতে করতে চললাম—

পিতা হি লোকে পুরুষঃ প্রধানো
হিতো মহাত্মা পরমোহনুকূলঃ।
অহেতুক স্নেহরসস্য মূর্তিঃ
প্রজাপতি র্বা স্বয়মেব মূর্তঃ॥
বিভুর্মহাত্মা মনসা বিভাব্য
সসর্জ পূর্বান্ পুরুষান্ প্রজার্থম্।
ত এব পশ্চাৎ পিতরো হি লোকে
মনুষ্য রূপেন সদা চরন্তি॥[১]

আমি নর্মদার ঘাটে পৌঁছে জলে নেমে তর্পণে মন দিলাম। শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিশেষতঃ শুক্ল যজুর্বেদান্তর্গত বাজসনেয়ি সংহিতার (অ-২/কণ্ডিকা ৩১-৩৪) যেসব মন্ত্র[২] বাবার কাছে শিখেছিলাম, তা স্মরণ মনন করতে করতে বিদেহী পিতা ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ালাম। উঠে দেখি, করপাত্রীজী এসে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে বললেন—উহ্ কোশা নর্মদামেঁ বিক দো। মাইয়াকী ভাণ্ডারসে হম্ মাংগ্‌কে লে আয়ে থে। তাঁর কথামত মা নর্মদাকে প্রণাম করে তাঁর জলে ছুঁড়ে দিলাম কোশাটা। 'অব চলিয়ে কোটেশ্বর মন্দিরমেঁ। শুনিয়ে বেটা! হম্ মহাত্মা প্রলয়দাসজী ও মহাত্মা সোমানন্দজীকা দোস্ত হুঁ। উন দোনো মহাত্মাকো তুম্‌হারা উপর কৃপাদৃষ্টি

১। লেখক প্রণীত 'পিতরো' নামক গ্রন্থের ১৩১—১৪১ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত মন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

২। তর্পণের ঐসব বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বুঝার জন্য 'পিতরো' গ্রন্থের ৮১—৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হায়। যব্ ভীল দস্যুনে তুমহারা উপর টাঙ্গি উঠায়া তো উনকা ইচ্ছানুসার মন্দিরমেঁ ফৌরণ্ আনে পড়া।'—এই বলে তিনি হাসতে লাগলেন। আমি চমকে উঠলাম, তাঁর কথা শুনে। ওঁকারেশ্বরে থাকেন প্রলয়দাসজী, তাঁর সঙ্গে সর্বশেষ দেখা হয়েছে মণ্ডলেশ্বরে অগস্ত্যি গুহায়। মহাত্মা সোমানন্দজী থাকেন চব্বিশ অবতারে কখনও বা সীতামায়ীর বনে, তাঁর সর্বশেষ দেখা পেয়েছি মাণ্ডবগড় কেল্লার কাছে রেবাকুণ্ডে, আর এই মহাত্মাকে মাত্র কয়েকদিন আগে সর্বপ্রথম দেখেছি অকলবাড়াতে। প্রত্যেকটি স্থান হতে অন্যস্থানের ব্যবধান বেশ কয়েক ক্রোশের ব্যাপার! এঁদের প্রত্যেকের মস্তিষ্কে যেন high power-এর transmitter বসানো আছে। প্রকৃত মহাযোগীদের সবই তাজ্জব ব্যাপার। যাই হোক, আমি তাঁকে প্রণাম করে বললাম—আমি আপনার কাছে অনেক ধৃষ্টতা ও অহেতুক উত্তেজনা প্রকাশ করেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

—কোঈ বাৎ নেহি, কোঈ বাৎ নেহি। হম্ আপকা উপর সদৈব প্রসন্ন হুঁ। আপ্ মন্দিরমেঁ যাইয়ে। পাঁচ দশ মিনিট বাদ হম্ যাতা হুঁ। হম্ দেখতে হেঁ শাশ্বতী মাতাজীকা নাও (নৌকা) আয়হে কি নাহি।

এই বলে তিনি দক্ষিণতটের দিকে ইতঃস্তত তাকাতে লাগলেন। আমি মন্দিরের দিকে হাঁটতে লাগলাম। মন্দিরে পৌঁছে আবার তাজ্জব বনে যেতে হল। শিবলিঙ্গের কাছে বসে থেকে তিনিই আমাকে প্রথম স্বাগত জানালেন —আইয়ে আইয়ে বাঙালীবাবা! আপ্‌কা তর্পণ হো চুকা? ম্যয় ত শোচতা হুঁ, তুম্‌হারা মনস্কাম সিদ্ধ হো গিয়া। কেঁও কি তুম্‌হারা মুখমণ্ডলমেঁ প্রসন্নতা ঔর জ্যোতিকা লহর খেলতা হৈ। রসিক সাধুর কৌতুক আমি নীরবে উপভোগ করলাম। নর্মদা ঘাট থেকে আমার পৌঁছবার আগেই তিনি এখানে এসে বসে আছেন! আমি চুপি চুপি যতীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলাম—ইনি কখন এসে পৌঁছালেন? যতীন্দ্র বললেন—তোমার কথা কিছু বুঝছি না। ইনি ত কোথাও যান নি। তুমি তর্পণ করতে যাওয়ার পর থেকে ইনি ত হরবখৎ এখানেই বসে আছেন! আমি এই কথা শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। তর্পণ শেষে আমি নর্মদা ঘাটে তাঁকে এইমাত্র প্রণাম করে এসেছি। কোন এক শাশ্বতী মাতার আগমন-পথের দিকে তিনি তাকিয়ে প্রতীক্ষারত আছেন দেখে এলাম! আর এখন শুনছি তিনি এ স্থান হতে পাদমেকং

কোথাও যান নি। একেই কি মহাযোগীর সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত থাকার ক্ষমতা বা অবাধিতভাবে ব্রহ্মভাবে নিরন্তর স্থিতি বুঝায়?

আমাকে এ বিষয়ে কোন চিন্তা করার সুযোগ দিলেন না। তিনি শাশ্বতী-মাতার প্রসঙ্গে বেদবতী আশ্রমের গল্প জুড়ে দিলেন। তিনি বলতে লাগলেন —শাশ্বতীমাতা বেদবতী আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষা, আশ্রম-মাতা। এঁর জ্যোতির্ময়ী শ্রীমূর্তি দর্শন করলেই বুঝতে পারবে ইনি ব্রহ্মবিদুষী। বেদবতী আশ্রমে কেবল তপস্বিনীরাই বাস করেন। সকলেই আবাল্যকুমারী, নিত্য বেদপাঠ এবং বৈদিক হবন এঁদের সাধনার অঙ্গ। ঐ আশ্রমে বোধহয় ৩০ জন তপস্বিনী কঠোর সাধনায় মগ্ন আছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠার বয়স প্রায় একশ হবে। শাশ্বতী মাতার বয়স আমি জানি ২৫৩ চলছে। যাঁর নামে এই আশ্রম সেই বেদবতীর উপাখ্যান ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বেদবতী ছিলেন বৃহস্পতির পুত্র ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের কন্যা। ইনি জন্মান্তরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কুশধ্বজ স্বয়ং লক্ষ্মী-মাতাকে কন্যারূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করলে, তাঁর স্ত্রী মালাবতী কালক্রমে লক্ষ্মীর অংশ রূপিনী এক কন্যা প্রসব করেন। এই কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র বেদধ্বনি করতে থাকেন; এইজন্য তাঁর নাম হয় বেদবতী। জন্মের পর মাত্র ন বছর বয়সেই তিনি পুষ্করতীর্থে গিয়ে এক মন্বন্তরকাল কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। এই সময় তিনি দৈববাণী শুনতে পান— 'তুমি জন্মান্তরে বিষ্ণুকে স্বামীরূপে লাভ করবে।' এই দৈববাণী পাবার পর বেদবতী গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে আবার তপস্যা করতে থাকেন। এই সময় হঠাৎ একদিন রাবণ তাঁর সামনে উপস্থিত হলে তিনি অতিথিজ্ঞানে তাঁর সেবা করেন। কিন্তু রাবণ এর রূপ যৌবনে মুগ্ধ ও কামাতুর হয়ে তাঁকে বলাৎকার করতে উদ্যত হলেন। তখন বেদবতী ক্রুদ্ধা হয়ে রাবণকে স্তম্ভিত করে তাঁর হাত, পা, মুখ প্রভৃতি সর্বাঙ্গ জড়ীভূত করে দিলেন। কিন্তু রাবণের এই অপমানের জ্বালায় তিনি তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে রাবণকে বলে যান—'এই অপমানের প্রতিশোধ নিবার জন্য আমি আবার অযোনিজা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে তোর বধের কারণ হব।'

বহুকাল পরে এই বেদবতী জনক রাজার কন্যা 'সীতা' নামে জন্মগ্রহণ

করেন। রাবণ সেই জন্মেও সন্ন্যাসীর বেশে পঞ্চবটি বনে গিয়ে সীতাকে বলপূর্বক হরণ করে লঙ্কাতে নিয়ে যান। বাল্মীকি রচিত রামায়ণের এই ঘটনা সকলেই জান। সীতা ও পূর্বজন্মের বেদবতীর জন্যই রাবণ রামচন্দ্রের হস্তে সবংশে নিহত হন। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যান, তখন দেবতাদের ইচ্ছাক্রমে প্রকৃত সীতা অগ্নির কাছে থাকেন। রাবণ ছায়া-সীতাকে অপহরণ করতে পেরেছিলেন। রাবণ বধের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষা কালে অগ্নিদেব প্রকৃত সীতাকে রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করেন এবং ছায়া-সীতা অগ্নি ও রামচন্দ্রের উপদেশানুসারে এই নর্মদা মাতার দক্ষিণ-তটে শূলপাণীশ্বর মহাদেবের সন্নিকটে ভয়ঙ্কর শূলপাণির ঝাড়ির একটি গুহাতে কঠিন শিব-তপস্যাতে রত হন। পরে দ্বাপরযুগে এই ছায়া-সীতা মহারাজ দ্রুপদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নিতে যোগবলে স্বয়ং সমুত্থিতা হয়ে যাজ্ঞসেনী বা দ্রৌপদী নামে পরিচিতা হন।

এই সময় আমি সহসা বলে ফেললাম—এবং এই দ্রৌপদীও কুরুবংশের ধ্বংসের কারণ হয়েছিলেন। তার মানে বেদবতী নাম্নী তপস্বিনী তিনি মহর্ষি কন্যা এবং লক্ষ্মীর 'অংশ স্বরূপিনী' হয়েও, জন্ম-জন্মান্তর ধরে তপস্যা করেও জিঘাংসা বৃত্তি ত্যাগ করতে পারেন নি! রাবণ তাঁর অপমান করে ছিলেন সেজন্য রাবণের উপর তাঁর প্রতিহিংসা থাকতে পারে, সীতারূপে জন্মে তার শোধ তুলে ছিলেন, এর যৌক্তিকতা তবু অনুধাবন করা যায় কিন্তু ছায়া-সীতা দ্রৌপদী রূপে জন্মে যে কুরুবংশ ধ্বংসের কারণ হলেন, সেই কুরুবংশের সঙ্গে রাবণের কি সম্বন্ধ! একথা ত কোন পুরাণকার লিখে যাননি যে রাবণ মরে দুর্যোধন হয়েছিলেন, তাই দ্রৌপদী রূপে জন্মে তাঁকে প্রতিশোধ নিতে হয়েছিল!

এছাড়াও আমার মনে আর এক ধাঁধা, বেদবতী রাবণ-বধের সংকল্প নিয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন বলে তিনি জন্মান্তর গ্রহণ করে রাবণ-বধের কারণ হতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন জন্ম ধরে এত যে তাঁর তপস্যা, সেই তপস্যাতেও তাঁর চিত্ত মল যদি পরিশোধিত না হয়, তাহলে এমন তপস্যার মূল্য কি?

করপাত্রীজী বললেন—বাঙালী বাবা! আপ্ থোড়া চুপ রহিয়ে। একদম খামুস্। শাশ্বতী মাতাজী আরহেঁ হ্যায়। শৈবাগম দর্শনকা

উপদেশ আচ্ছা মহর্ষিসে আপকো মিলা হ্যায়। কর্মমল, মায়িকমল জন্মান্তর মেঁ বিচিত্র রূপ লেতে হৈ। তপস্যা সে উস্‌কা শোধন হো সকতা হৈ, লেকিন আনবমল টুট্‌তা নেহি। কোঈ সুরতসে উসকো ভুগনেই পড়েগা। ইস্‌কা ঔর যো গহন গম্ভীর রহস্য হ্যায়, কোঈ বখৎ মোকা মিলনেসে হম্ আপকো সমঝা দুঙ্গা লেকিন্ আভি আপ্ কৃপা করকে চুপ রহিয়ে। আভি শাশ্বতী মাতাজীকো দর্শন করিয়ে। দক্ষিণতটমেঁ যিস গুহামেঁ ছায়া-সীতা তপস্যা কিয়ে থে, ওহি গুহাকো বেদবতী আশ্রম কহা যাতা হৈ। শাশ্বতী মাতাজী ওহি আশ্রমকা আচার্যা হ্যায়।

—আর আমাকে এ তত্ত্ব 'সমঝানোর' প্রয়োজন হবে না। অর্বাচীন পুরাণ বা উপ-পুরাণের গল্পকে যোগতত্ত্ব দিয়ে যতই বুঝানোর চেষ্টা করুন না কেন তা আমার মনকে স্পর্শ করবে না, কারণ আপনার মত মহাযোগীও পুরাণের যতই যৌগিক ব্যাখ্যা দিন না কেন, তা কখনই যুক্তি-সিদ্ধ হবে না।

—কেঁও আপ্ বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ পুরাণকো নেহি মানতে হেঁ? ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌কা সপ্তম অধ্যায় কী প্রথম খণ্ডমেঁ চতুর্থ শ্লোকমেঁ নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ আপ্ অধ্যয়ন কিয়া কি নেহি? উসমেঁ ইহ জিকর আয়া—নাম বা ঋগেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ আথর্বাশ্চতুর্থ-ইতিহাস-পুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ। স্বয়ং বেদ বলতে হেঁ পুরাণ মান্য হৈ, ইহ্ পঞ্চম বেদ হৈ।

—আপনি আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন। বেদ উপনিষদ যেখানে ইতিহাস পুরাণকে* পুনঃপুনঃ পঞ্চম বেদ বলছেন সে ঐ অর্বাচীন ১৮টি পুরাণ—যেগুলি ব্যাসের নাম দিয়ে চলে সেগুলি কদাপি নয়। যদি তর্কের খাতিরে এক মুহূর্তের জন্যও ধরে নিই যে ঐগুলি বেদব্যাসের লেখা, তাহলেও যে কোন লোক সাধারণ বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ বিচার করলেই বুঝতে পারবেন, ব্যাসের জন্মের বহু পূর্বে প্রকাশিত বেদ উপনিষদ—ব্যাসও যা অধ্যয়ন এবং ব্যাখ্যার করে বেদ বিভাগ পূর্বক বেদব্যাস হয়েছিলেন, পৃথিবীর সেই প্রাচীনতম গ্রন্থগুলিতে 'পুরাণ' শব্দের উল্লেখ থাকলে, 'পুরাণ' শব্দ তাহলে নিশ্চয়ই

* আগ্রহী পাঠক লেখক প্রণীত 'আলোক-বন্দনা' নামক গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠা—১০৯ পৃষ্ঠা পড়লে পুরাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রকৃত রহস্য জানতে পারবেন।

ওখানে ব্যাস রচিত বা পরবর্তীকালে ব্যাসের নাম দিয়ে রচিত অর্বাচীন পুরাণ যেমন ভাগবৎ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতিকে বুঝাচ্ছে না। ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে পুরাণকে 'পঞ্চম বেদ' বলা হচ্ছে বলেই বুঝা উচিত, ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যকের হাজার হাজার বছর পরে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদির মত অর্বাচীন অষ্টাদশ পুরাণকে ওখানে লক্ষ্য করা হচ্ছে না।

শাস্ত্রে আছে, 'যজমান যজ্ঞ সমাপ্তির পর দশম দিবসে পুরাণ পাঠ শ্রবণ করবে।' এ কথাতেও বুঝা যায় 'পুরাণ' বলতে বেদব্যাসের নাম দিয়ে প্রচলিত অর্বাচীন পুরাণগুলির কথা বলা হচ্ছে না। কারণ, বেদব্যাসের জন্মের বহু পূর্বেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হত, তখনও যজ্ঞান্তে পুরাণের পাঠ ও শ্রবণ করা হত! ব্যাসকৃত গ্রন্থের পঠন পাঠন শ্রবণাদি ব্যাসের জন্মের পরেই সম্ভব, পূর্বে নয়।

—তব্ আপ কহিয়ে আপ্ কা মতানুসারে পুরাণ কৌন্ হ্যায়?

—ঐতরেয়, শতপথ, গোপথ এবং সাম, এই চারটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থেরই অপর নাম পুরাণ। বেদের ব্যাখ্যাকেই পুরাণ বলা হয়। ঐতরেয় শতপথ গোপথ ও সাম—এই চারিটি গ্রন্থে সাক্ষাৎভাবে যদিও বেদবিদ্যার বর্ণনা আছে, ব্যাখ্যা আছে, তবুও বেদ ও উপনিষদ্ ঐ সব ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রূপ পুরাণকেই পঞ্চম বেদ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এগুলিতে ইতিহাস (যেমন জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ), পুরাণ (যেমন জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির বর্ণনা) কল্প (বৈদিক শব্দসমূহের সামর্থ্য বর্ণন ও অর্থ নিরূপণ), গাথা (যেমন কারও দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তরূপ কথা প্রসঙ্গ), নারাশংসীয় (মানুষের প্রশংসনীয় এবং অপ্রশংসনীয় কর্মের বর্ণনা) সমূহ লক্ষণ বর্তমান। এইজন্য শংকরাচার্যও বলেছেন—'ব্রাহ্মণেব পুরাণম্।' প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যও পুরাণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীন্নদ্যৌরাসীৎ'—ইত্যাদিকং জগতঃ প্রাগনবস্থামুপক্রম্য সর্গ প্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্ (ঐতরেয় সায়ন ভূমিকা)। অর্থাৎ 'প্রথমে কিছুই ছিল না, দ্যৌও ছিল না' ইত্যাদি কথায় যেখানে জগতের প্রথমতঃ অসত্তা নির্দেশ করে, পরে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে, সেই সকল সৃষ্টিতত্ত্ব প্রতিপাদক বাক্যই পুরাণ পদবাচ্য। ঐতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ঐসকল সৃষ্টিতত্ত্ব মূলক বাক্য আছে; বৈদিক যুগে যজ্ঞান্তে যজমান ঐ সব

সৃষ্টির উৎপত্তি বিষয়ক বাক্য, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ পাঠ করতেন তাই ব্রাহ্মণ গ্রন্থেরই অপর নাম পুরাণ। পুরাণ বলতে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ভাগবত পদ্মপুরাণ প্রভৃতিকে বোঝায় না, কাজেই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হতে আপনি যে বেদবতীর উপাখ্যান বললেন, তার গল্পাংশই আমি যখন বিশ্বাস করতে পারছি না, তখন 'কোঈ বখৎ মোকা মিলনেসে' তা আর আমাকে আপনার 'আচ্ছি-তরেসে সমঝানোর' প্রয়োজন দেখছি না। অবশ্য নর্মদার দক্ষিণতটে কোন একসময় বেদবতী নামে কোনও শ্রেষ্ঠ তপস্বিনী বাস করতেন এবং গুরু পরম্পর্য ক্রমে সেই ধারা আজও যখন বর্তমান রয়েছে, তখন এই বাস্তব ঘটনাকে আমি অবিশ্বাস করছি না।

যে কোন কারণেই হোক ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগী হিসাবে আপনার উপর আমাদের সকলেরই বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপন্ন হয়েছে। আপনিই বলুন না, বেদব্যাসের নাম দিয়ে যে আঠারোটি পুরাণ চলে আসছে ঐগুলি কি সত্যকার বেদ উপনিষদোক্ত পুরাণ পদবাচ্য? বেদব্যাস কি সত্যই ঐগুলির প্রণেতা?

আমার প্রশ্ন শুনে মহাত্মা চক্ষু মুদ্রিত করে বসে রইলেন। তিনি ইতি বা নেতিবাচক কোন উত্তর হয়ত দিতেন, কিন্তু তার আর তিনি অবকাশ পেলেন না। মোহান্তজী উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল ফেলে দিলেন—শাশ্বতী মাতাজী আ গয়া। শিঙ্গা ডম্বরু বাজাকর আপ্‌লোগ হমারা সাথমেঁ আইয়ে উনকো স্বাগত করেঙ্গে। পিছন ফিরে দেখি কিছু দূরে তিনি আসছেন। শিঙ্গা ডম্বরু বাজাতে বাজাতে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মোহান্তজী তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে নতমস্তকে আবাহন করছেন। রব উঠেছে স্বাগতম্! সুস্বাগতম্! নারায়ণ! নারায়ণ! মাতাজী কাছাকাছি হতেই মহাত্মা করপাত্রীজী ছাড়া আমরা যে পাঁচ জন মন্দিরে ছিলাম সবাই উঠে দাঁড়ালাম। তাঁর শরীর দেখে চমকে উঠলাম। লোলচর্মা বৃদ্ধা, গাত্রবর্ণ কষিতকাঞ্চন তুল্য। কপালের চামড়া ঝুলে পড়ে চোখকে বোধহয় ঢেকে দিয়েছে, তাই একখণ্ড গৈরিক বস্ত্র দিয়ে কপালে চামড়া সেঁটে বাঁধা হয়েছে। পরিধানে মৃগচর্ম। বক্ষদেশও আর একটি মৃগচর্ম দিয়ে আবৃত। পৃষ্ঠে বিশাল জটাভার, সুবর্ণকেশী, জটার চুলও স্বর্ণবর্ণের। হাতে ত্রিশূল। তিনি মেরুদণ্ড সোজা করে হেঁটে এসে মন্দিরের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পিছনে দুজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ,

তাঁদের হাতে দুটি ডেক্‌চি, গৈরিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত। মাতাজী সিঁড়িগুলি অতিক্রম করে মন্দিরের দরজার কাছে এসে করপাত্রীজীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে উঠে বললেন—গুরুজী আপনি সকাল আটটায় খবর দিয়ে আসার পরমুহূর্তে মহাদেবের পূজার আয়োজন প্রস্তুত করে এনেছি।

করপাত্রীজী তাঁর কথা শুনে লক্ষ্মণভারতীজীকে বললেন—ভেইয়া, তুম্‌লোগ ভোজনকে লিয়ে শালপাতা বগেরা লেকে আসন বিছাইয়ে।

সবকে শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, মহাদেবকো স্থূল রূপ হ্যায়, য্যায়সে আপলোগ হ্যায়। লিঙ্গরূপ হ্যায় য্যায়সে নর্মদেশ্বর লিঙ্গ, ওঁকারেশ্বর লিঙ্গ, কোটেশ্বর লিঙ্গ ইত্যাদি। লিঙ্গকা অন্দরমেঁ যব চিৎশক্তি প্রগট্‌ হোকর উনমে লিঙ্গকা রূপ বদল দেতা হৈ, তব উহ্‌ মন্ত্ররূপ হো যাতা হৈ, ঔর একাক্ষর, ত্র্যক্ষর, সপ্তাক্ষর যো শিবমন্ত্র হ্যায়, উহ্‌ মহাদেবকা মন্ত্র রূপ কহা যাতা হৈ: হমারা বেটি শাশ্বতী মাতাজী মূর্ত মহাদেবকো পূজা করনা পসন্দ্‌ করতা হৈ। আপ্‌ কৃপা করকে ইন্‌কো পূজা লিজিয়ে।

লক্ষ্মণভারতী আরও দুজন নাগাকে সঙ্গে নিয়ে গাছ থেকে শালপাতা সংগ্রহ করতে গেলেন। শাশ্বতী মাতাজী আমাকে লক্ষ্য করে করপাত্রীজীকে বললেন—গুরুজী! হম্‌ দেখতে হে সাড়ে দশসে ইহ্‌ বাচ্চা আপ্‌কো বহুৎ তন্‌ করতা হৈ। আচ্ছা, হম একঠো মন্ত্র বলতে হৈ, ইস্‌কা ক্যা মতলব কহিয়ে ত?

ভেরাড়্‌ভালমাশু কাটা সদা মুদে গজাবলা।
বিষাভাতমচ্ছমীড়ে, যস্য নাকধুনী গলে॥

আমি যথেষ্ট চিন্তা করেও ঐ রহস্য মন্ত্রের অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম না। আমি হাত জোড় করে তাঁকে বললাম—ইস্‌ মন্ত্রকা পাঠোদ্ধার হমসে হোগা নেহি। কৃপা পূর্বক আপ্‌ বাতাইয়ে।

শাশ্বতী মাতাজী কিঞ্চিৎ হেসে বলতে লাগলেন—অচ্ছং নির্মলং তং প্রসিদ্ধং ভে নক্ষত্রে রাজত ইতি ভেরাট্‌ চন্দ্রঃ। স ভালে যস্য তং ভেরাড়্‌-ভালং শিবম্‌ আশু শীঘ্রম্‌ অহমীড়ে স্তৌমী ইত্যর্থঃ। নাকধুনী গঙ্গা যস্য শিবস্য কাটা—কে শিরাসি অটতি সঞ্চরতীতি। তথা যস্য অবলা পত্নী অগজা

গিরিসুতাদুর্গা। পুনশ্চ যস্য গলে কণ্ঠে বিষাভ্য বিষস্য আভা দীপ্তি বর্ততে, তং শিবমিতি। অর্থাৎ চন্দ্র (ভেরাট্) যাঁর ভালে (ললাটে), পর্বতনন্দিনী (অগজা) দুর্গা যার সদানন্দদায়িনী পত্নী (অবলা), গঙ্গা (নাকধুনী) যাঁর মস্তকে সঞ্চারিত (কাটা) এবং বিষের আভা (নীলবর্ণ) যাঁর গলভূষণ, সেই সুনির্মল (অচ্ছ) শিবকে আমি স্তব করি পূজা করি।

শাশ্বতী মাতার মন্ত্র ব্যাখ্যা শুনে আমার খুবই আনন্দ হল। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণভারতীজী শালপাতা পেতে সকলকে ভিক্ষার জন্য বসিয়ে দিয়েছেন।

শাশ্বতী মাতা প্রথমে করপাত্রীজীর মাথায় চন্দন ও বেলপাতা দিয়ে 'নমঃ শিবায়' বলে তাঁর দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর মাথা ঠেকালেন। তারপর তাঁর ঝোলা থেকে এক একটি করে চন্দন মাখানো বেলপাতা বের করে সকল নাগা সন্ন্যাসীর মাথায় 'নমঃ শিবায়' 'নমঃ শিবায়' বলে তাঁর কৃত্য শিবপূজা করে যেতে লাগলেন।

এক ফাঁকে আমি সন্ন্যাসীদের সারি হতে একধারে একটু আলাদাভাবে আমার জন্য নির্দিষ্ট শালপাতাটি সরিয়ে নিয়ে বসে আছি। তিনি ক্রমান্বয়ে সকল সন্ন্যাসীদের মাথায় 'নমঃ শিবায়' মন্ত্রে বেলপাতা চাপিয়ে আমার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন—বালযোগিন্। এঁদের সারি থেকে তোমার আসন কিঞ্চিত দূরে কেন? এঁদের সঙ্গে তোমার ফারাক্ কোথায়?

—আত্মদৃষ্টিতে কোন প্রভেদ নাই কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে অনেক ফারাক্। ওঁরা অদৃশ্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে ফুটিয়ে তোলার জন্য কঠোর তপস্যা করছেন, কিন্তু আমি কোন সাধন ভজন করি না, তপস্যা কাকে বলে তাও জানি না। আমার পিতাই আমার জীবন্ত ঈশ্বর, প্রত্যক্ষ মহাদেব। আমি সেই দৃষ্ট দেবতাকেই স্মরণ মনন করি। আমি তাঁর স্নেহের ঋণ ভুলতে পারি নি। কিন্তু ওদের গুরুবর্গ আচার্য শঙ্করের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওঁদেরকে পিতৃমাতৃদায় থেকে রেহাই দিয়েছেন, ওঁরা আজ মহালয়ার মহাপুণ্য দিনেও মাতা-পিতা এবং পিতৃপুরুষদেরকে স্মরণ করা প্রয়োজন মনে করেন নি। তাই বেইমানদের কাছ হতে একটু দূরে বসেছি!

আমার কথা শুনেই শাশ্বতী মাতাজী থপ্ করে আমার সামনে বসে পড়লেন, তাঁর চোখ দুটি ক্রোধে অরুণবর্ণ হয়ে উঠল। তাতেও আমি বিন্দুমাত্র চঞ্চল না হয়ে বললাম—আমার মাথায় বেলপাতা চাপাবেন না,

তবে আপনার প্রসাদের উপর আমার লোভ আছে, বড্ড ক্ষুধাও পেয়েছে। এই সময় মন্দিরের ভিতর থেকেই করপাত্রীজী বলে উঠলেন—বেটি! শান্ত হো যাইয়ে। বাঙালী বাবাকো উপর হমারা দোনো দোস্ত্‌কো কৃপা দৃষ্টি হ্যায়।

মাতাজীর চক্ষু দুটি ক্রমে কোমল হয়ে উঠল। দু'চোখ দিয়ে যেন মমতা ঝরে পড়ছে। আমার মাথাটা দু'হাত দিয়ে কোলে টেনে নিয়ে শির চুম্বন করলেন, আমার মেরুদণ্ড দিয়ে যেন একটা স্নিগ্ধ স্রোত ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হল, একটা অভূতপূর্ব পুলক ও আবেশে আমার মন ভরে গেল।

মাতাজী 'নমঃ শিবায়', 'নমঃ শিবায়' বলতে বলতে উঠে গেলেন দরজার কাছে। ডেকচির ঢাকা ঈষৎ খুলে একহাতা খিচুড়ী দিলেন করপাত্রীজীর হাতে। তিনি ডান হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করে খেতে আরম্ভ করলেন। তারপর করপাত্রীজী যেমনভাবে আমাদেরকে পঞ্চকণিকার রুটি অর্পণ করেছিলেন তেমনিভাবে ডেকচিটি তাঁর সঙ্গী পণ্ডিতজী হাতল ধরে সকলের কাছে নিয়ে যেতে লাগলেন, আর তিনি গেরুয়া কাপড়ের ঢাক্‌না ঈষৎ সরিয়ে সরিয়ে সকলের পাতে প্রয়োজনমত খিচুড়ী পরিবেশন করতে লাগলেন হাতায় করে। এক একজনকে দেন আবার ডেক্‌চির মুখ ঢেকে ফেলেন। সকলকে দেওয়া হয়ে গেলে সকলকে আহার করতে বলে নমঃ শিবায়ঃ, নমঃ শিবায়, হর হর বম্‌, হর নর্মদে বলে ধ্বনি দিতে লাগলেন আর তাঁর পণ্ডিতজী ডম্বরু বাজাতে লাগলেন। সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠে নমঃ শিবায়, হর হর বম্‌ ধ্বনি অবিরাম বেজে চলল। এইভাবে তাঁর শিব পূজা শেষ হল। মন্দিরের মধ্যে ঢুকে তাঁর গুরুর মুখে একটু একটু করে জল ঢেলে দিলেন কমণ্ডলু থেকে। তাঁর হাতও ধুইয়ে দিলেন, হাত মুছিয়ে দিলেন সুবর্ণ কেশজটা দিয়ে। করপাত্রীজীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধুয়ে চরণোদক পান করে তিনি বিদায় চাইলেন সকলের কাছ হতে। আমরা সকলেই তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম নর্মদার ঘাট পর্যন্ত। চারজন মাঝি নৌকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নৌকার মাস্তুলে যে পতাকা উড়ছে তাতে দেবনাগরী ও গুজরাটি ভাষায় লেখা আছে 'বেদবতী আশ্রম'। নৌকা ছেড়ে দিল। আমরা ফিরে এলাম কোটেশ্বরের মন্দিরে। মন্দিরে এসে দেখি শিবের ঘর ফাঁকা। করপাত্রীজী অন্তর্হিত হয়েছেন।

শাশ্বতী মাতার প্রদত্ত খিঁচুড়ী ভোগ খেয়ে আমাদের সকলের পেট গমদম হয়ে উঠেছিল। প্রায় প্রত্যেককেই দেখলাম ঢেঁকুর তুলছেন আর জল খাচ্ছেন। মন্দিরে গাছতলায় সিঁড়িতে যে যেখানে পারলাম শুয়ে পড়লাম। ভূরি-ভোজনের ক্লান্তি ও আলস্যে আমাদের চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম। অবিশ্রান্ত ঘন্টানাদে আমরা যখন জেগে উঠলাম, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। মন্দিরের ভিতর তাকিয়ে দেখলাম করপাত্রীজী ঘন্টা বাজিয়ে চলেছেন আমাদেরকে জাগাবার জন্য। প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের আলোতে দেখলাম সেখানে একটি বড় পিতলের পঞ্চপ্রদীপ, একটি কর্পূরদানী, তুলার একটি বড় বাণ্ডিল, বেশ কতকটা কর্পূর এবং দু'বোতল ঘি রাখা আছে। তিনি মোহান্তজীকে ডেকে বললেন, তুমি তুলা, ঘি এবং পঞ্চ-প্রদীপের অভাবে কোটেশ্বরজীর আরতি করতে পারছ না বলে তোমার মনে দুঃখ। তাই এই সব নিয়ে এলাম। এখন তোমরা সব নর্মদা স্পর্শ করে এসে প্রাণভরে আরতি কর। হাপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পৌঁছে তাঁর আরতি করে এইসব পদার্থ যা যা অবশিষ্ট থাকবে, পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূরদানীসহ সব নর্মদার জলে ফেলে দিবে। তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এস ঘাট থেকে। আমি এখানে বসে বসে ভগবানের রূপমাধুরীর আস্বাদন করি।

তাঁর আদেশক্রমে আমরা সবাই নর্মদাতে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে 'হর নর্মদে' বলে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম মন্দিরে। এসে দেখি তিনি ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। চক্ষু নিমীলিত। চোখে মুখে অলৌকিক আনন্দের ছটা। মোহান্তজী পড়লেন বিষম সংকটে। তিনি আগেই আদেশ করেছেন আরতি করতে। আরতির সমূহ উপাদানও এনে দিয়েছেন। এখন শিঙ্গা, ডম্বরু বাজিয়ে ঘন্টাধ্বনি করতে করতে আরতি করলে ত তাঁর ধ্যান ভেঙে যাবে। তিনি চোখের ইসারায় লক্ষ্মণভারতীকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি পরামর্শ করলেন, এমতাবস্থায় কিংকর্তব্যং? তাঁদের মধ্যে কি আলোচনা হল শুনতে পেলাম না, তবে দেখলাম শলা-পরামর্শের পর তিনি সাবধানে মন্দিরে ঢুকে নিজেই ঘৃতসিক্ত তুলার বাতি পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে নিয়ে নীরবে আগের দিনের আরতি করতে লাগলেন। পঞ্চপ্রদীপের আরতির শেষে তিনি কর্পূর দিয়েও আরতি করলেন। স্তবপাঠ বা আরতির বাজনা বন্ধই আছে। আরতির পর

তিনি প্রণাম করে বেরিয়ে এলেন। সবাই আমরা নির্নিমেষ নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে জপ করে চলেছি। মোহান্তজী আরতির শেষে বেরিয়ে আসার পর তাঁর শরীরের চারদিকে একটা আভা ফুটে উঠল।

বহুক্ষণ পরে তাঁর শরীরে কম্পন দেখা দিল। মুখে হাসি। সে অবস্থাতেও তিনি আরও আধঘন্টা কাটালেন, তারপর তিনবার ঝাঁকুনি খেয়ে হর নর্মদে বলতে বলতে চোখ খুললেন। যতীন্দ্র কানে কানে বললেন—রাত্রি ১১টা।

আর পাঁচ মিনিট পরে মোহান্তজীর দিকে তাকিয়ে বললেন—কাল সুবে হাপেশ্বর জঙ্গলমেঁ প্রবেশ করিয়ে। ইস্ উত্তরতটমেঁ হাপেশ্বর ঔর দক্ষিণ তটমেঁ কাঁঠেদার ঝাড়িয়াঁ, ইয়ে এ্যায়সা কঠিন মার্গ নর্মদা যাত্রামেঁ কহী ভী নহি হৈঁ। ইয়ে দোনো ঝাড়িয়াঁ পথরোঁকে টুকড়ে, কঁকরোলী পথরোলী ভূমি পরিক্রমাবাসী হর নর্মদে করতে হুয়ে বড়ি কঠিনতাসে ইস্ মার্গকো পার করতে হৈঁ। খ্যার নর্মদা মাইয়া তুম লোগকো ইয়া উন্‌কা পরিক্রমাবাসী সন্তানকো খুদ্ সমহালেঙ্গে। কোঈ ফিকর নেহি।

মোহান্তজীকে ঠাট্টা করার ভঙ্গীতে বললেন—হাপেশ্বর জঙ্গলমেঁ বিশোয়াস কিজিয়ে আপ্‌লোগোকোঁ উপর হমারা দৃষ্টি রহেগা। কোঈ ডর নেহি। হাপেশ্বর মন্দিরমেঁ আপ্‌লোগকো সাথ হমারা ফিন্ ভেট হোগা।

এই বলে তিনি আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আবার বলতে সুরু করলেন—আজ দু'পহরমেঁ শাশ্বতীমায়ীসে ভিক্ষা লেনেকো বখৎ বাঙ্গালী-বাবা সন্ন্যাসীযোঁকো 'বেইমান্' কহা। ইস্‌লিয়ে আপ্‌কো কোঈ কোঈ চেলাকো উন্‌কা উপর বহুৎ গুস্যা হো গয়া। উন্‌লোগোকোঁ আপ্ সামহালেঙ্গে। ইয়ে হমারা খাস্ আর্জি, ইয়াদ্ রাখ্‌না। মোহান্তজী হাতজোড় করে তাঁকে বললেন—আপনি দয়া করে এ বিষয়ে কোন চিন্তা করবেন না। পূজ্যপাদ কমলভারতীজীর সম্প্রদায়ে এ জিনিষ সহ্য করা হবে না। ধর্মের প্রধান শিক্ষা সহনশীলতা। পরধর্মসহিষ্ণুতা যদি না থাকে এবং যে যার মতবাদ বা আপন অনুভব সম্বন্ধে যদি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে না পায়, তাহলে সাধু জীবনযাপনের সার্থকতা কি? শৈলেন্দ্রনারায়ণ কোন ত খারাপ কথা বলে নি। তা নিয়ে কারও মনে 'গুস্যা' করার কোন হেতু নাই। পিতা ও পিতৃপুরুষদের প্রতি তার যে অবিচল ভক্তি তা তো আমাদের সকলেরই শিক্ষনীয় বিষয়। সে যেমন আমাদের সঙ্গে আছে তেমনি যথোচিত মর্যাদায়

আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনি অন্তর্যামী, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আমি তাঁকে ইতিমধ্যেই ভালবেসে ফেলেছি।

মহাপুরুষ আর কোন কথা বললেন না। তিনি সকলকে আশীর্বাদ জানিয়ে চলে গেলেন নর্মদার ঘাটে, গেলেন সেই একইভাবে টলতে টলতে।

আমরা সকলেই তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠেই আমরা প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নর্মদা স্পর্শ করে যাত্রা সুরু করলাম। শিঙ্গা ডম্বরু বাজাতে বাজাতে ভগবান কোটেশ্বরের মন্দির পরিক্রমা করে চলতে লাগলাম পশ্চিমদিকে পশ্চিমগামিনী মা নর্মদার ধারাকে চোখে চোখে রেখে। কোটেশ্বর মন্দিরে যে তিক্ত ও মধুর অভিজ্ঞতা হল, তা আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকবে বলে আশাকরি।

ক্রমে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। রাস্তা বা পায়ে চলার দাগ বলতে কিছু নাই, কঠিন পার্বত্য পথ ঝোপেঝাড়ে লতায় পাতায় সব ঢেকে আছে। সবার আগে আছেন লক্ষ্মণভারতীজী। মোটামোটা শালগাছ, কেঁদ বারম, সাজা গাছের জঙ্গল। ছোট ছোট ঝোপেঝাড়ে প্রায় প্রত্যেকেই লাঠি বা ত্রিশূলের ঘা মারতে মারতে এগিয়ে চলেছি। যেখানে পথের উপর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছের ডাল এসে পড়েছে, সেখানে ছোট ছোট কুড়ুল বা টাঙ্গি দিয়ে নাগারা তা কেটে পথ পরিষ্কার করছেন। যতই এগুচ্ছি তত জঙ্গল ঘন হচ্ছে। শালবনের ভিতর দিয়ে কালো কালো পাথরের আঁকা-বাঁকা পথ এঁকে-বেঁকে যেতে যেতে এক একটা 'ডুংরি' বা অনুচ্চ পাহাড়ের সঙ্গে যেখানে মিশে গিয়েছে সেখানে দেখছি পাহাড়ের উপর শালগাছের সঙ্গে লতা-পলাশের জড়াজড়ি। এদেশের ভাষায় ছোট ছোট পাহাড়কে বলে 'ডুংরি'। ডুংরি শব্দটি লক্ষ্মণভারতীজীর কাছে এই আমি নূতন শুনলাম। তিনি মোহান্তজীকে বললেন—আপনার কি মনে আছে বছর পনের আগে গুরুদেবের সঙ্গে একবার আমরা এই পথে এসেছিলাম? সেবারে অমরকন্টক থেকে দক্ষিণতট ধরে পরিক্রমা করে এসে মণ্ডলেশ্বর যাবার পথে যখন এখানে এসে পৌঁছাই তখন ছিল চৈত্র মাস। সেই সময় সমগ্র জঙ্গল জুড়ে রক্ত-পলাশের সেই রঙীন বিচিত্র শোভার কথা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই? মোহান্তজী তাঁকে হাঁ-সূচক সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েই আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন—বড় বড় শালগাছকে জড়িয়ে

যেসব লতা-পলাশের মোটামোটা লতা, বসন্তকালে এই লতার গাঁঠে গাঁঠে অজস্র রক্ত পলাশ ফোটে। সমগ্র বনশোভা তখন অপরূপ হয়ে উঠে, তা দেখলে যে কোন রসকসহীন লোকের মনও উদাস হতে বাধ্য।

আমরা পথের মধ্যে একটা ঝর্ণা পেলাম। কুল্‌কুল্ করে বয়ে চলেছে। এইরকম পরিবেশে ঝর্ণার কলতানকে মধুর সঙ্গীত বলে মনে হচ্ছে। একজন নাগা সেই ঝর্ণার জল খেতে উদ্যত হতেই লক্ষ্মণভারতীজী 'হাঁ হাঁ' করে উঠলেন। তিনি তাঁকে কমণ্ডলুর জলপান করতে বললেন, কারণ তাঁর জানা এই বনের ছোট ছোট ঝর্ণার জল অনেক ক্ষেত্রেই বিষাক্ত হয়। হাতী বাঘ ভালুক প্রভৃতি বন্য জন্তুকেও এই জল খেয়ে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তাঁর কথায় আমরা কেউ ঐ ঝর্ণার জল খেলাম না। ঝর্ণা পেরিয়ে যতই এগোতে লাগলাম ততই জঙ্গলের পর জঙ্গল। বেলা প্রায় দশটা বাজতে যায় কিন্তু এই বনে সূর্যের আলো প্রবেশ করেনি। এতক্ষণের মধ্যে কোন মানুষের মুখ দেখলাম না, এমনকি একটা বন্যজন্তুও চোখে পড়ছে না। ক্রমোচ্চ পাহাড়ী পথের দুপাশেই শুধু জঙ্গল। বাংলাদেশের ছেলে আমি, এইরকম একটানা জঙ্গল দেখতে অভ্যস্ত নই। মুণ্ডমহারণ্য ওঁকারের ঝাড়ি দেখে এসেছি, সীতামায়ীর বনও ভয়ঙ্কর, শূলপাণির ঝাড়িরও প্রায় তিন চতুর্থাংশ অতিক্রম করে এলাম, কোথাও কোথাও এইরকম ঘনঘোর জঙ্গলও যে দেখিনি তা নয়, কিন্তু সেসব অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গল পথে বড় জোর একমাইল বা দুমাইল যাওয়ার পরেই সূর্যালোক চোখে পড়েছে কিন্তু এইরকম পাঁচ মাইল সাড়ে পাঁচ মাইল জুড়ে কেবলই অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে হয়নি। মোহান্তজীর নির্দেশমত লক্ষ্মণভারতীজীর হাতের লাঠি পিছন দিকে লম্বা করে বাড়ানো আছে, তাতে হাত ঠেকিয়ে আছেন প্রায় পাঁচ ছয় জন, লাঠির শেষ সীমায় যিনি, তিনি আবার তাঁর হাতের লাঠি বা ত্রিশূল লম্বা করে পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা শক্ত করে ধরে আছেন আরও কয়েকজন। এই পদ্ধতিতে হাত ধরাধরি করে যাওয়ার মত আমরা লাঠি ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছি। এই সাবধানতার কারণ পায়ের নীচে পার্বত্য পথ বড়ই কর্কশ। পায়ে মাঝে মাঝে সুঁচ ফোটার মত করে বিঁধছে। তার ফলে আকস্মিক ব্যথা পেয়ে কেউ যদি ব্যথার চোটে ঠিকরে পড়েন, হাতের ঐ লাঠি বা ত্রিশূল তিনি যেমন ঝাপ্‌টে ধরতে পারবেন,

তেমনি তাঁর আগে পিছে যাঁরা আছেন তাঁরাও তাঁকে ধরে ফেলতে পারবেন। অন্ধকারময় জঙ্গল পথে এইভাবে হাঁটার পরিক্রমাবাসীদের পরিভাষা হচ্ছে—'মদতদানি'। জঙ্গল আরও ঘন হল, গাঢ়তর হল অন্ধকার, একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি করে অতি মন্থর গতিতে আমরা হাঁটছি। কর্কশ্ সূচালো পাথর যখনই পায়ে ফুটছে তখনই সবাই মৃদুকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠছেন—'উঃ আঃ' শব্দে। ভূগর্ভস্থ টানেল বা সুড়ঙ্গ পথে হাঁটার মত আমরা জঙ্গলাবৃত অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে চলেছি, লক্ষ্মণভারতীজীর ভাষায় এইরকম ভয়ংকর দুর্গম পথের নাম ঝাড়ি সুড়ং (ঝাড়ি-সুড়ঙ্গ্)। নর্মদাকে যে প্রতিনিয়ত চোখে চোখে রাখতে হয় এ নিয়ম এখানে অচল।

কতক্ষণ পরে মনে হল জঙ্গল তুলনামূলক ভাবে কিঞ্চিৎ পাতলা হয়েছে। কারণ সূর্যের কিরণ কোথাও গাছপালা ভেদ করে ক্ষীণ রশ্মির আকারে এসে পড়েছে। একটু পরেই আমরা সূর্যালোকের মধ্যে এসে পড়লাম, সূর্যকে দেখতে পেলাম মাথার উপরে। আঃ! শান্তিঃ। শান্তিঃ! শান্তিঃ অন্ধকার হতে আলোতে ফেরার যে কী আনন্দ, যারা এইরকম দুর্বিপাকে কখনও পড়েননি, তাঁদেরকে এই আনন্দের কথা কিছুতেই বুঝানো যাবে না! কেন যে আমাদের বৈদিক ঋষিরা প্রাণের আকুতি জানিয়ে ছিলেন—'তমসো মা জ্যোতির্গময়', তা এখন যেন মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। তাঁদের সেই মন্ত্রের পারমার্থিক গভীর অর্থ যাই থাকুক না কেন, এই মুহূর্তে মন্ত্রের স্থূল অর্থটি বড়ই সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলে মনে হল! ক্রান্তদর্শী কবিগুরু কর্তৃক 'তিমির বিদারী উদার অভ্যুদয়ের' জয়ধ্বনি সর্বাংশেই সার্থক!

মধ্যাহ্ন-সূর্যের খরতাপকে এতই মধুর লাগছে যে আমরা সবাই উৎফুল্ল হয়ে তা সর্বাঙ্গ দিয়ে লেহন করছি। অধিকাংশ মানে শতকরা ৯৮ ভাগ পরিক্রমাবাসী কেন যে দক্ষিণতট দিয়ে পরিক্রমা করে দক্ষিণতটেই পরিক্রমা সমাপ্ত করেন, তার কারণও হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম।

এই সময় মোহান্তজী বললেন—সামনেই যে নর্মদার জলের মধ্যে অতি প্রাচীন শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে, ওরই নাম মেঘনাদ তীর্থ। এর সোজাসুজি দক্ষিণতটে সুরপান মহল্লা দেখা যাচ্ছে। এদিকে উত্তরতটে ত ভয়ঙ্কর জঙ্গল দেখলে, ঐ তটে কিন্তু লোকজনের বাড়ী ঘর দেখা যাচ্ছে। আমরা অনেক আগেই গুজরাট প্রদেশে ঢুকে গেছি। সুরপান মহল্লা থেকে

কিছু দূরেই রাজপিপ্‌লা। এ অংশটাও রাজপিপ্‌লা তহশীলের মধ্যে। রাজপিপ্‌লা তহশীলের সামান্য অংশ এদিকে। শতকরা ৯৫ ভাগ দক্ষিণ-তটে। রাজপিপ্‌লা এখন একটা ছোট শহর রূপে গড়ে উঠেছে। নর্মদা মায়ীর দিকে তাকিয়ে দেখ, পশ্চিমদিকে যেতে যেতে কিঞ্চিৎ উত্তরদিক ঘেঁসে এসেছেন। লক্ষ্মণভারতীজী মন্তব্য করলেন—আভি ত মাইয়া পাহাড় ভেদ করকে বক্রযানমেঁ যায়েঙ্গে। আমি হেসে বললাম—বৌদ্ধশাস্ত্রে হীনযান মহাযান শব্দের প্রয়োগ আছে। আমাদের উপনিষদেও দেবযান কালযান শব্দ দুটি সুপরিচিত। কিন্তু স্বামীজী! 'বক্রযান' গতির কথা ত কখনও শুনিনি।

—আভি থোড়া রুক যাইয়ে, আপনা আঁখমেঁ দেখেগা বক্রযান গতিকা স্বরূপ, তব্‌ পতা চলে গা।

আমরা ধীরে নেমে এলাম মেঘনাদ তীর্থের ঘাটে। অদূরেই জলের মধ্যে প্রাচীন শিবমন্দির, তট থেকে প্রায় ত্রিশহাত দূরে। মন্দিরের চূড়া কবেই ভেঙ্গে পড়ে গেছে। আমরা ঘাটে নেমে স্নান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মোহান্তজী বললেন—বেলা এখন সাড়ে বারটা। ঘন্টাখানিক মাত্র সময় দিতে পারি। কেননা বেশী দেরী হলে এই দুর্গম জঙ্গলের মধ্যেই আমাদেরকে রাত কাটাতে হবে। সকলেরই হাত পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। নিজেদের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ, পায়ের তলায় পাথরের কোণা ফুটে ফুটে আকল পড়ে গেছে, কারও বা ছিঁড়ে গেছে, কেটে গেছে। ঘন্টা কয়েক পরে ঐগুলো টাটিয়ে উঠবে। তখন আর মাটিতে পা ফেলতে পারবে না। স্নান পর্ব এর পরের তীর্থ ধর্মরায়ের মন্দিরে গিয়ে শেষ করব। তোমরা নর্মদা স্পর্শ করে এসে আমার কাছে এই তীর্থের মহিমা শুনে নাও। রাবণ ও মন্দোদরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিতের গল্প তোমরা সবাই জান। তারই নামানুসারে এই তীর্থের নাম মেঘনাদ তীর্থ। যাও নর্মদা স্পর্শ করে এস, আমি তোমাদের সবার জানা ঘটনার পুনরুল্লেখ করব। কারণ, পরিক্রমাকালে যে যে তীর্থে যাবে তৎ তৎ তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে হয়। রেবাখণ্ডের ৫৮-তম অধ্যায়ে মেঘনাদ তীর্থের বর্ণনা আছে।

আমরা সবাই নর্মদা স্পর্শ করে এলাম। আমি এসেই ঝোলা হাতড়ে

রেবাখণ্ডের ৫৬-তম অধ্যায় খুলে দেখতে লাগলাম। কিন্তু সেখানে অন্য প্রসঙ্গ, মেঘনাদ তীর্থের কোন উল্লেখ নাই। আমি সে কথা মোহান্তজীকে জানাতেই তিনি বললেন—তোমার কাছে যে বইটি আছে, সেটি স্কন্দ পুরাণের রেবাখণ্ড। বায়ু পুরাণের মধ্যেও রেবাখণ্ড আছে। সেই রেবা-খণ্ডের ৫৬-তম অধ্যায়ে মেঘনাদ-তীর্থের কথা আছে। পরে তুমি বায়ু পুরাণ দেখে নিও। একটা কথা বাবা তুমি জেনে রাখ, আমরা যেগুলিকে পুরাণ বলে মানি, তা স্বয়ং বেদব্যাসের লেখা হোক না হোক, যিনি বা যাঁরাই এইসব পুরাণের লেখক হোন, তাঁদের লেখায় কল্পনার আতিশয্য থাকলেও প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য জানার জন্য এইসব পুরাণের অবদান স্বীকার করতেই হবে। যাইহোক আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ইন্দ্রজিৎ মন্দোদরীর গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়েই মেঘগর্জনের মত ক্রন্দন করেছিলেন বলে এঁর নাম হয় মেঘনাদ। ইনি তাঁর পিতা রাবণের মতই মহা শিবভক্ত ছিলেন। মহামায়ার পূজা করে মেঘনাদ অলৌকিক যোগ বিভূতি ও মায়াবল লাভ করেন। তপস্যাকালে পর্যায়ক্রমে অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয়, গোমেধ বৈষ্ণব প্রভৃতি সপ্তযজ্ঞ সম্পন্ন করে এখানে এই নর্মদার উত্তরতটে এসেছিলেন দুঃসাধ্য মহেশ্বর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে। সম্পূর্ণ বায়ুভুক হয়ে, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পর মহেশ্বর যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার পর মহাদেব তাঁকে দর্শন দেন। মহাদেবের বরে মেঘনাদ কামচারী, আকাশগামী স্যন্দন (রথ), তামসী মায়া, অক্ষয় তূণীর এবং শত্রুনাশক দুর্লভ অস্ত্রসমূহ লাভ করে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেন। তাঁর শিব তপস্যায় মহাদেব এতই তুষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি ঐ সমস্ত দুর্লভ বস্তু ছাড়াও মেঘনাদকে নিজ হাতে দুটি শিবলিঙ্গ দান করেন।

ঐ দুটি শিবলিঙ্গ হাতে নিয়ে লঙ্কা যাত্রার উদ্দেশ্যে যখন আকাশগামী স্যন্দনে উঠে শূন্যপথে নর্মদা অতিক্রম করছিলেন সেই সময় দৈবাৎ তাঁর হাত থেকে একটি শিবলিঙ্গ নর্মদার জলে এইখানে পড়ে যান। তিনি একে মা নর্মদার ইচ্ছা মনে করে পরবর্তীকালে লঙ্কা হতে ফিরে এসে এই শিব মন্দিরটি স্থাপন করেন। সেই থেকে এই স্থানের নাম হয় মেঘনাদ তীর্থ। এখানে স্নান তর্পণ জপ দান ও ব্রহ্মভোজের ফল অত্যধিক। ব্রাহ্মণ তো আমাদের সঙ্গেই আছেন, কিন্তু এখানে ব্রহ্মভোজাদি সারতে গেলে

আমাদেরকেই 'ব্যাঘ্রভোজ' হয়ে যেতে হবে! কাজেই এখন পলায়নং তু জীবনং, এই তীর্থ ও তীর্থপতিকে প্রণাম করে এখান থেকে পালিয়ে যাই চল।

সবাই ঝোলা কম্বল নিয়ে উঠে পড়লাম। কিন্তু পা ফেলতে গিয়ে দেখি, ব্যথার জন্য পা ফেলতে পারছি না। সকলেরই একই অবস্থা। নর্মদা কিনার হতে অতিকষ্টে আবার সেই কঠিন পার্বত্যপথে ধীরে ধীরে পা ফেলতে ফেলতে চড়াই-এর পথে উঠতে লাগলাম। এখানটায় একটু জঙ্গল পাতলা ছিল, কিন্তু যতই পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম ততই জঙ্গল ক্রমশঃ পূর্ববৎ ঘন হতে লাগল। ধীরে ধীরে সূর্যদেব চোখের আড়াল হতে লাগলেন। আমরা আবার লক্ষ্মণভারতীজীর ভাষায় 'ঝাড়ি-সুড়ুং'-এ ঢুকলাম। আমার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল, এটা 'ঝাড়ি-সুড়ুং' না 'ডুংরি-সুড়ং'? কেননা, চড়াই-এর পথে আমরা যে ডুংরির উপর উঠে এসেছি তার চারপাশে এত বড় বড় গাছের জটলা যে সেই সবের ডালপালার ছায়ায় আমরা আবার অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেছি। তবে আমাদের পা রয়েছে ডুংরির উপর! কিন্তু লক্ষ্মণভারতীজীর যন্ত্রণায় এমন কাতরাচ্ছেন যে তাঁর সঙ্গে এ সময় কোন রহস্যালাপ করতে ইচ্ছা হল না। বুড়োমানুষ তিনিই আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নির্দেশে ইতিমধ্যেই আমরা পরস্পরের লাঠি বা ত্রিশূল পিছনদিকে লম্বালম্বি করে বাড়িয়ে, তাঁর ভাষায় 'মদতদারি' পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে হাঁটছি। এই সময় মোহান্তজী হঠাৎ হোঁচট খেলেন, তিনি নির্ঘাত পড়ে যেতেন কিন্তু তাঁর আগে যতীন্দ্র এবং পিছনে আমি, দুজনেই কোনমতে তাঁকে জাপ্‌টে ধরলাম। ডানপায়ের বুড়ো আঙুলে আঘাত পেয়েছেন। দু'মিনিট দাঁড়িয়ে আবার তিনি চলতে লাগলেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে। তিনি বললেন—গুরুদেব বলতেন, ঠাকুরের মন্ত্র বা স্তবপাঠ করতে করতে যেমন মাঝপথে বন্ধ করতে নাই, তেমনি জাগ্রত কোন নর্মদা-তীর্থেরও বর্ণনা মাঝপথে অর্ধসমাপ্তভাবে ছেড়ে দিতে নাই। আমরা দিনের আলো থাকতে থাকতেই ধর্মরায়ের ঘাটে পৌঁছাতে চাই বলেই মেঘনাদ-তীর্থের বর্ণনা সংক্ষেপে সেরেছি। সেইজন্যই এই আঘাত পেলাম। তোমাদের যতই জানা থাক, আমি ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে তোমাদেরকে মেঘনাদের কথা শোনাচ্ছি। তোমরা শুনতে শুনতে সাবধানে হাঁটতে থাক। আমরা

পরিক্রমাবাসী' মেঘনাদকে রাক্ষসরাজ রাবনের পুত্র রাক্ষস ভাবলে আমাদের চলবে না. তিনি নর্মদা-তটের একজন শ্রেষ্ঠ তপস্বী, দুশ্চর মহেশ্বর যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, মহা শিবভক্ত, এইটাই আমাদের কাছে তাঁর প্রধান পরিচয়।

মেঘনাদ শিবের বরে মহাবলীয়ান হয়েছে জেনে রাবণ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গ অভিযান করেন। সেই সময় মেঘনাদ শিবের বরে মায়া প্রভাবে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য থেকে. ইন্দ্রকে মায়াতে আচ্ছন্ন, শরজালে অবসন্ন এবং বন্দী করে লঙ্কাতে নিয়ে আসেন। দেবতারা ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রের মুক্তি ভিক্ষা করতে আসেন। ব্রহ্মা মেঘনাদকে ইন্দ্রজিৎ আখ্যা দেন। ইন্দ্রের মুক্তিপণ হিসাবে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার কাছে অমরত্ব দাবী করে বসেন। ব্রহ্মা ঐ বর দিতে অস্বীকার করলে ইন্দ্রজিৎ প্রার্থনা করেন, যখন তিনি যথাবিধি যজ্ঞ করে যুদ্ধযাত্রা করবেন তখন যেন সেই যজ্ঞাগ্নি হতে অশ্বসমেত রথ উত্থিত হয় এবং সেই রথে যতক্ষণ তিনি অবস্থান করবেন, ততক্ষণ তিনি যেন অমর থাকেন। অগত্যা ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলে দেবরাজকে মুক্ত করে নিয়ে যান।

রাম রাবণের যুদ্ধকালে ইন্দ্রজিৎ দুবার রাম লক্ষ্মণকে পরাজিত করেন। একবার নাগপাশেও বন্ধন করেন। বানর সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। গরুড়ের কৃপায় তাঁরা নাগপাশ হতে মুক্ত হন। তারপর কুম্ভকর্ণ অতিকায় ত্রিশিরা প্রভৃতি দুর্ধর্ষ রাক্ষসরা নিহত হলে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে অজেয় হতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঘরশত্রু বিভীষণের পরামর্শে লক্ষ্মণ সেই যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় অন্যায় ভাবে হত্যা করেন।

তাঁর মেঘনাদ তীর্থের গল্প শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আমরা সেই দু নম্বর ভয়ংকর 'ঝাড়ি-সুড়ং' অতিক্রম করে এসে পুনরায় সূর্যের মুখ দর্শন করতে পেলাম। এখানটাতে বন অপেক্ষাকৃত পাতলা। নর্মদার দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম। নর্মদা পশ্চিমাভিমুখী গতি ত্যাগ করে এঁকে বেঁকে পাহাড় ভেদ করে বয়ে চলেছেন উত্তর দিকে। রৌদ্রালোকে দেখতে পেলাম হোঁচট খেয়ে মোহান্তজীর বুড়ো আঙুলের নখ কতকটা উঠে গেছে।

আমরা সবাই খোঁড়াতে খোঁড়াতে অতিকষ্টে নর্মদার ঘাটে নেমে এলাম। লক্ষ্মণভারতীজী ধরে ধরে ঘাটে বসিয়ে দিলেন মোহান্তজীকে। পণ্ডিত কবিরাজ মশাই তাঁর ঝোলা থেকে একটা কবিরাজী তেল বের করে

মোহান্তজীর বুড়ো আঙ.লে লাগিয়ে আঁতাপাতার মত একটা গাছের পাতা দিয়ে বেঁধে দিলেন। লক্ষ্মণভারতীজী বলতে লাগলেন—ইয়ে বীজাসেনী তীর্থ হ্যায়। উসপারমেঁ যো মহল্লা দেখাই দেতে হৈ, উস্‌কা নাম ভৌতি ঘাট। ইস্‌ তীর্থকা নাম বীজাসেনী তীর্থ কৈঁও পড়া; ইস্‌কা কিস্‌সা বশিষ্ঠ সংহিতামেঁ হৈ। বায়ু পুরাণ কী রেবাখণ্ডমেঁ (অধ্যায় ৪৮) ইসকা বর্ণনা হৈ। রাবণ শিবজীকা পরম ভক্ত থা। একবার উসনে একাদশ রুদ্রকা তথা একাদশ রুদ্রানীয়োঁকা ভক্তিভাব সহিত পূজন কিয়া। ইসসে সমস্ত রুদ্রানী অত্যান্ত প্রসন্ন হুই। উনোনে রাবণকো বরদান মাগনেকো কহা। আপ্‌লোগ জানতে হৈ রাবণকো সহস্রোঁ পত্নীয়া থী। উনসে একলাখ পুত্র, সওয়া লাখ নাতি হো গয়ে থে। অব এায়সা অনুমান হোতা হৈ কি উহ্‌ পরিবার নিয়োজন করনা চাহতা থা। অতঃ উস্‌নে রুদ্রানীয়োঁ সে এহি বর মাংগা কি ‘মুঝে এায়সী কন্যা প্রদান করেঁ, জো সব স্ত্রীয়োঁকে গর্ভকো ভক্ষণ করে। রুদ্রানীকা আশীর্বাদমেঁ রাবণকো বীজাসেনী নামওয়ালী এক কন্যা হুই। উহ্‌ সভী স্ত্রীয়োঁকে গর্ভকা নাশ করনে লগী। লংকামেঁ তব সে বালক হোনে বন্ধ হো গয়ে হোংগে। যব শ্রীরামচন্দ্রজীনে রাবণ বধ কর দিয়া, তব্‌ শংকরজীনে বীজাসেনীকো উঁহা সে বুলা লিয়া ঔর আজ্ঞা দী—তুম্‌ নর্মদা কিনারে রহকর্‌ তপস্যা করো। ঔর গর্ভনাশকে স্থানমেঁ গর্ভ রক্ষা কিয়া করো। তভী সে বীজাসেনী ইহাঁ রহকর্‌ তপস্যা করনে লগী। ইয়ে তীর্থ ইসী কারণ বীজাসেনী তীর্থকে নাম সে প্রসিদ্ধ হো গয়া। যো স্ত্রীলোক বীজসেনীকো প্রণাম ঔর পূজা করতী হৈ, উনকা কভী গর্ভনাশ নহীঁ হোতা।

রতনলালজী হাসতে হাসতে বললেন—‘বাস্‌ করোজী, তীর্থ মহাত্ম্য শুনতে হয় শুনে নিলাম, এখানে প্রণাম করে এগিয়ে যাই চলুন ধর্মরায়ের ঘাটের দিকে। সেখানে গিয়ে গুরুজী যখন আজকের মত বিশ্রাম করতে চান, তখন ধুঁকতে ধুঁকতে সেখানে যেকোন ভাবে পৌছোতেই হবে। আমরা সন্ন্যাসী লোক, গর্ভিনী রক্ষা যাঁর একমাত্র কাজ, সেই দেবীর কথা বেশী শুনে লাভ কী? সকাল থেকে পেটে দানাপানি পড়েনি; তার উপর পথ এত সুন্দর যে সকলেরই হাত পা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে! আমি

বললাম তা হোক, প্রাচীন ভারতে অন্ততঃ একজনও যে পরিবার-নিয়ন্ত্রণের কথা চিন্তা করেছিলেন, এই সুসংবাদটি বায়ু পুরাণ থেকে জানা গেল!

—তবুও তুমি ত পুরাণকে মানতে চাও না! যতীন্দ্রের কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। হর নর্মদে হর নর্মদে বলতে বলতে আবার আমাদের যাত্রা হল শুরু। জঙ্গল কিছুটা পাতলা বলে আর আমাদেরকে লাঠি ধরাধরি করে অর্থাৎ মদতদানী করে হাঁটতে হল না। তবে পায়ের ব্যথায় সবাই কাতর, কোনমতে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম পা টেনে টেনে। বড় বড় গাছ যত্র-তত্র পাহাড়ের গায়ে থাকলেও সূর্যকে ঢেকে দিয়ে অন্ধকার সৃষ্টি করেনি। রোদের আলোতে হেঁটেও কিঞ্চিৎ স্বস্তি। পথ কিন্তু একই রকম কর্কশ, নরম মাটির উপর শিলা বৃষ্টি হলে যেমন তার মধ্যে অজস্র ছোট ছোট গর্ত হয় এবং মাটির আকার কোথাও উঁচু কোথাও নিচু হয়ে যায় তেমনি এই পার্বত্য পথের পাথরগুলো উঁচু নিচু খাঁজকাটা হয়ে পথকে অতি দুর্গম করে তুলেছে। ধারালো খাঁজকাটা পাথরের উপর ক্ষত বিক্ষত পা দুটো রাখা মাত্রই সকলেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠছেন। কখন কখনও বা একজন আর একজনকে ধরে এক পা উঠিয়ে এক পায়ে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে নিচ্ছেন। মোহান্তজীর অবস্থা বড়ই করুণ। তাঁর ডান পা বেশ ফুলে উঠেছে। তিনি লক্ষণভারতীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—ধর্মরায়জীকা ঘাট ঔর ক্যাত্‌না দূর বা?

ঔর এক মিল।

আমাদের চলার পথের ধার দিয়ে একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে। পাহাড়ের ঢালে আঙুল বাড়িয়ে রতনলালজী দেখালেন অনেক নিচে দুটো বড় বড় বাঘ জলপান করছে। বাঘ দেখে সকলেরই মেরুদণ্ড দিয়ে যেন শির্ শির্ করে হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। সকলেরই মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করেছে, কারও মুখে সাড়া নাই। ফিস্‌ফিস্ করে সবাই 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' জপ করছেন। লক্ষ্মণভারতীকে আমি পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে এগিয়ে যেতে বললাম। তিনি বোধহয় এই বালকের কথাটাকে এই সময়ে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে করলেন। অসাড় অঙ্গ কোনমতে টেনে টেনে তিনি চলতে লাগলেন। পরস্পর ঠেলাঠেলি করে, একজন আর একজনকে টেনে নিয়ে কোনমতে আমরা এগোতে লাগলাম। মাঝে মাঝে

আমরা কেউ কেউ বাঘ দুটোর দিকে একবার করে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছি। মোহান্তজীসহ আর অধিকাংশ নাগা উল্টোদিকে তাকিয়ে কোনমতে পা টেনে টেনে হাঁটছেন। প্রত্যেকের পা দুটো যদি অক্ষত থাকত এবং পথ যদি ভাল হত তাহলে সকলেই প্রাণপণে দৌড় লাগাত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একবার দেখলাম, বাঘ দুটো জলপান শেষ করে আমাদের দিকে বারেকের জন্য তাকালো, কিন্তু তাদের দৃষ্টি যেন বড়ই নিস্পৃহ এবং উদাসীন। তারা দৌড়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। ডালপালা নড়ার চিহ্ন দেখে অনুমান করলাম, তারা আমাদের কাছ হতে বিপরীত দিকে যাচ্ছে। আমার মনে হল, একটু আগেই হয়ত কোন হরিণ, সম্বর বা নীলগাই হত্যা করে তাদের ভূরি ভোজন হয়ে গেছে, পেট ভর্তি আছে তাই হয়ত তাদের এই নিস্পৃহতা, নতুবা-নতুবা……আমাকে আর 'নতুবার' পরের শব্দ খুঁজতে হল না, মোহান্তজী নিজেই আশ্বস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—করপাত্রীজী যে পুরাদস্তর আমাদের উপর দৃষ্টি রেখেছেন, এই ঘটনা তার জাজ্বল্য প্রমাণ। নতুবা দু দুটো হিংস্র বাঘ চোখের সামনে এতগুলো মানুষ দেখে ছেড়ে দেয়?

আমি বললাম—আমাদের গুরু শক্তি রক্ষা করেছেন বা মা নর্মদা রক্ষা করেছেন, একথা না ভেবে করপাত্রীজীর কথা আপনার মনে এল কেন?

—সদ্য সদ্য করপাত্রীজীর করুণা পেয়ে এলাম বলে আমার মনে তাঁর কথাই উদয় হল। গুরু শক্তি ও নর্মদার কৃপা বর্তমানে করপাত্রীজীরূপে ক্রিয়া করেছেন। তোমরা বিচার করে দেখ না, হাপেশ্বরের মহাজঙ্গলে এতখানা রাস্তা এলাম অথচ আমাদের কারও চোখে কোন হিংস্র শ্বাপদ পড়ল না! কৃপা ছাড়া একে আর কি-ই বা বলা যায়? কথা বলার জন্য কিঞ্চিৎ অসাবধানতার ফলে আমার ডান পাটা পড়ল একটা সূচালো পাথরের উপর। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে আমি পড়ে গেলাম। যতীন্দ্র এবং রতনলালজী আমাকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছিলেন। তাই রক্ষা নতুবা ডুংরি থেকে আমি গড়িয়ে পড়তাম জঙ্গলের মধ্যে। তখন কি ঘটত, তা মা নর্মদাই জানেন। হাঁটু দুটো ছেঁচে গেছে, গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। এখন আর কিছু করার উপায় নাই। কোনমতে যতীন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। একে ঠিক হাঁটা বলে না, হামাগুড়ি

দিয়ে ডুংরির উপর থেকে নিচের দিকে নামছি এইকথা বলাই সঙ্গত। সকলেরই অবস্থা তাই, মোহান্তজী হাঁটছেন রতনলালজীর কাঁধে ভর দিয়ে। যতীন্দ্র ও রতনলালজীরা সকলেরই গায়ে আকল হয়ে গেছে, গোটা দলটাকে দেখলেই যে কেউ বলবে একদল খঞ্জের মিছিল। সূর্যের আলো আছে বলে পথ দেখে দেখে কোনমতে চলতে পারছি। এখানটায় মাঝে মাঝে বড় বড় শাল গাছ ছাড়া ঝোপ ঝাড় নাই। রুক্ষ পার্বত্য পথ, পথের চেহারা দেখলে মনে হয় একদল দুর্ধর্ষ শক্তিশালী দৈত্যাকৃতি লোক গাঁইতি মেরে মেরে প্ল্যান মাফিক গোটা পার্বত্য পথটাকে খুবলে খুবলে দুর্গম ও রুক্ষ করে রেখেছে।

লক্ষ্মণভারতীজী আনন্দে বলে উঠলেন—হমলোগ্ ধর্মরায়জীকা ঘাটমেঁ পৌঁছ গিয়া। মন্দর দেখাই দেতে হৈ। অন্যান্য স্থানে দেখেছি, শিবমন্দির দেখতে পেলেই নাগারা আপনা হতেই শিঙা ডম্বরু বাজাতে লেগে যান। কিন্তু এখন সকলেরই শারীরিক অবস্থা কাহিল। শিঙা ডম্বরু কোনমতে ঝোলাতে রেখে বইছেন, তা বের করে বাজানোর মত মনের অবস্থা কারও নাই। যতীন্দ্রের ঘড়িতে এখন বেলা চারটা। মন্দিরে এসে পৌঁছে গেলাম। বিরাট আকাশচুম্বী পাথরের মন্দির, দক্ষিণমুখী, মন্দির থেকে প্রায় ১৫ হাত দূর দিয়ে নর্মদা বয়ে চলেছেন। বিস্তার এখানে কম। চারপাশেই পাহাড়। দক্ষিণতটের দিকে তাকিয়ে দেখি সেদিকেও পাহাড় নেমে এসেছে নর্মদার কিনার পর্যন্ত। এই মন্দিরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল চন্দ্রাতপ, প্রায় ৫০ ফুট দীর্ঘ এবং ৫০ ফুট প্রস্থ। চারদিকেই পাথরের দেওয়াল, প্রবেশ দ্বারে বড় বড় লোহার শিক বসানো গেট, এই গেটেই দরজার কাজ করছে। আমি যাকে চন্দ্রাতপ বলছি, লক্ষ্মণভারতীজী আমার ভুল শুধরে দিয়ে বললেন—দেব দেউলকা ইয়ে হ্যায় সভামণ্ডপ। সেখানে পৌঁছেই মোহান্তজী বললেন—'সামান উমান রাখকে আভি চলিয়ে নাহানেকে লিয়ে।' আমি মোহান্তজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—ধর্মরায় কে?

—দেবতাদের মধ্যে যম সর্বাপেক্ষা পুণ্যবান বলে তাঁর নাম ধর্ম বা ধর্মরাজ, অপভ্রংশে ধর্মরায়।

—শেষ পর্যন্ত তাহলে আমরা যমের দুয়ারেই এসে পৌঁছলাম!

আমার কথা শুনে সকলেই এত দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যেও হেসে উঠলেন।

মোহান্তজীও হাসতে হাসতে আমার গায়ে একটা টোকা মেরে বললেন—ফাজলামি (দিল্লাগী) করতে হবে না, এখন সবাই মিলে ঘাটে চল। বলেই তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগলেন। আমারও দুই হাঁটু রক্তাক্ত, পায়ের আকল ব্যথায় টনটন্ করছে, আমিও খুঁড়িয়ে চললাম। আমি হাসতে হাসতে তাঁকে বললাম—অন্ধেন নীয়মানা: যথান্ধা:, কাণা কাণাকে পথ দেখালে উভয়ে গিয়ে খানায় পড়ে, কিন্তু খঞ্জ খঞ্জকে জড়িয়ে ধরে যাচ্ছি, স্থান মাহাত্ম্যে এবং স্পর্শ মাহাত্ম্যে কিন্তু এখানে পৃথক ফল! খানায় পড়বো না, পড়বো মা নর্মদার কোলে! আর সকলেই ইতিমধ্যে জলে নেমে গেছেন। আমার কথা শুনে লক্ষ্মণভারতীজী মন্তব্য করলেন ভেইয়া, আগে নর্মদার জলে নাম, তারপর মালুম হবে মায়ের কোল কেমন শীতল! নর্মদায় নামতেই আমরা দুজনেই ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম। মোহান্তজীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘা এবং আমার হাঁটুর ঘাতে জল লাগা-মাত্রই জ্বলতে লাগল। কাতরাতে কাতরাতে কোনমতে জলে ডুব দিয়েই রতনলালজীর হাত ধরে আমরা দুজনেই উঠে এলাম জল থেকে তাড়াতাড়ি। ঘাটে বসে কোনমতে তর্পণ সেরে মন্দিরে এলাম। লক্ষ্মণভারতীজী আগে এসেই মন্দিরের দরজা খুলেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—মন্দিরের গর্ভগৃহে কি যমরাজের মূর্তি আছে? তাঁর উত্তরের আগেই মোহান্তজী বললেন—নর্মদাতটে শিব ছাড়া আর কেউ থাকেন না। ধর্মরায় বা যমের এটা তপস্যা ক্ষেত্র। তাঁর মূর্তি থাকবে কেন?

লক্ষ্মণভারতীজী শিবের মাথায় জল ঢেলেই কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এসেই সকলের ঝোলা থেকে যার কাছে যতটা কন্দ-মূল আছে তা বের করে দিতে বললেন। মোহান্তজী ঢুকলেন মন্দিরে। তিনিও জল ঢেলে লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। আমরা বাকী সকলে দূর থেকে প্রণাম করে পূজার কাজ সারলাম।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মণভারতীজী সকলের জন্য কন্দমূল কেটে ভাগ করে রেখেছেন। আমরা একটুকরো করে কন্দমূল চিবিয়ে পেটপুরে জল খেলাম। এলোমেলো ভাবে, যে যেমন ভাবে পারল কম্বল পেতে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। গা হাত পায়ের ব্যথাতে সবাই কাতরাচ্ছেন। পণ্ডিত কবিরাজের কাছে যে একবাণ্ডিল আয়াপান ছিল, তা থেঁতো করে মোহান্তজীর পায়ের

বুড়ো আঙুলে, আমার দুটো হাঁটুতে প্রলেপ দিয়ে অন্যান্যদের ক্ষত স্থানেও লাগিয়ে দিলেন। সকলকে একটা করে কবিরাজী 'বটিকাও' সেবন করালেন। কবিরাজ মশাই-এর নিজের পাও ক্ষত বিক্ষত। তিনি নিজের উপরেও ঔষধ প্রয়োগ করলেন। মোহান্তজী শুয়ে শুয়েই বললেন—লছমন ভেইয়া ধূনী কা ধান্দা ছোড় দিজিয়ে। ফাটক্ বন্ধ্ করকে লেট যাইয়ে। সব মাইয়াকা উপর ছোড় দো। বেলা বোধহয় সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। এখনও সূর্যাস্ত হয়নি। এই পাহাড়-ঘেরা জায়গার দৃশ্য মনোরম হলেও তা উপভোগ করার মত মন নাই এখন। কে কখন যে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। বন্য মোরগের ডাকে যখন ঘুম ভাঙল, তখন যতীন্দ্র জানালো যে রাত্রি চারটা বেজে গেছে। কারও ঘুম ভাঙলেও ক্লান্তির জন্য কেউ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। মোহান্তজী এবং লক্ষ্মণভারতীজী প্রবল জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। কবিরাজ মশাই খুবই চঞ্চল হয়ে পড়েছেন তাঁদের জন্য। তিনি জ্বরের প্রতিষেধক ঔষধ জানেন কিন্তু একসঙ্গে এতগুলি নাগার প্রয়োজনীয় ঔষধ তাঁর কাছে নাই। কোটেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে ভীলদস্যুদের হামলার সময় তারা অনেক ঔষধই নষ্ট করে দিয়ে গেছে। সকাল সাতটা বেজে গেল, পাঁচ ছ'জন নাগা ছাড়া আমরা কেউ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছি না। আমরা কয়েকজন বিছানার উপর উঠে বসেছি মাত্র। আমার ত কোমর থেকে পা পর্যন্ত অর্থাৎ মনে হচ্ছে কোনও সাড়ই নাই। মোহান্তজী এবং লক্ষ্মণভারতীজীর কোনও হুঁস নাই দেখে আমরা সবাই চিন্তিত।

ধর্মরায়ের ঘাটে ধীরে ধীরে একটা নৌকা এসে ভিড়ল। শিখা যজ্ঞোপবীত এবং হাতে ফুলের সাজি দেখে মনে হল ওপার থেকে পুরোহিত এসেছেন মহাদেবের পূজা করতে। তাঁর সঙ্গে দুজন লোক, তার মধ্যে একজনের হাতে একটা দেশী বন্দুক। নৌকাতে দুজন মাঝি বসে রইল। পুরোহিত মশাইএর মন্দিরে প্রবেশ করাই দুষ্কর। মন্দিরে ঢুকতে হলে আমাদেরকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে তাঁকে যেতে হবে। আমাদের কবিরাজ পণ্ডিত মোহান্ত মহারাজের পরিচয় দিতেই তিনি শশব্যস্তে মণ্ডপ গৃহের এক কোণে নর্মদার জল ছিটিয়ে পূজার সরঞ্জাম এবং তাঁর পিতলের কমণ্ডলুটি রেখে সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গী দুজনকে বসিয়ে নৌকাতে ফিরে গেলেন। নৌকা

ফিরে চলল দক্ষিণতটের দিকে। আমরা এর কার্যকারণ বুঝলাম না। প্রৌঢ় বন্দুকধারীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন মতীন্দ্রজী। বন্দুকধারী বললেন— পুরোহিত মশাই বোধহয় এই মন্দিরের সেবাইৎ রাজপিপ্‌লার জমিদার গিন্নীকে খবর দিয়ে বৈদ্যজীকে আনতে গেলেন।

আপনারা জানেন না, এই মোহান্তজীর পরমগুরু সিদ্ধ মহাত্মা কমল-ভারতীজীর কৃপাতেই এঁদের রাজৈশ্বর্য হয়েছে, বংশ রক্ষা হয়েছে। বর্তমান জমিদার গিন্নীর শ্বশুরের পিতা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন, অপুত্রক ছিলেন। পুত্রলাভের জন্য তিনি অনেক দেবমন্দিরে মাথা ঠোকেন, অনেক পূজা ও যজ্ঞাদি করেন কিন্তু কিছু ফল হয়নি। কিন্তু অবশেষে মহাত্মা কমলভারতীজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁরই নির্দেশে এই মন্দিরে বসে দীর্ঘ এক-মাস ধরে ধর্মরায়ের পূজা এবং নর্মদা ব্রত পালন করে পুত্রলাভ করেন। তারপর থেকে তাঁর ভাগ্যোন্নতি ঘটে। তিনি এই ধর্মরায়ের নামে রাজ পিপ্‌লাতে প্রচুর ভূসম্পত্তি দিয়ে গেছেন। তাঁর 'বসিয়ত নামাতে' এই নির্দেশ আছে, এই মহাদেবের নিত্য সেবা পূজা ছাড়াও যেসব পরিক্রমাবাসী পরিক্রমাকালে এখানে এসে পৌঁছবেন, তাঁর বংশধরকে সেইসব পরিক্রমা-বাসীদেরকে, তাঁদের সংখ্যা হাজার হলেও তাঁদেরকে ভিক্ষা দিতেই হবে। তাঁদের যথোচিত সেবাও করতে হবে। মহাত্মা কমলভারতীজীর গদীর মোহান্তজী স্বয়ং এসে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এ সংবাদ শুনলে স্বয়ং রাণীমাই নিজেই হয়ত ছুটে আসবেন। আমরা তাঁকে রাণীমাই বলি। গরীব দুঃখীর প্রতি তাঁর খুবই দয়া। নিজেও জপ-তপ নিয়েই থাকেন। তাঁর দেবীমূর্তি দেখলে আপনারা নিজেই বুঝতে পারবেন।

এইসময় একজন নাগা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বললেন—আপনার হাতে বন্দুক কেন? এখানে কি খুব বাঘের ভয়?

—ইয়ে জঙ্গলমেঁ বহুৎ বহুৎ বড়া বড়া বাঘ হ্যায়। লেকিন মন্দিরমেঁ কভি বাঘকা হামলা আভিতক্ নাহি হুয়ে। আপলোগোঁকা কোঈ ডর নেহি, বেফিকর রহিয়ে।

কথা বলতে বলতেই দেখলাম পুরোহিতজীর নৌকা ফিরে আসছে। নৌকা ঘাটে এসে ভিড়তেই নৌকা হতে পুরোহিতজীর সঙ্গে নেমে এলেন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁর কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের

মালা। তাঁকেই বৈদ্যজী বলে মনে হল। তাঁর সঙ্গে তাঁর একজন অনুচর একটা কাঠের বাক্স বয়ে আনছেন। মন্দিরে এসেই মহাদেবকে প্রণাম করে মোহান্তজীকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা মানে নাড়ী ধরে বসে রইলেন। তারপরেই লক্ষ্মণভারতীজীরও নাড়ী পরীক্ষা করলেন। ঔষধের বাক্স খুলে মোহান্তজী এবং লক্ষ্মণভারতীজীকে একরকম বড়ি খল-নুড়িতে মধু দিয়ে মেড়ে খাইয়ে দিলেন বৈদ্যজী। খল নুড়ি এবং মধু তিনি সঙ্গে করেই এনেছিলেন। তারপর তিনি প্রত্যেকের পায়ের ও হাঁটুর ক্ষত পরীক্ষা করে প্রত্যেককে এক একটি অতি ক্ষুদ্রাকৃতি বড়ি দিলেন সেবন করতে। যতীন্দ্র আমাদের সঙ্গী কবিরাজমশাই-এর পরিচয় দিতে বৈদ্যজী তাঁর কাছে বসে কোন্ ঔষধের কি নাম, কি কি উপাদানে প্রস্তুত, সেইসব বিশদভাবে আলোচনা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পুরোহিতমশাই-এরও শিবপূজা হয়ে গেছে। তিনি বন্দুকধারীকে জানালেন—'রাণীমা ক্ষুদ্ আয়েঙ্গে।'

বৈদ্যজী আজ সবাইকে স্নান করতে নিষেধ করলেন। আমরা লাঠি বা ত্রিশূল ঠুকে ঠুকে নর্মদার ঘাটে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নর্মদা স্পর্শ করে এলাম। স্বয়ং বৈদ্যজী, পুরোহিতজী এবং তাঁর সঙ্গী দুজন, এবং বৈদ্যজীর ছাত্র বা অনুচরও আমাদেরকে ঘাটে যেতে এবং ঘাট থেকে ফিরে আসতে সাহায্য করলেন।

বেলা প্রায় বারটা নাগাদ মোহান্তজী এবং লক্ষ্মণভারতীজীর কিঞ্চিৎ হুঁস ফিরে এসেছে বলে মনে হল। বৈদ্যজী আর একবার দু'জনের নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন—আধাঘণ্টাকো অন্দরমেঁ পুরা চৌন (চেতনা) আ যায়েগা। বুখার ভি আভি কম হো গয়া।

শিবমন্দিরে আছি অথচ গর্ভগৃহে ঢুকে নিজের হাতে শিবপূজা করতে পারছি না, নর্মদা তটে এই ঘটনা পরিক্রমাকালে এই প্রথম ঘটল। যে যার আসনে বসে জপে মন দিয়েছেন। বৈদ্যজীও জপ করছেন। আমি মহর্ষি তণ্ডিকৃত স্তবরাজ মনে মনে পাঠ করতে লাগলাম।

বেলা প্রায় দেড়টা নাগাদ আর একটি নৌকা ঘাটে এসে ভিড়ল। 'রাণীমা আ গিয়া' বলতে বলতে বৈদ্যজী, পুরোহিতজী প্রভৃতি দৌড়ে গেলেন ঘাটে। তাঁদের রাণীমা ছৈ-এর ভিতর থেকে বেরিয়ে বোধহয় পুত্রের হাত ধরে নেমে এলেন ঘাটে! যুক্তকরে মা নর্মদাকে প্রণাম করেই তিনি বৈদ্যজীর

কাছে আমাদের শারীরিক অবস্থার খবর নিতে লাগলেন। বৈদ্যজী বললেন —মোহান্তজী ঔর এক নাগা সন্ন্যাসীকো পুরা চৌন হো গয়া। বুখার ভি বহোৎ কমতি হ্যায়। সামকা বখৎ বুখার ছুট যায়েগা। কাল দুপহরমেঁ সব পরিক্রমাবাসীয়োঁকা দরদ ঔর ঘা বগেরা বিলকুল আরাম হো যাবে গা। 'রাণীমা'কে দেখে বন্দুকধারীর কথামত সত্যই দেবীমূর্তি বলেই মনে হল। আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্র ও উত্তরীয়তে ঢাকা, গৌরবর্ণা মায়ীকে একজন ব্রতচারিণী তপশ্চারিণী বলেই মনে হল। মুখে চোখে সাত্ত্বিকতার চিহ্ন। বয়স বোধহয় ষাটের কাছাকাছি। তাঁর ত্রিশ বর্ষীয় যুবক পুত্রটিও সুদর্শনকান্তি। তাঁরা মন্দিরে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি নিবেদন করে পরিক্রমাবাসীদের উদ্দেশ্যে মাথা নত করে প্রণাম জানালেন—'সর্বেভ্যঃ সাধুভ্যো নমঃ।'

মোহান্তজীর পদতলে উভয়ে করজোড়ে বসে রইলেন। তাঁরা নেমে আসার পর দুজন ব্রাহ্মণ দুটি বড় ডেক্‌চি কাঁধে করে আনলেন মন্দিরে। সঙ্গে একজন রাইফেলধারী ছিল, সেও এলো মন্দিরে। এসে তিনজনেই প্রণাম করলেন মহাদেবকে।

দু পাঁচ মিনিট পরেই মোহান্তজী চোখ খুললেন। যতীন্দ্রকে ডেকে বললেন—মুঝে থোড়া পাকড়কে বৈঠা দিজিয়ে। যতীন্দ্র তাঁকে বসিয়ে দিতেই তিনি বিস্ময়ভরা চোখে 'রাণীমা' প্রভৃতির দিকে তাকাতে লাগলেন। কালরাত্রি থেকে প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী, তাঁর কোন হুঁস ছিল না। এখন জ্বর ছেড়ে গেছে, পুরা হুঁস এসেছে। কিন্তু চোখ খুলতেই দেখছেন, ধর্মরায়ের মন্দিরে ছায়াছবির দৃশ্যপট বদলানোর মত, দৃশ্যপট বদলে গেছে! তিনি একবার 'রাণীমা' ও তাঁর পুত্রকে, একবার বৈদ্যজী এবং অন্যান্য লোকগুলিকে দেখতে লাগলেন। যতীন্দ্র তাঁর এবং লক্ষ্মণভারতীর হতচকিত অবস্থা দেখে, বন্দুকধারীর কাছে যা শুনেছিল, সেইসব আনুপূর্বিক পরিচয় এবং মহাত্মা কমলভারতীজী এবং তাঁর স্থাপিত গদীর সঙ্গে এঁদের আত্মিক সম্পর্কের বিবরণ দিলেন। মাতা পুত্র প্রত্যেকে একটি করে গিনি তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলেন। রাণীমা তাঁকে বললেন—'গুরুজী আপনি আমাদের আশ্রয়স্থল।' মোহান্তজী 'শিবমস্তু' বলে উভয়কে আশীর্বাদ করলেন।

এইবার রাণীমা বৈদ্যজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—এঁদেরকে ভিক্ষা দিবার জন্য খিঁচুড়ি করে এনেছি দিতে পারব ত?

—বড়ি খুশীসে। ওহি আচ্ছি সুপথ্য হোগা।

বৈদ্যজীর অনুমতি নিয়ে তিনি অনুচরবর্গকে ইঙ্গিত করলেন। তাঁরা শালপাতা ধুয়ে এনে আমাদের খাওয়ার আয়োজন করলেন। 'রাণীমা' মোহান্তজীকে প্রথমে দিয়েই আমাদের সবাইকে পরিবেশন করতে লাগলেন। তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন দুজন ব্রাহ্মণ যুবক। আমাদের কাছ হতে একটু দূরে বসে বৈদ্যজী, পুরোহিতজী এবং তাঁদের সঙ্গী তিনজনও প্রসাদ পেলেন। আমাদের প্রত্যেকেরই পায়ে ক্ষত ও ব্যথা থাকলেও পেটে ত কিছু হয় নি। কাল থেকে কেউ কন্দমূল ছাড়া আর কিছু খায় নি। কাজেই সকলেই এখন 'বৃকোদর'।[১] পরিক্রমাবাসীদের খাওয়া দেখে কে বলবে যে তাঁরা অসুস্থ। মোহান্তজী ও লক্ষ্মণভারতীজীও কম খেলেন। 'রাণীমার' সুবৃহৎ দুই ডেক্‌চিই নিঃশেষ হয়ে গেল। আমাদেরকে ধরে ধরে তাঁরা ঘাটে নিয়ে গেলেন, 'রাণীমার' পুত্র ধরে নিয়ে গেলেন মোহান্তজীকে। আমরা নর্মদায় মুখ হাত ধুয়ে যে যার কমণ্ডলু ভরে নিয়ে মোহান্তজীর ইচ্ছানুসারে ঘাটে কিছুক্ষণ বসলাম। আমরা বসে থাকতে থাকতেই 'রাণীমার' পুত্র তাঁর অনুচরবর্গকে ডাক দিলেন। আধঘণ্টা পরেই তারা ফিরে এল। মুক্ত বাতাসে বসে নর্মদার ধারা এবং রমনীয় পরিবেশ দেখে আমরা সবাই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। শরীর ও মনের অনেক ক্লেদ ও ক্লান্তি অনেকখানি দূর হয়ে গেছে বলে মনে হল। 'রাণীমার' লোকজন ফিরে আসতেই আমরা তাঁদের সাহায্যে মন্দিরের মণ্ডপে ফিরে এসে 'রাণীমা' তাঁর লোকজনের সাহায্যে মন্দিরের প্রবেশ পথ কিছুটা ফাঁকা রেখে আমাদের জন্য সারি সারি কম্বল অর্থাৎ বিছানা পেতে দিয়েছেন অত্যন্ত পরিপাটি করে। মায়ের জাত ছাড়া এরকম যত্ন এবং সেবা আর কাদের পক্ষে সম্ভব?

আমরা যে যার শয্যায় বসলাম। 'রাণীমা' মোহান্তজীকে প্রণাম করে বললেন—কাল ভি বৈদ্যজীকা সাথ হমারা লেড়কাকো ভেজেংগে আপ্ কৃপা করকে আরাম কিজিয়ে; কোঈ চীজ্‌কা জরুরৎ হোগা ত কৃপা করকে হুকুম দেগা।

'রাণীমা' পুত্রসহ সকলকে নিয়ে যখন নৌকাতে উঠলেন তখন যতীন্দ্রের ঘড়িতে বেলা ৪টা।

১। বৃকদর—বৃক (অগ্নি) আছে উদরে যাঁহার।

দেওয়ালে ঠেক দিয়ে মোহান্তজী 'রাণীমার' শ্রদ্ধাভক্তির প্রশংসা করলেন। 'নর্মদার তটে তটে যেমন মহা মহা যোগসিদ্ধদের দর্শন মিলে, তেমনি অনেক ভক্তদেরও দর্শন পাওয়া যায়, নর্মদামায়ী তাঁর পরিক্রমাবাসী সন্তানদের জন্য সব ব্যবস্থাই রেখেছেন। আমরাই শুধু তাঁকে চোখে চোখে রেখে পরিক্রমা করি না, তিনিও যে আমাদেরকে সদা সর্বদা চোখে চোখে রাখেন--আজকের ঘটনা তার জলন্ত সাক্ষ্য'—এই বলে মোহান্তজী সজল চোখে বারবার প্রণাম করতে লাগলেন মা নর্মদাকে।

সবাই চুপচাপ বসে রইলাম। কারও মুখে কোন কথা নাই। প্রত্যেকে হঠাৎ মোহান্তজীর কথা শুনে ভাবস্থ হলেন, না, অতি ভোজনের ফলে তন্দ্রা-জড়িত হয়ে পড়েছেন, তা বুঝতে পারলাম না। দেখছি, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মোহান্তজী অনেকক্ষণ নীরবে বসে থাকার পর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—সন্ধ্যা হয়ে এল, অথচ বাঙালীবাবা আজ শারীরিক কারণে নর্মদার ঘাটে গিয়ে সন্ধ্যা করতে পারবে না! আচ্ছা ভাল কথা, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি যতদিন আমাদের সঙ্গে আছ, প্রতিদিনই তোমাকে সকালে ও সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করতে দেখেছি, কিন্তু মধ্যাহ্নকালে ত তোমাকে কোনদিনই সন্ধ্যা করতে দেখি নি। মধ্যাহ্নকালে যখন পরিক্রমারত, তখন আর কি করে সন্ধ্যা করবে? কিন্তু কোথাও বিশ্রাম করলেও ত তোমাকে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করতে দেখি নি। অথচ ত্রিসন্ধ্যা করাই ত বিধি।

—ওটা স্মার্ত ব্রাহ্মণদের বিধি, বৈদিক বিধান নয়। তিনকালে সন্ধি হয় না। আলোক ও অন্ধকারের সন্ধি সায়ংকাল এবং প্রাতঃকাল—এই দুই কালেই হয়ে থাকে। সায়ংকাল দিনের আলো চলে যাচ্ছে, রাত্রির অন্ধকার নেমে আসছে—এইটি একটি সন্ধিকাল আবার প্রাতঃকালে রাত্রির অন্ধকার অপগত হচ্ছে, দিনের আলো ফুটে উঠছে, এটি একটি সন্ধিকাল, কাজেই দুইকালে সন্ধ্যার বিধান। যিনি এটি না মেনে মধ্যাহ্নকালে তৃতীয় সন্ধ্যা মানেন, তাহলে তিনি মধ্যরাত্রিতেও সান্ধ্যোপসনা করেন না কেন? যদি কেউ মধ্যরাত্রিতেও সন্ধ্যা করতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রতি প্রহরে, প্রতি ঘন্টায়, প্রতি পলে এবং প্রতিক্ষণেও ত সন্ধি হয়ে থাকে তাহলে তখনও তিনি সন্ধ্যা করতে থাকুন। এটা কেবল তাঁর খামখেয়াল হবে। কোন বৈদিক

শাস্ত্রে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা সম্বন্ধে কোন প্রমাণও নাই। অতএব প্রাতঃকাল এবং সায়ংকাল, এই দুইকালেই সন্ধ্যা এবং অগ্নিহোত্র করা সঙ্গত, তৃতীয় কালে নয়।

অবশ্য, সন্ধ্যা শব্দের যৌগিক অর্থ সম্যক ধ্যান ধরলে তার আর নির্দিষ্ট সময় কি। কারণ, ধ্যান ত করা যায় না, ধ্যান হয়।

—সুন্দর কথা। তবে এখন এ প্রসঙ্গ থাক্। আজ সারাদিন রোগের জ্বালায় যথোচিত স্মরণ মনন, এমন কি শিবপূজাও করতে পারি নি। যে তীর্থে এসেছি, নিয়ম অনুযায়ী সেই তীর্থের কিছু মহিমা বলি, তোমরা শোন।

লক্ষ্মণভারতীজী বললেন—আজ আপনার শরীর দুর্বল, আজ থাক্ না; কাল বলবেন।

—না, এখন শরীরে স্ফূর্তি আছে। কিছুটা বলি, কষ্ট অনুভব করলে বন্ধ করব। ধর্মরাজের মহিমা কিছুটা স্মরণ মনন না করলে শান্তি পাব না।

আমি পূর্বেই বলেছি, যমেরই অপরনাম ধর্মরাজ বা ধর্মরায়। পুরাণ মতে ইনি দক্ষিণের দিকপাল। সূর্যের ঔরষে এবং স্ত্রী সংজ্ঞার গর্ভে এঁর জন্ম। ইনি বৈবস্বত মনুর ভ্রাতা। স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞাদেবী ছায়াকে স্বামীর নিকটে রেখে পলায়ন করেন। কিন্তু ছায়াদেবী সংজ্ঞার সন্তানদের যথোচিত যত্ন করতেন না বলে যম একবার ক্রুদ্ধ হয়ে বিমাতাকে পদাঘাত করেন। বিমাতার অভিশাপে তার পদদ্বয় ক্ষত ও কীটদষ্ট হয়। যম পিতা সূর্যদেবকে অকপটে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে সূর্য তাঁর ক্ষতস্থানের পুঁজ এবং কীটভক্ষনের জন্য একটি কুকুর দান করলেন। এই কুকুর ক্ষত হতে নির্গত পুঁজ ও কীট ভক্ষণ করাতে যম সুস্থ হয়ে উঠলেন। অতঃপর পিতার নির্দেশে তিনি এসেছিলেন এই পুণ্যভূমিতে নর্মদাতটে তপস্যা করতে। দুশ্চর তপস্যার বলে তিনি সর্বসিদ্ধির আকর এবং দেবতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান হিসাবে অভিনন্দিত হন।

দক্ষ প্রজাপতির তেরটি কন্যাকে যম বিবাহ করেছিলেন। যমের ঔরষে তাঁদের গর্ভে তেরটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শান্তির গর্ভে গর্ব, ক্রিয়ার গর্ভে যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, তিতিক্ষার গর্ভে মঙ্গল, লজ্জার গর্ভে বিনয় এবং মূর্তির গর্ভে নরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

মহাভারতে দেখা যায়, কুন্তীর গর্ভে যমের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। এই ভগবান যমই সতীকুল শিরোমণি সাবিত্রীর স্তব ও আর্তিতে তুষ্ট হয়ে তার মৃত পতি সত্যবানকে পুনর্জীবিত করেন এবং সাবিত্রীর অন্ধ ও রাজ্যভ্রষ্ট শ্বশুরকে চক্ষু ও রাজ্য ফিরিয়ে দেন। যম স্বর্গের দেবতা হলেও নরকের অধীশ্বর। একজন্ম হতে পুনর্জন্মের মধ্যে মানুষ তার দুষ্কৃতির পরিমাণ অনুসারে নরকে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যায়। যমের পুরীর নাম সংযমনী। এঁর সামনে বিরাজ করেন পাশ মুদ্গরধারী ত্রিলোক সংহারক মৃত্যু, পার্শ্বে জলদগ্নিতুল্য মূর্তিমান কালদণ্ড, তাই তিনি দণ্ডধর নামে প্রসিদ্ধ।

ইনিই মানুষের মনে শান্তি বা নিবৃত্তি এনে দেন, তাই যমের অপর নাম শমন; অন্ত আনেন বলে ইনি কৃতান্ত বা অন্তক; পিতৃপুরুষের উপর এঁর প্রাধান্য বলে ইনি পিতৃপতি। যমই জীবের পাপপুণ্যের বিচার কর্তা। এই কাজে সাহায্য করবার জন্য পাপপুণ্যের হিসাবরক্ষক চিত্রগুপ্ত এঁর মন্ত্রী। মানুষ মৃত্যুর পর নরকে গমন করলে সেখানে মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতা থেকে প্রত্যেকের পাপপুণ্যের বিবরণ বর্ণনা করেন।

যমের দেহের বর্ণ সবুজ, তিনি রক্তবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত। যমের দুজন অনুচরের নাম—মহাচন্দ ও কালপুরুষ। যমের দূতরা যমদূত নামে খ্যাত। এঁরা মৃত্যুর পর জীবাত্মাদের যমালয়ে নিয়ে যায়।

এই পর্যন্ত বলে মোহান্তজী ঘন ঘন হাই তুলতে লাগলেন। আমরা তাঁকে শুয়ে পড়তে বললাম। তিনি 'হর নর্মদে হর নর্মদে' বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন। বৈদ্যজী যাবার সময় আমাদের সঙ্গী কবিরাজের কাছে দু বোতল পাঁচন রেখে গেছলেন। তিনি টর্চ টিপে টিপে সেই ঔষধ সকলের মুখে এক দাগ করে ঢেলে দিলেন। ঔষধ খেয়ে সকলেই শুয়ে পড়লেন। আমার পা ও গায়ের ব্যথা অনেকখানি কমে গেলেও সম্পূর্ণ সারেনি। শুয়ে শুয়ে অনেক কথা ভাবতে লাগলাম, বেশী করে মনে পড়তে লাগল ধাবড়ীকুণ্ডের মহাত্মা সচ্চিদানন্দের কথা। কোটেশ্বরের আগের লিঙ্গ দর্শন করার পর থেকেই মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, নর্মদার তটে তটে এত যে শিবলিঙ্গ, সেগুলির মধ্যে যন্ত্ররূপ মন্ত্ররূপ এবং চিৎশক্তি যতই নিহিত থাক্, শিব ত অন্যরূপও ধারণ করতে পারতেন। বেছে বেছে তিনি পাথরের রূপই বা ধারণ করলেন কেন? ধাবড়ীকুণ্ডে যেসব নর্মদেশ্বর শিব সংগ্রহ

করেছি সেগুলিও সব পাথরের। ধাবড়ীকুণ্ডে দেখেছি, নর্মদার জলের মধ্যে বসে কে যে সেই রহস্যময় কারিগর যিনি বিচিত্র সব চিহ্নযুক্ত বিচিত্র বর্ণের শিবলিঙ্গ নিরন্তর গড়ে চলেছেন আর নর্মদার ঢেউ-এর বাহিত হয়ে এসে সেগুলি ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে কুণ্ডের গহ্বরে। এটা যদি শিবেরই অলৌকিক রহস্য হয় তবে সেই অলৌকিক শক্তিধর কি অন্য কোন ধাতুকে তাঁর লিঙ্গ-রূপের উপাদান হিসাবে বেছে নিতে পারতেন না? এ সময় থাকতেন যদি সচ্চিদানন্দ, তিনি আমার এই জিজ্ঞাসার হাস্য পরিহাসছলে হলেও যাইহোক একটা উত্তর দিতেন! হায়, তাঁর মত সুপণ্ডিত রসিক ও প্রেমিক সাধুর সঙ্গে হয়ত আর এ জীবনে দেখাই হবে না। নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখছি, সচ্চিদানন্দ আমার কাছে আসছেন নর্মদার ঘাট থেকে। মন্দিরের ফাটক খুলে তিনি সোজাসুজি বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর সেই দাড়ি ও টাক, সেই সৌম্যদর্শন অবয়ব দেখে তাঁকে না চিনে কোন উপায় নাই। প্রশস্ত ললাট, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, মুখে সেই স্মিত হাসিটি লেগেই আছে। তিনি হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন—

গণেশের ইন্দুরটি করিয়া দর্শন
ছুটে ছুটে যায় সর্প করিতে ভক্ষণ।
কার্তিকের ময়ূরটা সর্পকে দেখিয়া
অমনি ছুটিয়া যায় খাইবে বলিয়া।
গজানন গণেশকে চক্ষে যদি হেরে
পার্বতীর সিংহটাও যায় ধরিবারে।
সপত্নী গঙ্গারে যদি করেন দর্শন,
পার্বতীর মহাক্রোধ অমনি তখন।
শিবের কপালে অগ্নি ধক্ ধক্ জ্বলে,
চন্দ্রকে পাইয়া কাছে খেতে যায় গিলে।
এইসব দেখি শুনি হয়ে জ্বালাতন,
প্রস্তরের লিঙ্গরূপ ধরে ত্রিলোচন।

তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ভঙ্গিমায় শ্লোকটি বলেই তিনি ধীরে ধীরে শূন্যে মিলিয়ে গেলেন। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম, সর্বাঙ্গ আমার ঘামে ভিজে গেছে। আমি হতভম্ব ও স্তম্ভিত হয়ে বিছানার উপর উঠে বসলাম। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, সকলেই ঘুমে অচেতন। আমি স্মরণ করতে লাগলাম সদ্যশ্রুত পদ্যটি। আমার বইগুলির আড়ালে আলখাল্লা চেপে টর্চ জেলে ডায়েরীতে লিখে নিলাম কবিতাটি। পা টিপে টিপে অতি সাবধানে ফাটক খুলে আমি মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে পায়চারী করতে লাগলাম। সচ্চিদানন্দের স্মৃতিতে মন বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এইমাত্র ঘুমের মধ্যে যা দেখলাম, একি স্বপ্ন? মায়া? না, অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া? ধাবড়ীকুণ্ডে থাকার সময় তাঁর মুখে এই রকম অনেক স্বগতোক্তি শুনেছি, স্বভাব-কবি শিব সম্বন্ধে এই রকম অনেক ছড়া মুখে মুখে রচনা করে আমাকে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক স্মরণ করতে পারছি না, এই একই প্রশ্ন তাঁর কাছে কোনদিন করেছিলাম কিনা এবং তিনি এই একই ছড়া শুনিয়েছিলেন কিনা। তা যদি ঘটে থাকে, তাহলে স্বপ্নের ঘোরে আমার অবচেতন (sub concious region) বা মগ্ন চেতনার স্তরে (subliminous concious region) পূর্বশ্রুত পদ্যই অবভাসিত হল। কখনও কখনও কারও কারও ভাগ্যে এই রকম ঘটনা ঘটে থাকে। কিন্তু তা যদি না হয়? তবে, তবে কি, আমার গাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি হেথা সেথা দু'চারটা ছাড়া নিরন্ধ্র জমাট অন্ধকারে সব ঢাকা হয়ে আছে।

মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে মন্দিরের দিকে ঘুরতে গিয়ে অনুভব করলাম, আমার পা ও হাঁটুর ব্যথা নাই বললেও চলে। আমি আবার মন্দিরের ঢুকে টর্চ টিপে টিপে নিজের কম্বলে এসে শুয়ে পড়লাম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন প্রায় সাতটা বেজে গেছে। সকলেরই বিছানা গুটানো, নর্মদার ঘাটে দেখছি সকলেই স্নান করছেন। মোহান্তজী ও লক্ষণভারতীজীকে স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে দেখে বুঝলাম তাঁরাও সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আমি তাড়াতাড়ি কম্বল গুটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মোহান্তজীকে বললাম, আপনাকে এবং লক্ষ্মণভারতীজীকে স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে দেখে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে।

—বৈদ্যজীর ঔষধে সকলেরই খুব ফল হয়েছে। আয়ুর্বেদশাস্ত্র চরক সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষি প্রণীত শাস্ত্র বলে, আয়ুর্বেদের বিধান অনুযায়ী শুদ্ধ প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত হলে তার কার্যকারিতা অমোঘ। তুমি তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান তর্পণ করে মন্দিরে এস। আমরা আজ পুরোহিত মশাই আসার আগেই একসঙ্গে সকলেই শিবপূজা সেরে ফেলব। ১০ জন নাগা সন্ন্যাসীকে পাঠিয়েছি ফুল তুলতে। মন্দিরের পেছনে গিয়ে তাকালে বনফুলের শোভা দেখে তুমি মুগ্ধ হবে। আমরা দুদিন এখানে যাঁর আশ্রয়ে রয়েছি তাঁকে এখনও ভাল করে দর্শন ও পূজা করা হয়নি।

আমি তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়ে বসার সময় হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করলাম। যাইহোক স্নান তর্পণাদি সেরে মন্দিরের গর্ভগৃহে গিয়ে দেখি নানা রং এর বিচিত্র বনফুল প্রচুর পরিমাণে তুলে এনেছেন নাগারা। সকলেই অঞ্জলি ভরে ফুল নিয়ে শিবকে ঘিরে বীরাসনে বসে গেলাম আমরা। মোহান্তজী মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে শিবকে স্নান করালেন, তারপর আমাদেরকে মন্ত্রপাঠ করাতে লাগলেন—

একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সমস্তং সত্যং সত্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ।
একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে তস্মাদেকং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশম্॥

অর্থাৎ হে প্রভো! একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য সনাতন ব্রহ্মই বিদ্যমান। এই সংসারে নামরূপের কোন পরমার্থিক সত্তা নাই, এক রুদ্রই এ জগতে অদ্বিতীয় পরম পদার্থ, সেই অদ্বিতীয় মহেশ্বরমূর্তি আপনি, অতএব আমি আপনার শরণাগত হলাম।

মন্ত্রপাঠের পরেই আমরা অঞ্জলি-ভরা ফুল মহাদেবের উপরে অর্পণ করে প্রণাম করলাম। সকলেই একে একে মন্দির থেকে বেরিয়ে যেতেই মোহান্তজী আমাকে বললেন, তুমি তোমার 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' বইটা এবং টর্চটা নিয়ে এস দেখি, লিঙ্গ গাত্র ভাল করে পর্যবেক্ষণ করব। এঁর যদি দয়া হয়, তাহলে এঁর স্বরূপের পরিচয় পাব। আমি তাঁর আদেশমাত্রই বই এবং টর্চ নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। প্রায় চারফুট দীর্ঘ বৃহদাকারের শিবলিঙ্গ, গর্ভগৃহের দরজার বাইরে থেকে যাঁকে কৃষ্ণবর্ণের বলে মনে হচ্ছিল, টর্চ টিপতে দেখতে পেলাম, লিঙ্গের বর্ণ রক্তচন্দনের মত। বই এর পাতা খুঁজতে খুঁজতে পেলাম—

ঈষৎরক্তময়ং কান্তং স্থূলং দীর্ঘং সমুজ্জ্বলং।
মহাকালং সমাখ্যাতং ধর্মকামার্থ মোক্ষদং ॥

দুজনেই আরেকবার মহাদেবকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। তিনি সকলকে বললেন, টর্চ টিপে দেখতে গেলে ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে। তোমরা একটা প্রদীপ জ্বেলে একে একে দেখে এস মহাকালরূপী শিবলিঙ্গকে, ঈষৎ লাল বর্ণ, দেখতে বড় মনোহারী, ইনি চতুর্বর্গ দান করে থাকেন। যম বা ধর্ম-রায়ের নামাঙ্কিত তীর্থে মহাকাল শিবলিঙ্গই ত বিরাজ করবেন এইটাই স্বাভাবিক।

লক্ষ্মণভারতীজী প্রদীপ জ্বাললেন, সকলেই দর্শন করে এলেন মহাকালকে। যতীন্দ্র বললেন—গতকাল ত সাড়ে সাতটার মধ্যে পুরোহিত মশাই এসেছিলেন, আজ তাঁর দেখা নাই কেন? বৈদ্যজীও ত এলেন না। আমার পায়ের আকল গুলোতে এখনও কিঞ্চিৎ ব্যথা আছে। আজ একবার ঔষধ খেলে হয়ত সম্পূর্ণভাবে সেরে যাব।

—দেখ, যতীন্দর্, তুমি না সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসীর অপেক্ষা এবং উপেক্ষা দুটোই থাকতে নাই। আমরা কি ঐ বৈদ্যের ভরসায় এখানে এসেছিলাম? ওঁকে কি চিনতাম আমরা? মা নর্মদাকে স্মরণ করতে করতে আমরা পরিক্রমা করছি। মা তাঁর এতগুলো সন্তানের দুর্দশা দেখে বৈদ্যকে হাজির করালেন। করুণাময়ী মায়ের কৃপা কটাক্ষে অল্পবিস্তর সবাই সুস্থ হয়েছি। আবার তিনি যদি মনে করেন আরও ঔষধ খাওয়া প্রয়োজন, তাহলে মাই তাঁকে পুনরায় টেনে আনবেন। আমরা তার জন্য হা পিত্যেশ করে আশাপথ চেয়ে বসে থাকব কেন? আমরা কারও জন্য অপেক্ষাও করব না, অযাচিতভাবে এসে গেলে উপেক্ষাও করব না।

মৃদু ধমক খেয়ে যতীন্দ্রজী চুপ করে গেলেন।

বেলা প্রায় এগারটা নাগাদ, দেখা গেল পুরোহিতজীর নৌকা ঘাটে এসে ভিড়ল। বৈদ্যজীর সঙ্গে 'রাণীমার' ছেলেও এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে কালকের মতই দুই ব্রাহ্মণ যুবকের কাঁধে দুই ডেকচি খাবার, নামাবলী দিয়ে ঢাকা। বৈদ্যজী এসেই বললেন—আমি জানি ঔষধে কাজ হবেই। আজ ঔষধ খাইয়ে যাব। তবে আর দুটো দিন আপনারা এখানে বিশ্রাম

করলে ভাল হয়। তিনি তাঁর ঔষধের বাক্স নিয়ে বসলেন। 'রাণীমার' পুত্র যাঁর নাম পরে জানলাম কুমার সিং তিনি মোহান্তজীকে প্রণাম করে একধারে বসলেন। পুরোহিত ঢুকলেন পূজা করতে। কুমার সিং এর রাইফেলধারী প্রহরী এবং দুজন ব্রাহ্মণ যুবকও ডেকৃচি দুটি একধারে রেখে মহাদেব এবং মোহান্তজীকে প্রণাম করলেন। বৈদ্যজী একে একে সকলের নাড়ী পরীক্ষা করলেন। পুরোহিত মশাই পূজা করে বেরিয়ে এলেই কুমার সিং যুক্ত করে নিবেদন করলেন—'মা আপনাদের জন্য ভিক্ষা পাঠিয়েছেন, দয়া করে গ্রহণ করুন।' গতকালের মত তাঁদের লোকজনই শালপাতা পেতে পুরী লাড্ডু ও শব্জী পরিবেশন করলেন আমাদেরকে।

আমাদের আহার পর্ব শেষ হতেই বৈদ্যজী হুকুম করলেন রাইফেলধারীকে—আভি ত শের্ ভাল্লু ইধর কুছ নেহি হ্যায়, তুম ইয়ে দোনো ডেকৃচি সাফ করকে গরম পানিকা ইন্তেজাম করো। সাধুলোগনে গরম পানিকা সাথ দাওয়াই পিয়েঙ্গে। সাধুসেবা করনেসে তুমহারা জিন্দেগী ভি সফল হো যাবে গা।

লোকটি ডেকৃচি দুটি নর্মদার জলে ধুয়ে টুকরো পাথরের দুটি তেউড়ী সাজিয়ে আগুন জেলে জল গরম করতে বসাল। বৈদ্যজী তাঁর শিশি হতে কাল মাষকলাই এর মত এক একটি বড়ি বের করে সকলের হাতে দিয়ে বললেন—গরম পানিকা সাথ এ দাবা গ্রহণ করিয়ে। তাগদ্ ঔর তাজগিকে লিয়ে, দরদ হঠানেকে লিয়ে এ দাবা বহুৎ আচ্ছা হ্যায়। আমরা প্রত্যেকে সেই বড়ি গলায় ফেলে একটু করে গরম জল পান করলাম।

যাবার সময় বৈদ্যজী বলে গেলেন 'বিহান মৈঁ ফিন্ আয়েঙ্গে।' তাঁরা সবাই মোহান্তজীকে প্রণাম করে নৌকাতে গিয়ে উঠলেন। বেলা তখন আড়াইটা।

আমরা সব শুয়ে বসেই কাটালাম। বেলা প্রায় সাড়ে চারটার সময় আমরা সবাই নর্মদার ঘাটে গিয়ে বসলাম। আজ মোহান্তজীর দেহে মনে খুব স্ফুর্তি দেখছি। তিনি নিজের থেকেই বলতে লাগলেন—ধর্মরাজ যম বা ধর্মরায়ের মহিমা সব বর্ণনা করা হয়নি। কাল রাত্রে বলতে বলতে ঘুম পেয়ে গেল, আজ বাকিটুকু বলছি শোন।

কঠোপনিষদে যমের প্রসঙ্গ আছে। বাজশ্রবস্ মুনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করে মুনি ঋষিদেরকে তাঁর যথাসর্বস্ব দান করেছিলেন। এই যজ্ঞের এই নিয়ম। যজ্ঞের শেষে তিনি ঋত্বিকদেরকে যে সকল গাভী দান করেছিলেন, তাদের রুগ্ন ও জীর্ণ অবস্থা দেখে বাজশ্রবস্ মুনির বালকপুত্র নচিকেতার মনে হল বাবা এ কি করছেন, বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য গাভীগুলি দানের দ্বারা ত বাবার স্বর্গলাভ দূরে থাকুক, পরলোকে তাঁর অধোগতিই হবে। এইরকম দানের দ্বারা সত্যিকার দান হচ্ছে না—

পীতোদোকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।

অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ কঠ ১।১।৩

এই সকল গাভী এত বৃদ্ধ যে, এদের জলপান, তৃণভক্ষণ বা দুগ্ধ দানের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে ; এদের ইন্দ্রিয়শক্তি এতই ক্ষীণ যে প্রজনন শক্তি লোপ পেয়েছে। গাভীগুলি দানের অযোগ্য। যে যজমান এইরকম দায়সারা গোছের নিষ্ফল বস্তু দান করেন তাঁকে মৃত্যুর পর আনন্দনাম নিরানন্দ দুঃখময় লোকে যেতে হয়। এইসব ভাবতে ভাবতে নচিকেতা পিতার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—

স হোবাচ পিতরং, ততঃ কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।

দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং, তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ১।১।৪

অর্থাৎ আপনি আমাকে কোন্ ঋত্বিকের উদ্দেশ্যে দান করবেন? এই একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার. তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তাঁর পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'তোকে যমের উদ্দেশ্যে দান করলাম।'

পিতার আদেশ পেয়ে নচিকেতা যম ভবনে গমন করেন। সেখানে গিয়ে দেখেন যমরাজ গৃহে নাই। তিনি যমের অপেক্ষায় সেখানে তিন দিন অনাহারে বাস করলেন। যম প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর অমাত্যবর্গ তাঁকে জানালেন—'তেজস্বী ব্রাহ্মণ অতিথি তিনদিন ধরে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় আপনার দুয়ারে অপেক্ষা করছেন। আগে তাঁকে শান্ত করুন।' যম ব্যস্তসমস্ত হয়ে নচিকেতাকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, যেহেতু আপনি তিন-রাত্রি আমার গৃহে অনাহারে যাপন করেছেন সেই কারণে প্রতি রাত্রির জন্য একটি করে মোট তিনটি বর প্রার্থনা করুন।

প্রথম বরে নচিকেতা প্রার্থনা করলেন---'আমাকে যমালয়ে পাঠিয়ে না জানি পিতা কতই উদ্বেগে কাল কাটাচ্ছেন, তাঁর সেই উদ্বেগ প্রশমিত হোক। আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি যেন আমাকে চিনতে পারেন এবং আদর করেন।'

যমরাজ 'তথাস্তু' বললে, দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করলেন—স্বর্গলোক সুখের স্থান। সেখানে আপনারও কোন অধিকার নাই, জরা ব্যাধিরও ভয় নাই। সেই স্বর্গলাভের সাধনভূত অগ্নিবিদ্যা আমি দ্বিতীয় বরে প্রার্থনা করছি। যম তাঁকে অগ্নিবিদ্যার শিক্ষা দিলেন। বললেন—

অনন্তলোকাপ্তিম্ অথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম॥

কঠ ১।১।১৪

হে নচিকেতা, তুমি জানবে অগ্নিই অনন্তলোক অর্থাৎ অনন্তকাল বোপে স্বর্গলোক প্রাপ্তির উপায়, বিরাটরূপে সর্বজগতের প্রতিষ্ঠা (ধারণকর্তা), বিদ্বানগণের বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত। (এখানে অগ্নি বলতে স্থূল অগ্নিকে বুঝাচ্ছে না, সর্বজীবের বুদ্ধিরূপ গুহাস্থিত বৈশ্বানর অগ্নিকে বুঝাচ্ছে। যম এই অগ্নিবিদ্যার বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন। এই অগ্নির উপাসনা করে যম স্বর্গলোকে যমপদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন)।

অগ্নিবিদ্যা প্রাপ্তির পর নচিকেতা তৃতীয় বর হিসাবে যমের কাছে প্রার্থনা করলেন—মৃত্যুর পর কেউ বলেন আত্মা থাকে আবার কেউ বলেন আত্মা নাই বা থাকতে পারেন না। এই তত্ত্বটি প্রত্যক্ষ বা অনুমান কোন প্রকারেই আমাদের জানার উপায় নাই। অথচ পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষলাভের জন্য আত্মার স্বরূপজ্ঞান উপলব্ধি একান্ত আবশ্যক। অতএব আপনি আমাকে আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিন।

নচিকেতার এই কথা শুনে যমরাজ খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দেবতারাও সম্যক্ জানেন না। আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, অতি গুহ্য, অতি দুর্জ্ঞেয়। তুমি বরং অন্য বর প্রার্থনা কর—অন্যং বরং বৃণীষ ; মা মা উপরোৎসী--আত্মতত্ত্ব জানার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি কোরো না। পরিবর্তে তিনি নচিকেতাকে শতায়ু পুত্র-পৌত্র গো, হস্তী, স্বর্ণ, অতুল ধনসম্পদ এমনকি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য পর্যন্ত দান করতে চাইলেন কিন্তু নচিকেতা

অবিচলিত কণ্ঠে জানালেন—ন বিত্তেন তর্পণীয়ঃ মনুষ্যঃ—বিত্তদ্বারা মানুষের তৃপ্তি হয় না। আপনি নিজেই বলেছেন, দেবতারাও এ তত্ত্ব জানেন না। আপনার মত উপদেষ্টা আর কোথায় পাব। কাজেই আপনার প্রতিশ্রুত তৃতীয় বরে আমাকে আত্মতত্ত্বেরই উপদেশ দিন। নান্যং তস্মাৎ নচিকেতা বৃণীতে—এই আত্মবিদ্যা ছাড়া নচিকেতা আর অন্যবর প্রার্থনা করে না। অবশেষে যম বাধ্য হয়ে নচিকেতার ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখে তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতে বাধ্য হলেন। তিনি নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যার হেতুভূত গুহ্যাতিগুহ্য সাধনতত্ত্বের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন—

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্ অমৃতত্বমেতি বিষ্বক্ অন্যাঃ উৎক্রমণে ভবন্তি॥

অর্থাৎ মানুষের হৃদয় হতে নিঃসৃত একশ একটি নাড়ী আছে। তাদের মধ্যে একটি নাড়ী (সুষুম্না) মূর্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র) ভেদ করে নির্গত হয়েছে। মৃত্যু-কালে ঐ নাড়ী পথ দিয়ে জীব উর্ধে গমন করে অমৃতত্ব লাভ করে। অন্য নাড়ী পথে গেলে উৎক্রমণের অর্থাৎ অন্যান্য লোকে বিবিধ গতিলাভের কারণ ঘটে।

এই পর্যন্ত বলে মোহান্তজী কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। তারপর বলতে লাগলেন—তোমরা এই পর্যন্ত যা শুনলে তাতে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমরা যাঁর তপস্যাক্ষেত্রে বসে আছি সেই ধর্মরায় স্বর্গের সাধন-ভূত অগ্নিবিদ্যা এবং আত্মার সাধনভূত ব্রহ্মবিদ্যা—এই উভয় গুহ্যতত্ত্বে বিশারদ ছিলেন। অগ্নিবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে হলে এঁর কৃপালাভ আবশ্যক। পদ্মপুরাণে আছে, যম পাপীদের কাছে ভীষণ রূপ ধারণ করলেও পুণ্যবানদের কাছে নারায়ণ রূপে দেখা দেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে, বিশ্বকর্মার সংজ্ঞা নামে এক কন্যা ছিল। সূর্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সংজ্ঞা সূর্যকে দেখে তাঁর প্রচণ্ড তেজে চক্ষু নিমীলিত করেছিলেন, এতে সূর্য ক্রুদ্ধ হয়ে সংজ্ঞাকে অভিশাপ দেন, তাঁকে দেখে চোখ বন্ধ করেছেন বলে তার গর্ভে যে পুত্র হবে, সে পুত্র প্রজাসংযম যম নামে অভিহিত হবে, জীবদেরকে দুঃখ তাপ দিয়ে সংযত করাই তার কাজ হবে। সংজ্ঞাদেবী সূর্যনারায়ণের এই অভিশাপে চঞ্চল হয়ে আবার

স্বামীর প্রতি চঞ্চল দৃষ্টিপাত করাতে তিনি বলেন, তোমার যে কন্যা হবে সে চঞ্চলা নদীরূপে পরিণত হবে। কালক্রমে সংজ্ঞার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের নাম যম এবং কন্যার নাম যমুনা। এই সূর্যকন্যা পরে যমুনা নদী হয়।

এই হল যম বা ধর্মরায় সম্বন্ধে বিবরণ যতটা জানি তোমাদের কাছে বললাম। তবে আমার হৃদয়ের বিশ্বাস কঠোপনিষদে যম সম্বন্ধে যা বিবরণ আছে অর্থাৎ তিনি অগ্নিবিদ্যায় পারঙ্গম এবং ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা, এইটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, নর্মদা স্পর্শ করে মন্দিরে ফিরে যাই চল, আজ মহাকালের আরতি করব। কাল বাঙালীবাবার কাছে বেদে কোথাও যমের প্রসঙ্গ আছে কিনা তা শুনব। আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন— তুমি বাবা স্মরণ-মনন করে রেখ।

তিনি নর্মদা স্পর্শ করে মন্দিরের দিকে গেলেন। আমরাও একে একে নর্মদা স্পর্শ করে মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলাম। লক্ষ্মণভারতীজী পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়েই রেখেছিলেন। করপাত্রীজী ঘি, পঞ্চপ্রদীপ, তুলা, কর্পূর ও কর্পূর-দানী সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কোটেশ্বর হতে এই ধর্মরায়ের ঘাটে এসে আরতি করার মত শারীরিক অবস্থা কারও ছিল না। আজ সবাই দেহে-মনে বল ফিরে পেয়েছি, কাজেই আজ বাদ্যভাণ্ড সহকারে খুব ঘটা করেই মহাকালের আরতি করা হল। আরতি শেষ করার পরেই আমরা শুয়ে পড়লাম। অনেকেই ইষ্টমন্ত্র জপে বসলেন। পরদিন সকালে উঠে মনে হল, আমাদের শরীর সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেছে। কারও শরীরে কোন ব্যথা বেদনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। লক্ষ্মণভারতীজী দুবার শূন্যে লাফিয়ে উঠে, ঘাটের পাথরে দুবার জোরে জোরে পা ঠুকে মোহান্তজীকে বললেন— অভি হমারা পুরা তাগদ আগয়া। বৈদ্যজীকো দাবাসে বহুৎ ফয়দা হুয়া।

বুড়োর এইরকম স্ফূর্তি ও ছেলেমানুষী দেখে আমরা সবাই হাসতে লাগলাম। স্নান তর্পণ এবং মহাকালের পূজা সেরে যে যার ইষ্ট স্মরণে মন দিলেন। আজ ১৪ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার। আমাকে আজ বিকালে ধর্মরায়ের সম্বন্ধে কিছু কথা শুনাতে হবে বৈদিক দৃষ্টিকোণ থেকে। মোহান্তজীর সেইরকমই আদেশ। তিনি আমাকে স্মরণ মনন করে রাখতে

কালই আদেশ করেছেন। আমি তাঁকে কি করে বুঝাব যে সমগ্র চতুর্বেদ কারও পক্ষে কণ্ঠস্থ রাখা সম্ভব নয়। আমার ত নাই-ই নাই। বেদে বহু গুহ্য তত্ত্ব আছে, বহু গম্ভীর বিষয়ের সঙ্কেত আছে। বেদপাঠীরা সাধারণতঃ গায়ত্রী মন্ত্র সবিতা, ইন্দ্র, বরুণ, উষা, অগ্নি ও সোম প্রভৃতি দেবতা বিষয়ক সূক্তগুলির বেশী পর্যালোচনা করে থাকেন। যম বিষয়ক মন্ত্র নিয়ে কেউ বেশী মাথা ঘামান না। আমি পিতা তথা পিতৃলোক বিষয়ক তত্ত্বে বেশী আগ্রহী বলে বেদে বেছে বেছে ঐসব বেদমন্ত্র বাবার কাছে স্বাধ্যায় করেছিলাম। সেখানে যমেরও উল্লেখ পেয়েছি, সেইসব মন্ত্র স্মরণ করতে লাগলাম, আমার সঙ্গে ঋগ্বেদের যে খণ্ডটি আছে, তাও নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলাম।

বেলা ১১টা নাগাদ আজও 'রাণীমার' নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ল। কুমার সিং সহ পুরোহিত মশাই এবং বৈদ্যজী মন্দিরে এসে পৌঁছলেন। আজও 'রাণীমা' সন্ন্যাসীদের জন্য ভিক্ষা পাঠিয়েছেন। পুরোহিত মশাই মহাকালের পূজায় রত হলেন, বৈদ্যজী সকলের নাড়ী দেখে খুব খুশী মনে ঘোষণা করলেন—আপ্‌লোগোকো বিলকুল আরাম হো গয়া। আভি আপলোগ যা সকতে হেঁ। হম্‌ রাণীমায়ীকা হুকুমসে বহুৎ দুর্লভ দাবা দে দেতে হেঁ। সামনেমেঁ হাপেশ্বর তক্‌ জঙ্গল বহোৎ কাঁকরোলি ঔর খতরনাক হৈ। আঘাত প্রাপ্ত হোনেসে একঠো করকে বড়ি সেবন করেগা। ঔর ডাব্বামেঁ যো মলহম্‌ দেতে হেঁ, আঘাত প্রাপ্ত স্থানমেঁ খুন নিকালনে সে ভি ইহ্‌ মলহম্‌ প্রয়োগ করেগা। এই বলে আমাদের সঙ্গী কবিরাজ মশাই-এর হাতে এক শিশি বড়ি ও মলমের ডিবা দিলেন। পুরোহিত মশাই এর পূজা শেষ হলেই কুমার সিংজী আমাদেরকে ভিক্ষা দিলেন। আজ রাণীমা পুরী শব্জী এবং হালুয়া পাঠিয়েছেন, আহার-পর্ব সমাধা হলে আজও কবিরাজ ডেকচিতে জল গরম করে আমাদেরকে একটি করে বড়ি ঈষদুষ্ণ গরম জলসহ সেবন করালেন। মোহান্তজী বললেন—কাল সকালেই আমরা এখান থেকে যাত্রা করব। কাজেই কাল আর আপনাদের কষ্ট করে এখানে আসার দরকার নাই। 'রাণীমাকে' আমার বহুৎ সুক্রিয়া (ধন্যবাদ) এবং আশীর্বাদ জানাবেন। কুমার সিংকে বললেন মোকা মিলনেসে এক দফে মাতাজী ঔর বৈদ্যজীকো সাথমেঁ লেকর মণ্ডলেশ্বরমেঁ পরম গুরুজীকো

মূল গদী দর্শন করকে আইয়েগা। তিনি তাঁর আশীর্বাদ স্বরূপ কুমার সিংহজীকে একটি ত্রিমুখী, বৈদ্যজীকে চতুর্মুখী এবং 'রাণীমার' জন্য একটি দ্বিমুখী রুদ্রাক্ষ দান করলেন। বৈদ্যজী বললেন—এখান থেকে চার মাইল দূরেই হিরণফাল। এখান থেকে হাপেশ্বর পর্যন্ত জঙ্গল আর জঙ্গল। পথ বড়ই বিপজ্জনক। বিপজ্জনক এই কারণে যে, কোটেশ্বর থেকে এ পর্যন্ত যে কঠিন রুক্ষ পার্বত্য পথ পেয়েছেন, সামনের জঙ্গল কোথাও কোথাও আরও ঘনঘোর দেখতে পাবেন। পথে যেসব ডুংরি পাবেন, সেগুলো যে-কোন রহস্যময় কারণে দেখবেন ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। দীর্ণ বিদীর্ণ পাহাড়ের ঢাল দিয়ে যেতে হবে, সে পথও দেখবেন ফাটা-ফাটা পাথরের জন্য বড়ই কষ্টপ্রদ। আমার বয়স যখন উনিশ-কুড়ি সে-সময় পিতাজীর সঙ্গে এই ধর্মরায়ের মন্দিরে এসে এক অতিবৃদ্ধ মহাত্মার দর্শন পেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন—এই হাপেশ্বরের জঙ্গল মহাদেবের 'একাদশ তনুর' প্রতীক। 'একাদশ তনু' অর্থাৎ একাদশ রুদ্র। মহাদেব একাদশ বার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করে একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত হন। তাঁদের নাম যথা—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর এবং ঈশ্বর। তাঁদের প্রতীক এই হাপেশ্বরের জঙ্গলে এগারটি ডুংরি বা ছোট ছোট পাহাড় আছে। এই পাহাড়গুলির আকৃতি প্রকৃতি সবই রুদ্র অর্থাৎ ভয়াল, ভয়ংকর। আপনারা চারটি ডুংরি মাত্র অতিক্রম করে এসেছেন, আরও সাতটি বাকী আছে। হাপেশ্বরের মন্দিরে বিরাজ করছেন ঈশ্বররূপী রুদ্র ভগবান। মা নর্মদার দয়ায় পথ আপনাদের মঙ্গলময় হোক—শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

এইবলে তাঁরা চলে গেলেন। মোহান্তজী বললেন—ও লছমন্ ভেইয়া, বৈদ্যজী কি চমৎকার বার্তা শুনিয়ে গেলেন, শুনলেন ত? মুঝে বহুৎ ডর আতী হৈ।

—বসে বসে ভয়ে কেঁপে লাভ কি? মা নর্মদার দয়ায় এর আগেও ত অনেক মহাজন এ পথে গেছেন, আমরাও মায়ের দয়ায় পৌঁছে যাব।

আমরা বেলা চারটা পর্যন্ত বিশ্রাম করলাম। তারপর মোহান্তজীর ইচ্ছানুসারে আমরা নর্মদার ঘাটে গিয়ে বসলাম। ঋগ্বেদ হাতে নিয়ে বসেছি। মোহান্তজী বললেন—বাঙালীবাবা, এবার বেদে ধর্মরাজ বা ধর্মরায় যম সম্বন্ধে

কি পেয়েছ তা শোনাও। ধর্মরায় বেদমুখে নিজের মহিমা শুনুন, আমাদেরও স্বাধ্যায়ের কাজ হোক।

আমি আরম্ভ করলাম—বৈদিক ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'যো ধর্মে রাজতে স ধর্মরাজঃ' যিনি ধর্মেই প্রকাশমান, অধর্মরহিত এবং ধর্মেরই প্রকাশক, সেই পরমেশ্বরেরই নাম ধর্মরাজ বা ধর্মরায়। (যমু উপরমে) এই ধাতু হতে 'যম' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যঃ সর্বান্ প্রাণিনো নিযচ্ছতি স যমঃ,' যিনি সকল প্রাণীকে কর্মফল দানের ব্যবস্থা করেন এবং সকল অন্যায় হতে পৃথক, সেই পুণ্যময় পরমাত্মার নাম যম।

যমের নাম প্রায় ৫০ বার উল্লেখ করা হয়েছে ঋগ্বেদে। অনেক স্থানে যমকে বরুণ ও অগ্নির সঙ্গে একত্রে বর্ণিত হতে দেখা যায়। আবার কোন কোন স্থানে অগ্নি ও যম অভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছেন।

অথর্ববেদের মতে, যমই মৃতদের আশ্রয় দেন এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ বাসের স্থান নির্দেশ করে দেন। বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে, যমের আত্মাই সর্বপ্রথম স্বর্গে গমন করেন। বরুণের পাশের ন্যায় যমের পড়বিশ অর্থাৎ পদ-বন্ধন থাকে। যমের দূত উলূক বা কপোত আর দুটি সারমেয় (কুকুর)। যমের দূত যে সারমেয় তার চারটি চোখ, বর্ণ বিচিত্র, নাসিকা বৃহৎ। তারাই যমের প্রহরী, পথরক্ষী, সকল ব্যক্তির পিছনে পিছনে সূক্ষ্মদেহে ঘোরাফেরা করে সূক্ষ্মদেহে অলক্ষ্যে এবং সকল ব্যক্তির পাপকাজ ও পুণ্যকাজের উপর লক্ষ্য রাখে। এরা যমের পথও রক্ষা করে, তার ফলে কর্মের পূর্ণভোগ না হওয়া পর্যন্ত সহসা যমের পথে প্রবেশ করতে পারে না। এই রহস্যময় সারমেয়দের সামনে প্রেতাত্মারা দ্রুতবেগে চলতে থাকে। বৈদিক পণ্ডিতদের মতানুসারে, এই দুই কুকুর চন্দ্র ও সূর্যের রূপক মাত্র।

আপনি পুরাণের মতানুসারে বলেছিলেন যে, যম সূর্য ও সংজ্ঞার পুত্র। তাঁর ভগ্নীর নাম যমুনা, পরে যিনি যমুনা নদীরূপে রূপান্তরিত হয়েছেন। ঋগ্বেদের মতে বিবস্বান্ ও সরণ্যুর সন্তান যম ও যমী—তাঁরা যমজ ভ্রাতা-ভগ্নী। 'যমের পুরীর নাম সংযমনী'—পুরাণের এই মতও বেদ স্বীকার করেন না। বেদের মতে যমের পুরীর নাম 'অস্ত'। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১৪নং সূক্তে আট নম্বর মন্ত্রে (যার দ্রষ্টা ঋষি যম, দেবতাও যম) বলা হয়েছে—

সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্‌।
হিত্বা আবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ॥

মৃত ব্যক্তিকে দাহ করার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বলতে হয়—সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হও, মিলিত হও যমের সঙ্গে এবং তোমায় ধর্মানুষ্ঠানের ফলের সঙ্গে। পাপ পরিত্যাগপূর্বক অস্ত নামক যমপুরীতে প্রবেশ করে উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর।

এই সময় আমাকে বাধা দিয়ে মোহান্তজীর সহচর একজন পণ্ডিত (ইনি কবিরাজ নন) বলে উঠলেন—আমি শুনেছি, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০ নম্বর সূক্তে যম-যমীর কথোপকথন আছে সেখানে নাকি যমী আপন সহোদর ভাই-এর সঙ্গে সহবাস করতে চেয়েছিলেন. যম অবশ্য যমীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। একথা কি সত্য?

—দশম মণ্ডলের দশম সূক্তের যম ও যমী দেবতা, তাঁরাই ঋষি। আপনি বোধহয় কোন পুরাণ পাঠীর কাছে বেদের ব্যাখ্যা শুনে থাকবেন। পুরাণের ক্লেদাক্ত ভাবধারায় যাঁদের মন ভারাক্রান্ত তাঁদের পক্ষে বেদমন্ত্রের সঠিক অর্থ বুঝা সম্ভব নয়। কোন প্রকৃত বৈদিক পণ্ডিতের কাছে ঐ মন্ত্রগুলির অর্থ শুনলে আপনার এ ভ্রম হত না। বেদভাষ্যকারদের মতে যম ও যমীর আর একটি মৌলিক অর্থ দিবা ও রাত্রি। রাত্রি দিবার পশ্চাতে আসে, কিন্তু তাদের সংগমন হয় না। দিবা ইচ্ছা করলেও রাত্রির সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। এই তত্ত্বটি না বুঝে পুরাণ-পাঠীরা ঐ বৈদিক মন্ত্রগুলি নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন।

মোহান্তজী পণ্ডিতজীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করে আমাকে বাকী কথা বলতে নির্দেশ দিলেন। আমি পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগলাম—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪ নম্বর সূক্তের যে মন্ত্রের পূর্বে ব্যাখ্যা করেছি, তার আরও দু'চারটি মন্ত্র ব্যাখ্যা করলে যমের কর্মধারা এবং তাঁর সঙ্গে মর্ত্যজীবের কি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে, তা স্পষ্টীকৃত হবে।

ঐ সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে আছে—হে অন্তঃকরণ! তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়ে সেবা কর। তিনিই সৎকর্মান্বিত জীবদেরকে সুখের দেশে নিয়ে যান, তাঁর নিকটেই সকল জীব গমন করে। আমরা

যে পথে যাব, তা যমই প্রথম দেখিয়ে দেন। সে পথ আর বিনষ্ট হবে না। যে পথে আমাদের পূর্বপুরুষেরা গিয়েছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্মানুসারে সে পথে যাবেন।

বেদের মতে, যম আমাদের বিদেহী পিতৃপুরুষগণের সুখবিধান কর্তা এবং পুণ্যকর্মের পুরস্কার-বিধাতা, তাই যমের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে—

যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষৌ নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যামেনং পরিদেহি রাজন্ স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি॥

১০ম।১৪ সূ।১১

হে যম। তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুকুর আছে, যাদের চার চার চক্ষু, যারা পথ রক্ষা করে এবং যাদের দৃষ্টি পথে সকল মানুষকেই পড়তে হয়, তাদের কোপ হতে এই বিদেহীকে রক্ষা কর; হে রাজন্ এঁকে তুমি কল্যাণভাগী এবং নীরোগী কর।

পুরাণে যমের সম্বন্ধে এমন ভয়ঙ্কর ছবি আঁকা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ যম বলতেই ভয় পায়, শিউরে ওঠে, সকলে মনে করে যম পাপপুণ্যের কঠোর বিচারক এবং একজন নিষ্ঠুর শাসক। মানুষ কাউকে গালাগালি বা অভিশম্পাত দিতে গিয়ে বলে 'তুই যমের বাড়ী যা' অর্থাৎ তার মৃত্যু হোক। কিন্তু বেদ দেখিয়েছেন, মৃত্যুর পর জীব যখন নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়ে তখন তাকে যমই আশ্রয় দেন এবং তাকে কল্যাণের পথে, শ্রেয়োমার্গের পথ প্রদর্শন করেন। তাই বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন।
ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ॥

১০ম। ১৪ সূ। ১৫

অর্থাৎ যম রাজার উদ্দেশ্যে মধু এবং অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য দিয়ে হবন কর। যে সকল পূর্বকালের সত্যদ্রষ্টা ঋষি আমাদের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে এই ধর্মের পথ বা ধর্মরাজের পথ দেখিয়ে তাঁর সত্যস্বরূপ বর্ণনা করে গেছেন, তাঁদেরকে নমস্কার করি।

কাজেই বৈদিক দৃষ্টিতে আমাদের প্রিয় পিতৃপুরুষগণের সদ্গতিদাতা যম আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব।

আমার আলোচনা শুনে মোহান্তজী খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তিনি আমার হাত থেকে ঋগ্বেদটি নিয়ে মাথায় ঠেকালেন এবং আমার হাত জড়িয়ে ধরে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, লক্ষ্মণভারতীজী আরত্রির আয়োজন করছেন।

সন্ধ্যা হতেই বাদ্যভাণ্ড সহকারে আরতি সুরু করলেন মোহান্তজী। শিঙ্গা ডম্বরু বাজতে লাগল। সকলেই আমরা একমনে আরতি দেখছি, মোহান্তজী মন্ত্রপাঠ করতে করতে আরতি করছেন, কিন্তু কয়েকজন নাগা এতই উল্লাসভরে শিঙ্গা ডম্বরু বাজাচ্ছেন যে, তার প্রচণ্ড শব্দে শত চেষ্টা করেও মন্ত্রের একবর্ণ বুঝতে পারছি না। এমন সময় প্রচণ্ড বাঘের গর্জন, মনে হচ্ছে যেন মন্দিরেরই পিছনেই তিন চারটা বাঘ একসঙ্গে হুঙ্কার দিচ্ছে। সেই শব্দে মোহান্তজীর হাত থেকে পঞ্চপ্রদীপ ছিটকে পড়ে গেল। বাদকদের হাত থেকে শিঙ্গা ডম্বরুগুলোও খসে পড়ল। সকলের ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে, সবাই যেন ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে আড়ষ্ট ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকেই বসে পড়েছেন, ফিস্‌ফিস্ করে বলছেন 'জয় করপাত্রীজী', 'জয় মহাকাল', 'হর নর্মদে হর নর্মদে'। আধঘণ্টা কেটে গেল এইভাবে। সবাই আশা করেছিলেন—এইমাত্র বাঘ এসে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল বলে! তা যখন ঘটল না, তখন অর্ধসমাপ্ত ভাবে আরত্রিক বন্ধ করা অপরাধ বলে লক্ষ্মণভারতীজী পুনরায় পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে দিলেন। বাদ্যভাণ্ড বন্ধ রেখে মোহান্তজী নীরবে কোনমতে আরতি শেষ করে মহাকালের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কারও মুখে কোন কথা নাই, অন্ধকারে কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না, আলো থাকলে সকলের শ্রীমুখের আকৃতি কি রকম হয়েছে দেখা যেত! সকলেই শুয়ে পড়েছেন বটে কিন্তু মাঝে মাঝেই প্রত্যেকের শ্রীঅঙ্গের নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছি। মোহান্তজীর লোহার ফাটকের উপর বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। তিনি প্রায় তিনবার বললেন—কেউ একজন গিয়ে দেখে এস, লোহার ফাটক ঠিকমত বন্ধ আছে কিনা! কিন্তু কেউ বিছানা ছেড়ে উঠলেন না, না যতীন্দ্র, না লক্ষ্মণভারতীজী! অগত্যা আমিই উঠলাম। আমি টর্চ টিপে দু'তিন পা গিয়েছি, মোহান্তজী

বললেন—'কৌন্ বাঙ্গালী বাবা? আপ্ মৎ যাও। রতনলাল যায়েগা।' রতনলালজী বাধ্য হয়ে ফাটক দেখে এসে বললেন—ফাটক আচ্ছিতরেসে বন্ধ হ্যায়। তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে পারলেন। একমাত্র আমি ছাড়া বোধহয় কেউ-ই সে রাত্রিতে দুই চোখের পাতা এক করতে পারেননি। আমার মনে কোন ভয় জাগেনি, কারণ বাবা আমার মনে এই দৃঢ় সংস্কার বদ্ধমূল করে দিয়ে গেছেন যে, বেদপাঠীর কখনও অপঘাত মৃত্যু হয় না। কাজেই বাবার কথা চিন্তা করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরেই আমার ঘুম ভাঙল, বোধহয় তখন ছ'টা বেজেছে। উঠে দেখি, এরই মধ্যে প্রত্যেকেই প্রায় স্নান করে নিয়েছেন। যে যার তল্পিতল্পা বাঁধছেন, আমিও তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করে এলাম। সকলেরই চোখ মুখ বসে গেছে! প্রত্যেকের চোখ লাল, অনিদ্রা এবং রাত্রিজাগরণের ফল! ধর্মরায়ের ঘাটে মহাকাল মন্দিরে সবাই এক রাত্রির জন্য যম-যন্ত্রণা ভোগ করে নিলেন।

সকাল সাতটায় আমরা যাত্রা সুরু করলাম। আজ ১৫ই আশ্বিন শুক্রবার। নর্মদাকে দর্শন করতে করতে পশ্চিমদিকে এগোতে লাগলাম। প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পরেই জঙ্গলে এসে পড়লাম। ছায়া ছায়া অন্ধকারে ঢাকা জঙ্গলের মধ্যে কঠিন পার্বত্যপথ। তবে এই পথে হাঁটতে কোন কষ্ট হচ্ছে না, কারণ সূঁচালো এবড়ো খেবড়ো পাথরে পথ কষ্টপ্রদ হয়নি। আমরা আরও পনের মিনিট পরে উৎরাইএর পথে উঠতে লাগলাম, এটাও একটা ডুংরি, বৈদ্যজী কথিত একাদশ রুদ্রের মধ্যে কোন রুদ্রেরই বোধহয় প্রতীক। জঙ্গল ক্রমশঃ ঘনতর হচ্ছে। বড় বড় শাল গাছ, অন্যগাছ এবং ঝোপ জঙ্গল ত আছেই। প্রত্যেক গাছকে জড়িয়ে আছে পূর্বের মত লতা পলাশের মোটা মোটা শিকড়। এই ডুংরির উপর যেসব মোটা মোটা শালগাছ দেখছি সেগুলি প্রস্থে বোধহয় সাড়ে পাঁচ ছয় ফুট হবে। দুই হাত প্রসারিত করে কারও পক্ষে এইরকম শালগাছের বেড় পাওয়া সম্ভব নয়। সারা ভারতবর্ষে আর কোথাও এইরকম মোটা শালগাছ আছে বলে আমার জানা নাই। কেবলই ভাবছি, এইরকম আবার বন হয়? হায় ভগবান এই জঙ্গলের কি শেষ নাই? হঠাৎ লক্ষ্মণভারতীজী চিৎকার করে উঠলেন—'তিন নং ডুংরি সুরু, মদতদানি কিজিয়ে।' এই বলে তাঁর হাতের লাঠি

পিছন দিকে বাড়িয়ে দিলেন। পিছনে নাগারা তা সঙ্গে সঙ্গে ঝাপ্‌টে ধরলেন এবং প্রত্যেকেই যে যার হাতের লাঠি বা ত্রিশূল লম্বা করে এগিয়ে দিয়েছেন পিছনের লোককে। মদতদানি করে অন্ধকারাবৃত পার্বত্য পথে প্রায় ঘন্টাখানিক অতি সন্তর্পণে হাঁটার পর গাছপালা একটু পাতলা হয়ে এল। সূর্যের আলো এসে পড়েছে পথে। নর্মদাকে দর্শন করবার জন্য বাঁদিকে তাকাতে লাগলাম, কিন্তু নর্মদার ধারা দেখতে পেলাম না। লক্ষ্মণভারতীজীকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন—ইধর্‌ ত মাইয়াকো দর্শন মিলেগা নেহি। মায়ী পাহাড় ফাড়ফোড় করকে অন্দরমেঁ কাঁহি ঘুষ গিয়া হোংগে। হিরণফাল ঘাটমেঁ যাকর উন্‌কী ফিন্‌ দর্শন মিলেগী; বঁহা নর্মদা চাট্টানোঁ মে হোকর নীচে গিরতী হৈঁ। হুঁয়া উন্‌কী বহুৎসী ধারায়েঁ হো গয়ী হৈ। ঔর এ উঁচাই সে গিরনে কা কারণ তীব্র গতিসে প্রবাহিত হোতী হৈঁ। লগভগ এক মীলকে পশ্চাৎ ইয়ে সব ধারায়েঁ মিলকর ফিন্‌ একধারা হো যাতী হৈ। পথ যতই দুর্গম হোক বন অপেক্ষাকৃত পাতলা হওয়ায় বড় বড় গাছের পাতায় সূর্যের আলো পড়ায় পাতাগুলো ঝিলমিল করছে। কবি হলে কাব্য করে বলতাম, সূর্যকিরণ ঝিলিমিলি খেলছে গাছের সবুজ পাতার সঙ্গে। এ দৃশ্য আমার ভালই লাগছে। লক্ষ্মণভারতীজী চিৎকার করে জানালেন—দর্শন করিয়ে মা নর্মদাকো। কিন্তু এ কী নর্মদার রূপ! ধর্মরায়ের ঘাটে নর্মদার যে বিস্তার দেখে এলাম, এখানে দেখছি নর্মদা আর একটা ছোট পাহাড়ের উপর উঠে এসে সেই ডুরিং ভেদ করে বয়ে চলেছেন। আমরা এই চার নম্বর ডুংরির পাশ দিয়ে অত্যদ্ভুত প্রকৃতির কিনার দিয়ে হেঁটে চলেছি। নর্মদার জল ছিট্‌কে এসে পড়ছে আমাদের পথের উপর। অত্যন্ত সাবধানে ভিজা পাথরে পা টিপে টিপে আমরা চলতে লাগলাম। একবার পা পিছলালে আর রক্ষা নাই। প্রায় আধ মাইলটাক রাস্তা এইভাবে পা টিপে টিপে হাঁটার ফলে পাগুলো সকলেরই ব্যথা ব্যথা করছে। নর্মদা আবার তাঁর গতিপথ বদল করে উঠে গেছেন পাঁচ নম্বর ডুংরিতে। এই ডুরিং বা পাহাড়টা একটা বিশাল শিবলিঙ্গের মত দেখতে। পাহাড়ের উপরটা সমতল ভাগের মত। কিন্তু এই ডুংরির মধ্যভাগ ভেদ করে নর্মদা অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছেন নিচে। একটা শিবলিঙ্গ বা বড় কলার মোচার মাঝখানে একটা ছিদ্র করে সেখান দিয়ে জলকে প্রবাহিত করা যায়, আবার

তাকে মাঝখানে চিরেও দুভাগ করা যায়, সেটাকেও বলতে পারি মধ্যভাগ ফাটিয়ে। এখানে যে বললাম 'ডুংরির মধ্যভাগ ফাটিয়ে', তারমানে নর্মদার তীব্রস্রোত ছোট পাহাড়টার মাঝামাঝি স্থানে এমন প্রবল ধাক্কা দিয়েছে যে, পাহাড়টা সমান দুফাঁক হয়ে গেছে। সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে নর্মদা বয়ে চলেছেন, তাঁর এখানে যে কলকল নাদধ্বনি উঠেছে তার সঙ্গে বম্ বম্ ধ্বনি মিলালে বেশ মিলে যায়। মনে হচ্ছে শিবপুত্রী বম্ বম্ ধ্বনি তুলতে তুলতে সাগর সন্নিধানে মিলিত হতে যাচ্ছেন। লক্ষণভারতীজী বললেন— এহি হ্যায় হিরণফাল তীর্থ। সমান দুভাগে বিভক্ত ফাটা ডুংরির এভাগে আমরা আছি, লাফ দিয়ে পড়তে হবে ঐ ভাগে, কারণ ঐ ভাগ দিয়ে রাস্তা আছে হাঁটার মত। সেই রাস্তায় আমাদেরকে যেতে হবে খেড়াঘাট। এখানে ত দেখতেই পাচ্ছ নর্মদার বিস্তার বড়জোর পাঁচ ফুট হবে। একটা হরিণ এটা অবলীলাক্রমে লাফিয়ে যেতে পারে বলেই এর নাম হিরণফাল।

মোহান্তজী যুক্তিপরামর্শ করে এই প্ল্যান করলেন যে, ঝোলাঝুলি গাঁঠরী কমণ্ডলু, লাঠি, ত্রিশূল ইত্যাদি হাতে বা কাঁধে নিয়ে ডিঙানো সম্ভব নয়। কাজেই আগে চার পাঁচজনকে লাফ দিয়ে ওপারে গিয়ে পড়তে হবে, তারপর আমরা এক এক করে সব জিনিষপত্র ছুঁড়ে দিব, তারা লুফে নেবে, ধরে নেবে। তাঁর যুক্তি সকলেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু কে আগে ডিঙিয়ে যাবে? প্রত্যেকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

বড় বড় বাঁদরের নাদা নাদা পেট,
সাগর ডিঙাতে সবে মাথা করে হেঁট!

আমি মোহান্তজীকে বললাম, স্কুল কলেজে পড়বার সময় আমি 'লং জাম্প' অনেক অভ্যাস করেছি, আমিই আগে লাফ মারছি, আপনি অনুমতি দিন। এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি 'হর নর্মদে' বলে লাফ মারলাম। নির্বিঘ্নে ওপারে গিয়ে পড়লাম। আমার দেখাদেখি লক্ষ্মণভারতী, যতীন্দ্র, রতনভারতী প্রভৃতি দশ বারজন নাগা হর নর্মদে বলতে বলতে লাফ দিলেন। এরপর লাফ দিলেন স্বয়ং মোহান্তজী এবং দুজন পণ্ডিত। এবারে বাকী নাগারা আমাদের ঝোলা, কম্বল, গাঁঠরী, লাঠি, ত্রিশূল ইত্যাদি একে একে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন, আমরা একে একে সব ধরে নিলাম। একটা কম্বলের

চারকোণে ধরে আমরা পেতে ধরলাম, কমণ্ডলুগুলো একে একে ওপার থেকে ছুঁড়ে দিলেন নাগারা। সব জিনিষপত্র এদিকে চলে আসার পর বাকী নাগারা একে একে লাফ দিয়ে পেরিয়ে এলেন। আমরা নতজানু হয়ে মা নর্মদাকে প্রণাম জানালাম। মোহান্তজী বললেন—যহাঁ হিরণ্যাক্ষনে তপস্যা কী থী, ইসীলিয়ে উসীকো নাম সে য়হ হিরণ্যতীর্থঘাট কহলাতা হৈঁ। হিরণকা (হরিণ) উল্লম্ফন কা সাথ ইস্‌কা কোঈ মতলব নেহি। আভি ইনকা কথা শুনিয়ে। এই বলে তিনি বলতে লাগলেন—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি এইখানে এসে ঘোরতর তপস্যা করে পদ্মযোনি ব্রহ্মার দর্শন পান। ব্রহ্মার বরে দুর্ধর্ষ হয়ে সে যুদ্ধ করার জন্য স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হন। দেবতারা ভয়ে পলায়ন করেন। তারপর অসুর জলক্রীড়ার জন্য সমুদ্রে অবতরণ করে। সেখান হতে বরুণের জল মধ্যস্থ প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং বরুণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে। বরুণ বলেন, পৃথিবীতে তোমার সমকক্ষ কেউ নাই। একমাত্র ভগবান বিষ্ণু তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ, তুমি বরং তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান কর। তখন হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুর সন্ধানে রসাতলে প্রবেশ করে বরাহরূপী বিষ্ণুকে দেখে তাঁকে আক্রমণ করে। বিষ্ণু বরাহ দন্ত দ্বারা হিরণ্যাক্ষকে বিদীর্ণ করে হত্যা করেন।

অন্যমতে হিরণ্যাক্ষ ত্রিলোক জয় করে পৃথিবীকে সমুদ্রতলে নিক্ষেপ করেন। বিষ্ণু বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে দশনাগ্রে রসাতল হতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন।

গল্প শুনে আমার মনে হল, বলিহারি, পুরাণকারদের বচন পারিপাট্য; কল্পনার সাহায্যে তাঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প রচনা করতে পারেন। মহর্ষি কশ্যপের পুত্র হিরণ্যাক্ষ এখানে তপোভূমি নর্মদার তটে তপস্যা করতে এসেছিলেন, এইটুকুই যা ঘটনা।

এখানে লাফালাফি এবং লুকালুকিতে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এবারে যে যার পুল্লিতল্লা নিয়ে খেড়াঘাটের দিকে যাত্রা করলাম।

হিরণফাল ঘাট হতে নর্মদা যেদিক দিয়ে বয়ে চলেছেন, আমরা শালবনের ফাঁক দিয়ে সেই পথেই উৎরাই এর পথে হেঁটে যেতে লাগলাম। পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জল অজস্র ধারায় গড়িয়ে পড়ছে, মান্দালাতে যে

সহস্রধারা দেখে এসেছি এখানের দৃশ্য সেইরকম নয়। এখানের ধারাগুলিতে জলস্রোতের উচ্ছ্বাস আছে, সে জল তীব্রবেগে শুভ্রফেনিল রূপ ধারণ করে গর্জন করতে করতে গড়িয়ে পড়ছে নর্মদার মূলধারার সঙ্গে। এখানকার দৃশ্য সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। এখানে ডুংরির ছোট ছোট ছিদ্রপথে ঝির ঝির করে গড়িয়ে পড়ছে নর্মদার ধারা, অথচ তা জলপ্রপাতের মত রূপ ধারণ করেনি, গর্জনশীলাও নয়। কোথাও বা সরু সরু ফিনকি দিয়ে ফোয়ারার আকারে নর্মদার জল পাহাড়ের গা বেয়ে পড়ছে. কোথাও বা দেখা যাচ্ছে অজস্র ফিনকির পর ফিনকি বা ফোয়ারা মূল পর্বত গাত্র হতে পাঁচ-দশ হাত দূরে গিয়ে পড়ছে। সেই পর পর ফিনকির সারি এক নজরে দাঁড়িয়ে দেখলে বড় বিচিত্র এক বড় অপরূপ বলে মনে হয়।

কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনের অবসর কোথায়? পথের দুর্গমতা আমাদেরকে সব সময়েই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমরা কেবলমাত্র সৌন্দর্য সম্ভোগী সখের ভ্রমণকারী নয়, আমরা তীর্থযাত্রী পরিক্রমাবাসী. আমাদের কিছু অবশ্য করণীয় নিত্যকর্ম আছে, আমাদের সেই নিত্যকর্মের জন্য স্থিতি ও নিরাপত্তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি শিবমন্দির। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি কোথায় পাই সেই অভয় আশ্রয়। হিরণ্যাক্ষের ঘাটে নর্মদার সেই সাড়ে পাঁচফুট বা ছ'ফুট মাত্র বিস্তার দেখেছিলাম, মাইলখানিক হাঁটার পরেই দেখলাম ডুংরি ফাটিয়ে যেসব অজস্র ধারা ছুটে বেরিয়েছিল, তারা সব একত্রে মিলিত হয়ে গেছে, ফলে নর্মদার বিস্তার বেড়ে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট চওড়া হয়েছে। নর্মদার গতিপথও যেমন বদলেছে, তেমনি বদলে গেছে পার্বত্য পথের প্রকৃতিও। লক্ষ্মণভারতীজী এর আগে নর্মদার বক্রযান গতির কথা বলায় তার সেই বক্রযান শব্দটি নিয়ে কৌতুকবোধ করেছিলাম, কিন্তু এখন তাঁর কথার তাৎপর্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। কোন নদীর গতিপথ কি এমনভাবে আঁকাবাঁকা হয়? নিজের চোখে না দেখলে জীবনে বিশ্বাসই করতে পারতাম না কিভাবে নর্মদা এরকম এঁকেবেঁকে চলেছেন। পথ ত কঙ্করময় সন্দেহ নাই, কিন্তু এখানের পাহাড় জঙ্গলময় নয়, কচিৎ কদাচিৎ বড় বড় শালগাছ চোখে পড়লেও এইসব পাহাড়ের ঢালে শুধুই বেলগাছের আধিপত্য। হাজার হাজার বেলগাছ, কখনও পাহাড়ের উপরদিকেও

বেলগাছ ঢেকে রেখেছে ডুংরির পর ডুংরিকে। আমাদেরকে কখনও উৎরাই কখনও চড়াই-এর পথ দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। পথের উপর ঝড়ে বা অন্য কারণে অনেক বেলগাছ পথ ঢেকে পড়ে আছে। ভূশতিত ভূপাতিত অনেক বেলগাছ শুকিয়েও গেছে। গাছ শুকিয়ে গেলেও তার কাঁটার বিদ্ধ করার ক্ষমতা কিছুমাত্র কমেনি। কাঁটা মাত্রই তা ক্ষুদ্র হোক তার বিদ্ধ করার বা যন্ত্রনা দেওয়ার ক্ষমতা কিছুমাত্র কমে না। তাই আমরা অতি সাবধানে পা ফেলে হাঁটছি। জঙ্গল কম, সূর্যালোকও অবারিত তাই রক্ষে। নতুবা এই পথ যদি পূর্বদৃষ্ট ঝাড়ি সুড়ং এর মত হত তাহলে আমাদের পথ চলাই দুষ্কর হত। সমানে নাগারা কুড়ুল ও টাঙ্গির সদব্যবহার করছেন, পথের উপর যেসব শুকনো বেলগাছ পড়ে রয়েছে তার ডালপালা কেটে ছেঁটে এগোচ্ছেন। তবুও এত সাবধানতা সত্ত্বেও সাতজন নাগার পায়ে বেলকাঁটা ফুটল। রতনভারতী এবং দুজন পণ্ডিতমশাই-এর পায়ে যে কাঁটাগুলি ফুটল সেগুলি আকারে বেশ বড়। তাঁরা যন্ত্রনায় আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁদের পায়ের কাঁটা সবলে টেনে বের করতে হল। যথেষ্ট রক্তপাত হল। একজন নাগা তাঁর ব্যবহৃত নামাবলি ছিঁড়ে তাঁদের প্রত্যেকের পায়ে ফেট্টি বেঁধে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফেট্টিগুলো ভিজে গেল রক্তে। রক্তের স্রোত কিছুতেই বন্ধ হল না, এখানে অপেক্ষা করারও উপায় নাই, বেলা বোধহয় একটা বেজে গেছে। ডুংরিটা এমনই যে এখানে ঝোপঝাড় বা অন্য কোন লতাপাতার গাছও নাই। কাজেই রক্তনিরোধক কোন লতাপাতা অনুসন্ধানের প্রশ্নই আসে না, থাকলেও তা চিনে আনবেন কে? যিনি চেনেন, সেই কবিরাজ পণ্ডিত নিজেই ত যন্ত্রনায় ছটফট করছেন। মোহান্তজীর নির্দেশে কন্টকে বিদ্ধ যন্ত্রনাকাতর প্রত্যেককে, প্রায় একরকম কাঁধে তুলেই নিয়ে যেতে হল। সেই ডুংরি থেকে নেমে কিছুটা সমতল প্রান্তরে নেমে আসতেই লক্ষ্মণভারতীজী বললেন এহি খেড়াঘাটে বা। মোহান্তজী তা শুনেও এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন না। খেড়াঘাটের উদ্দেশ্যে বারেকের জন্য করজোড়ও হলেন না; তাতে বুঝলাম এই খেড়াঘাট কোন তীর্থ নয়, এটা কারও তপস্যাক্ষেত্রও নয়। যাওয়ার পথে একটা স্থান মাত্র। মোহান্তজীকে বিষম চিন্তিত ও বিষণ্ন দেখছি। সাতজন সঙ্গী যদি এমনভাবে কাঁটা ফুটে চলৎশক্তিহীন হন, তাহলে কারই বা ভাল লাগে? তাঁদের মাঝে মাঝে

যন্ত্রনাকাতর আর্তনাদ শুনে আমাদের সবারই মন খারাপ হয়ে গেছে। যে সাতজন নাগা তাঁদেরকে বইছিলেন, তাঁদেরকে বদল করে অর্থাৎ তাঁদেরকে বিশ্রাম দিয়ে আর সাতজনকে তাঁদেরকে বহন করতে বলা হল। যাঁরা এতক্ষণ আহতদেরকে বইছিলেন, তাঁরা হাঁপাচ্ছেন, ঘেমে নেয়ে গেছেন তাঁরা। এইরকম ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করতে হয়, কিন্তু মোহান্তজী একমিনিটের জন্যও কাউকে বসতে দিলেন না। ডুংরির পর ডুংরি পথের মধ্যে পর পর তিনটি খাড়া দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি। যেন পথে কেউ সাজিয়ে রেখেছে। একেবারে নাঙ্গা, বড় বড় গাছ ত দূরের কথা, সেইসব পাহাড়ে দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি, কোনও ঝোপঝাড়ও চোখে পড়ছে না। যেসব দুর্গম অরণ্য পেরিয়ে এলাম, তারপরেই এইরকম ন্যাড়ানেমসি পাহাড় এই পরিবেশে বড়ই বেমানান্ ঠেকছে। সাতজন আহত নাগাকে যাঁরা বইছিলেন তাঁরা আর বইতে পারছেন না। ধীরে ধীরে কাঁধ থেকে তাঁদেরকে নামানো হল। সাত সাতটি প্রকাণ্ড জীবন্ত লাশকে এইরকম রুক্ষ ও দুর্গম পথে কাঁহাতকই বা কে বইতে পারেন? মনে মনে ভাবছি, এইসময় কোন হিংস্রজন্তু যদি হঠাৎ তেড়ে আসে তাহলে ত সমূহ বিপদ্! আহত নাগাদের যে যে পায়ে বেলকাঁটা ফুটেছিল সেই পাগুলো ফুলে উঠেছে, তাঁরা বলছেন ঘায়ের মুখগুলো কট্ কট্ ঝন্ঝন্ করছে, বলতে বলতে কেউ কেউ কেঁদেই ফেললেন! তাঁরা মোহান্তজীকে বললেন—আপনারা আমাদেরকে এখানে রেখে চলে যান। আমাদেরকে মনে হয় নিয়তি টানছে। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কাছে জীবন-মৃত্যু দুই-ই সমান, যেদিন বিরজা হোম করে নিজেরাই নিজেদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডার্পণ করেছি, সেইদিন থেকেই ত শাস্ত্র-দৃষ্টিতে আমরা মৃত! যিনি এই কথাগুলি বললেন, তাঁর মুখ সেইসময় যে করুণ হাসি ফুটে উঠল, তা যে-কোন বিয়োগান্তক নাটকের মর্মান্তিক দৃশ্যের চেয়েও মর্মন্তুদ। আমরা বুকটা গুরগুর করে উঠল। মোহান্তজী প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি তাঁদেরকে ধমক দিয়ে বললেন—সন্ন্যাসী হয়েছি বলে কি মানবতা হারিয়ে ফেলেছি নাকি? হয় আমরা একসঙ্গেই হাত্নী সংগমে গিয়ে পৌঁছব, না হয় একসঙ্গেই ধূনি জ্বেলে এখানেই রাত কাটাব।

মা নর্মদার যা ইচ্ছা তাই ঘটুক। মোহান্তজীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ।

কিছুক্ষণ আগে থেকেই একটা কথা আমার মনে উদয় হয়েছে, কিন্তু কথাটা এমনই শ্রুতিকটু যে বলি বলি করেও বলতে পারিনি। এখন মরিয়া হয়েই বলে ফেললাম—আচ্ছা, লম্বালম্বা চৌদ্দটা দণ্ড কেটে নিয়ে, শব-বাহকরা যেমন খাটিয়াতে শব বহন করে নিয়ে যায়, সেইরকম ভাবে কাঠের খাটিয়া বেঁধে তার উপর শুইয়ে চারজন করে সেই খাটিয়া বয়ে নিয়ে গেলে কেমন হয়? তাতে ভার অনেক লঘু হবে বইবারও সুবিধা হবে, বলেই আমি আহত নাগাদের কাছে হাতজোড় করে মাপ চাইলাম।

লক্ষণভারতীজী আমার প্রস্তাবটা দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে কুড়ুল ও টাঙ্গি হাতে করে জনাদশেক নাগাকে সঙ্গে নিয়ে গাছের সন্ধানে গেলেন। তাঁরা চলে যেতেই মোহান্তজী অশ্রুসজল নেত্রে আহতদের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগলেন এর আগে গুরুজীর সাথে বার তিনেক এই পথে এসেছি, পথের কষ্ট যেমন এখন হচ্ছে, তেমনি তখনও ভোগ করেছি কিন্তু এইরকম দৈব দুর্বিপাকে শোচনীয় অবস্থায় কখনও পড়িনি। গুরুজীর তপোবলে বারবার রক্ষা পেয়েছি। কি করব, আমার কোন ত্যাগ তপস্যা নাই, তাই তোমাদেরকে এই বিপাকে পড়তে হয়েছে। হর নর্মদে. হর নর্মদে।

আমি পণ্ডিত কবিরাজ মশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, ধর্মরায়ের ঘাটে বৈদ্যজী যে ঔষধ ও মলম দিয়েছিলেন, সেগুলি কোথায়? আমি সেগুলি আপনাদের পায়ে লাগিয়ে দিলে উপকার হবে কি? তিনি ইঙ্গিতে সম্মতিদান করতেই আমি সাবধানে পায়ের ফেট্টি খুলে প্রত্যেকের পায়ে মলম লাগিয়ে পুনরায় ফেট্টি বেঁধে দিলাম। প্রত্যেকেরই ক্ষত স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। প্রত্যেকেরই মুখে একটি করে বড়ি ফেলে কমণ্ডলুর জল মুখে ঢেলে দিলাম। ঔষধ লাগানো ও খাওয়ানোর পর্ব শেষ হয়েছে এখন সময় লক্ষণভারতীজী দলবলসহ প্রায় সাত ফুট করে লম্বা কাঠের চৌদ্দটি ডাণ্ডা আরও চারফুট করে একবোঝা ছোট ছোট কাঠের সরু সরু লাঠি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে একবোঝা লতাও ছিঁড়ে এনেছেন। তিনি এসেই লম্বালম্বি দুটি করে দণ্ড পেতে তাদের মাঝখানে ছোট ছোট লাঠি লতার সাহায্যে শক্ত করে বাঁধতে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য নাগারা বাকি দুটি কাঠের খাটিয়া বেঁধে ফেললেন। প্রত্যেক খাটিয়ার উপর কম্বল দু ভাঁজ

করে পেতে সাতজন রোগীকে শুইয়ে চারজন করে নাগা এক একটি খাটিয়া কাঁধে তুলে নিলেন। যতীন্দ্রের ঘড়িতে তখন বেলা চারটা। লক্ষ্মণভারতীজীর কাছে জানলাম আরও দু মাইল গেলে তবে হাতনী সংগমে পৌঁছতে পারব। হর নর্মদে ধ্বনি তুলে আমরা অতি সাবধানে সামনের তিনটি ন্যাড়া ডুংরি লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলাম। পথ রুক্ষ, মাঝে মাঝে এবড়ো খেবড়ো পাথরের গুটি পায়ে বিঁধছে সন্দেহ নাই তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে কোটেশ্বর থেকে ধর্মরায়ের ঘাটে পৌঁছতে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝাড়ি সুড়ং ও ডুংরি সুড়ং অতিক্রম করতে হয়েছিল কিংবা সূঁচালো ও অত্যন্ত মসৃণ পাথরের কুচি ফুটে সবাই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলাম, প্রত্যেকেরই পা রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল, এ পথে সেরকম কষ্ট নাই। সবচেয়ে স্বস্তি সূর্যের আলোতে পথ ঘাট স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। আমরা একটা নাঙ্গা ডুংরি হতে আর একটা নাঙ্গা ডুংরিতে উঠতে লাগলাম। এই ডুংরি বড়জোর দু হাজার বা আড়াই হাজার ফুট উঁচু হবে, তাতেই চড়াই পথে হাটতে গিয়ে বুকে টান ধরছে। যাঁরা খাটিয়া বহন করছেন তাঁরা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অতি কষ্টে উঠতে লাগলেন। প্রত্যেকটি খাটিয়াতে আর দুজন করে নাগা খাটিয়ার মধ্যিখানের ডাণ্ডায় কাঁধ লাগালেন। ভাগ্যিস, এখানে কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই, মানুষ জন থাকলে তারা দূর থেকে দেখে এই ধারণাই করত, যে একদল শববাহক সাত সাতটি শবকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ডুংরির উপর উঠে খাটিয়াগুলি নিচে নামিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করতে বসা হল। মোহান্তজী অন্য নাগাদেরকে এইবারে কাঁধ লাগাতে বললেন। কারণ যাঁরা বইছিলেন তাঁরা ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এই সময় লক্ষ্মণভারতীজী বলে বসলেন—হমনে ভুল গয়া হম্ নেহি বোলা জো এহি নাঙ্গা ডুংরিমেঁ সাঁপকা ডর হ্যায়, ইধর বহুৎসা সাঁপ হ্যায়। কী মধুর সংবাদ! সংবাদ শুনে প্রাণমন জুড়িয়ে গেল। অন্যান্য সবাইত বটেই, যাঁরা ফোলা ও রক্তাক্ত পা নিয়ে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছেন, তাঁদের মুখে চোখে স্পষ্টতই আতঙ্কের ছাপ পড়ল। মোহান্তজী এবার উঠতে হুকুম দিলেন। নতুন লোক এবারে খাটিয়াগুলি কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন। পাল্কী বাহকদের মত তাঁরা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সুরকরে একসঙ্গে বলতে বলতে চললেন—"হেঁই মাইয়া হেঁইয়ো, হর নর্মদে

হেঁইয়ো। ডুংরির উপর ভাগটা মোটামুটি সমতল, তাই জোর কদমে হাঁটতে লাগলাম। মিনিট পনের হাঁটার পরেই লক্ষণভারতীজী হাত উঠিয়ে থামতে বললেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে পেলাম, আমাদের কাছ হতে প্রায় ষাট সত্তর ফুট দূরেই চার চারটে বড় বড় সাপ ফণা বিস্তার করে খেলছে, নাচছে। আমার মনে হল প্রত্যেকটা সাপই মোটা এবং প্রায় চৌদ্দ পনের ফুট করে লম্বা, পাইথন এবং শঙ্খচূড় আমি এই পরিক্রমা করতে করতে চিনে গেছি। এগুলো পাইথন বা শঙ্খচূড় নয়, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের বাংলাদেশে যেসব তেঁতুল্যা খরিস দেখা যায় এগুলিকে তাদেরই সগোত্র বলে মনে হল, তবে আকৃতিতে অনেক বড় এবং অনেক বেশী ভয়াল। সাপগুলোর দৃষ্টি এখনও আমাদের উপর পড়েনি, তারা নিজেদের মধ্যেই খেলাতেই মত্ত। এক একটা সাপ অন্য সাপের গায়ে ফণা দিয়ে ছোবল মারার ভঙ্গী করছে, অথচ কেউ কাউকে দংশন করছে না। আমি আর কালবিলম্ব না করে কমণ্ডলুর জল স্পর্শ করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মহাত্মা দিওয়ানজী প্রদত্ত মন্ত্রের প্রয়োগ করলাম। মুহূর্তে সাপের খেলা বন্ধ হয়ে গেল। তারা স্থির হয়ে ফণা তুলে কুত্‌কুতে চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগল। নড়ন চড়ন বন্ধ হয়ে গেছে। আমি মোহান্তজীকে বললাম, এইবার এগিয়ে আসুন, সবকে আসতে বলুন, কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদে আমরা এস্থান পেরিয়ে যেতে পারব। তিনি কিন্তু আমার কথায় ভরসা করতে পারলেন না। ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে তিনি আমাকে তাঁদের কাছে দৌড়ে পালিয়ে আসতে বললেন। আমি তাঁর কথায় পিছিয়ে ত গেলামই না, পরিবর্তে মহাত্মা প্রলয়দাসজীকে মনে মনে প্রণাম করে উচ্চৈস্বরে তার প্রদত্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলাম সাপগুলোর উপর দৃষ্টি রেখে :

মা নো অগ্নেহব সৃজো অঘায়া বিষ্যবে রিপবে ডুচ্ছুনায়ৈ।
মা দত্বতে দশতে মাদতে নো মা রীষতে সহসাবন্ পরা দাঃ॥

হে অগ্নি! আমাদেরকে হিংসুক অন্নগ্রাসী, শুভনাশী রিপুর হাতে সমর্পণ করো না; আমাদেরকে দন্তবিশিষ্ট, দংশনকারীর (সাপের) হাতে সমর্পণ

করো না; দন্তরহিতের (শৃঙ্গাদি বিশিষ্ট পশু) হাতে সমর্পণ করো না। হে বলবান অগ্নি! হিংসকদের হাতে আমাদেরকে সমর্পণ করো না।

আমার মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হতেই দেখা গেল সাপগুলো নেতিয়ে পড়েছে। আবার মোহান্তজীকে ডাক দিলাম, এবার তিনি ভরসা করে দলবলসহ এগিয়ে এলেন। সাপগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন—ওগুলো কি মন্ত্রের প্রভাবে মারা গেল!

—না, দু তিন ঘণ্টা মন্ত্রের প্রভাবে ওরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকবে। তারপর নিজেদের স্বভাব ফিরে পাবে।

—তুমি এই মন্ত্র কোথায় শিখেছ? কার কাছে?

—একজন প্রাচীন মহাত্মার কাছে। নাম বলতে নিষেধ আছে।

তা শুনে তিনি আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। আমরা ডুংরি থেকে উৎরাই-এর পথে নামছি। প্রায় আধমাইলটাক হাঁটার পর আবার বাহক বদল করা হল। যতীন্দ্র জানাল—৬টা বেজেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পশ্চিমদিকের আকাশ অস্তগামী সূর্যের লাল রশ্মিতে রক্তাভ হয়ে উঠেছে। এই আলোতে ফাঁকায় ফাঁকায় হাতনী সঙ্গমে পৌঁছে যেতে পারলেই মঙ্গল, নতুবা অন্ধকার ছেয়ে এলেই বিপদে পড়ব। সকলেই বুঝছেন একথা, আলোর আভাস থাকতে থাকতে পৌঁছে যেতে সবাই প্রাণপণে হাঁটার চেষ্টা করছেন, কিন্তু অভুক্ত অবস্থায় সারাদিন হাঁটার ফলে সবাই ধুঁকছি। যারা খাটিয়া বইছেন তাঁদের ত প্রায় অর্ধমৃত অবস্থা, ক্লান্তিতে তাঁরা ভেঙ্গে পড়েছেন। আমরা এতক্ষণ নর্মদাকে তাঁর বিচিত্র বক্রযান গতির জন্য দেখতে পাই নি; পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে প্রবাহিত হয়ে যাবার জন্য তিনি চোখের আড়ালে ছিলেন। এখন তাঁর দর্শন পেলাম। দর্শন দিলেন নিজের পরিপূর্ণ বিস্তার নিয়ে, তার কলোচ্ছ্বাস শুনে বুঝতে পারছি, তিনি আর বক্রযান গতির ছদ্মবেশে নাই; তিনি তাঁর স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। দূরের এক ডুংরি ভেদ করে গর্জন করতে করতে হাতনী নদীর জলধারা এসে মিশেছে নর্মদার সঙ্গে। নর্মদার একুল ওকুল আর দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে না, লক্ষ্মণভারতজী ঘোষণা করলেন হাতনী সংগমে পৌঁছে গেলাম। একটা দোতলা পাকাবাড়ী দেখিয়ে মোহান্তজী বললেন—ওহি ধরমশালামেঁ চলিয়ে। ইহ্ আনোখিলাল

চৌকশীনে বানায়া। লছমন ভেইয়া, আপ্ পহেলে যা কর তালাস করিয়ে শেঠজীকা ধরমশালামেঁ জাগা মিলেগী কি নেহি।

লছমনভারতীজী ধর্মশালার গেটে পৌঁছানোর পরেই দেখলাম, দশ বারজন লোক ধর্মশালার গেটে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা সবাই ধরাধরি করে অসুস্থ নাগাদের খাটিয়া ধর্মশালার নিচের তলায় একটি বড় হলঘরে নিয়ে গিয়ে রাখলেন। বড় হলঘরের দুদিকে দুটো লণ্ঠন জ্বলছে। ধর্মশালার লোকরাই হাত লাগিয়ে সকলের কম্বল পেতে দিলেন। চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেছে। নর্মদা ত কাছেই কিন্তু নর্মদাতে গিয়ে যাঁরা আহত তাঁদের পক্ষে হাত মুখ ধুয়ে আসা সম্ভব নয়। সেই সাতজন বাদে আমরা সবাই নর্মদাতে কোমর পর্যন্ত জলে নেমে স্নান করে এলাম। স্বচ্ছতোয়া নর্মদার স্নিগ্ধ জলের স্পর্শে আমাদের শ্রান্তি, ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। স্নান করে এসে দেখি, ধর্মশালার বাসিন্দারাই সেই সাতজনের মুখ হাত ধুইয়ে দিয়েছেন, এমন কি গরম জলে তুলা ডুবিয়ে সাতজনেরই কণ্টকবিদ্ধ ক্ষতস্থানের জমাট রক্ত ধুইয়ে দিয়েছেন। গরম জলের স্পর্শ পেয়ে তাঁরা আরাম বোধ করছেন। যতীন্দ্র মলমের ডিবা থেকে মলম নিয়ে তাঁদের পায়ে লাগিয়ে দিয়ে প্রত্যেককে একটি করে বৈদ্যজীর বড়ি খাইয়ে দিলেন।

আমরাও যে যার প্রয়োজনমত ব্যথার জায়গায় একটু করে মলম লাগিয়ে নিয়ে একটি করে বড়ি মুখে ফেলে পেটপুরে সবাই জলপান করলাম। পরিক্রমার নিয়মানুসারে সূর্যাস্তের পরে জল ছাড়া কিছু খেতে নাই, কন্দমূল ছাড়া কোন খাদ্যও আমাদের কাছে নাই। আমরা আসামাত্রই যাঁরা আমাদের সেবা পরিচর্যা করলেন, তাঁদের সহৃদয়তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে মোহান্তজী তাঁদেরকে বিদায় দিলেন। আমরা শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়েই অনুভব করছি পায়ের টাটানি ব্যথা। স্নানের জন্য ঘুমে ঢলে পড়লাম তাড়াতাড়ি। অঘোরে ঘুমিয়েছি সন্দেহ নাই। ঘুমের মধ্যে দেখছি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রলয়দাসজী। জলদর্চিমান বহ্নিশিখার মত তাঁর অঙ্গজ্যোতি। এখন আর তাঁর অর্ধনিমিলিত প্রায়ান্ধ চক্ষু দেখছি না। তিনি আয়ত চক্ষু মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে গদগদকণ্ঠে বলছি—প্রণাম, পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে। হে হিরণ্যরেতা হিরণ্ময় পুরুষ।

সৌম্য অবয়বে তব প্রীতি যেন লভিয়াছে কায়া।
সর্বাঙ্গে ক্ষরিছে ক্ষান্তি আঁখিপাতে প্রশান্তির ছায়া॥

তিনি জলদ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন—তোমরা পরিক্রমাবাসীরাই শুধু মা নর্মদার আদরের সন্তান নও, নর্মদাতটের হিংস্র পশু, জীবজন্তু সর্পাদিও তাঁর সন্তান, চারটে সাপের উপর বেদমন্ত্র প্রয়োগ করে তাদের গতি স্তব্ধ করে দিয়ে এলে, তারপর তার কাটান মন্ত্র প্রয়োগ করলে না কেন?

—আপনি ত বলেছিলেন মন্ত্রের প্রভাব দু তিনঘণ্টা থাকবে, তারপর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হবে। তাছাড়া কাটান মন্ত্রও আপনি শেখান নি।

—মন্ত্র যন্ত্র প্রয়োগে এজন্য অধিকারভেদের বিচার আছে। বালক তুমি, তাই কোন মন্ত্রের কি গুরুত্ব বুঝতে পার নি। সামান্য সরীসৃপের উপর দু দুটো সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ করে বসলে। এরকম আর কখনও করো না। যে কোন একটা মন্ত্রই প্রয়োজনবোধ করলে প্রয়োগ করবে, কদাচ দুটো মন্ত্র কারও উপর প্রয়োগ করবে না। এটা মন্ত্রের উপর অবিচল নিষ্ঠা সূচনা করে না। সাপেদের উপর যে মন্ত্রটি প্রয়োগ করেছ, সেটি ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৮৯তম সূক্তের পঞ্চম মন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা অগস্ত্যদেব, দেবতা অগ্নি। ঐ প্রথম মণ্ডলের ১৬৫ সূক্ত হতে ১৯১ সূক্ত পর্যন্ত সমূহ মন্ত্রের দ্রষ্টা মহর্ষি অগস্ত্য। তাঁর দৃষ্ট অগ্নিগর্ভ মন্ত্রের কাটান করতে ত্রিভুবনের কোন মন্ত্রেরই ক্ষমতা নাই। তবে ১৬৫ সূক্তের তাঁরই দৃষ্ট ১ম মন্ত্রটি উচ্চারণ করলে মন্ত্রতেজ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে, ঐ মন্ত্রটি হল—

কয়া শুভা সবয়সঃ সনীলাঃ সমান্যা মরুতঃ সং মিমিক্ষুঃ।
কয়া মতী কুত এতাস এতে অর্চন্তি শুষ্মং বৃষণো বসূয়া॥

এই মন্ত্রটি মনন করবে, মুখস্থ করবে। আমি ঐ সাপগুলির গতীবন্ধন কেটে দিয়েছি, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। অতঃপর এইরকম ঘটনা যেন আর না ঘটে। জঙ্গম প্রাণীর ইচ্ছা বা গতি স্তব্ধীভূত করতে একটি মন্ত্রের প্রয়োগই যথেষ্ট। শিবমস্তু। তাঁর হিরন্ময় দেহ ধীরে ধীরে জ্যোতি-মণ্ডলে গিয়ে মিলিয়ে গেল। আর অপসৃয়মান্ দেহের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করতে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল। চাঁপাফুলের গন্ধ ঘরের মধ্যে ম্-ম্ করছে। এটি তাঁর স্বাভাবিক গাত্রসৌরভ। আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে

নিশ্চয়ই তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। আমি আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমার আর ঘুম এল না। অন্ধকার ঘরে নিজের শয্যার উপরেই বসে রইলাম। সকাল হতে এখনও অনেক দেরী আছে। আমি বসে বসে জপ করতে লাগলাম। প্রায় দুঘণ্টা পরে চোখ খুলে দেখি সকাল হয়ে গেছে। সেই সাতজন অসুস্থ নাগা ছাড়া প্রায় সকলেই প্রাতঃকৃত্য সারার জন্য বাইরে বেরিয়ে গেছেন। যাঁদের পায়ে বেলকাঁটা ফুটেছিল তাঁদেরকেও দেখছি, লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে বেরোনোর উপক্রম করছেন। তাঁদের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁদের পায়ের ফোলা অনেক কমে গেছে। পূর্বোক্ত বৈদ্যজীর ঔষধের আশ্চর্য প্রভাব আর একবার দেখে অবাক হলাম। যা বড় বড় বেলকাঁটা পায়ে ফুটেছিল এবং ফোটার পরে তড়্ তড়্ করে পা ফুলে উঠেছিল এবং অবিরত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, তাতে ত আমার মনে ভয় হয়েছিল হয়ত ক্ষতগুলো দূষিত হয়ে সেপ্টিক হয়ে যাবে, এই জঙ্গলখণ্ডে আধুনিক চিকিৎসক এবং ঔষধপত্রই বা কোথায় পাওয়া যাবে? যোগীদের সঙ্গে আমাদেরও বুঝি দুর্দশার চূড়ান্ত হবে। কিন্তু মা নর্মদার দয়ায় এত দ্রুত তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠবেন, কল্পনা করতে পারিনি।

কম্বল গুটিয়ে গামছা কমণ্ডলু হাতে নিয়ে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সারার জন্য ধর্মশালার গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। মূল নর্মদা প্রবল বেগে ধেয়ে চলেছে, হাতনী নদী উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে গর্জন করতে করতে নর্মদায় পড়ে জলের বিস্তারকে দিয়েছে বাড়িয়ে, জল উপচিয়ে উঠে এসেছে অনেকখানি। মনে হচ্ছে নর্মদা যেন এখানে একটা প্রকাণ্ড বিল। জলের ধারে ধারে চারপাশে কিছু ঝোপঝাড় থাকায় মনে হচ্ছে যেন একটা অসীম রহস্যে ভরা একটা বিরাট জলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। গতকাল সন্ধ্যায় যখন শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে এখানে এসে পৌঁছেছিলাম, তখন দীপচিহ্নহীন ছায়ান্ধকারে এই গোটা অঞ্চলটাই ঢাকা ছিল। কাজেই এই রূপ তখন চোখে পড়েনি। এখন দেখে ভালই লাগছে। আরও ভাল লাগছে এইজন্য যে আমাদের বাংলাদেশের অতি পরিচিত ঘেঁটুফুলের গাছে ভরে আছে এই বিরাট বিলের কোন কোন অংশ। প্রাতঃকৃত্য সারতে গিয়ে দেখলাম, ধর্মশালার পশ্চিমদিকেই শিবমন্দির আছে, শিবমন্দিরের

গায়েই একটি ছোট একতলা বাড়ী ; কাঠের বেড়ায় শুকাচ্ছে দুটি গেরুয়া-বস্ত্র, ধর্মশালার পিছন দিকে কিছু কর, জাম এবং মহুয়া গাছ আছে। এখানে দাঁড়িয়ে সুউচ্চ বিন্ধ্যপর্বতের শিখর শ্রেণী চোখে পড়ছে। আমি প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে স্নান করতে নামলাম। স্নান তর্পণ সেরে দেখি তখনও মোহান্তজী এবং আরও দু চারজন নাগা দাঁড়িয়ে আছেন, আর সবাই ধর্মশালায় ফিরে গেছেন। মোহান্তজী আমাকে কাছে ডেকে বললেন — এই ঋষিক্ষেত্রকে প্রণাম কর বাবা। বলে নিজেই যুক্তকরে প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁর দেখাদেখি আমিও প্রণাম করলাম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কিছুটা পশ্চিমদিকে এগিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে একটা পাহাড়ের চূড়া দেখালেন। পাহাড়ের তিন চতুর্থাংশ ডুবে আছে জলে, চূড়ায় পোতা আছে একটি বিরাট ত্রিশূল প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফুট উঁচু। আমার মনে পড়ল গোরক্ষপুরে গোরক্ষ-মন্দিরে বিশাল শ্বেতমর্মরের মন্দির হতে প্রায় একশ ফুট দূরে বায়ুকোণে ভৈরোঁনাথের (ভৈরবনাথ) এক অগ্নিকুণ্ড আছে। সেই যজ্ঞশালাতেও এইরকম একটা মোটা বিরাট ত্রিশূল দেখেছিলাম।

মোহান্তজী বললেন—এখন ধর্মশালাতে ফেরা যাক। আমাদের রোগীরা বোধহয় ভালই আছেন, এখানে চার-পাঁচদিন বিশ্রাম করব ভাবছি। তিন-দিনের মধ্যে তাঁদের পা ঠিক হয়ে যাবে আশা করছি। কোন একসময় এই ঋষিক্ষেত্র সম্বন্ধে যা জানি বলব।

আমরা ধর্মশালায় ফিরে দেখি, অসুস্থ সাতজনের স্নান হয়ে গেছে। ধর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক (care-taker) শ্রী রূপা কাণ্ডারী ধর্মশালার দুই চাকর দিয়ে কয়েক ভার জল তুলে দিয়েছেন স্নানের জন্য। একজন জটাধারী বয়স্ক সাধু গরম জলে তুলা ডুবিয়ে ক্ষতস্থানে সেঁক দিয়ে মলম লাগিয়ে দিচ্ছেন। তিনি আর কাউকে হাত লাগাতে দেননি। এই জটাধারীকে কাল সন্ধ্যার পরেও দেখেছিলাম ঘোরাঘুরি করতে। এখন তাঁর এই অযাচিত সেবা দেখে আমার মনে শ্রদ্ধা জন্মাল। যতীন্দ্র আমাকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে জটাধারী সাধুর পরিচয় দিতে লাগলেন—এর নাম কপালীবাবা। এই ধর্মশালার প্রতিষ্ঠাতা আনোখীলাল চৌকসীর গুরু ইনি, অগ্নিহোত্রী, বেদজ্ঞ পণ্ডিত, সকাল সন্ধ্যা দুবেলাই ইনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করেন। এখান থেকে কিছুদূরেই একটি ছত্র আছে। গুজরাটের কয়েকজন শেঠ,

তাঁরা এঁরই শিষ্য, প্রধানতঃ কপালীবাবার অনুপ্রেরণাতেই আজ দশ বছর হল এখানে একটি ছত্র স্থাপন করেছেন। সেই ছত্র হতে পরিক্রমাবাসীদেরকে চাল ডাল আটা প্রভৃতি ভিক্ষা দেওয়া হয়। তাই আশা জাগছে, কালকের মত হয়ত আজ উপবাসে কাটাতে হবে না।

আমরা দুজনে ফিরে এলাম হলঘরে। কপালীবাবা উঠে দাঁড়িয়েছেন, তিনি দণ্ডায়মান মোহান্তজীর একখানি হাত ধরে বলছেন—আপনারা যে কয়দিন এখানে থাকবেন, কৃপা করে আমার প্রদত্ত ভিক্ষা স্বীকার করে নিন। সেবা করা আমার ব্রতাঙ্গ। দয়া করে আমাকে সেবা করার সুযোগ দিন। আপনার বয়স আমার থেকে কম হবে বলেই মনে হয়। এই শরীরের বয়স আশী হতে চলল। আপনার গুরুজীর আশীর্বাদে মা সরস্বতীর দয়ায় ভাণ্ডারে কিছুরই অভাব নাই। আমার আশ্রমে চারটি গাভী আছে, গোমাতারা প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধদান করে থাকেন। সেই দুগ্ধজাত ঘৃত হতেই আমার নিত্য হবন কার্য চলে। আপনার গুরুজীর সঙ্গে আমার দোস্তি ছিল, আপনি কি আপনার গুরুজীর সঙ্গে কোনদিন পরিক্রমায় আসেন নি? আমাকে কি কখনও দেখেন নি?

মোহান্তজী কিছু উত্তর দেবার আগেই লক্ষ্মণভারতীজী বললেন—আপকো হম্ পয়চান লিয়া। আপ্‌কো গাত্রবর্ণ পহেলে 'কালাসা' কৃষ্ণবর্ণ থে, কিঞ্চিৎ দুবলা ভি থে. অভি আপকো সকল্ বদল গিয়া, গৌরবর্ণ হো গয়ে, ইসী লিয়ে হমারা মোহান্তজীকো থোড়া সা ভ্রম হোতি হ্যায়। মোহান্তজী এবার বললেন—হাঁ হাঁ এবার সব মনে পড়ছে। আপনাকে চিনতে পেরেছি। বলে তিনি নতমস্তকে 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন করলেন, ভিক্ষার জন্য তাঁর নিমন্ত্রণও স্বীকার করে নিলেন। কপালীবাবা হাসিমুখে বললেন—যাঁরা অসুস্থ তাঁদেরকে কষ্ট করে যেতে হবে না, আমার ব্রহ্মচারীরা এসে সেবা করে যাবে। করীব এক দেড়কা অন্দর্ সব হো যাবে গা।

কপালীবাবা চলে গেলেন। আমরা মোহান্তজীর সঙ্গে শিবমন্দিরে গেলাম পূজা করতে। ছোট মন্দির, মন্দিরে গর্ভগৃহের প্রবেশ পথে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে—বৃষাকপি। 'বৃষাকপি' নামটি পড়েই আমি চমকে উঠলাম। আমার মনে পড়ে গেল ধর্মরায়ের ঘাটে বৈদ্যজী বর্ণিত

রুদ্রের একাদশ তনুর কথা। একাদশ রুদ্রের মধ্যে অষ্টম রুদ্রের নাম 'বৃষাকপি'। তাহলে ত বৈদ্যজীর কথামত ঘোর জঙ্গলে যেসব ডুংরি অতিক্রম করে এসেছি সেগুলি রুদ্রেরই প্রতীক! শ্বেতবর্ণের শিবলিঙ্গ। মোহান্তজীসহ সকল নাগা একে একে নর্মদার জল ঢেলে শিবলিঙ্গের স্তবপূজা করতে লাগলেন, আমি মন্দিরের বারান্দায় বসে তণ্ডিকৃত মহাদেবের স্তবপাঠ করতে লাগলাম। সুদীর্ঘ স্তবপাঠ করে আমিও শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে প্রণাম করে ফিরে এলাম ধর্মশালায়। যতীন্দ্রের কাছে শুনলাম তখন বেলা পৌনে বারটা। প্রায় একটার সময় স্বয়ং কপালীবাবা এলেন আমাদেরকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যেতে। তাঁর আশ্রমে গিয়ে পৌঁছতেই তিনি ছোট বড় প্রত্যেক অতিথির কাছে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ অতিথির্নমস্যঃ স্বস্তি মেঽস্তু, নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ অতিথির্নমস্যঃ স্বস্তি মেঽস্তু" অর্থাৎ আপনি ব্রাহ্মণ ও অতিথি কাজেই আমার নমস্কারের যোগ্য। আপনাকে প্রণাম করি আমার মঙ্গল হোক।

মূল আশ্রমবাড়ীর সামনে চারদিকে চারটি লম্বা লম্বা চালা, শালপাতার ছাউনী, মধ্যস্থলের প্রাঙ্গনে দুটি বড় বড় চতুষ্কোন বিশিষ্ট যজ্ঞকুণ্ড, সেখানে শুনলাম গত পনের বছর ধরে অগ্নি অনির্বাণ রয়েছে। এক একটি চালাতে অন্তত: ৬০ জন করে সন্ন্যাসী স্বচ্ছন্দে বসে ভোজন করতে পারেন। একটি চালাতেই আমাদের সঙ্কুলান হয়ে গেল। খাবার আয়োজনও বিপুল; পুরী লাড্ডু সব্জী ছাড়াও প্রত্যেককে এক সরা করে ঘন দুধ দেওয়া হয়েছে। সন্ন্যাসীরা সমস্বরে সুর করে গেয়ে উঠলেন 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' ইত্যাদি। ধাবড়ী কুণ্ডে একলিঙ্গস্বামীর আশ্রম ছেড়ে এসে এতদিন আর কোথাও এইরকম পুরু সর দুধ খাইনি। খেতে বসে আমি মনে মনে ভাবছি কপালীবাবার অতিথি আবাহনের পদ্ধতিটি। তিনি যে মন্ত্রে আমাদেরকে আবাহন জানালেন, তা হল নচিকেতার প্রতি ধর্মরাজ যমের আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনা বাক্যের মন্ত্রাংশ। স্বয়ং যম ব্রাহ্মণ অতিথি নচিকেতা ন'বৎসরের বালক হলেও তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করেছিলেন, কাজেই কপালীবাবা অশীতিপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হলেও এভাবে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? প্রাচীন ভারতের অবশ্য পালনীয় রীতি ছিল সাদরে অতিথি-সৎকার। আমাদের পূর্বপুরুষরা বিশ্বাস করতেন যে ঠিকমত

অতিথির পরিচর্যা না হলে গৃহস্থ বা আশ্রমবাসী সকলেরই ঘোর অমঙ্গল হয়, তার সকল আশা-ভরসা বিনষ্ট হয়, যজ্ঞাদির সুফললাভে বঞ্চিত হয়, পশু বিত্ত পুত্রাদিও নষ্ট হয়। স্বয়ং শ্রুতি ঘোষণা করেছেন—ইষ্টাপূর্তে পুত্র পশুশ্চ সর্বান্ বৃঙক্তে (কঠ ১।১।৮)। ইষ্ট বলতে বুঝায়—অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য, বেদের অনুপালন, আতিথ্য, বিশ্বের সমস্ত জীবের সেবা ইত্যাদি পুণ্যকর্ম; আর পূর্ত শব্দে বুঝায় বাপী, কূপ পুষ্করিণী আদি খনন, দেব মন্দির নির্মাণ, অন্নদান, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। অতিথি বিমুখ হয়ে হয়ে ফিরে গেলে এ সমস্ত পুণ্যকার্যের ফলই নষ্ট হয়। শাস্ত্রে এ উপদেশও দেওয়া আছে—প্রিয়ং চ বা এষ সংবিদং চ গৃহাণামশ্নাতি, যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি—অর্থাৎ যে অতিথির পূর্বে ভোজন করে সে প্রকৃতপক্ষে নিজের জ্ঞান ও সৌভাগ্যকেই ভোজন করে। 'সর্বং সুকৃতমাদত্তে ব্রাহ্মণোঽর্চিতো বসন্' ব্রাহ্মণ-অতিথি অনাদৃত হয়ে ফিরে গেলে তিনি গৃহস্বামীর সমস্ত পুণ্যরাশিই সঙ্গে নিয়ে চলে যান।

আমার চিন্তাসূত্রে ছেদ পড়ল কপালীবাবার কথায়। তিনি সামনে এসে হাতজোড় করে বলছেন—এঁরা সব নিয়মনিষ্ঠ নাগা সন্ন্যাসী; এঁদের একবারের বেশী ভোজ্য গ্রহণ করতে নাই, কিন্তু তুমি ত এখনও কোথাও মাথা মুড়াওনি, তুমি বিশেষ কোন নিয়মের অধীন নও, তুমি এখনও স্বাধীন ও স্বরাট। তুমি আর একটু দুধ সর গ্রহণ কর। কিন্তু আমার যথেষ্ট খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই মাথা নেড়ে 'না' জানালাম। হাত মুখ ধুয়ে আমরা যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে, কপালীবাবাকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে ফিরে এলাম ধর্মশালায়। ধর্মশালায় ফিরে এসে দেখি, যে সাতজন পায়ের কষ্টের জন্য যেতে পারেননি, তাঁদেরকে ইতিমধ্যেই কপালীবাবার ব্রহ্মচারী শিষ্যরা এসে খাইয়ে গেছেন।

আমরা বিছনার উপর অর্ধশায়িত থেকে কপালীবাবার আতিথ্যের সুখ্যাতি করতে লাগলাম। লক্ষণভারতীজী বললেন, কপালীবাবাকে কেউ ভাবেন উচ্চকোটির তান্ত্রিক, কেউ ভাবেন বেদপন্থী অগ্নিহোত্রী, কিন্তু আমার মনে পড়ছে প্রায় বার তের বছর আগে আমি যখন গুরুদেবের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিক্রমা করতে আসি, সেই সময় তিনি বলেছিলেন যে, কপালীবাবা শৈবাগমপন্থী সাধক।

এই সংবাদটি শুনে আমার মনে খুব স্ফূর্তি হল। একটু পরে কপালীবাবা স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন।

আমরা সকলেই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে স্বাগত জানালাম। মোহান্তজী তাঁকে নিজেরই আসনের এক কোণে বসতে দিলেন। আতিথ্যের বহুতর সুখ্যাতি করে হঠাৎ আমাকে দেখিয়ে বললেন—এই বাঙ্গালী বাবার পিতাজী অগ্নিহোত্রী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁরই আদেশ ও ইচ্ছাক্রমে ইনি পরিক্রমা করতে এসেছেন; মণ্ডলেশ্বর হতে বহুদূর আসার পর ইনি আমাদের দলের সঙ্গে আসছেন। এঁর মনে ইতিমধ্যেই আশা করি বহু প্রশ্ন জাগরিত হয়েছে। আপনি দয়া করে এঁর কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। বাঙ্গালীবাবা! তুমি নিঃসঙ্কোচে কিছু প্রশ্ন কর। এঁর উত্তর শুনে আমরাও লাভবান হব। অর্থাৎ মোহান্তজী আমাকে দিয়েই মধুচক্রে খোঁচা দিতে চান, মধুক্ষরণ হতে থাকলে সকলেই সেই মধু পান করবেন! তাঁর ইঙ্গিত বুঝে প্রথমেই কপালীবাবাকে প্রশ্ন করলাম—এই হাতনী সঙ্গমকে কেন ঋষিক্ষেত্র বলা হয়, দয়া করে বলুন।

—প্রথমে তুমি বল, ঋষি বলতে তোমার মনে কি ধারণা আছে!

—ঋষ্ ধাতু দর্শনে। কাজেই ঋষি বলতে আমি বুঝি বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা যাঁরা, তাঁরাই প্রকৃত ঋষি পদবাচ্য, যেমন বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, দীর্ঘতমা, মধুচ্ছন্দা, অঙ্গিরা, প্রস্কন্ব, উতথ্য, গৌতম, গৌতম পুত্র নোধা, হিরণ্যস্তূপ, কুৎস প্রভৃতি। ঋষি শব্দের সুনির্বাচিত প্রতিশব্দ হল—কবি ও ক্রান্তদর্শী। যাঁদের কাছে তপস্যাবলে বেদমন্ত্র প্রকট হয়েছে এবং যাঁদের মধ্যে একাধারে কবিত্ব ও ক্রান্তদর্শিতা আছে তাঁদেরকেই আমি ঋষি বলে মনে করি।

—সাধু! সাধু! তোমার উত্তর শুনে বড়ই খুশী হলাম বাবা। তবে এই সঙ্গে আমিও কিছু কথা যোগ করছি। পরমার্থতত্ত্বে যিনি সম্যক দৃষ্টি রাখেন তিনিই ঋষি। লক্ষ্য করবে, আমি সম্যক শব্দটি ব্যবহার করেছি। সম্যক শব্দটির তাৎপর্য হল সম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ। যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গে বিচরণ করে ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে সংসার অতিক্রম করতে পেরেছেন, তাঁরা বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা হোন বা না হোন তাঁদেরকেও আমরা ঋষি বলতে পারি। এঁরা ঈশ্বর আদিষ্ট পুরুষ, এঁদের জীবন ও বাণী হতেই বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি সম্যকরূপে নিরূপিত হয়ে থাকে।

ব্রহ্মার মানসপুত্র সাতজন ঋষিকে সপ্তর্ষি এবং প্রজাপতিও বলা হয়। তাঁরা সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সকল ঋষিসমাজের মান্য। শতপথ ব্রাহ্মণে এঁদের নামোল্লেখ আছে—যথা গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অত্রি। মহাভারত অনুসারে সপ্তর্ষিদের নাম—মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ। বায়ুপুরাণে ভৃগুর নাম যোগ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে আমরা আরও দুটি নাম ভৃগু ও দক্ষকে যুক্ত হতে দেখি। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে গৌতম, কণ্ব, বাল্মীকি, ব্যাস, মনু বিভাণ্ডক প্রভৃতিকেও ঋষি হিসাবে আখ্যাত করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত সপ্তর্ষি আকাশে সাতটি তারকারূপে বিরাজ করছেন। জ্যোতির্বিদ্যায় এই সপ্তর্ষিমণ্ডল Great Pear নামক নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত।

ঋষি সাতপ্রকার—শ্রুতর্ষি যেমন সুশ্রুত; কাণ্ডর্ষি যেমন জৈমিনি; পরমর্ষি যেমন ভেল; মহর্ষি যেমন বেদব্যাস; রাজর্ষি যেমন বিশ্বামিত্র ও জনক; ব্রহ্মর্ষি যেমন বশিষ্ঠ; দেবর্ষি যেমন নারদ, অত্রি, মরীচি, ভরদ্বাজ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু এবং প্রচেতা।

এই প্রসঙ্গে আরও বিশ রকমের ঋষির উল্লেখ পাই, যেমন—বৈখানস বালখিল্য, সংপ্রক্ষাল, অশ্মকুট্ট, আকাশনিলয়, অনবকাশিক, দন্তোলূখল, অশয্যা, পত্রাহার উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, বায়ুভক্ষ, জলাহার, আর্দ্রপট্টবাস, স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্ধ্ববাস তপোনিষ্ঠ পঞ্চতপা শান্তিত, সথপ, সোমবায়ব্য। এছাড়াও মহাভারতে ফলাহারী, ফেনপায়ী নামক আরও দুই শ্রেণীর ঋষির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য আমার মতে বেদের সাক্ষাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা ছাড়া আর সবাইকে মুনি বা মহামুনি বলাই ভাল। এখন তোমার মূল প্রশ্ন ছিল এই স্থানের নাম ঋষিক্ষেত্র কেন? কারণ, এখানে এই নর্মদাতটে এসে বহু মুনি ঋষি তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

এখন যেখানে 'বৃষাকপি' শিবের মন্দির ঐখানে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ঋষি মুদ্গল। ইনি মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ, আদি গোত্র-পুরুষ। মুদ্গল ছিলেন কুরুক্ষেত্রবাসী একজন ধর্মাত্মা মুনিব্রতধারী ব্রাহ্মণ। ইনি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে প্রতি পক্ষে একদিন মাত্র আহার করতেন এবং প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে যজ্ঞ করতেন। তিনি অতিথিদেরকে এক দ্রোণ (মানপত্র) করে অন্ন দিতেন। তার অবশিষ্ট অন্ন অতিথি দেখলেই বেড়ে

যেত। একদিন দুর্বাসা তাঁর অতিথি হন। মুনি মুদ্গল তাঁহাকে অন্ন দান করলে তিনি সমস্ত অন্ন ভোজন করে দেহে উচ্ছিষ্ট অন্ন মেখে চলে যান। দুর্বাসা পরপর ছয়টি পর্বদিনে এসে এইভাবে সমস্ত অন্ন ভক্ষণ করে এবং উচ্ছিষ্ট অন্ন গায়ে মেখে চলে যান, তারফলে অতিথি দেখলেই যে মুদ্গলের অন্ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হত, তার সেই-অলৌকিক সিদ্ধি নষ্ট হয়। এরফলে মুদ্গল নির্বিকারভাবে অনাহারেই কাল কাটাতে লাগলেন। এতে প্রীত হয়ে আর একবার দুর্বাসা আবির্ভূত হয়ে বলে যান, মুদ্গল স্বশরীরে স্বর্গে যাবেন। তাঁর পরিবারবর্গের আর কোনদিন অন্নের অভাব হবে না। তাঁর সমস্ত ঋদ্ধি-সিদ্ধিও ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, অতিথি এলে বা প্রয়োজন হলেই তাঁর বংশপরম্পরা এই অন্নবৃদ্ধির সিদ্ধি বজায় থাকবে। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মুনিব্রতধারী মুদ্গল এক পূর্ণিমা তিথিতে যজ্ঞ করছেন এমন সময় দেবদূত মুদ্গলকে স্বশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য দৈব-বিমান নিয়ে উপস্থিত হলেন। মুদ্গল দেবদূতকে স্বর্গবাসের দোষ-গুণ বর্ণনা করতে বললে দেবদূত স্বর্গবাসের বিবিধ সুখের কথা বলে দোষ হিসাবে বললেন—স্বর্গে কৃতকর্মের ফল ভোগ হয়, কিন্তু নূতন কোন কর্ম করা যায় না, তাছাড়া অপরের সম্পদে অসন্তোষ হয় এবং কর্মক্ষয় হলে পৃথিবীতে আবার পতন হয়। এই কথা শুনে মুদ্গল দেবদূতকে বিদায় দিয়ে বলেন—যে অবস্থায় উপনীত হলে লোকে শোক দুঃখ পায় না বা কোন মতেই আর পতিত হয় না, সেই অভয় অমৃত কৈবল্যপদই তাঁর কাম্য, এই বলে তিনি কুরুক্ষেত্র হতে এইস্থানে পৌঁছে তপোভূমি নর্মদার কোলে বসে তপস্যা করতে থাকেন এবং দেববিদ্যার সাহায্যে নির্বাণ পদ লাভ করে ঋষিত্বে উন্নীত হন। বেদমন্ত্র তাঁর কাছে প্রকট হয়েছিল।

মুদ্গল ঋষি ছাড়াও এই হাতনী সংগম আর একজন ঋষিরও সিদ্ধিক্ষেত্র। তিনি হলেন বেদের প্রসিদ্ধ মহিলা ঋষি বিশ্ববারা, অত্রি ঋষির কন্যা। ওঁকারক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি অত্রি ও অনসূয়ার সাধনগুহার নাম শুনে এসেছ। ঔর্বি সংগমের নিকটে ওঁকারের ক্ষেত্রে বিন্ধ্যপর্বতের গুহায় বসে তাঁরা তপস্যা করতেন। অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র, তাঁর চক্ষু হতে উৎপন্ন এবং সপ্তর্ষির মধ্যে অন্যতম। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৩৭-তম সূক্ত হতে ৪৩-তম এবং ৮৫-তম এবং ৮৬-তম সূক্তের সমূহ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি অত্রি। অথর্ববেদে অত্রির দৃষ্ট

মন্ত্রের প্রাধান্য খুব বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অত্রির জগদ্‌বিখ্যাত তিন পুত্রের নাম সোম, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয়। তিন পুত্রই যোগিকুলশিরোমণি এবং সমস্ত ঋদ্ধি-সিদ্ধির অধিপতি হলেও তাঁদের কাছে বেদমন্ত্র প্রকাশিত হয় নি অর্থাৎ তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন না; কিন্তু অত্রিঋষির দুই কন্যা বিশ্ববারা এবং অপালা দু জনেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।

হিন্দুর চোখে বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষির স্থান সর্বোচ্চে। ঋগ্বেদে অসংখ্য সূক্ত আছে, সেইসব সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিও অনেক আছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে মহিলা ঋষি আছেন মোটে সাতজন, যথা—অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা, অত্রিকন্যা বিশ্ববারা ও অপালা, কক্ষীবান ঋষির কন্যা ঘোষ সূর্যা ইন্দ্রাণী এবং অম্ভৃন ঋষির কন্যা বাক্‌।

এইখানে তপস্যা করতে করতে কোন সুদূর অতীতে হিরণ্ময় আকাশ ভেদ করে একদিন বিশ্ববারার কাছে প্রকট হয়েছিল ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ নম্বর সূক্তের ছয়টি মন্ত্র। এই ভয়ঙ্কর দুর্গম অরণ্যের মধ্যে বসে দৃঢ়তম একাগ্র নিষ্ঠায় উগ্রতম তপস্যা করেছিলেন এক নারী, একথা ভাবলেও গাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে।

তাঁর দৃষ্ট মন্ত্রগুলির দেবতা অগ্নি। আমি তাঁর প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র দুটি স্মরণ করছি শুন।

ওঁ সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙুষসমুর্বিয়া বিভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভির্দেবাঁ ঈলানা হবিষা ঘৃতাচী॥ ১

অর্থাৎ ঋষি বিশ্ববারা অনুভব করছেন, দিব্য যোগাগ্নি বা যজ্ঞাগ্নি প্রদীপ্ত হয়ে আকাশে দীপ্তি বিস্তার করেন এবং জ্ঞানময়ী উষার অভ্যুদয়ের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন; বিশ্ববারা পূর্বমুখী হয়ে দেবগণের স্তব উচ্চারণ পূর্বক হব্য পাত্র নিয়ে ব্রহ্মাগ্নির সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছেন।

এই মন্ত্রে পরম সাধনার সঙ্কেত ছাড়াও যাঁর কাছে বেদমন্ত্র প্রকট হয়, তখন তার কি রকম পরাবস্থা ঘটে, তারও আভাষ আছে।

তৃতীয় মন্ত্রটি হল—

অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু।
সং জাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ শত্রূয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি॥ ৩

হে অগ্নি! আমাদের বিপুল যোগৈশ্বর্য লাভের জন্য এই দিব্য যোগানুষ্ঠানের বাধাগুলিকে দমন কর, তোমার মহিমা সকল দিকেই উৎকর্ষ লাভ করুক। তুমি দাম্পত্য সম্বন্ধকে সুসংবদ্ধ কর এবং শত্রুগণের পরাক্রমকে আক্রমণ কর।

মন্ত্রটির শেষাংশে বিশ্ববারা জগতের সকল নরনারীর পবিত্র দাম্পত্য জীবনে শুচিতা ও সংযম এনে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি ও শৃঙ্খলা এনে দিবার জন্য অগ্নির কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

নর্মদা ও হাতনীর সংগমস্থলে নিমজ্জিত ডুংরির যেটুকু অংশ জলের উপর জেগে আছে, যার উপর একটা মোটা ত্রিশূল পোঁতা আছে আমরা গুরুপরম্পরা শুনে আসছি, ঐ স্থানেই দেবী বিশ্ববারার সাধন ক্ষেত্র। ঐ নিমজ্জমান ডুংরির মধ্যে এক বিরাট সুড়ঙ্গ আছে বলেও শোনা যায়। যে তপঃক্ষেত্রে দু দুজন বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি কোন এক যুগে বাস করতেন, তাকে ঋষিক্ষেত্র ছাড়া আর কি বলা যায়?

কপালীবাবা তাঁর ট্যাঁক থেকে পকেট ঘড়ি বের করে সময় দেখে নিলেন, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। তিনি সান্ধ্যকৃত্য করার জন্য তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন। যাঁরা অসুস্থ তাঁদেরকে বাইরে বসিয়ে আমরা নর্মদার তীরে সবাই মিলে বেড়াতে লাগলাম।

মনোরম পরিবেশে, এখানে ইতঃস্তত: কিছু বনস্পতি থাকলেও ঝোপঝাড় জঙ্গল আদি নাই বললেও চলে। ঝাড়ি-সুড়ং-এর জমাট অন্ধকার সম্বন্ধে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে তাতে সূর্যের আলো দেখতে পেলেই স্বস্তি; স্বস্তি হয় মানুষজনের মুখ দেখলে। ধর্মশালা, কপালীবাবার আশ্রম, শেঠদের ছত্র ছাড়াও দুজন মাড়বারবাসী এখানে একটি দোকান পেতে বসেছেন দেখলাম। সে দোকানে সূঁচ সুতা থেকে তেল নুন ঝাল মশলা গম ও বাজরার আটাও পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে এখানে বোধহয় শতখানিক লোক বাস করেন দেখলাম। এইজন্য পরিক্রমাবাসীদের পক্ষে এ স্থান বড় প্রিয়, দুর্ভেদ্য ঝাড়িপথ অতিক্রম করে এসে এখানে তাঁরা বিশ্রাম করতে পান; আহার্য বস্তুও তুলনামূলকভাবে সুলভ; সবচেয়ে স্বস্তির কথা, বিন্ধ্যাপর্বতের কোলে এই স্থানের দূরে দূরে জঙ্গল থাকলেও এখানে বাঘ ভালুক চিতার উপদ্রব তত নাই।

আমরা বেড়াতে বেড়াতে নিমজ্জিত ডুংরির উপরিস্থিত সেই ত্রিশূলকে

প্রায় একশ হাত দূরে নর্মদার তটে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে প্রণাম করলাম। মহাদেবী বিশ্বারার কথা স্মরণ করতেই গাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মোহান্তজী বললেন – কপালীবাবা বলে গেলেন বটে যে ঐ পবিত্র স্থান মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বিশ্ববারার তপস্যা ক্ষেত্র, তবে আমি গুরুদেবের মুখে শুনেছি ঐ স্থান মেরু-সাবর্ণ নামক একাদশ মনুর কন্যা স্বয়ংপ্রভা দেবীর তপস্যা ক্ষেত্র। বাল্মীকি রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে তাঁর সবিশেষ প্রসঙ্গ আছে। সন্ধ্যাদি সেরে তাঁর বিষয়ে সবিস্তারে বলব। তবে এমনও হতে পারে বৈদিক যুগে বিশ্ববারা ওখানে তপস্যা করেছিলেন, পরবর্তীকালে রামায়ণের যুগে স্বয়ংপ্রভা দেবী এই একই স্থানে তপস্যা করে থাকতে পারেন। একই স্থান বিভিন্ন যুগে উভয়েরই তপোক্ষেত্র হতে বাধা নাই। এখন আমরা ফিরে যাই চল।'

আমরা ধর্মশালায় ফিরে আসার পর জল গরম করে আমি যতীন্দ্র ও লক্ষ্মণভারতীজী তিনজনে রোগীদের পায়ে গরম জলের সেঁক দিয়ে মলম লাগিয়ে বড়ি খাইয়ে দিলাম; তাঁদের পায়ের ক্ষত শুকোতে আরম্ভ করেছে। গায়ে পায়ে ব্যথার জন্য আমরাও একটি করে বড়ি খেলাম। মোহান্তজী সান্ধ্য-ক্রিয়া সেরে আমাদেরকে স্বয়ংপ্রভা দেবীর গল্প বলার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি বলতে সুরু করলেন—ব্রহ্মা ও গায়ত্রী হতে প্রথম স্বায়ম্ভুব মনুর উদ্ভব ঘটে। তাঁর পত্নীর নাম শতরূপা, এদের তপস্যাক্ষেত্র ছিল নৈমিষারণ্যে। মনু-শতরূপার পুত্রকন্যা হতে মানবজাতির বিস্তার। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চার যুগের সহস্র যুগে (অর্থাৎ সর্বমোট চার সহস্র যুগে) ভগবান ব্রহ্মার একদিন। ঐ এক ব্রহ্মদিবসে চৌদ্দজন মনু জন্মগ্রহণ করেন। ঐ এক এক মনুর অধিকার কালকে মন্বন্তর বলা হয়। এক এক মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মনু, সপ্তর্ষিগণ, দেবগণ ইন্দ্র ও মনুপুত্ররা আবির্ভূত হন। মন্বন্তরের কাল পূর্ণ হলেই দেবতা, সপ্তর্ষি, ইন্দ্র, মনুপুত্ররা সকলেই বিলুপ্ত হন এবং নূতন করে অন্য মনু, দেবতা ইত্যাদির উদ্ভব হয়। সকল মন্বন্তরেই সপ্তর্ষিরা ধর্মের ব্যবস্থা ও লোকরক্ষার জন্য এসে থাকেন। প্রত্যেক চতুর্যুগের অবসানে বেদ বিপ্লব হয়। তখন সপ্তর্ষিরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে আবার বেদ প্রচার করেন। চতুর্দশ মনুর অধিকার কালকে এক কল্প বলে। চৌদ্দজন মনুর নাম—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবতঃ, চাক্ষুষ,

বৈবস্বত, সার্বর্ণি, রৌচ্য, ভৌত্যঃ, মেরুসাবর্ণি, ঋভু, ঋতুধামা এবং বিষ্বক্‌সেন। রৌচ্য ও ভৌত্যঃ মনুর অপর নাম যথাক্রমে দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি। আর শেষোক্ত তিনজন মনুর অপর নাম যথাক্রমে রুদ্রসাবর্ণি, দেবতাসাবর্ণি এবং ইন্দ্রসাবর্ণি। প্রত্যেক মনুই প্রজাপতি, তাঁরা প্রত্যেকেই মানবধর্ম শাস্ত্র প্রণেতা এবং সংহিতাকার। এখন পৃথিবীতে চলছে বৈবস্বত মনুর অধিকার, তিনি বিবস্বাণ্ বা সূর্যের পুত্র। স্বয়ংপ্রভা দেবীর পিতা মেরুপর্বতে প্রসূত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল মেরুসাবর্ণি।

বাল্মীকি বর্ণনা করেছেন, সুগ্রীবের আদেশে হনুমান অঙ্গদ সুষেণ জম্বুবান নল নীল প্রভৃতি প্রধান বানরগণ সীতান্বেষণে গিয়ে 'সশৈলবনকাননান' সর্বত্র অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে ঋক্ষবিল নামে এক প্রকাণ্ড গুহা মধ্যে প্রবেশ করেন। সেই গুহার চারদিকেই জল, দূর থেকে প্রকাণ্ড বিল বলে তাঁদের মনে হয়েছিল, এখন সেখানে নর্মদা গর্ভে নিমজ্জিত ছোট পাহাড় ও সুবৃহৎ ত্রিশূলটি দেখছি, রামায়ণ বর্ণিত ঋক্ষবিলের পরিবেশের সঙ্গে এখানকার পরিবেশ মিলে যাচ্ছে কিনা দেখ। বাল্মীকি কী সুন্দর ভাবে বিন্ধ্যপর্বত এবং তৎসন্নিহিত ভয়ঙ্কর বনের বর্ণনা দিয়েছেন, নিজেদের অভিজ্ঞতা হতে বুঝ, তাঁর বর্ণনা এতদিন পরেও কিরকম বাস্তব।

> বিচিনোতি চ বিন্ধ্যস্য গুহাশ্চ গহনানি চ॥
> সিংহশার্দ্দূলজুষ্টাশ্চ গুহাশ্চ পরিতস্তদা।
> বিষমেষু নগেন্দ্রস্য মহাপ্রস্রবণেষু চ॥

বিন্ধ্যপর্বতের প্রত্যেকটি গুহা, সিংহ শার্দ্দূল অধ্যুষিত গহন অরণ্য, দুই নদীর সংগমস্থল প্রস্রবনাদি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও বানরেরা সীতার সন্ধান পেলন না। এইসময় তাঁরা সহসা একটা বিরাট বিলের মধ্যে ঋক্ষবিল নামক গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন, প্রবেশ করেই তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লেন, কারণ সেই গুহা স্বর্ণপ্রভ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, সেখানকার তরুলতা সুদৃশ্য ভবনাদিও স্বর্ণময়—

> আপীড়েশ্চ সতাভিশ্চ হেমাভরণ ভূষিতান্
> তরুণাদিত্যসঙ্কাশান্ বৈদূর্যময় বেদিকান্॥

কিছুদূর থেকেই তাঁরা দেখতে পেলেন কৃষ্ণাজিনধারিণী তেজোময়ী এক তাপসীকে—তাঞ্চতে তে দদৃশুস্তত্র চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরাম্। এই অলৌকিক স্থানে পৌঁছে বিস্ময়াবিষ্ট বানরদের বাক্যস্ফূর্তি হল না। কেবলমাত্র বীর হনুমানই প্রণাম নিবেদন করে বিনম্রকণ্ঠে তাঁর এবং সেই স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন—'মা! আমরা সূর্যবংশোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের অপহৃতা পত্নী সীতার অন্বেষণ করতে করতে এখানে দৈবাৎ এসে পৌঁচেছি। ক্ষুধাতৃষ্ণায় জর্জরিত, এই গোলকধাঁধা সদৃশ সুড়ঙ্গ হতে নিষ্ক্রান্ত হতে পারছি না। আপনি দয়া করে আমাদেরকে আপনার পরিচয় দিন বহির্গমনের পথ দেখিয়ে দিন।' সেই তেজোময় তাপসী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—দুহিতা মেরু সাবর্ণেরহং তস্যাঃ স্বয়ংপ্রভা। আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা স্বয়ংপ্রভা, হেমা নামে এক স্বর্গ-অপ্সরার রূপে মুগ্ধ হয়ে ময়দানব এই হিরণ্ময় উপবন মায়াবলে সৃষ্টি করে হেমাকে নিয়ে দীর্ঘকাল এখানে আনন্দবিলাস করতে থাকে। পরে ইন্দ্র কর্তৃক ময়দানব নিহত হলে ব্রহ্মা হেমাকে এই বিশাল হিরণ্ময় ভবন ও হিরণ্যবনের অধিকারিণী করে দেন। আমি হেমার সখী, হেমারই অনুরোধে আমি এই এই পুরী রক্ষা করছি। এই মায়াপুরীতে প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য, দৈবাৎ কেউ প্রবেশ করতে পারলেও এখান হতে কারও বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তারপক্ষে এখানে বেঁচে থাকাও দুষ্কর—জীবতা দুষ্করং মন্যে প্রবিষ্টেন নিবর্তিতুম্। এখান হতে নিষ্ক্রান্ত হতে হলে বহু তপস্যার প্রয়োজন হয়। হনুমান সব শুনে সেই তপস্বিনীকে বহুভাবে কাতর মিনতি জানাতে লাগলেন। অবশেষে স্বয়ংপ্রভার দয়া হল। তিনি বানরদেরকে ফল-মূল ভোজ্যপানীয় দান করে বললেন—তোমরা নিজেদের হাতের আঙুল চোখে চাপা দিয়ে চোখ বন্ধ কর, খোলা চোখে কারও পক্ষে এই সুড়ঙ্গ হতে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়—ন হি নিষ্ক্রমিতুংশক্যম অনিমীলিত লোচনৈঃ। তাঁর আদেশানুসারে সকল বানর পুঙ্গব চোখ বন্ধ করতেই নিমেষকালের মধ্যে স্বয়ংপ্রভা তাঁদেরকে সুড়ঙ্গপথ হতে বাইরে এনে বললেন—এষ বিন্ধ্যো গিরিঃ শ্রীমান্নানাদ্রুমলতাযুতঃ, চোখ খুলে দেখ সামনেই নানা বৃক্ষলতা সমাকীর্ণ বিন্ধ্যপর্বত বিরাজ করছে। তোমাদের সকলের মঙ্গল হোক—

স্বস্তি বোহস্তু গমিষ্যামি ভবনং বানরর্ষভাঃ
ইত্যুক্তা তদ্বিলং শ্রীমৎ প্রবিবেশ স্বয়ংপ্রভা ॥

—বাল্মীকি, কিষ্কিন্ধ্যা ৫২ সর্গ

এইবলে তিনি সেই মহাবিলের মধ্যে প্রবেশ করে অন্তর্হিতা হলেন।

মোহান্তজীর গল্প শেষ হতে রাত্রি দশটা বেজে গেল। আমরা যে যার কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম। সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সেরে মন্দিরে গেলাম শিবপূজা করতে। মন্দিরে গিয়ে দেখি কপালীবাবা একটি প্রজ্বলিত তামার যজ্ঞকুণ্ড নিয়ে গিয়ে বৃষাকপি মহারুদ্রের উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন। আমাকে দেখে মন্তব্য করলেন—আমার কাছে এই হবনই পূজা। তিনি হবন শেষ করে ফিরে গেলেন আশ্রমে। আমি মন্দিরে বসে বসে তণ্ডিকৃত মহাস্তব পাঠ করতে লাগলাম। পাঠান্তে ধর্মশালাতে ফিরে এসে দেখি, মোহান্তজী দোতলায় বসে বসে ধর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক রূপা কাণ্ডারীর সঙ্গে গল্প করছেন। একটু পরেই নেমে এসে আমাদেরকে জানালেন—এখানে আরও তিনদিন বিশ্রাম করার ইচ্ছা। তার মধ্যেই আশা করছি অসুস্থ সকল নাগাই সুস্থ হয়ে উঠবেন, পূর্ণ চলৎশক্তি ফিরে পাবেন। কপালীবাবার আগ্রহাতিশয্যে তাঁর কাছে আজ ও কাল নিয়ে দুদিন আতিথ্য গ্রহণ করাই যথেষ্ট। ত্রিশজন লোককে নিত্য ভোজন করাতে তাঁর হয়ত অসুবিধা হবে না, তবে আমার বিবেকে লাগছে। তাই কাণ্ডারীজীর সঙ্গে কথা বলে বন্দোবস্ত করে এলাম, বাকী তিনদিন আমরা ছত্র হতে আটা ভিক্ষা করে নিয়ে এসে নিজেদের ভোজন বানিয়ে নিব। লছমন ভেইয়া তুমি আজ বিকালে কাণ্ডারীজীর সঙ্গে গিয়ে ছত্রে কথা বলে আসবে। তাঁর এই প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করলেন।

যথারীতি বেলা বারটা নাগাদ কপালীবাবার দুজন ব্রহ্মচারী এলেন আমাদেরকে নিয়ে যেতে। সেই একই রীতিতে তিনি আমাদেরকে যুক্তকরে আবাহন জানালেন। ছোট বড় নির্বিশেষে সকলকেই নমস্কার জানালেন এবং পরিতোষ সহকারে ভোজন করালেন। সকালেই তিনি হোম করেছেন, হোমের গন্ধে তাঁর আশ্রম ভরপুর। আমরা ধর্মশালায় এসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকলের মধ্যে নারায়ণদাস এবং হর

নর্মদে ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গেল। আমি জেগে দেখি কপালীবাবা আসছেন, তাঁকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। তিনি এসেই বললেন আগামীকাল মহাষ্টমী ১৯শে আশ্বিন, মঙ্গলবার। আপনারা কেউ মহাষ্টমী উপলক্ষ্যে হোম করতে চাইলে আমার দ্বিতীয় যজ্ঞকুণ্ডে গিয়ে হোম করতে পারেন। আশ্রমে ঘি-এর অভাব নাই। সাত আট জন নাগা তদ্দণ্ডেই রাজী হয়ে গেলেন, দুজন পণ্ডিতও বললেন—পরিক্রমা করতে এসে বেলকাঁটা ফুটে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছি। আপনার দয়ায় হোমের সুযোগ পেলে হোম ও চণ্ডীপাঠ ত করবই, কালকে উপবাসও করব। তবে আপনার আশ্রমে পৌঁছব কি করে ভাবছি। যতীন্দ্রজী তাঁদেরকে বললেন—আপনাদের পায়ের ক্ষত ত শুকিয়ে গেছে বললেই হয়। অল্প স্বল্প হাঁটতেও পারছেন, আমি এবং আরও তিন চার জন নাগা আপনাদের দুজনকে ধরে ধরে ওঁর আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে আসব। মোহান্তজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাঙ্গালীবাবা মহাষ্টমীর দিনে তোমার প্রোগ্রামটা কি, তুমিও হোম চণ্ডীপাঠ উপবাসাদি করবে নাকি?

—কদাচ নয়, আমি ঐসব মানি না। রাম দুর্গাপূজা করেন নি, বাল্মীকি রামায়ণে রাম দুর্গাপূজা করেছিলেন এ রকম কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। মহর্ষি বাল্মীকি রামচরিত্র অঙ্কন করেছেন, অথচ তিনি যে ঘটনা জানেন না, তামাম হিন্দুস্থানের লোক বোধহয় ধ্যানযোগে তা জেনে ফেলেছেন। রামচন্দ্র লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে বসে অকালবোধন করে দুর্গাপূজা, নবরাত্রির ব্রত-পালন মহাষ্টমীতে হোম এবং চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি করেছিলেন, তাই ধরে নিয়েই অধিকাংশ হিন্দু এইসব করে থাকেন। মহাষ্টমীই মানছি না যখন, তখন উপবাসের কোন প্রশ্নই আসে না।

আমার অসময়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় এমনিতে মেজাজ ভাল ছিল না। আমি আশা করছিলাম কপালীবাবা হয়ত কোন প্রতিবাদ করবেন কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। আমার দিকে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা করতে লাগলেন যথা শূলপাণির ঝাড়ি ও হাপেশ্বর জঙ্গলের ভয়ংকর পথের কথা, এখানকার জলবায়ু, বর্ষা ও শীতে দুর্নিবার কষ্ট ইত্যাদির কথা। এই সুযোগে মোহান্তজী তাঁকে বললেন—আপনার আতিথ্যে আমরা মুগ্ধ। দুদিন ত আপনার কাছে শ্রদ্ধাভরে ভিক্ষা নিলাম। কাল থেকে আমাদেরকে ছত্র থেকে ভিক্ষা করে আনতে দিন, ত্রিশ

জন লোক নিয়ে আপনার আশ্রম থেকে দিন দিন ভিক্ষা গ্রহণ করতে বিবেকে পীড়া দিচ্ছে। কপালীবাবা তাঁর প্রস্তাব কিছুতেই শুনবেন না কিন্তু মোহান্তজী বিনম্রবাক্য অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে নিরস্ত করলেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে একটা রফা হল যে তাঁর আশ্রম থেকে দুধ গ্রহণ করতেই হবে। প্রায় পাঁচটা নাগাদ কপালীবাবা তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন। আমরা বেড়াতে বেরোলাম। বেড়িয়ে ফিরে এসে নর্মদাস্পর্শ করে যে যার সান্ধ্যক্রিয়া করতে বসলাম।

তার পরদিন মহাষ্টমীর সকালে দুজন পণ্ডিতকে স্নান করিয়ে যজ্ঞার্থী নাগাগণ সকাল সাড়ে ৬-টায় তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন কপালীবাবার আশ্রমে। লক্ষ্মণভারতীজী কয়েকজন নাগা এবং যতীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন ছত্রে। এই ফাঁকে মোহান্তজী আমাকে বললেন—বাবা! কোটেশ্বরের মন্দিরে তুমি সন্ন্যাসীদেরকে যে কারণে বেইমান বলে ধিক্কার দিয়েছিলে তা শুনে আমার মনে কোন আঘাত লাগে নি, বরং চৈতন্যের উদয় হয়েছে। আমি আশৈশব বাবার খুব অনুরক্ত ছিলাম, বাবাকে ছেড়ে দু'দণ্ডও থাকতে পারতাম না, বাবাও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। অযোধ্যা আমার জন্মস্থান। আমরা সরযূপারীণ ব্রাহ্মণ। বাবা খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই রকম স্নেহময় পুত্রবৎসল পিতা কমই হন। তিন বৎসর বয়সে মাকে হারিয়েছিলাম। পিতার স্নেহযত্নে মায়ের অভাব আমি কোনদিন বুঝতে পারি নি। আমাদের বাড়ী হতে বেশ খানিকটা দূরে ছিল সংস্কৃত পাঠশালা। পাঠশালা হতে ফিরতে দেরী হলে বাবা অস্থির হয়ে পড়তেন। উনিশ বৎসর বয়সে ব্যাকরণের আচার্য পরীক্ষা দিই। তার কিছু পরেই নিমুনিয়া রোগে বাবার দেহান্ত হয়। সংসারের একমাত্র সহায় ও আকর্ষণ পিতাজীকে হারিয়ে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। একরাত্রে আমি গৃহত্যাগ করি। নানাতীর্থে ঘুরতে ঘুরতে আমি জব্বলপুরে এসে পৌঁছি, সেখানেই নর্মদার তটে গুরুদেবের দর্শন পাই। সেই থেকে আমি সন্ন্যাসী, আজ আমার শরীরের বয়স ৬৯, আজ পর্যন্ত আমি সেই স্নেহময় পিতাজীর মুখখানি ভুলতে পারি নি। বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নিয়েছি, গুরু আমাকে গদীর ভার দিয়ে গেছেন, তাঁর সেই ভার সাধ্যমত বহন করছি, সাধ্যমত তাঁর সংঘের সেবা করছি। কিন্তু বিরজা হোমের সঙ্গে সঙ্গে মাতাপিতার সঙ্গে

শুধু সম্পর্ক ছিন্ন নয়, তাঁদের ঔর্ধদেহিক কার্য বা তাঁদেরকে স্মরণ মননের যে শাস্ত্রসম্মত বিধি আছে তাও জলাঞ্জলি দিতে হয়, সন্ন্যাসের এই বিধিকে আমি কোনদিন সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারি নি। সেদিন কোটেশ্বর মন্দিরে শাশ্বতী মায়ের সঙ্গে তোমার কথা শুনে আমার মনে দোলা লেগেছে। গদীর মোহান্ত হওয়ার ফলে প্রকাশ্যে হয়ত শ্রাদ্ধ তর্পণ-পিণ্ডার্পণাদির কাজ করতে পারব না, সন্ন্যাসের রূঢ় ও শুষ্ক-বিধি-বিধান হয়ত আজীবন মেনে চলতেই হবে। কী করব। এই হয়ত আমার বিধিলিপি। তবে তোমার যুক্তি অনুসারে পিতার পুণ্যস্মৃতি স্মরণ মননের জন্য তর্পণাদি করতে আমার ইচ্ছা হয়। বিরজা হামের নামে একদিন পিতৃপুরুষের নামে কিঞ্চিৎ আহুতি দিলেই তাঁদের প্রতি সব দায় ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায়, একথায় অন্তর সায় দেয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে হয়ত শুধু নিজেরই মুক্তি নয়, পিতৃপুরুষদেরও সদ্‌গতি হয়, কিন্তু কয়জন সন্ন্যাসীরই বা ভাগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের অমৃত লাভ ঘটে? তাই বলছি তুমি বেদসম্মত পিতৃতর্পণের বিধি আমাকে লিখে দিও. আজ চল নর্মদার ঘাটে, আমাকে পিতৃতর্পণ করাবে. ধীরে ধীরে মন্ত্রোচ্চারণ করে মোটামুটি অর্থও বলে দিও।

উৎফুল্ল মনে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নর্মদার ঘাটে গেলাম। উভয়ে স্নান করার পর আচমনাদি করে তীর্থপতি বৃষাকপি এবং মা নর্মদাকে প্রণাম করে নাম ও গোত্র উচ্চারণ করে করে আমি যেমন আমার পিতা ও মাতার উদ্দেশ্যে চোখের জল ফেলতে ফেলতে অঞ্জলি দিলাম, মোহান্তজীও আমার মন্ত্র শুনে শুনে তাঁর পিতামাতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন। আমি খুব ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলাম। পিতাকে স্মরণ করে যখন তিনি অঞ্জলি দিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে কান্নায় ফেটে পড়তে দেখলাম। প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্র 'উর্জ্জং বহন্তী অমৃতং' মন্ত্রটির অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করেও তর্পণ করলাম। তারপর আরম্ভ করলাম দিব্য পিতৃতর্পণ—

ওঁ সোমসদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। সোমপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। হবির্ভুজঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম॥

নামগুলির ব্যাখ্যা শোনাতে লাগলাম—'যে সোমে জগদীশ্বরে পদার্থ-বিদ্যায়াঞ্চ সীদন্তি তে সোমসদঃ।' অর্থাৎ যাঁরা পরমাত্মা এবং পদার্থবিদ্যা

বিষয়ে নিপুণ তাঁরা সোমসদঃ। 'যৈরগ্নেবিদ্যুতো বিদ্যা গৃহীতা তেঽগ্নিষাত্তাঃ' যাঁরা অগ্নি বা বিদ্যুৎ প্রভৃতি পদার্থের জ্ঞাতা তাঁরা অগ্নিষ্বাত্ত। 'যে বর্হিষি উত্তমে ব্যবহারে সদন্তি তে বর্হিষদঃ', যাঁরা উত্তম বিদ্যা বুদ্ধিযুক্ত কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁরা বর্হিষদ। যে সোমৈশ্বর্যমোষধিরসং বা পান্তি পিবন্তি বা তে সোমপাঃ', যাঁরা ঐশ্বর্যের রক্ষক এবং মহৌষধি রসপান দ্বারা রোগরহিত হন এবং যাঁরা ঐশ্বর্যরক্ষক ঔষধ অন্যকে প্রদান করে রোগমুক্ত করেন তাঁরা সোমপা। 'যে হবির্হোতুমত্তুমর্হং ভুঞ্জতে ভোজয়ন্তি বা তে হবির্ভুজঃ,' যাঁরা মাদক পদার্থ এবং হিংসালব্ধ দ্রব্য পরিত্যাগ করে ভোজন করেন, তাঁরা হবির্ভুজ। 'যে আজ্যং জ্ঞাতুম্ প্রাপ্তুং বা যোগ্যং রক্ষন্তি বা পিবন্তি ত আজ্যপাঃ,' যাঁরা জ্ঞাতব্য বস্তুর রক্ষক এবং যাঁরা ঘৃত দুগ্ধাদির সেবন করেন, তাঁরা আজ্যপা। 'শোভনঃ কালো বিদ্যতে যেষাং তে সুকালীনঃ' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ধর্মানুষ্ঠান ও যজ্ঞাদির দ্বারা যাঁদের সময় সুখময় আনন্দময় হয়, তাঁরা সুকালীন ইত্যাদি।

এইভাবে মোটামুটি সরল অর্থ বলে আমি মোহান্তজীকে বললাম, ঐ শব্দগুলির আরও নানারকম গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, আমি সেগুলি খাতায় লিখে দিব। এখন বাকী ক্রমগুলি সেরে উঠে যাই চলুন। বেশীক্ষণ ঘাটে থাকলে আপনার খোঁজে বা এতক্ষণ আমার সঙ্গে কি করছেন তা জানার কৌতূহলে নাগারা এদিকে পৌঁছে যেতে পারে।

তর্পণ শেষ করে আমরা উঠে গেলাম ধর্মশালায়। এসে দেখি লক্ষ্মণভারতীজী ছত্র হতে প্রয়োজনীয় খাদ্য সম্ভার এনে রূপা কাণ্ডারীর সাহায্যে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে লিট্টি পাকাতে বসে গেছেন। ৬ জন নাগা তাঁকে এ কাজে সাহায্য করছেন। আমি ও মোহান্তজী মন্দিরে গেলাম শিবপূজা করতে। বোধহয় বারটা নাগাদ কপালীবাবা ৪০টা মাটির সরাসহ প্রচুর দুধ সর নিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর ব্রহ্মচারী শিষ্যরা দুধ বয়ে এনেছেন। তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধে মোহান্তজী তা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। যেসব নাগা তাঁর আশ্রমে মহাষ্টমীর হোম করতে গেছেন তাঁদের হোম এখনও শেষ হয়নি। পণ্ডিতজীদের চণ্ডীপাঠ তখনও চলছে। তাঁরা ত সবাই আজ উপবাসী থাকবেন, কাজেই তাঁদের জন্য আর অপেক্ষা না করে আমরা ভোজনপর্ব শেষ করলাম।

বেলা প্রায় ৩টায় অষ্টমীর ব্রতধারীরা ফিরলেন। তার ঘণ্টাখানিক পরেই এলেন কপালীবাবা। তাঁর কপালে আজ 'যজ্ঞশেষ ফোঁটা'। আমরা শুয়ে বসে সময় কাটাচ্ছিলাম, তিনি আসতেই আমরা উঠে দাঁড়ালাম, মোহান্তজী অভ্যর্থনা করে তাঁর জন্য আজ পৃথক একটি মৃগচর্ম পেতে দিলেন। কম্বলের উপর এই মৃগচর্ম পেতে তিনি নিজে জপ ও সান্ধ্যকৃত্য করে থাকেন। আসনে বসেই তিনি অনুযোগ করতে লাগলেন, আপনারা অহেতুক আজ রুটি পাকানোর ঝঞ্ঝাট করলেন। মোহান্তজী বললেন—আপনারই অনুপ্রেরণায় আপনার শিষ্য গুজরাটের শেঠরা এই ছত্র স্থাপন করেছেন, একথা আমি শুনেছি। কাজেই ছত্র হতে আটা আনা মানে ভোজ্যবস্তু আপনার ভাণ্ডার থেকেই এসেছে। তাছাড়া আপনার আশ্রম থেকে এসেছে প্রচুর দুধ। কাজেই এ নিয়ে আপনার কোন ক্ষোভ থাকা উচিত নয়। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—বাঙালীবাবা! তোমার মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমাকে কোন প্রশ্ন করতে উদগ্রীব হয়েছ। আজ কিন্তু আমি তোমাকে আগেই একটি প্রশ্ন করছি। আমাদের এই দেশের নাম ভারতবর্ষ কেন বলতে পার? ভারতবর্ষ নাম হওয়ার পূর্বে আর কোন নাম ছিল কি? সবিস্তারে সব বলে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি কর।

—চন্দ্রবংশীয় রাজা ভরতের নামানুসারে আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমির নাম হয়েছে ভারতবর্ষ। ভরতের পূর্বে এদেশের নাম ছিল ব্রহ্মাবর্তবর্ষ।

রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে কণ্বমুনির আশ্রমে ভরত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুষ্মন্তের পর ইনি রাজা হয়ে তৎকালীন সকল নৃপতিবর্গকে পরাজিত করে ভরত সার্বভৌমত্ব লাভ করেন। ইনি যমুনাতীরে একশ, সরস্বতী তীরে তিনশ এবং গঙ্গাতীরে চারশ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। পরে আবার সহস্র অশ্বমেধ এবং শত রাজসূয় যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করেন। এগুলি ছাড়াও অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উকথ্য বিশ্বজিৎ এবং সহস্র বাজপেয় যজ্ঞেরও অনুষ্ঠাতা ছিলেন মহারাজ ভরত। প্রজাপালন, প্রজার হিতকর বহুবিধ কল্যাণমূলক কাজ ছাড়াও সারাজীবন ধরে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ইনি জীবন অতিবাহিত করেন। বিদর্ভরাজের তিন কন্যাকে ইনি বিবাহ করেন। ইনিই বৃহস্পতি পুত্র ভরদ্বাজকে পালন করেছিলেন। প্রবল

প্রতাপান্বিত রাজা হিসাবে আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র দেশকে নিজের শাসনাধীনে আনতে পেরেছিলেন। মহারাজ ভরতের নবম বংশধর কুরু, তাঁর চতুর্দশ বংশধর শান্তনু। এই শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য এবং চিত্রাঙ্গদের ক্ষেত্রজ পুত্রদের বংশধররাই পাণ্ডব ও কৌরব নামে বিখ্যাত।

এইবার আপনাকে আমি প্রশ্ন করি, কৃপা করে অনুমতি দিন।

—বড়ি খুশীসে পুছিয়ে।

—আপনি সেদিন মোহান্তজীকে ভিক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসে বলেছিলেন, মা সরস্বতীর দয়ায় আপনার ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নাই। অমরকণ্টক হতে এ পর্যন্ত পরিক্রমা করে আসতে আসতে প্রত্যেক মহাজনের মুখে শুনেছি 'নর্মদা মায়ী কি দয়াসে', আবার কেউ কেউ বলেছেন 'গুরুকৃপাসে', এই যেমন আমি বলি 'বাবার দয়ায়, পিতাজীকী কৃপাসে।' মা সরস্বতীর দোহাই দিতে কাউকে দেখিনি। আমার জানতে ইচ্ছা করে আপনার এই মা সরস্বতীটি কে? কি তাঁর স্বরূপ পরিচয়! তিনি কি আপনার ইষ্টদেবী?

—ইষ্টদেবী ত জরুর! আমি তার স্বরূপের নিশ্চয়ই পরিচয় দিব। তার আগে বাবা, আর একটু কষ্ট করে বল দেখি সরস্বতী সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা? মোহান্তজী বলেছেন তুমি নাকি তোমার পিতাজীর কাছে বেদের পাঠ নিয়েছ। বেদে কোথায় সরস্বতী দেবীর উল্লেখ আছে?

—বাবার মুখে শুনেছি, সরস্বতী জ্যোতিঃ (প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ) এবং রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সরস্বতী—স, রসবতী। 'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ রসস্বরূপ পরব্রহ্মের তিনি পরম প্রকাশ। তাই রসবতী শব্দের পূর্বে 'স' ব্যবহার করা হয়েছে, 'সা' নয়। অথচ ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'সা' শব্দ প্রয়োগ করাই উচিত ছিল।

পুরাণকাররা সরস্বতীকে নিয়ে অনেক উপাখ্যান সৃষ্টি করেছেন, যেমন ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণে আছে, সৃষ্টিকালে প্রধানা শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পাঁচভাগে বিভক্ত হন—রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী। সরস্বতী কৃষ্ণকণ্ঠ হতে উদ্ভূতা। শ্রীকৃষ্ণ এই দেবীকে প্রথমে পূজা করেন। সেই হতে এই দেবীর পূজা প্রচলিত হয়। দেবী শ্রীকৃষ্ণ হতে উদ্ভূতা হয়ে শ্রীকৃষ্ণকেই কামনা করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীকে নারায়ণ ভজনা করতে বলেন। লক্ষ্মী

এবং সরস্বতী দুজনেই নারায়ণের স্ত্রী। দেবী ভাগবত মতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। পুরাণকাররা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পুষ্টির জন্য যেভাবে দেবদেবীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তবে পুরাণকারদের প্রধান মতটি এই, পরমাত্মার মুখ হতে এক দেবীর আবির্ভাব হয়। এই দেবী শুক্লবর্ণা, বীণাধারিণী এবং চন্দ্রের শোভাযুক্তা, ইনি শ্রুতি ও শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কবি এবং বিদ্বানদের ইষ্টদেবতা, এই জন্য এঁর নাম সরস্বতী।

আমি পুরাণবর্ণিত সরস্বতীকে নয়, বৈদিক দেবতা হিসাবেই তাঁকে মান্য করি। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে ঋষি মধুচ্ছন্দা দৃষ্ট দশ, এগার ও বার নম্বর মন্ত্রে সরস্বতী দেবীর উল্লেখ আছে। ঐ ঋগ্বেদেরই ১৪২ সূক্তে ঋষি দীর্ঘতমা দৃষ্ট ৯ নম্বর মন্ত্রে সরস্বতী দেবীকে ইলা এবং ভারতী নামেও অভিহিত করা হয়েছে, যেমন—শুচির্দেবেষ্বর্পিতা হোত্রা মরুৎসু ভারতী। ইলা সরস্বতী মহী বর্হিঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ। এই মন্ত্রে ইলা সরস্বতী এবং ভারতীকে অগ্নির ত্রিমূর্তি হিসাবে বন্দনা করে বলা হয়েছে, চিরশুচি এবং দেবগনের মধ্যস্থা হোমনিষ্পাদিকা ভারতী, ইলা এবং সরস্বতী আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত হোন। বাবার কাছে শুনেছি, ভারতী স্বর্গস্থ বাক্‌দেবতা, ইলা পৃথিবীস্থ বাক্‌দেবতা এবং সরস্বতী অন্তরীক্ষস্থ বাক্‌দেবতা।

সরঃ শব্দের অর্থ জল; সরস্বতীর প্রথম অর্থ নদী এতে সন্দেহ নাই। যাস্কাচার্যও বলেছেন—তত্র সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবৎ এব তাবৎ চ নিগমা ভবন্তি। আর্যাবর্তে সরস্বতী নামে যে নদী ছিল (এখন লুপ্তপ্রায়), তাই প্রথমে সরস্বতী দেবী বলে পূজিত হয়েছিলেন। এই নদীতীরেই বৈদিক ঋষিদের আবাসস্থল ছিল। সারা বৎসর ধরে এই নদী তীরে নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করা হত এবং বেদধ্বনি হত বলে কালক্রমে সরস্বতী নদী পবিত্র মন্ত্রের দেবী বাক্‌দেবীরূপে রূপান্তরিতা হলেন। বেদমন্ত্রে সরস্বতীর এইভাবে মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে—পুণ্যতোয়া যজ্ঞময় তীরশালিনী সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করেন। মনোহর বেদবাক্য সকলের প্রেরণকর্ত্রী, সুন্দর স্তুতির উদ্বোধনকারিনী সরস্বতী যজ্ঞকে ধারণ করেছেন। ইনি আপন স্রোতরূপ পতাকা দ্বারা মহার্ণব প্রকাশ করেন।

বাক্‌দেবীরূপে এঁর মহিমা ঋষিরা এইভাবে প্রকাশ করেছেন—মানুষের হৃদয়কে পবিত্র ও নির্মল করেন, যিনি যজ্ঞশালিনী এবং অন্নদাত্রী সেই

সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ কামনা করেন। ইনি সুন্দর ও সত্যবাক্যের প্রেরণকর্ত্রী, ইনি সুবুদ্ধি ও সুমেধার উদ্বোধনকারিণী, যজ্ঞের ধারণকর্ত্রী। ইনি মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম পরমাত্মাকে চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করে থাকেন। ইনি সমুদয় নরনারীর হৃদয়ে জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করেন—

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥ ১মা৩সূ।১১

—সাধু! সাধু! বৈদিক সরস্বতীর যেভাবে মহিমা বর্ণনা করলে, তাতে খুবই পরিতৃপ্ত। আমার ইষ্টদেবী যিনি, তিনি কোনমতে পৌরাণিক সরস্বতী নন, বৈদিক সরস্বতীর সমূহ শক্তি ও মহিমা তাঁতে থাকলেও তিনি সম্পূর্ণতঃ বৈদিক ঋষিদের আরাধিত সরস্বতী নন। শৈবাগমতন্ত্রে যাঁকে সিদ্ধবিদ্যা ষোড়শী বিদ্যা বলা হয় সেই ষোড়শী বিদ্যা দেবীকেই আমি সরস্বতী বলি। শৈবাগম সাধকদের নিকট সাধারণ ভাবে ইনি বাণী বীণাপানি, বাক্‌দেবী, শুভ্রা, হংসবাহনা প্রভৃতি নামে পরিচিতা। পৌরাণিক সরস্বতী এবং বৈদিক সরস্বতীর সঙ্গে এঁর এইসব সাদৃশ্য থাকলেও ধ্যান ও মন্ত্ররহস্য সম্পূর্ণ পৃথক। এই দেবী নানাস্থানে নানাভাবে পূজিতা হয়ে থাকেন। দেবীর বহুরূপ বহুবাহন ও বহুলীলা। দেবী কখনও দ্বিভুজা কখনো চতুর্ভুজা আবার প্রয়োজনবোধে কখনো বা ষোড়শভূজা। প্রত্যেক রূপেই মন্ত্র যন্ত্র পৃথক পৃথক। ষোড়শী বিদ্যাদেবীর ষোলটি নাম, ষোল রকমের রূপ। সকলেরই মাথার উপর মন্দিরের মত উঁচু মুকুট। সকলেই ললিত মুদ্রাসনে আসীনা, একটি পা নীচু করে রেখেছেন, একটি পা আসনের দিকে গুটানো। সকলেরই দক্ষিণ হস্ত বক্ষোপরি বরমুদ্রায় স্থাপিত, বামহস্ত যোড়া এবং উঁচুতে তোলা। প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গীই গভীর ভাবের দ্যোতক, বিভিন্ন যোগরহস্যের সঙ্কেত-সূচক। আমি একে একে বর্ণনা করছি—

১। রোহিনী—সরস্বতীর ষোড়শ নামের প্রথম নাম রোহিনী। এঁর বাহন জলচৌকি, দেবী চতুর্ভুজা, দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই চক্র। দেবীর অপর নাম—'অজিতবলা।'

২। প্রজ্ঞপ্তী—সরস্বতীর দ্বিতীয় নাম। এঁর বাহন হংস। দেবী

ষড়ভূজা। তাঁর হাতে অসি কুঠার চন্দ্রহাস[১] ও দর্পণ। দেবীর অপর নাম 'ত্রিতারী।'

৩। বজ্রশৃঙ্খলা—সরস্বতীর তৃতীয় নাম। এই চতুর্ভুজা দেবীর বাহন হংস। হাতে পারিঘ[২] ও বৈষ্ণবাস্ত্র।

৪। কুলিশাঙ্কুশা—সরস্বতীর চতুর্থ নাম। এঁর বাহন অশ্ব। দেবী চতুর্ভুজা তাঁর ডান হাতে অসি এবং বাম হাতে ভূষণ্ডী[৩]। দেবীর অন্যান্য নাম যথাক্রমে 'মনোবেগা' 'মনোগুপ্তি' এবং 'শ্যামা'।

৫। চক্রেশ্বরী—সরস্বতীর পঞ্চম নাম। এঁর বাহন গরুড়। দেবী ষোড়শভুজা। উপরের দক্ষিণ ও বাম হস্তে শতঘ্নী[৪] এবং ১০ হাত মুষ্টিবদ্ধ। দুই হাত কোলে স্থিরভাবে পতিত এবং বাকী দুই হাতে বরদানের মুদ্রা।

৬। পুরুষদত্তা ভারতী—সরস্বতীর ষষ্ঠনাম। এঁর বাহন হস্তী। দেবীর দক্ষিণ হস্তে চক্র এবং বাম হস্তে শতঘ্নী। এঁর মুখমণ্ডল চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, পুরুষাকৃতি। দেহের গঠন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কোমর সিংহের মত সরু।

৭। কালী—সরস্বতীর সপ্তম নাম কালী। এই কালী দশমহাবিদ্যার কালী নন। এঁর বাহন বৃষ। দেবী চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও বাম হস্তে শতঘ্নী। দেবীর অপর নাম 'শান্তি।'

৮। মহাকালী—সরস্বতীর অষ্টম নাম। ইনি ও তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার মহাকালী নন। এই চতুর্ভুজা দেবীর কোন বাহন নাই। এঁর ডান হাতে যষ্ঠি এবং বাম হাতে শতঘ্নী। দেবীর অপর নাম অজিতা এবং সুরতারকা।

৯। গৌরী—সরস্বতীর নবম নাম, নবম স্বরূপ। এঁর বাহন বৃষ। দেবী

১। চন্দ্রহাস—প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্র। এটি একটি লৌহদণ্ডের মাথায় অর্ধ-চন্দ্রাকারে লৌহফলক। এর দৈর্ঘ্য বিস্তৃত, সম্মুখে চকচকে খুব সরু মুখ এবং মাথায় শিখা, নাতি পরিমিত লম্বা। এর কার্য পাতন ও ছেদন।

২। পরিঘ—লৌহমুখ বা লৌহকণ্টকযুক্ত মুদ্গর। কার্য—পিটন ও শায়িতকরণ।

৩। ভূষণ্ডী—প্রস্তর প্রক্ষেপক চর্মরজ্জুময় যন্ত্র, এর দ্বারা বড় বড় পাথর অতি দূরে নিক্ষেপ করা যায়; লৌহগুলিকা ক্ষেপন যন্ত্র।

৪। শতঘ্নী—একই সময়ে একশ সৈন্য হনন করা যায় বলে এই যুদ্ধাস্ত্রের ঐরূপ নাম। কণ্টকিত লৌহসার—মুদ্গর বা বড় হাতুড়ীর মত দেখতে, সুদৃঢ় এবং বর্তুল প্রমাণ চারহস্ত। মুষ্টিযুক্ত গদাযুদ্ধের বলগণ বা প্রয়োগকালীন আস্ফালন যেরূপ, এর বল্গণও সেইরূপ।

চতুর্ভুজা। এঁর দক্ষিণ হস্তে মঙ্গলঘট এবং বাম হস্তে যষ্ঠি। দেবীর মস্তকের মন্দিরাকৃতি মুকুটের বাম পার্শ্বে 'চন্দ্র'। দেবীর অপর নাম 'মানসী' ও 'অশোকা।'

১০। গান্ধারী---সরস্বতীর দশম নাম ও দশম স্বরূপ। এই চতুর্ভুজা দেবীর কোন বাহন নাই। এঁর ডান হাতে পরিখ অর্থাৎ লৌহকন্টকযুক্ত মুদ্গার আর ডান হাতে সীর (লাঙ্গলাস্ত্র), এর দুই স্থান বাঁকা। মুখ ও মূলাংশ লৌহবদ্ধ, সার্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ। এই মন্ত্রের কাজ আকর্ষণ ও নিপাতন। এই দেবীর অপর নাম 'চণ্ডা।'

১১। সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা সরস্বতীর একাদশ নাম, একাদশ স্বরূপ। এর বাহন বৃষ। দেবী অষ্টভুজা। দক্ষিণ হস্তে অসি, ত্রিশূল, ভল্ল (বর্শা বিশেষ)। কার্য—নিক্ষেপে ছেদন, নিপাতন ও শায়িত করণ।। বৈষ্ণবাস্ত্র এবং বাম হস্তে ব্রহ্মশির অস্ত্র[৫], তীর ও পাশ। মস্তকে মন্দিরাকৃতি বিরাট মুকুট। মুকুটের চতুর্দিকে অরণ্য। দেবীর অপর নাম 'জ্বালামালিনী' 'ভৃকুটি' (ভ্রূভঙ্গী বা ভ্রূকুটি)।

১২। মানবী—সরস্বতীর দ্বাদশ নাম। এঁর বাহন সাপ। চতুর্ভুজা দেবীর দুই হস্তে দর্পণ, এক হাতে যষ্ঠি এবং অপর হাত বরমুদ্রায় স্থাপিত। দেবীর অপর নাম অশোকা।'

১৩। বৈরাটা—সরস্বতীর ত্রয়োদশ নাম। এঁর বাহনও সাপ। দেবী চতুর্ভুজা। এঁর দুই হস্তে বৈষ্ণবাস্ত্র[৬] ও ভল্ল। দেবীর অপর নাম 'বৈরোটি'।

৫। ব্রহ্মশির—ব্রহ্মতেজ পূর্ণ অস্ত্র বিশেষ। এই অস্ত্র দ্রোণ তাঁর পুত্র অশ্বত্থামাকে দান করেছিলেন। অর্জুনও এই অস্ত্র মহাদেবের কাছ হতে পেয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অশ্বত্থামাকে নিহত করার জন্য অর্জুন ভীম ও যুধিষ্ঠির তাঁকে ঘিরে ফেলেন। অশ্বত্থামা ভয় পেয়ে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। অস্ত্র হতে কালান্তক যমের মত অগ্নি উদ্গত হতে থাকল। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জুন তাঁর ব্রহ্মশির অস্ত্র মোচন করে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করার চেষ্টা করলেন। তাঁর অস্ত্র প্রলয়াগ্নির মত জ্বলে উঠল। তখন নারদ ও ব্যাস ঐই দুজনকেই এই অস্ত্র প্রতিসংহার করতে বললেন। অর্জুন তাঁর অস্ত্র প্রত্যাহার করে নিলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা পারলেন না। মহা অব্যর্থ অস্ত্র পাণ্ডব-নারীদের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হল, উত্তরার গর্ভস্থ শিশু মারা গেল, পরে কৃষ্ণ তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন।

৬। বৈষ্ণবাস্ত্র—শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর প্রার্থনায় তাঁর পুত্র নরককে এই দিব্যাস্ত্র দান করেছিলেন। প্রাগজ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নরকাসুরের কাছে এই অস্ত্র পান। জগতে এই

১৪। অচ্ছুপ্তা—সরস্বতীর চতুর্দশ নাম। এঁর বাহন হংস। দেবী চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তে ভল্ল এবং বাম হস্তে বিজয়ধনু[৭]। দেবীর অপর নাম 'অনন্তবতী' ও 'অরুণা'।

১৫। মানসী—সরস্বতী দেবীর পঞ্চদশ স্বরূপ। এঁর বাহন সিংহ। দেবী চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তে ভল্ল ও কুঠার এবং বামহস্তে দর্পণ[৮] ও বিজয়ধনু। দেবীর অপর নাম 'কন্দর্পা'।

১৬। মহামানবী—সরস্বতীর ষোড়শ স্বরূপ। এর বাহন ময়ূর। চতুর্ভুজা দেবীর দক্ষিণহস্তে ভল্ল ও বামহস্তে চক্র। দেবীর অপর নাম 'নির্বাসী'।

ষোড়শী বিদ্যা সরস্বতীর এই ষোল রকমের দিব্যমূর্তি নিয়ে ভক্তের কাছে প্রকট হন। তাই তাঁর ষোড়শী রূপই আমাদের ধ্যানের ধন। তাঁর প্রত্যেকটি রূপের মন্ত্র যন্ত্র পৃথক পৃথক থাকলেও সব মিলিয়ে তাঁর যে দিব্যস্বরূপ, সরস্বতী বলতে আমি তাঁকেই বুঝি। মহর্ষি মুদ্গলের যেমন অতিথি দেখলেই অন্নবৃদ্ধি হত, তেমনি তাঁর তপস্যাক্ষেত্রে সরস্বতীদেবীর দয়ায় অতিথি এসে পৌঁছালেই আমার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে যায়। এই রহস্য কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। তাই বলেছিলাম—মা সরস্বতীর দয়ায় আমার ভাণ্ডারে কোন কিছুরই অভাব নাই। আজ এখন আসি সাড়ে পাঁচটা বাজে, অগ্নিহোত্রের সময় হয়ে এসেছে। তুমি একবার সময়মত আশ্রমে যেও। এই বলে তিনি তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন।

পরদিন সকালে উঠে নর্মদায় স্নান তর্পণাদি সেরে এসেই মোহান্তজীর সঙ্গে বৃষাকপির মন্দিরে গেলাম পূজা করতে। আমাদের আগেই অন্যান্য নাগারা

অস্ত্রের অবধ্য কেউ নাই। মহাভারতে পাই, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে ভগদত্ত এই অস্ত্র প্রয়োগ করলে শ্রীকৃষ্ণ এই অস্ত্র নিজ বক্ষে বহন করেন এবং তা বৈজয়ন্তীমালারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে লগ্ন হয়।

৭। বিজয়ধনু—দিব্যাস্ত্রবিশেষ। এই ধনুকের সাহায্যে ইন্দ্র দৈত্যদের জয় করেছিলেন। পরে ইন্দ্র এই ধনু পরশুরামকে দান করেন এবং এই ধনু দিয়েই পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয়দেরকে পর্যুদস্ত করেছিলেন।

৮। দর্পণ—মানসী নাম্নী সরস্বতী হস্তের এই দর্পণ নারীদের প্রসাধন যন্ত্র নয়। প্রাচীন ভারতের এটি একটি যুদ্ধাস্ত্র। দেখতে গোলাকৃতি, তার একদিকে হাতল। নানা সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এর কাঁচ তৈরী করা হত। এর দ্বারা শত্রুর চোখে আলো ফেলে তাকে অন্ধ করে দেওয়া হত এবং পিছনের দিকে অবস্থিত শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করা হত।

শিবপূজা করে গেছেন। আমরা পূজা করে যখন ধর্মশালায় ফিরে এলাম ছত্র থেকে আটা এনে লক্ষ্মণভারতীজী অন্যান্য কয়েকজন নাগাকে সঙ্গে নিয়ে লেট্টি তৈরী করার আয়োজন করছেন। আমি কপালীবাবার আশ্রমে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। বেলা দশটা বেজেছে। মোহান্তজী বললেন ভোজন প্রস্তুত হতে এখনও অনেক দেরী, চলনা আমিও তোমার সঙ্গে যাই। মহাত্মা রোজই আসছেন আমাদের কাছে। আশ্রমের সবকিছু একবার খুঁটিয়ে দেখে আসি চল। দুজনে গিয়ে তাঁর আশ্রমে পৌঁছতেই তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। তিনি সেইমাত্র যজ্ঞ করে উঠেছেন, বিশ্রাম করছেন। তিনি প্রথমেই তাঁর প্রাঙ্গনস্থিত দুটি যজ্ঞকুণ্ডের কাছে নিয়ে গিয়ে বুঝাতে লাগলেন অগ্নিহোত্রের জন্য কোন ধাতু অথবা মৃত্তিকা নির্মিত বেদী (যজ্ঞকুণ্ড) তৈরী করার নিয়ম হল, বেদীর উপরি ভাগ ধরে অথবা ষোল অঙ্গুলি পরিমাণ চতুষ্কোণ এবং ঐ পরিমাণ গভীর, নীচে তিন বা চার অঙ্গুলি পরিমাণ (চতুষ্কোণ) থাকবে অর্থাৎ উপরিভাগে যে পরিমাণ প্রশস্ত হবে, নিম্নভাগ তার এক চতুর্থাংশ হবে। এই নিয়মেই আমার এই যজ্ঞবেদী দুটি তৈরী করা হয়েছে। চন্দন, পলাশ অথবা আম্র প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাষ্ঠখণ্ড বেদীর পরিমাণে ছোট বড় করে যজ্ঞকুণ্ডের মধ্যে সাজাতে হয়। এখানে আমকাঠ দুর্লভ। চন্দনকাঠ ত সর্বত্রই সুদুর্লভ। এখানে পলাশগাছ প্রচুর। আমি পলাশকাঠ দিয়েই হোমের কাজ করি। অগ্নি স্থাপন করে তার উপর পুনরায় সমিধ (যজ্ঞকাঠ) চাপাতে হয়।

দুটি বিশেষ ধরণে প্রস্তুত বিভিন্ন আকারে কাঠের পাত্র দেখিয়ে বললেন—এটি প্রোক্ষণী পাত্র, আর একটি প্রণীতা পাত্র। যজ্ঞকালে এই প্রোক্ষণী ও প্রণীতা পাত্রে জল রাখতে হয়। একটি তাম্রকুণ্ড দেখিয়ে বললেন --এইটি আজ্যস্থালী, ঘৃত রাখবার পাত্র। এই তিনটি হল চমস, আহুতি দিবার যন্ত্র। তিনটি চমসই কাঠের তৈরী। ঘৃতপাত্রে ঘৃত রেখে প্রথমে একটু তাপ দিয়ে নিতে হয়। হোমকালে হস্ত প্রক্ষালনের প্রয়োজন হলে প্রোক্ষণী ও প্রণীতাতে রক্ষিত জল ব্যবহার করা হয়। যে যজ্ঞকুণ্ডটি কিঞ্চিৎ বড় সেটি দেখিয়ে তিনি বললেন—এইটি আমার অগ্নিহোত্রের কুণ্ড, এতে অপরকে হবন করতে দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়টি দেখিয়ে বললেন—এটি শিষ্যভক্ত ব্রহ্মচারীদের হবনের জন্য। গতকাল আপনাদের যেসব নাগা এবং

পণ্ডিতমশাইরা এসেছিলেন, তাঁরা এই কুণ্ডেই হবন করে গেছেন। প্রথমে হোম করতে হলেই ওঁ ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা। ভুবর্বায়বেঽপানায় স্বাহা। স্বরাদিত্যায় ব্যানায় স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরগ্নিবায্বাদিত্যেভ্যঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা।

এইভাবে অগ্নিহোত্রের প্রত্যেকটি মন্ত্র পাঠ করে এক একটি করে সশ্রদ্ধভাবে আহুতি দিতে হয়। অগ্নিহোত্র ছাড়া পিতৃযজ্ঞ এবং দেবযজ্ঞ নামে আরও দুটি ক্রিয়া আছে। পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ যাতে দেব অর্থাৎ বিদ্বান, ঋষি, যাঁরা অধ্যয়ন করেন সেইসকল আচার্য এবং পিতরঃ অর্থাৎ মাতা, পিতা, বৃদ্ধ জ্ঞানী এবং পরম যোগীদের সেবা করা। পিতৃযজ্ঞ দু'রকম—প্রথম শ্রাদ্ধ, দ্বিতীয় তর্পণ, শ্রাদ্ধ শব্দটি শ্রৎ ধাতু হতে নিষ্পন্ন, শ্রৎ শব্দের অর্থ সত্য। "শ্রৎ সত্যং দধাতি যয়া ক্রিয়য়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া যৎ ক্রিয়তে তৎ শ্রাদ্ধম্।" যে ক্রিয়া দ্বারা সত্যকে গ্রহণ করা যায় তাকে শ্রদ্ধা বলে এবং শ্রদ্ধাপূর্বক যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তার নাম শ্রাদ্ধ। জাগতিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন কর্ম করা হোক না কেন, তার মূলে যদি প্রাণভরা শ্রদ্ধা ও আকুতি থাকে তা শ্রাদ্ধে পরিণত হয়। আর তৃপ্যন্তি তর্পয়ন্তি যেন পিতৃন তৎ তর্পণম্' যে সকল কর্ম ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের দ্বারা বিদ্যমান মাতাপিতা প্রভৃতি পিতৃগণ তৃপ্ত অর্থাৎ প্রসন্ন হন এবং যে সকল ক্রিয়া দ্বারা তাঁদেরকে প্রসন্ন করা যায় তার নাম তর্পণ।

বেদে মাতা-পিতাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সেই মাতা-পিতা যখন জীবিত থাকেন তখন তাঁদের একান্ত অনুগত থেকে সর্বদা তাঁদের আদেশ পালন এবং সর্বতোভাবে তাঁদেরকে সুখে রাখতে পারলে তবেই পুত্রের কর্তব্য করা হয়। মাতা-পিতার মুখে হাসি ফুটাবার জন্য তাঁদের আনন্দজনক যেসব কর্ম পুত্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় সেগুলিও শ্রাদ্ধ তর্পণের নামান্তর।

এই সময় তাঁর কথার মধ্যেই বলে উঠলাম, যেসব পুত্র তা করে না, কেবল মাতা-পিতার মৃত্যুর পর লৌকিক সংস্কার বশে পিণ্ডার্পণ এবং তিল কুশ সহযোগে অঞ্জলি জল, স্বর্গস্থ মাতা-পিতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হল ভাবেন, তাকে কোনমতেই শ্রাদ্ধ তর্পণ বলা চলে না। বৈদিক ঋষিরা শ্রাদ্ধ তর্পণ বলতে একথা নিশ্চয়ই বুঝাতে চাননি। আমাদের বাংলাদেশের দুই

কবির দুইটি ছড়া বলছি ; তা শুনলেই বুঝবেন, শ্রদ্ধাহীন মমতাহীন তথা-কথিত শ্রাদ্ধ তর্পণের অভিনয়কে কিভাবে তীব্র কষাঘাত করা হয়েছে :

(১) জ্যান্তে দিলি না ভাত কাপড়
মরলে করবি দান সাগর !

(১) এখন আমি ক্ষুধার জ্বালায় করছি ছটফট,
মরলে আমার চিতায় তুমি গড়ে দেবে মঠ !!

—খুবই খাঁটি কথা বলা হয়েছে ঐ দুটি ছড়াতে। জীবিত পিতা-মাতার সর্ববিধ দৈহিক ও মানসিক তৃপ্তিসাধন এবং তাঁদের দেহান্ত হলে চিন্ময় বেদমন্ত্র সহযোগে নিত্য তাঁদের পুণ্য স্মৃতিচারণকেই যথার্থ অর্থে শ্রাদ্ধ তর্পণ বলা উচিত। পিতৃযজ্ঞের মত দেবযজ্ঞও বিবিধ। অগ্নিমুখে দেবতা ও বিদেহী পিতৃপুরুষগণ হব্য কব্য দুই গ্রহণ করেন বলে সায়ং-সন্ধ্যা দুবেলাই হবন করা কর্তব্য। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে (অথর্ব কাণ্ড ১৯।অনু ৭।মং ৩।৪)—

সায়ং সায়ং গৃহপতি র্নো অগ্নিঃ প্রাতঃ প্রাতঃ সৌমনসস্য দাতা ॥ ১
প্রাতঃ প্রাতর্গৃহপতি র্নো অগ্নিঃ সায়ং সায়ং সৌমনস্য দাতা ॥ ২

প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে যে হোম হয়, বাহ্যতঃ তার হুতদ্রব্য প্রাতঃকাল পর্যন্ত দূষিত বায়ুকে পরিশুদ্ধ করে হোতার পক্ষে সুখজনক হয় আর আধ্যাত্মিক অর্থে ঐ হুতদ্রব্যের তন্মাত্রা চিন্ময় মন্ত্রসংযোগে দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করে। আর প্রত্যহ প্রাতঃকালে অগ্নিতে যে হোম করা হয় তার হুতদ্রব্য সায়ংকাল পর্যন্ত বায়ুর শুদ্ধির দ্বারা একদিকে যেমন হোতার পক্ষে বল বৃদ্ধি এবং আরোগ্যজনক হয় তেমনি তাঁর উপাস্য দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের সন্তুষ্টি বিধান করে। এই জন্য দিন ও রাত্রির সন্ধিকালে অর্থাৎ সূর্যের উদয় ও অস্তকালে পরমেশ্বরের ধ্যান এবং অগ্নিহোত্র করা অবশ্য কর্তব্য বলে বেদ বিধান দিয়েছেন। বৈদিক ঋষিদের জীবন ছিল যজ্ঞময়, এক কথায় যজ্ঞে নিবেদিত জীবন। অগ্নিমুখে আহুতি প্রদান ছাড়াও দুঃস্থ ও আতুরদের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান, ব্যাপক অর্থে জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠানকেও তাঁরা যজ্ঞের মর্যাদা দিয়েছিলেন।

কপালীবাবার কথা শেষ হলে মোহান্তজী তাঁকে প্রশ্ন করলেন — বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি, ব্রাহ্মণদের ত্রিসন্ধ্যা করা কর্তব্য। অনেক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দেখেছি তাঁরা সকাল দুপুর সন্ধ্যা ত্রিকালেই 'সন্ধ্যা' করে থাকেন। কিন্তু এই বাঙালীবাবা কয়েকদিন আগে আমাকে বলেছিলেন—ত্রিসন্ধ্যা হয় না, প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল এই দুটি কালই সন্ধিকাল। বৈদিক বিধানে নাকি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যা করাই বিধি। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

—বাঙালীবাবা আপনাকে ঠিক কথাই বলেছেন, ত্রিকালে সন্ধি হয় না, তাই বেদ ত্রিসন্ধ্যার কথা বলেননি। তবে শৈবাগম শাস্ত্রে ত্রিকাল শব্দের প্রয়োগ আছে। সকাল দুপুর ও সন্ধ্যাকে ত্রিকাল বলে না। শৈবাগমের ঋষিদের কাছে 'ত্রিকাল' শব্দের অর্থ—কাল, অকাল ও কালাকাল এই তিনটি। সন্ধ্যার পর হতেই ত্রিকালের কার্য আরম্ভ হয়, যথা—

১। কাল—সন্ধ্যা হতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।
২। অকাল—রাত্রি ৮টা হতে ১০টা পর্যন্ত।
৩। কালাকাল—রাত্রি ১০টা হতে ১১টা পর্যন্ত।

এই তিনটি মিলিত হয়ে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তার নাম ত্রিকাল শক্তি। শৈবাগমের পরিভাষায় এর নাম 'আস্থা'। এরপর রাত্রি ১১৷৷০ টাকে 'আধার' বলে। কালাকালের অবস্থায় যখন আধার উৎপন্ন হয়, তখন ক্ষণ এসে যুক্ত হলে, যা আবির্ভূত হয় তার নাম 'মহামহাক্ষণ'। মহানিশার ক্ষণ অর্থাৎ মহামহাক্ষণ হতেই যোগীর দিবসের সূচনা হয়ে থাকে। এইজন্য মহামহাক্ষণকে ধারণ করা পূর্ণসিদ্ধির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। গুরুদত্ত মহাকর্ম ক্ষণ না ধারণ করতে পারলে কদাচ সিদ্ধ হয় না। মহামহাক্ষণ সহ অষ্টক্ষণের পরিচয় আমি দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা লিখে নিন—

১। মহামহাক্ষণ—রাত্রি ১১৷৷০টা হতে রাত্রি ১২টা।
২। মহাক্ষণ—রাত্রি ১২টা হতে রাত্রি ৩টা।
৩। ব্রাহ্মক্ষণ—রাত্রি ৩টা হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত।
৪। মায়াক্ষণ—সূর্যোদয় হতে বেলা ৮টা পর্যন্ত।
৫। মোহমায়াক্ষণ—বেলা ৮টা হতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত।

৬। অভিশপ্তক্ষণ—মধ্যাহ্ন ১২টা হতে অপরাহ্ন ৩টা পর্যন্ত।

৭। দগ্ধক্ষণ—অপরাহ্ন ৩টা হতে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত।

৮। সন্ধিক্ষণ—ঠিক সন্ধ্যাবেলায় সূর্যাস্তের সময়।

নরদেহের পক্ষে পূর্ণতালাভের জন্য যোগ-লক্ষ্য স্থাপন, নিত্যকর্ম ও ক্ষণের আনুগত্য স্বীকার একান্তভাবে প্রয়োজন। নিজেকে সরল শিশুর ন্যায় ভাল-মন্দ বিচার না করে খুলে রাখা অর্থাৎ শ্রীভগবানের কাছে তুলে ধরাই যোগ-লক্ষ্য স্থাপন। এরজন্য ক্রিয়া করা দরকার। প্রথম অবস্থায় ক্ষণের চিন্তা রেখে ক্রিয়া করে যেতে পারলে যুক্তাবস্থায় আর চিন্তার প্রয়োজন থাকে না। তখন ক্ষণই ক্রিয়াবান সাধককে টেনে নিয়ে যায়।

এইবার তিনি আমাদেরকে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর পূজার ঘরে। এখানেও আছে একটি তামার যজ্ঞকুণ্ড। হোমের গন্ধে ঘরটি সুরভিত। তিনি বললেন এই যজ্ঞকুণ্ডে আমি সরস্বতী দেবীর ষোড়শী রূপের উদ্দেশ্যে হবন করি, ঘৃত মধু ও রক্তচন্দন দিয়ে। আমি পূর্বেই বলেছি, সরস্বতীর প্রত্যেকটি স্বরূপেরই পৃথক পৃথক বীজমন্ত্র আছে। প্রায় চারফুট দীর্ঘ ও তিনফুট প্রশস্ত একটি সুবৃহৎ তাম্রপাত্র দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো আছে, তাতে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত আছে রোহিনী, প্রজ্ঞপ্তী, বজ্রশৃঙ্খলা কুলিশাকুশা এবং চক্রেশ্বরী প্রভৃতি সরস্বতীর বিভিন্ন রূপ। প্রত্যেক স্বরূপের মধ্যে তাঁদের স্ব স্ব বীজমন্ত্র। প্রায় মধ্যস্থলে অঙ্কিত আছেন গৌরী। গৌরী স্বরূপের দক্ষিণ হস্তের মঙ্গলবট এবং তার মস্তকের মন্দিরাকৃতি মুকুটের বামপার্শ্বে অঙ্কিত চন্দ্র বড় উজ্জ্বল, মনে হচ্ছে শ্রীমূর্তিকে ঘিরে উজ্জ্বল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ যেন ঢল ঢল করছে। মনকে বড়ই আকর্ষণ করে। আমরা সরস্বতীর রহস্যময়ী ষোড়শী রূপের সিদ্ধ যন্ত্রকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম কপালীবাবার পূজার ঘর থেকে। বেরিয়ে এসেই তিনি আমাকে বললেন—'পরিক্রমায় এসে দীর্ঘদিন যাবৎ মাকে কোন পত্র লেখনি কেন? তিনি যে কেঁদে কেঁদে অস্থিচর্মসার হতে বসেছেন। সন্তানের জন্য মায়ের যে কি ব্যথা এবং নিরন্ত উদ্বেগ হয়, তা আর কারও পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। তিনি রাত্রে প্রায়ই ঘুমাতে পারছেন না। মা নর্মদার কাছে প্রতিনিয়ত তোমার জন্য প্রার্থনা করছেন। অবিরত চোখের জল ফেলায় পরে তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়তে পারেন।

আমি বললাম, চিঠি দিবার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। কিন্তু এই দুর্গম অরণ্য পথে আমার চোখে আজ পর্যন্ত কোথাও একটা ডাকঘর চোখে পড়েনি। কেবল অমরকন্টক হতে পরিক্রমা আরম্ভ করার আগের দিন অমরকন্টকে নর্মদা উদ্‌গম মন্দিরের নিকটস্থ সন্থস্থাপিত ডাকঘরে মায়ের নামে একখানা পত্র লিখে ফেলে এসেছিলাম। জানিনা তিনি সেই চিঠি পেয়েছেন কিনা। গত তিন বৎসরের মধ্যে তাঁকে আর কোন পত্র দিতে পারিনি। ইচ্ছা থাকলেও উপায় হয়নি।

—এখনও বারটা বাজেনি। ভিক্ষার এখনও দেরী আছে, আমি তোমাকে কাগজ কলম দিচ্ছি। তুমি এখানে বসেই মাকে পত্র লেখ। আমি সেই পত্র পাঠিয়ে দিবার ব্যবস্থা করব। আগামীকাল বিজয়া দশমী, তোমাদের বাংলাদেশে বিজয়া উপলক্ষ্যে খুব হৈচৈ হয়। মাকে বিজয়ার প্রণাম জানাতে ভুলো না।

আমি তাঁর পীড়াপীড়িতে মাকে আমার কুশল বার্তা জানিয়ে পত্র লিখে তাঁর হাতে দিলাম[১]। সাড়ে বারটায় ফিরে এলাম ধর্মশালায়, আসার পূর্বে

১। উত্তরতট পরিক্রমা সমাপ্ত করে আমি নর্মদার দক্ষিণ তটও পরিক্রমার শেষে পুনরায় অমরকন্টকে পৌঁছে নর্মদা-উদ্‌গম মন্দিরস্থ কোটি তীর্থের ঘাটে ১৩৬২ সালের ৩০শে আশ্বিন শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জলবিষুব সংক্রান্তির দিনে (ইং ১৭।১০।১৯৫৫) পরিক্রমা বিসর্জন দিই। অমরকন্টকে পাঁচ দিন বিশ্রাম করে বিলাসপুর থেকে ট্রেন ধরে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করি। কলিকাতা হতে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কালিয়াড়া গ্রামে গিয়ে বিজয়া দশমীর দিন বেলা প্রায় ১০ টার সময় স্বগৃহে পৌঁছে মাকে প্রণাম করি। গিয়ে দেখলাম মায়ের শরীর সত্যই অস্থিচর্মসার হয়েছে। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে বলেন, "এ বছর কার্তিক মাসে দুর্গাপূজা হল। আজ ৯ই কার্তিক বিজয়া, গত বৎসর আশ্বিন মাসে মায়ের পূজা হয়েছিল, ২১শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার বিজয়া দশমীর দিন সকালে বালিশের তলা থেকে আচম্বিতে তোর একটি চিঠি পাই। কি কাণ্ড হয়েছিল জানিস, আমার ত বাপু সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়েই বালিশের তলা থেকে দক্তার কৌটা হতে এক চিমটি দক্তা নিয়ে গালে ফেলা অভ্যাস। দক্তার কৌটা নিতে গিয়ে একটা খাম হাতে লাগল। আমি তোর দাদাকে ডেকে সেই খামটা কি, দেখতে বললাম। তোর দাদা বলল, 'এতো শৈলেনের চিঠি।' আমি ভাবলাম, এত সকালে চিঠি আসবে কি করে? এ চিঠি নিশ্চয়ই কাল এসেছে। বিন্টু বা খেতু (আমার দুই কনিষ্ঠ ভগ্নী) এ চিঠি আমাকে দিতে ভুলে গেছে। পরে রাত্রে মনে পড়তে চুপি চুপি আমার বালিশের তলায় রেখে গেছে। আমি তাদেরকে ডেকে বকতে লাগলাম। তোর দাদা বলল—মা তুমি ওদেরকে শুধু শুধু বকছো কেন? শৈলেনের এই চিঠির উপর কোন ডাকটিকিট নাই, ডাকঘরের কোন ছাপও নাই। তবে এ চিঠি কে দিয়ে গেল? যাইহোক তোর চিঠি পড়ে প্রাণ ফিরে এল। তোর হাতের লেখা দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। হ্যাঁরে তুই এই চিঠি কিভাবে কার হাতে পাঠালি? আমি

কপালীবাবা মোহান্তজীকে জানিয়ে দিলেন যে, আজ বিকালে তিনি আসতে পারবেন না। বেলা একটায় আমাদের ভোজন পর্ব শেষ হল। অনেকক্ষণ শুয়ে বসে বিশ্রাম করে আমরা প্রায় সকলে মিলে বেড়াতে বেরালাম। বেড়াতে বেড়াতে সকলেই কপালীবাবার বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁর আতিথেয়তা এবং সেবায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সবাই করলেন। পণ্ডিত কবিরাজ বললেন—ওঁকে আমার তান্ত্রিক বলেই মনে হয়। তান্ত্রিকদের অনেক ঋদ্ধিসিদ্ধি থাকে। তান্ত্রিক ক্রিয়ায় নানাবিধ কৃত্যা এবং যাতুধানী সৃষ্টি করা যায়। তাছাড়া তিনি ত নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন যে তিনি শৈবাগমতন্ত্র মতে উপাসনা করেন। আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, বাংলাদেশ আসামে প্রধানভাবে ভারতের অন্যান্য স্থানে তন্ত্রের নামে যেসব পঞ্চম-কারের ক্রিয়া কর্ম চলে, শৈবাগমতন্ত্র বলতে কোনমতেই সেই তন্ত্রকে বুঝায় না। শৈবাগম স্বয়ং শিবের মুখ নিঃসৃত সাধনোপদেশ। মহামুনি দুর্বাসা এর প্রবর্তক। শৈবাগমকে তন্ত্র বলা হয় এই কারণে যে তন্যতে বিস্তীর্যতে আত্মজ্ঞানং অনয়া। বেদবিদ্যার সাহায্যে যেমন আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় তেমনি শৈবাগমের সাধন-প্রণালী অনুসরণ করলেও বোধহয় তার চেয়ে দ্রুততর সময়ে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় কিংবা ঘুরিয়ে বলতে গেলে বোধহয়, এই বললেই ঠিক হয় যে বেদবিদ্যার practical এবং positive সাধনপন্থাই শৈবাগম। রতনলাল ভারতী মোহান্তজীকে জিজ্ঞাসা করলেন কৃত্যা বা যাতুধান বলতে কি বুঝায়?

মোহান্তজী পণ্ডিত কবিরাজকেই ঐ দুটি শব্দের অর্থ বলতে বললেন। পণ্ডিত-কবিরাজ জানালেন তন্ত্রমতে নানাবিধ আভিচারিক ক্রিয়ায় অপরের ক্ষতির জন্য একরকম অপদেবতা সৃষ্টি করা যায়। পূর্বকালে রাক্ষস বা

বললাম, আমারও এ রহস্য জানা নাই। হাপেশ্বরের জঙ্গলে হাতনী সংগমে কপালীবাবা নামে এক মহাপুরুষ তোমাকে পাঠাবার জন্য নবমীর দিন দুপুরবেলা আমাকে দিয়ে, জোর করে একটি চিঠি লিখিয়ে নেন। সেইদিন রাত্রেই (১৩৬১ সালের ২০শে আশ্বিন বুধবার, ইং ৬।১০।১৯৫৪) সেই চিঠি তোমার বালিশের তলায় কিভাবে পৌঁছে গেল, তা ব্যাখ্যা করতে পারব না। সৌভাগ্যক্রমে আমার পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণী এখনও জীবিতা। তিনি একথা অনেকের কাছে গল্প করেছেন। এখনও যে কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।—লেখক

দুর্ভাগ্য এই যে, বই প্রকাশের পূর্বেই আমার পরমারাধ্য পিতাশ্রী ও ঠাকুমার দেহান্ত হয়েছে।—প্রকাশক

দানবরা এই বিদ্যায় কৃতবিদ্য ছিল। বায়ুপুরাণের মতে এদের আকার অনেকটা কুকুর শকুনী বা অন্যান্য হিংস্র জন্তুর মত। রাক্ষস-রাক্ষসীর স্বরূপ নিয়েও এদের উদ্ভব ঘটতে পারে। বায়ুপুরাণে ১২জন যাতুধানের নাম পাওয়া যায়। এরা উৎপন্ন হয়ে তান্ত্রিক সাধকের ইচ্ছানুসারে যে-কোন অপকার্য করতে প্রবৃত্ত হয়।

আমাদের দলে অপর যে পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বললেন আপনারা শুনতে চাইলে মহাভারতের অনুশাসন পর্ব হতে আপনাদেরকে যাতুধানীর গল্প শুনাতে পারি। এখন সকলেরই গল্প করা এবং গল্প শোনার মেজাজ। আমরা সকলেই সোৎসাহে সম্মতি দিতেই পণ্ডিতজী গল্প আরম্ভ করলেন—

একবার কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীদেবী ব্রহ্মলোক লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করে পৃথিবী ভ্রমণ করছিলেন। পশুসখ নামে এক শূদ্র এবং তার স্ত্রী গণ্ডা এই ঋষিদের পরিচর্যা করত। সেইসময় অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্যাভাবে দেশের লোকরা নিরাতিশয় কষ্টে পড়েছিল। মহারাজ শিবির পুত্র শৈব্য-বৃষাদর্ভি এক যজ্ঞ করে ঋত্বিকগণকে নিজ পুত্রকেই দক্ষিণাস্বরূপ দান করে বসলেন। সেই পুত্রের অকালে মৃত্যু ঘটলে পূর্বোক্ত ঋষিগণ খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট হয়ে নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য সেই দান হিসাবে প্রাপ্ত শৈব্যপুত্রের দেহ অগ্নিতে পাক করতে থাকেন। তা দেখতে পেয়ে শৈব্য তাঁদেরকে এই নিষ্ঠুর কার্য ত্যাগ করতে বলেন, পরিবর্তে তাঁদের যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তা তিনি দিবেন এই অঙ্গীকার করেন। ঋষিরা বললেন, আপাততঃ রাজার এই দান গ্রহণ করলে সুখ হবে বটে কিন্তু পরিণামে দান গ্রহণের ফলে তাঁদের সমস্ত তপস্যা নষ্ট হবে তাঁরা সেই মৃতদেহের রন্ধন ত্যাগ করে প্রস্থান করলেন।

তখন রাজা তাঁর মন্ত্রীদের সাহায্যে বন থেকে উড়ুম্বর অর্থাৎ ডুমুর সংগ্রহ করে ঋষিদের দিতে থাকেন। কিছুকাল পরে রাজা ফলের মধ্যে সুবর্ণ ভরে পাঠাতে থাকেন। অত্রি সেই গুরুভার ফল সুবর্ণ পূর্ণ বুঝে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং সকলে অন্যত্র প্রস্থান করেন। এইভাবে দান প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় রাজা শৈব্য এক যজ্ঞ করে যাতুধানী নামে এক ভীষণা কৃত্যা (অপদেবী) সৃষ্টি করলেন। রাজা ঋষিদের ও তাঁদের দাসদাসীদের

নাম জিজ্ঞাসা করে করে সকলকেই হত্যা করতে যাতুধানীকে আদেশ দেন। যাতুধানী এক সরোবরে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র ঋষিদেরকে রক্ষা করার মানসে এক স্থূলকায় পরিব্রাজক রূপে ছদ্মবেশে এক হৃষ্টপুষ্ট সারমেয়কে সঙ্গে নিয়ে ঋষিদের পরিচর্যাভিলাষী হয়ে তাঁদের সঙ্গ নেন। ঋষিরা যাতুধানী রক্ষিত সরোবরে খাদ্যের জন্য পদ্মডাঁটা তুলতে গেলে যাতুধানী তাঁদের নাম এবং নামের অর্থ বলে সরোবরে নামতে বলে: ঋষিরা সকলেই নিজ নিজ নাম ও নামের অর্থ বললে, যাতুধানী তাঁদের প্রত্যেককে বলে তোমাদের নামের অর্থ আমাদের বোধগম্য হল না বটে কিন্তু তাহলেও তোমরা জলে নামতে পার। অবশেষে পরিব্রাজকবেশী ইন্দ্র বললেন যে তাঁর নাম শুনঃসখ। শুনঃসখ শব্দের অর্থ যম বা ধর্মের সখা। যাতুধানী এই অর্থ বুঝতে না পেরে তাঁকে পুনরায় নামের অর্থ বলতে বলল। তখন পরিব্রাজক বললেন, একবার বলাতেও যখন সে নামের অর্থ বুঝতে পারে নি, তখন তাকে তিনি ত্রিদণ্ডের আঘাতে বধ করবেন। এই বলে পরিব্রাজক যাতুধানীর মাথায় আঘাত করে তাকে বধ করলেন। ধর্মরক্ষক এবং ধার্মিকের রক্ষক দেবতার হাতে নিহত হল অপদেবতা।

এদিকে ঋষিরা মৃণাল তুলে তীরে রেখে পুনর্বার জলে নেমে তর্পণান্তে উঠে দেখলেন, উৎপাটিত মৃণাল অপহৃত হয়েছে। তাতে তাঁরা শপথ করে অপহরণকারীর উদ্দেশ্যে অভিশাপ দিতে থাকলেন। শুনঃসখ ক্রুদ্ধ ঋষিদেরকে বলেন, যে চুরি করেছে, সে দৈবজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্য সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করুক এবং অথর্ববেদের মন্ত্রোচ্চারণ করে স্নান করুক নতুবা সে বিপদে পড়বে। তাঁর এই হেঁয়ালীপূর্ণ কথাবার্তায় ঋষিরা তাঁকেই চোর বলে ধরেন। তখন ইন্দ্র আত্মপরিচয় দিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে বলেন, তিনি ঋষিদেরকে পরীক্ষা এবং যাতুধানীর কবল হতে উদ্ধার করতে এসেছেন। ঋষিরা দানের প্রলোভন ত্যাগ করে ক্ষুধা সহ্য করার জন্য সর্বকামপ্রদ অক্ষয় লোক লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ইন্দ্র ঋষিদেরকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করলেন।

"প্রতিগ্রহ করা অর্থাৎ অপরের দান গ্রহণ করলে তপস্যা নষ্ট হয়", এই বোধহয় এই গল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষণীয় বিষয়।

গল্প করতে করতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। নর্মদা স্পর্শ করে আমরা ধর্মশালায় ফিরে এলাম। আর বাক্যালাপ না করে (কারণ ইতিমধ্যেই বৃথা বাক্য ব্যয় অনেক হয়েছে!) আমরা যে যার সান্ধ্যক্রিয়ায় বসে গেলাম। জপ সেরে রাত্রি ৯টা নাগাদ আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম। যতীন্দ্র জানিয়েছে রাত্রি ৯টা, কিন্তু বিন্ধ্যপর্বতের কোলে এই নির্জন তটভূমিতে মনে হচ্ছে, রাত যেন কত গভীর, কতই নিশুতি! আমি শুয়ে শুয়ে মায়ের কথাই ভাবতে লাগলাম। কপালীবাবা বলছেন মা আমার ভাবনায় অস্থিচর্মসার হয়ে গেছেন, কেঁদে কেঁদে চোখ হারাতে বসেছেন! আমার বুকটা গুমরে গুমরে উঠল। আমি শুয়ে শুয়ে নীরবে কাঁদতে লাগলাম। কপালীবাবাকে অজস্র ধন্যবাদ, তিনি আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিয়েছেন, তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, মা যাতে ঐ চিঠি পান, তার তিনি ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু গুজরাটের কোন নিকটবর্তী শহর ছাড়া ত ডাকঘর নাই, তিনি তাঁর কোনও ব্রহ্মচারীকে সেখানে পাঠালেও ত ডাক বাক্সে চিঠি পড়তেই ত অনেক সময় লাগবে, তারপর হাজার হাজার মাইল দূরে আমাদের গণ্ডগ্রামে চিঠি পৌঁছতে সময় লাগবে কম করেও দু'মাস। এইসব চিন্তায় মন কাতর হয়ে পড়ল। কিছুতেই ঘুম এল না। অত্যন্ত গরম লাগছে। আমি বিছানা থেকে চুপিসারে উঠে গিয়ে ধর্মশালার বাইরে এসে বসে রইলাম। আকাশে অর্ধচন্দ্রের উদয় হয়েছে, অসংখ্য তারা ঝিকিমিকি করে হাসছে। সামনের দিকে নর্মদার জল চিক্‌চিক্‌ করছে দেখতে পেলাম। আমি মা নর্মদার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম—"মা! তুমি আমার মায়ের মনে শান্তি দাও, ফিরে গিয়ে তাঁকে যেন সুস্থ ও নীরোগ দেখি। বাবাকে হারিয়েছি, তাঁর আদেশেই এসে পৌঁছেছি তোমার কোলে, আমাকে মাতৃহারা করো না মা, করুণাময়ি! করুণা কর।" কাঁদতে কাঁদতেই ধর্মশালার ফাটকে ঠেস দিয়েই কখন যে চোখে ঘুম নেমে এসেছে জানি না। ঘুমের মধ্যে দেখছি, কপালীবাবা আমাদের কলিয়াড়া গ্রামের মাঠ ভেঙে হেঁটে চলেছেন। তাঁর কপালে যজ্ঞশেষ কৌটা। গলায় রুদ্রাক্ষমালা। তাঁর প্রলম্বিত জটা হাঁটার দ্রুততালের সঙ্গে তাল রেখে সমানে দুলছে। কংসাবতী নদীর ধার দিয়ে সতীকুণ্ডের আমবাগানে পৌঁছে গেছেন তিনি। আমি চিৎকার করে তাঁকে জানাতে চাইলাম যে এই সতীকুণ্ডে আমার

অতি অর্থাৎ অতিবৃদ্ধা প্রপিতামহী তাঁর স্বামী ৺বিক্রমনারায়ণ ঘোষালের সঙ্গে সহমৃতা হয়েছিলেন, তাই এর নাম সতীকুণ্ড! তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না। বন্যায় বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, তিনি সেই হানা[1] মুখে নেমে ডানদিকে বেঁকে কেয়াবনের ভিতর দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে চললেন আমাদের বাড়ীর দিকে! আমি মাঠের মাঝখানে যেখানে যোগিনী পূজা হয়, আমাদের গ্রামবাসীরা যাকে বলে 'যুগ্নি মাড়ো' সেই উঁচু পোতায় দাঁড়িয়ে তাঁকে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম। ঐ ত আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে বাঁ পাশেই দেশের শীতলা মন্দির, কপালীবাবা ধীরে ধীরে আমাদের বাড়ীর উঠানে যে বিরাট আমগাছটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার তলাতে গিয়ে দাঁড়ালেন, ঝোলা থেকে বের করলেন আমার লেখা চিঠিটা!

আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটা নিশাচর পাখী ডাকছে—"ক্যার্ ক্যার্ ক্যারর্ এ্যার্"। চারিদিকে এখনও ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, আমি মা নর্মদাকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে উঠে গেলাম নিজের বিছানায়।

পরদিন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা সাড়ে সাতটা। উঠে দেখি মোহান্তজী ছাড়া আর কেউ নাই। তিনি বললেন—রাত্রিতে গরমের জন্য বোধহয় ভাল ঘুম হয়নি। সকলেই প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি সেরে বৃষাকপির মন্দিরে গেছে পূজা করতে। আমি তোমার জন্য বসে আছি। উঠে পড় আজ বিজয়া দশমী ২১শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার। আমি নর্মদার ঘাটে গিয়ে স্নান করছি, তুমি প্রাতঃকৃত্য সেরে আমার কাছে চলে যেও। আজও তুমি আমাকে তর্পণ করাবে।

আমরা স্নানাদি সেরে উভয়ে যখন তর্পণও শেষ করেছি, তখন দেখলাম লক্ষ্মণভারতীজী সকল নাগাকে সঙ্গে নিয়ে শিবপূজা করে ফিরে আসছেন। আমরা দুজনে গেলাম বৃষাকপি রুদ্রের মন্দিরে।

মন্দিরে পৌঁছেই তিনি বললেন—এখানে আসা অবধি একদিনও বৃষাকপি রুদ্রমহাদেবের আরতি করা হয় নি। তুমি বাবা একবার দৌড়ে গিয়ে লছমন ভেইয়ার কাছ হতে কর্পূর, কর্পূরদানী এবং একটা দিয়াশলাই চেয়ে

---

[1]। হানা—বন্যার নদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেলে গ্রাম্য পরিভাষায় তাকে 'হানা পড়া' বলে।

নিয়ে এস। কাল সকালেই এখান হতে চলে যাবার ইচ্ছা। তাই আজ আরতি করতে চাই। আমি তাঁর কথামত দশ মিনিটের মধ্যেই কর্পূরাদি নিয়ে মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। উভয়ের পূজা হয়ে গেলে তিনি বললেন—একদিন গুরুদেব কোন কারণে আমার উপর তুষ্ট হয়ে চারটি গুহ্য মন্ত্র শিবপূজার জন্য শিখিয়েছিলেন। তুমি আরতি কর, আমি সেই মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করে যাই। তুমি যেমন আমাকে পিতৃতর্পণের বৈদিক মন্ত্রগুলি লিখে দিয়েছ, তেমনি আমিও তোমাকে এই চারটি মন্ত্র কোন একসময়ে লিখে দিব। একবার ব্রহ্মার মনে এই আত্মাভিমান জেগেছিল যে তিনি জগদ্‌যোনি, লোক-পিতামহ, ত্রিজগতে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। ব্রহ্মার এই মনের ভাব দেখে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'ক্রতু' ব্রহ্মাকে উপহাস করে বলেছিলেন—'পরমতত্ত্ব না জেনে তুমি একি প্রলাপ বকছ! আমিই জগৎ ও জীবনের কর্তা। যজ্ঞস্বরূপ এবং পরমজ্যোতি স্বরূপ ; এইভাবে দুই দেবতার দ্বন্দ্ব যখন চরমে, তখন চারি বেদ তাঁদের সামনে প্রকট হয়ে যা বলেছিলেন, আমি তা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করি, তুমি আরতি করতে থাক। আমি আরতি করতে লাগলাম, মোহান্তজী বলতে লাগলেন—

১। ঋগ্বেদ বলেছিলেন—ঋগুবাচ।

যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্বং প্রবর্ততে।
যদাহুস্তৎপরং তত্ত্বং স রুদ্রস্ত্বেক এব হি॥

অর্থাৎ ভূতগণ যাঁর অন্তরে অবস্থিত, যাঁ হতে সমস্ত উৎপন্ন এবং মহাত্মাগণ যাঁকে পরম বা শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন সেই রুদ্রই একমাত্র পরমতত্ত্ব।

২। যজুরুবাচ—

যো যজ্ঞৈঃ অখিলৈঃ ঈশো যোগেন চ সমিজ্যতে।
যেন প্রমাণং হি বয়ং স এক সর্বদৃক্ শিবঃ॥

যজুর্বেদ বলেছিলেন, যে ঈশ্বর যোগ এবং যজ্ঞের দ্বারা অর্চিত হন এবং যাঁর দ্বারা আমরা জগতে প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়েছি, সেই শিবই একমাত্র যথার্থ তত্ত্ব।

৩। সামোবাচ—

যেনেদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্যো বিচিন্ত্যতে।
যদ্ভাসা ভাসতে বিশ্বং স একস্ত্র্যম্বকঃ পরঃ॥

সামবেদ বললেন, যিনি এই বিশ্বকে পরিচালনা করছেন, যিনি যোগীগণ কর্তৃক বিচিন্তিত এবং যাঁর দীপ্তিতে বিশ্ব প্রকাশ পাচ্ছে, সেই একমাত্র ত্র্যম্বকই পরমতত্ত্ব।

৪। অথর্বোবাচ—

> যং প্রপশ্যন্তি দেবেশং ভক্ত্যানুগ্রহিণো জনাঃ।
> তমাহুরেকং কৈবল্যং শংকরং দুঃখতস্করং॥

অথর্ববেদ বললেন, কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণ যে দেবেশকে দর্শন করে থাকেন, সেই কৈবল্যরূপী দুঃখহারী শংকরকেই মহাত্মাগণ একমাত্র পরমতত্ত্বরূপে কীর্তন করে থাকেন।

তাঁর মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হল, আরতিও শেষ হল। উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে মন্দির থেকে যখন ধর্মশালায় ফিরে এলাম তখন বেলা বারটা বেজে গেছে। ভিক্ষান্ন প্রস্তুত হয়ে গেছে। লছমন ভারতীজীর ব্যবস্থাপনায় আমরা পরম পরিতোষ সহকারে ভোজনপর্ব শেষ করলাম। আহারান্তে আমরা যখন বিশ্রাম করছি, এমন সময় উদাত্তকণ্ঠে একটি বেদমন্ত্র গাইতে গাইতে কপালীবাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর বসার জন্য মৃগচর্ম পাতাই ছিল, তিনি সেখানে বসে সুর করে গাইতে থাকলেন—

> পবকাঃ নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
> যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ॥ ১ম।৩সূ।১০

একবার, দু'বার, তিনবার; ঐ একই মন্ত্র তিনি গাইলেন ভাবাবেগে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে; তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রকট হয়ে উঠল উদ্গীথ ছন্দ। কিছুক্ষণ পরে তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হতেই যোহান্তজী বললেন—আপনি দয়া করে মন্ত্রের অর্থও ব্যক্ত করুন। আপনার উচ্চারিত মন্ত্র আমাদের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ভাবের তরঙ্গ তুলছে কিন্তু অর্থবোধ না হওয়ায় আমরা মন্ত্রের পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করতে পারছি না। তখন কপালীবাবা ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন—এই মন্ত্র গায়ত্রীর, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র ঋষি মধুচ্ছন্দার দৃষ্ট মন্ত্র। মন্ত্রের সরল শব্দার্থ হল, ঋষি মধুচ্ছন্দা বলছেন, পতিতপাবনী, বিত্তান্নপ্রদায়িনী, জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী আমাদের সাধন যজ্ঞকে সার্থক করে তুলুন। এই

প্রার্থনার ভাব এই যে, আমাদের সাধনা যেন সিদ্ধ হয়, আমাদেরকে যেন পরমধন প্রদান করে।

ঋকে বলা হয়েছে—তিনি পাবকা। পুনাতি ইতি পাবকা। অর্থাৎ সরস্বতী দেবী পূতকারিণী, পতিতপাবনী সুতরাং মুক্তিদায়িনী। আমি অপবিত্র আছি, পাপের ক্লেদ আমাকে আচ্ছাদন করে রেখেছে, আচ্ছাদন করে রেখেছে আমার অমৃতসত্ত্বাকে। মাতৃরূপিণী তিনি; সে ক্লেদ ধৌত করে আমাকে কোলে তুলে নিবেদন অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছেন। পাবকাঃ নঃ সরস্বতী, মাই আমাদের একমাত্র পরিত্রাণকারিণী।

ঋকে আর একটি শব্দ আছে, তিনি 'বাজিনীবতী'। টীকাকারগণ এই শব্দের নানা রকম অর্থ করেছেন। একপক্ষ বলছেন, বাজিনীবতা শব্দের অর্থ 'অন্নপ্রদানকর্ত্রী। তিনি অন্নপ্রদানকর্ত্রী ত বটেনই। সন্তানের মুখ চেয়ে মা ছাড়া আর কে অন্নদান করতে পারে? অজ্ঞান অবোধ সন্তান যতই দুর্বিনীত হোক, তাকে অন্নদান না করে, মা কখনও স্থির থাকতে পারেন না। তাই তিনি মমতাময়ী অন্নদাত্রী। অন্য এক পক্ষ 'বাজিনীবতী' শব্দের অর্থ করেছেন—'অশ্বারূঢ়া', বলাবাহুল্য, সে অর্থ সরস্বতীর এক রূপ কল্পনা করে নিষ্পন্ন করা হয়। আমি মায়ের ষোড়শীরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে সরস্বতীর এক স্বরূপের কথা বলেছিলাম 'কুলিশাঙ্কুশা'। তাঁর বাহন অশ্ব; তাঁর অপর নাম 'মনোবেগা'। তিনি অশ্বারূঢ়া অর্থাৎ দ্রুতগতিবিশিষ্টা। কিজন্য দ্রুতগতিবিশিষ্টা?—সন্তানের উদ্ধার কামনায়। সন্তান বিপন্ন হলে, আর্তকণ্ঠে 'মা মা' বলে কাঁদলে গর্ভধারিণী মা যেমন দ্রুতগতিতে দৌড়ে এসে আপন সন্তানকে কোলে তুলে নেন, সন্তানের ব্যথা দূর করে দেন, তেমনি বেদময়ী মাতা সরস্বতীও মনোবেগে কারণাগত আর্ত সাধকের সামনে প্রকট হয়ে সাধককে রক্ষা করেন, তাঁকে সিদ্ধিদান করেন।

ঋকে আরও বলা হয়েছে, তিনি 'ধিয়াবসু'। ধিয়া কর্মণা বসু ধনং লভাতে যস্য সকাশাৎ সা ধিয়াবসু। অর্থাৎ যে যেমন বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করবে বিদ্যাচর্চায় যে পরিমাণ মনোনিবেশ করবে, যে পরিমাণ নিষ্ঠাসহকারে জ্ঞানের তপস্যা করবে তদনুযায়ী মা তাকে সুমেধা দান করবেন। এই বিশেষণেই সরস্বতীর প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। মা আমার স্নেহময়ী বটেন, মা পতিতোদ্ধারিণী একথাও সত্য কিন্তু তাই বলে তিনি একদেশদর্শিনী নন।

তিনি করুণাময়ী কিন্তু তাঁর সেই করুণাপ্রবাহ অযথা পথে প্রবাহিত নয়। ঋক যে প্রকারান্তরে উপদেশ দিচ্ছে যথোচিত বেদবিদ্যার অনুশীলন কর, যোগবিদ্যার চর্চা কর, কিংবা জাগতিক যে কোন বিদ্যারই (যেহেতু তিনি সব বিদ্যারই অধিষ্ঠাত্রী) নিষ্ঠা সহকারে সাধনা কর মায়ের করুণাদৃষ্টিতে তৎ তৎ বিদ্যার অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞালোকে তোমার চিত্তপট উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেই। তখন অন্ন, ধন, ঋদ্ধি সিদ্ধি যে কোনোও কাম্যবস্তু ছাড়াও কামনার অতীত সামগ্রী মোক্ষরূপ পরমধনও লাভ করে তুমি সিদ্ধকাম হতে পারবে।'

বেদমন্ত্রটি ব্যাখ্যা করে মহাত্মা কিছুক্ষণের জন্য নীরব হলেন, চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন, মিনিট পাঁচেক পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বেদের দৃষ্টিতে সরস্বতীর স্বরূপ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে ত পড়েইছ, আশা করি অথর্ব-বেদে সরস্বতীর যে স্বরূপ-ব্যাখ্যান আছে তাও তোমার জানা আছে। না জানা থাকলে পরিক্রমা শেষে তা তুমি নিশ্চয়ই অনুশীলন করবে। বেদ-বিদ্যা সারাজীবন ধরে অধ্যয়ন মনন এবং স্বাধ্যায় করলেও ইয়ত্তা পাওয়া যায় না। শৈবাগমের ঋষিরা যে দৃষ্টিতে সরস্বতীকে দেখতেন তারও কিঞ্চিৎ আভাস তোমাদেরকে দিয়েছি। অথচ তামাম হিন্দুস্থানে গৃহে গৃহে যেভাবে সরস্বতীর পূজা হয় তাতে কি দেখ? নটিনী রঙ্গিনীর মত বীণাবাদনরতা এক অপ্সরা বা সুন্দরী গায়িকার মূর্তি গড়ে, অভাবে কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক জড়ো করে শ্রীপঞ্চমীর দিনে তাতে ফুল চাপিয়ে মন্ত্র পড়ে—

ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥

মূর্খ পুরোহিতের দোষে এই মন্ত্র আবার ভুলভাবে পড়ানো হয়—"বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ!" যেমন পূজা তেমন ফল, দেশের ছেলে-মেয়েরা বিদ্যার নামে এবং বিদ্যাস্থানের অর্থাৎ বিদ্যালয়ের নামে তাই ভয় পাচ্ছে। এদেশের শিক্ষকরাও ভয়াবহ হয়ে উঠেছেন। তাঁর কথা শুনে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, হাসির কথা নয়, বড়ই ভাবনার কথা, ভয়ের কথা। বেদ উপদেশ চ্ছলে সাবধান করে দিচ্ছেন, ধিয়াবসু মাতা সরস্বতীর যে যেমন নিষ্ঠা ও শ্রম সহকারে বিদ্যা ও বুদ্ধির অনুশীলন করবে তদনুযায়ী তিনি ফল দান করে থাকেন, আর দেশের ছাত্রছাত্রীরা সারাবৎসর না পড়াশুনা

করে বৎসরের একটা বিশেষ দিনে মূর্তিতে বা পুঁথিতে কয়েকটা ফুল ছুঁড়ে দিয়েই ভাবছে কিস্তিমাৎ! মা সরস্বতী তার উপর দয়া করতে বাধ্য!

প্রণাম মন্ত্রে মা সরস্বতীর একটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে ভদ্রকালী। এই ভদ্রকালী কিন্তু তথাকথিত তন্ত্রে বর্ণিত 'ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী' নন, তিনি তান্ত্রিকদের কল্পনানুযায়ী 'জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি' একথাও সর্বদা বলছেন না, এই ভদ্রকালী হচ্ছেন, আমি যে শৈবাগম মতে সরস্বতীর সপ্তম স্বরূপ কালীর কথা বলেছি, ইনি সেই কালী। কালীর অপর নাম বলেছি 'শান্তা।' ভদ্রকালী শব্দের অর্থও হল যিনি কল্যাণকারিণী, শান্তিদাত্রী এবং প্রকৃতিতে শান্ত।

তাঁর কথা শেষ হতেই সেই অবকাশে মোহান্তজী তাঁকে বললেন—এখন আমরা সকলেই আপনার কৃপায় সেবা এবং যত্নে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেছি। কাল সকালে এখান থেকে যাত্রা করার ইচ্ছা। আপনি প্রসন্ন মনে অনুমতি দিন। সকালে আপনি হয়ত যজ্ঞাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকবেন, সেসময় হয়ত দেখা হবে না। আপনার সাহচর্যে আমরা প্রচুর আনন্দ পেলাম। এই বলে তিনি কপালীবাবাকে 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন জানালেন। তিনি অভিবাদন করতেই আমরাও একে একে প্রণাম করলাম। তিনি 'শিবমস্তু' জানিয়ে রূপা কাণ্ডারীকে ডেকে আমাদেরকে পথের নিশানা দেখিয়ে দিতে বললেন। ধর্মশালার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আবার তিনি ফিরে এসে আমাদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, তোমাদের বাড়ীর পশ্চিমদিকে নদীর তটেই যে কল্কে ফুলের গাছ দিয়ে ঘেরা একটি দেবীমন্দির আছে, ঐ দেবীর নাম কি? আমি হতচকিত হয়ে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলাম ঐ দেবী আমাদের কুলদেবী। আমার পূজ্যপাদ বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহাতাপস ৺সীতারাম ঘোষাল একদিন কংসাবতী নদীর ধারে বসে সন্ধ্যা করছিলেন, তখন শ্রাবণ মাস, নদীতে বান এসেছে। ধীরে ধীরে নদীর জল বাড়তে বাড়তে তাঁর কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল। আমার প্রপিতামহ ৺অক্রুরনারায়ণ এবং পাড়ার লোকেরা তাঁকে গিয়ে অনেক ডাকাডাকি সাধাসাধি করলেন। প্রপিতামহ ত কাঁদাকাটাই সুরু করে দিলেন তবুও তিনি সন্ধ্যা অসমাপ্ত রেখে এলেন না। যথাসময়ে সন্ধ্যা শেষ করে তিনি প্রপিতামহকে বললেন—

'ওরে হারিকেনটা আমার কাছে নিয়ে আয়। জলের ঢেউএ আমার কোলে যেন কি চেপে বসেছে।' হারিকেনের আলোতে তিনি দেখলেন, তাঁর কোলে সিঁদুরচর্চিত, প্রায় ২৭" ইঞ্চি দীর্ঘ, ১৫" ইঞ্চি চওড়া একটি প্রস্তর। প্রস্তরে একটি দ্বিভূজা মূর্তি ক্ষোদাই করা আছে। দেবীর বাম হস্তে পরিঘ এবং দক্ষিন হস্ত উর্ধ্বে উত্তোলিত, তাতে অভয় মুদ্রা। তখনই আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ সেই দেবীমূর্তিকে ভক্তিভরে মাথায় চাপালেন। পাড়ার সমস্ত নরনারী শঙ্খ ঘন্টা বাজাতে বাজাতে আর প্রপিতামহ রাস্তায় জল সেচন করতে করতে দেবীকে আমাদের বাড়ীতে এনে স্থাপন করলেন। বাবার কাছে শুনেছি, সেই রাত্রেই দেবী স্বপ্নে বীজমন্ত্র এবং পূজার পদ্ধতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের নিকট প্রকট করে দেন। পরে গ্রামবাসীরা তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ৩০ খানা গ্রামের লোকজন তাঁকে 'বুড়ী শীতলা' বলে ডেকে থাকেন। অসুখ বিসুখ, বিপদ আপদ, বান বন্যা, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, মারী এবং মড়কে—ঐ মায়ী সকলের আশ্রয়স্থল। তাঁকে ডেকেই সকলে বিপদে আপদে রক্ষা পান বলে গ্রামবাসীরা আজও সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন।

—তোমাদের বাড়ীর অতি সন্নিকটে বামদিকে যে মন্দিরে ঘটস্থাপন করে পূজা হয় উনি কে?

—গ্রামবাসীদের প্রতিষ্ঠিত শীতলা দেবীর ঘট, তাঁকে দেশের শীতলা বলে ডাকা হয়।

—গ্রামবাসীরা তোমাদের কুলদেবীকে 'বুড়ী শীতলা' বলে অভিহিত করলেও তোমার বাবা তাঁকে কি নামে ডাকতেন?

—বাবা বলতেন, ঐ মূর্তি দেবীচণ্ডীর সিদ্ধ যন্ত্র। পূজনীয় প্রপিতামহের কাছে মা চণ্ডীর বীজই প্রকট হয়েছিল। বাবা চণ্ডীর বীজমন্ত্রেই তাঁর পূজা এবং হোম করতেন। প্রতিদিন চণ্ডীপাঠও করতেন।

—তুমি তাঁর মধ্যে আর কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছ?

—তাঁর মূর্তির মাথায় একটা সোনায় বাঁধানো গর্ত আছে। দেখলে মনে হবে একটা আধ ইঞ্চি পরিসরের সোনার নল দেবীর মাথায় ঢোকানো আছে। বাবা বলতেন 'হেমঘট'। সেই হেমঘটে আমি একবার দু'তিন কলসী জল ঢেলেও দেখেছি, সে জল নিমিষের মধ্যে কোথায় যে অন্তর্হিত হত তা বুঝা যেত না। মূর্তির পিছনে গিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ দেখতাম কোথাও ঝিরে

জল বেরিয়ে যাচ্ছে কিনা। কিন্তু একবিন্দু জলও বাইরের দিকে কোথাও বেরিয়ে যেতে দেখি নি।

বাবা প্রতিদিন নিত্যপূজার সময় এক কোশা করে জল সেই হেমঘটে ঢালতেন। বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মহামারীর সময় গ্রামের ঘরে ঘরে যখন কান্নার রোল উঠত, ডাক্তার ও গ্রাম্য কবিরাজরা যখন রোগীকে শেষ জবাব দিয়ে যেত, তখন সেই হেমঘটের একবিন্দু জলের প্রত্যাশায় গ্রামবাসীরা ছাড়াও দূর দূরান্ত গ্রাম হতে অনেক লোক মন্দিরে এসে ধর্না দিত। বাবা হেমঘটের মধ্যে বেলপাতার অগ্রভাগ ডুবিয়ে ভক্তদেরকে যৎকিঞ্চিৎ জল দিতেন। তাতে দেখেছি মৃত্যুপথযাত্রীও সেই জল মায়ের প্রসাদ হিসাবে পান করে নিরাময় হয়ে উঠেছে।

—ঐ দেবীমূর্তি চণ্ডীর সিদ্ধযন্ত্র সন্দেহ নাই। প্রস্তরময় সিদ্ধযন্ত্রে যেসব চিহ্ন থাকে তা হল গুহ্য সাধন সঙ্কেত। তোমাদের কুলদেবীর বামহস্তে বলছ রয়েছে পরিখ। পরিখের একটি অর্থ লৌহকন্টকযুক্ত মুদগর অর্থাৎ এটি একটি প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র হলেও, পরিখ সূচিত করছে বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত যোগবিশেষ। আবার বিষ্কুম্ভ শব্দের অর্থ হল অর্গল, কীলক বা হুড়কা। মহামুনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে প্রথমেই অর্গল, কীলক প্রভৃতির প্রক্রিয়ার স্তুতি করেছেন।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে বলে তিনি আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না। সকলকে বিদায় আশীর্বাদ জানিয়ে তিনি চলে গেলেন, তিনি চলে যেতেই সকলের মধ্যে সরবে আলোচনা সুরু হয়ে গেল, তিনি আমাদের গ্রামের ইষ্টদেবীর মন্দিরের কথা এভাবে জানলেন কি করে? মন্দিরের চারদিকে যে কল্কে ফুলের গাছ এবং তা যে নদীর ধারেই অবস্থিত, তা নিজের চোখে না দেখা থাকলে ত আর বলতে পারতেন না। মোহান্তজী এই বলে সকলকে চুপ করালেন যে, যোগীরা ধ্যানদৃষ্টিতে অনেক কিছুই দেখতে পান। এখন চল নর্মদাতটে বেড়িয়ে মাকে আরতি করে ধর্মশালায় ফিরব। লক্ষ্মণভারতীজী আরতির সব উপাদান সঙ্গে নিলেন। কয়েকজন নাগা নিলেন শিঙ্গা, ডমরু প্রভৃতি। আজ ধর্মশালার রূপা কাণ্ডারীজীও আমাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরোলেন। বেড়াতে বেড়াতে আমরা ঋষি মুদ্‌গল, মহাদেবী বিশ্বধারা এবং স্বয়ংপ্রভার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার

নেমে আসতেই নর্মদা স্পর্শ করে মোহান্তজী প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ পরে কর্পূর-দানীতে কর্পূর জেলে নর্মদার আরতি সুরু করলেন। শিঙ্গা, ডম্বরু বাজতে থাকল, নাগারা সমস্বরে গাইতে লাগলেন—

হৈঁ তেরে আধার নর্মদে, হৈঁ তেরে আধার।
মূর্তি মনোহর মঙ্গলকারী, নীলাম্বর হৈ মগর সওয়ারী,
রূপ অনুপম ভব ভয়হারী, মহিমা অমিত অপার।
নর্মদে! হৈঁ তেরে আধার।
শম্ভুলোকসে ধারা আই, মেকল পর্বত তীর্থ বনাই।
অমরকণ্টক জগকীরতি ছাই, হোবে জয় জয়কার;
নর্মদে হৈঁ তেরে আধার॥

আরতির পর হর নর্মদে ধ্বনি তুলে মা নর্মদাকে প্রণাম জানিয়ে আমরা ধর্মশালায় ফিরে এলাম। রূপা কাণ্ডারীজীর কাছে জানা গেল, কাল সকালে উঠে দুটি দুর্ভেদ্য জঙ্গলাবৃত ডুংরি অতিক্রম করে বার মাইল রাস্তা হেঁটে যেতে পারলে আমরা হাপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পৌঁছে যেতে পারব। হাপেশ্বরের জঙ্গলও শেষ হবে।

যে যার জপতপ সেরে রাত্রি সাড়ে ন'টায় সকলে শুয়ে পড়লাম। খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সেরে আমরা যে যার গাঁঠরী, কমণ্ডলু, লাঠি হাতে নিয়ে নর্মদা বন্দনা করতে করতে আমরা বৃষাকপির মন্দির পরিক্রমা করে শেষবারের মত ঋষি মুদ্গল ও বিশ্ববারার তপস্যাক্ষেত্রকে প্রণাম জানিয়ে যাত্রা সুরু করলাম। আজ ২২শে আশ্বিন, শুক্রবার, শুক্লা একাদশী তিথি। রূপা কাণ্ডারী প্রায় আধ মাইলটাক রাস্তা এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন।

আমরা এবড়ো খেবড়ো পাথরের রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম, সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে। আরও আধমাইলটাক রাস্তা এইভাবে হাঁটার পর দেখলাম নর্মদার গতিপথ আবার বেঁকে গেল। নর্মদার ধারে বড় বড় ঘাস বন। এইরকম লম্বা লম্বা বিচিত্র প্রকৃতির ঘাস এর আগে দেখিনি। লক্ষ্মণভারতীজী বললেন—'পাটেরা ঘাস বা!' আমি মনে মনে ভাবছি, ভাগ্যিস ভোরে স্নান করে এসেছি, এই ঘাস বন ঠেলে নর্মদাতে স্নান করা ত দূরের কথা

এক কমণ্ডলু জলের দরকার হলেও নর্মদাতে নেমে তা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। নর্মদা উদগম মন্দির হতে দক্ষিণ দিকে ভৃগু কমণ্ডলু যাওয়ার পথে বড় বড় ঘাসের বন দেখেছিলাম, সে ঘাসের মধ্যে ঢুকে গেলে মানুষের গলা মাথা পর্যন্ত ডুবে যায়, কিন্তু এই পাটেরা ঘাস তার চেয়েও লম্বা। সামনে আমরা একটা ডুংরি দেখতে পাচ্ছি। তার ঢালে এই ঘাস বন। ঘাস বন পেরিয়ে নর্মদা; ডুংরির অপর দিকের ঢালে বড় বড় গাছের সমারোহ। ডুংরির আকৃতি শিরা বহুল, ডুংরির উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পাথরের শিরা নেমে এসেছে, মনে হচ্ছে যেন কোন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির মুখের উপর কুঞ্চিত বলী রেখা। আমাদেরকে চড়াই এর পথে এই ডুংরির গা বেয়ে যেতে হবে। কতকটা হেঁটে যাওয়ার পরেই লক্ষ্মণভারতীজী হাতে তুলে আমাদেরকে দাঁড়িয়ে পড়তে ইঙ্গিত করলেন। আমাদের গোটা দলই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, লক্ষ্মণভারতীজীর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরা দেখতে পেলাম, আমাদের কাছ হতে প্রায় ৭০।৮০ গজ দূরেই যেন পুঞ্জীভূত কালো মেঘের একটা পাহাড় আমাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। একটা দাঁতালো বিরাটকায় বুনো হাতি! হাতি নড়ছে না, কাজেই আমাদেরও নড়নচড়ন বন্ধ। প্রায় মিনিট দশেক এইভাবে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকার পর হাতিটা শুঁড় মাটিতে ঠুকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার করতে লাগল। আর সেই সঙ্গে মাটি (এখানে পাথর) থাবড়াতে লাগল। লক্ষ্মণভারতীজী সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এসে আমাদেরকে শুনিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগলেন—খবরদার! এক পাও কেউ নড়বে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। হাতীর এই ধরনের ভাব ভঙ্গী এবং আওয়াজ আসলে সে সকল বন্যপ্রাণীকে উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদেরকেও সতর্ক করে দিচ্ছে। এই ধরনের আওয়াজ শুনে মনে হয় হাতীটি বাঘের গন্ধ পেয়েছে। দলছাড়া নিঃসঙ্গ একা বলেই সে ভয় পেয়েছে। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মা নর্মদাকে স্মরণ করতে লাগলাম। হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে হাতিটার গা ঘেঁসে একটা হলুদ আলো ঝিলিক মেরে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতের মত বাঘের গর্জন। হাতিটা পাগলের মত দৌড়চ্ছে, পাটেরা ঘাসের বনের মধ্য দিয়ে। ঘাস বনে যেন সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে। একটুর জন্য লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে, আমরা হাতির উপর দরদ দেখিয়ে বলে উঠলাম জয় মা নর্মদে! কিন্তু আমাদের

সেই আনন্দ স্তব্ধ হয়ে গেল বাঘের হুঙ্কারে। বাঘটা হুঙ্কার দিচ্ছে, হুঙ্কারের পর হুঙ্কার। আমাদের কানের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়ার যোগাড়। আমার সঙ্গী নাগারা এমনকি মোহান্তজীও ভয়ে জড়সড় হয়ে সবাই প্রায় একসঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন বলার চেষ্টা করছেন, আসলে তাঁরা ভয়ে স্নায়ুর চাপে একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। কেউ কেউ ভয় পেয়ে থরথর করে কাঁপছেন আর অঝোরে কেঁদে যাচ্ছেন। আবার বাঘের ডাক শুনতে পেলাম, এবার খুব ঘন ঘন, কখনও 'আ-আ-আম-ম' নরম গলায়, আবার কর্কশ 'আ-উ-উ-উ', আ-ও-ও-আম্ গম্ভীর গলায়। কখনও মনে হচ্ছে বাঘটা পূর্ব দিক থেকে ডাকছে আবার কখনও মনে হচ্ছে পশ্চিম দিক থেকেই ডাকছে। যাইহোক কিছুক্ষণ পরে বাঘের আওয়াজ থামল। যতীন্দ্র ভয় জড়িত কণ্ঠে আমাকে জানাল যে, সাড়ে নটা থেকে এখন ১০টা ১৫ মিনিট, এই ৪৫ মিনিট সময়ের মধ্যে বাঘটা ২২ বার ডেকেছে, আমি গুনে দেখেছি।

আমি বললাম হাতিকে শিকার করতে না পেরে ব্যর্থ আক্রোশে আমার মনে হয়, এই ডুংরিটারই উপরে কোথাও দাঁড়িয়ে সে হুঙ্কার দিচ্ছিল। আমরা আবার হাঁটতে সুরু করেছি। আমার শেষ কথাটা লক্ষণভারতীজী শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—বাঘটা যে ডুংরির উপর দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিচ্ছিল, এ কথা তুমি জোর করে বলতে পার না। বাঘের ডাক শুনে বাঘের অবস্থান নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়। কারণ বাঘটা যখন হুঙ্কার দিচ্ছিল তখন দেখেছ ত পাহাড়ের চারদিক থেকেই হুঙ্কার উঠছিল বলে মনে হচ্ছিল বাঘটা বোধহয় ৫০ গজ দূর থেকে ডাকছে ডুংরির ঈশাণ কোণ থেকে, কখনও মনে হচ্ছিল ডুংরিরর উপর থেকে, কখনও মনে হচ্ছিল ডান দিক থেকে, কখনও বাঁ-দিকের কোণ ঘেঁসে আওয়াজটা আসছে। বাঘের আওয়াজ শুনে বাঘের অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন কিছুই ধারণা করা যায় না। স্বরক্ষেপনের এই অদ্ভুত কৌশল এই নির্জন পার্বত্য-প্রকৃতির অদ্ভুত দান, যার ফলে বাঘের শিকাররা দিশেহারা হয়ে পড়ে। লক্ষ্মণভারতীজীর কথাই যে ঠিক তা বুঝলাম চড়াই পথে ডুংরির উপরে উঠে। ডানদিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় একশ গজ দূরে একটা ঝরনার পাশে বাঘটা দাঁড়িয়ে আছে। অথচ কিছুক্ষণ পূর্বে আমি ভুল অনুমান

করেছিলাম যে বাঘটা ডুংরির উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে, অথচ বাঘ তখন চলে গেছে ১০০ গজ দূরে ঝরনার ধারে। আমাদের উপর বাঘটার দৃষ্টি পড়তেই গজরাতে গজরাতে কয়েক পা তেড়ে এল, তারপর লুকিয়ে পড়ল একটা পাথরের পিছনে। আমরা ততক্ষণে আবার সিঁটকে গেছি ভয়ে। এতবড় বিরাট বাঘটাকে আবার দেখতে পেয়ে আমাদের সবকিছু গোলমাল হয়ে গেছে। বাঘের স্বভাব হল শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে কতকটা আড়াল খোঁজে। তাই পাথরের আড়ালে লুকাতেই আমরা ভাবলাম, এইবার বাঘ দৌড়ে এসে আমাদের উপর নির্ঘাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিন্তু না, আমরা তার লক্ষ্য ছিলাম না, সে ঝাঁপাল ঠিকই, ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা সম্বর হরিণের উপর, আমরা চোখ বন্ধ করে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম, পরে দেখলাম সম্বরটাকে মুহূর্তে পিঠে ফেলে সে ঝর্ণার ধারে ধারে দৌড়ে পালাচ্ছে !

আমরা ডুংরি থেকে উৎরাইএর পথে নেমে গোলকধাঁধার মত ঘাসের জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছলাম। বড় এবং ঘন পাটেরা ঘাসের জঙ্গল পাহাড়ের তলা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, আর তারই কোল ঘেঁসে সুরু হয়েছে ঘন বড় বড় গাছের জঙ্গল। তবে এ জঙ্গল কিছুটা ছড়ানো, কিছুটা ঝোপ-ঝাড়, কিছুটা কাঠের বন। ঢেউএর মত উঁচু-নীচু পার্বত্য পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে প্রায় মাইল খানিক সংকীর্ণ পথ পেলাম দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে। পরিভাষায় যাকে বলে গিরিসঙ্কট। এই গিরিসঙ্কট অতিক্রম করেই পেলাম আর একটা ডুংরি। পাহাড়টার গা জড়িয়ে খিল্‌খিল্ হাসিতে বয়ে চলেছে এক ঝর্ণা। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনই অপরূপ যে রবীন্দ্রনাথ শেলী বা কীটস্‌এর মত মহাকবি এস্থান দেখলে অজস্র সনেট বা গীতিকাব্য স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে লিখে ফেলতে পারতেন !

এই ঝর্ণাটার স্বচ্ছ জলের ছন্দে দোল খেয়ে খেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে নানা বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সুন্দর নুড়ি পাথর। অন্য সময় হলে দু'চারটে কুড়িয়ে নিতাম ঠিকই, এখন মাথার উপর সূর্য তপ্ত রশ্মি ঢালছেন, সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরছে, পেটও জ্বলছে। কাজেই সুন্দর নুড়ির আকর্ষণ ত্যাগ করে আমরা যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে হাঁটতে লাগলাম। গিরিসঙ্কটের পথ শেষ হতেই সামনে পেলাম আর একটা ডুংরি।

আমি লক্ষ্মণভারতীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোটেশ্বরের বৈষ্ণজীর কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে মহাদেবের একাদশ তনু অর্থাৎ একাদশ রুদ্রের প্রতীক এই ডুংরিগুলিকে ধরলে হাতনী সংগমের বৃষাকপি রুদ্রকে অষ্টম রুদ্রের প্রতীক ধরে, যে ডুংরিতে বাঘের হুঙ্কার শুনে এলাম সেটি নবম অর্থাৎ শম্ভু এবং সামনের ডুংরিটিকে তাহলে দশম রুদ্রের প্রতীক অর্থাৎ হর বলে গণ্য করতে হয়।

—জী হাঁ, ইস্‌কা বাদ হি ঈশ্বররূপী রুদ্রদেবকী একাদশতম হাপেশ্বর মহাদেব বিরাজ করতে হৈ।

আমরা ডুংরিতে উঠতে লাগলাম। পায়ে অল্প স্বল্প পাথরের খোঁচা লাগছে। ক্রমেই ডুংরির চড়াই পথে সূঁচালো পাথরের ঘায়ে আমরা বিব্রত হয়ে পড়লাম। মোহান্তজীর পরামর্শে আমরা বসে পড়ে যে যেমনভাবে পারলাম, নামাবলী ওড়না প্রভৃতি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিলাম, এতে আর যাইহোক অন্ততঃ সরাসরি পাথর ফুটে পায়ে রক্ত ঝরবে না, ঘাও হবে না। আমি ভাবলাম, এই বুদ্ধিটা যদি মোহান্তজীর মাথায় আগে আসত তাহলে আমরা ইতিপূর্বে এত দুর্দশাগ্রস্ত হতাম না। যে অবস্থায় আমরা ধর্মরায়ের মন্দিরে বা হাতনী সংগমে পৌঁছেছিলাম, পায়ে এভাবে কাপড় জড়ানো থাকলে আমাদের দুর্দশা অতখানি শোচনীয় হত না। ডুংরির উপরে উঠেই আমরা দেখতে পেলাম নর্মদা দুর্দান্ত বেগে বয়ে চলেছেন, আঁকা বাঁকা অনিয়তাকার গতিপথ তাঁকে একটা স্বতন্ত্র রূপ দান করেছে। এই ডুংরিতেও বড় বড় শাল, সাজা, মহুয়া, অশ্বত্থ, বেল, আমলকী ও আবলুষ গাছের জঙ্গল আছে কিন্তু তত ঘনঘোর নয় বলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্গম।

উৎরাইএর পথে ডুংরি থেকে নেমে এসে এক নূতন দৃশ্য দেখলাম। এই 'হর' নামা ডুংরির পাহাড়তলীতে নর্মদার ধার ঘেঁসে জংলা পাখীর মেলা বসে গেছে। সারা বৎসর কষ্টে-সৃষ্টে থাকার পর শরতের শেষাশেষি এই সময়টাই পাখীদের মেলা বসে যায়। এখন আর ডিমে তা দেওয়ার বা ছানাকে জেগে বসে থাকতে হয় না, ওদের এখন ঝাড়া হাত-পা। হিম পড়ে না, কন্‌কনে ঠাণ্ডাও নাই। গুজরাটের এই অঞ্চলে দেখছি চাষবাসের উপযোগী কিছু কিছু জমিও পাথর কেটে বের করা হয়েছে। সেই সব জমিতে দেখছি সবে লাঙ্গল পড়ছে, সত্ত বোনা হয়েছে গম। তাই রাজ্যের পাখী—

সরিয়াল, হরিয়াল, ঘুঘু, রাজঘুঘু, কালিজ, কবুতর, বন্যমুরগী, নকুটী এমনকি কালো তিতিরের মত মুখচোরা পাখীও তাদের গোপন আস্তানা থেকে এই সময় বেরিয়ে পড়েছে। কেউ বা জলের ধারে উড়ে বেড়াচ্ছে, কেউ বা মাঠে মাঠে ছড়ানো বীজ মনের সুখে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

আমি যেমন যেমন পাখী দেখছি, তক্ষুনি জিজ্ঞাসা করছি লক্ষ্মণভারতীজীকে সেইসব জংলী পাখীর নাম। বৃদ্ধসন্ন্যাসীকে বিরক্ত হতে দেখছি না, তিনি হাসিমুখে বিভিন্ন পাখীর পরিচয় দিয়ে চলেছেন। এক ঝাঁক নূতন পাখী দেখলাম, সেগুলি যখন উড়ে বেড়াচ্ছিল তখন সেগুলির ধূসর বক্ষদেশ এবং সাদা পেট দেখে মনে হচ্ছিল বাজপাখী, আমাদের বাংলাদেশেও এরকম পাখী অজস্র দেখেছি, কিন্তু তাদের তীক্ষ্ণাগ্র ডানা এবং ভোঁতা লেজের ধারগুলোতে দেখছি সোনা রংএর বার্ণিশ। পাখা আর লেজ যেখানে মিশেছে সেখানে আছে খেই হারা নকশার মেলা। বাঁকানো ঠোঁট, বাঁকানো বাঁকানো নখ আর হলুদ বর্ণ চোখ দেখে ঐ পাখীগুলিকে ঠিক বাজপাখী বলে ঠাওর করতে পারলাম না। লক্ষ্মণভারতীজীকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন—হাঁ এগুলি বাজপাখাই। এই বিশেষ ধরনের বাজপাখী এই অঞ্চলেই দেখা যায়।

কষ্টকর সুঁচালো পাথরের পাহাড়ী পথ শেষ হল, আমরা নর্মদার কিনারে এসে পৌঁছলাম। সকলেই নর্মদার জল চোখ মুখে দিয়ে পেট পুরে জল খেয়ে নর্মদার ধার ধরে হাঁটতে লাগলাম। স্নিগ্ধ জলের স্পর্শে দেহ মন শীতল হল। এই সময় আমাদেরকে দূর থেকে দেখলে যে কেউ মনে করত কলিকাতার রাস্তাঘাটে যেমন দেখা যায় সেই রকম একদল কুষ্ঠরোগীর মিছিল চলছে। প্রত্যেকের পায়ে কাপড় জড়ানো, পথের ধূলায় এবং নর্মদার জলে ভিজে খুবই নোংরা এবং জবড়জং দেখাচ্ছে। মাইল খানিক এই ভাবে হাঁটার পর দূর থেকে একটি মন্দিরের ঝাণ্ডা দেখিয়ে মোহান্তজী বললেন ঐ যে হাপেশ্বর মহাদেবের মন্দির! হর নর্মদে, হর নর্মদে! আমরা সকলেই যুক্তকরে প্রণাম জানালাম হাপেশ্বরকে। মনের আনন্দে লক্ষ্মণভারতীজী গান ধরলেন—

অব শিব পার করো মেরে নাইয়া।
অউ ঘট ঘাট অগাধ জলধি, বল্লী লাগে ন খেওইয়া।

বারি বরোবর বারি রহো হ্যায়, তা'পর অতি পুরবৈয়া।
থর থরাওত কম্পত হিয়া মেরো, শিব কি দেত দুহৈয়া।
দেবী সহায় লছমন পুকারত শিবপুত্রী রেবা মেরা মৈয়া॥

লক্ষণভারতীজীর কণ্ঠসংগীত এর আগেও আমার ভাল লাগেনি। এখনও আমার ভাল লাগছেনা, কিন্তু বৃদ্ধ এমনই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন যে তাঁকে থামানো কঠিন, তিনি নেচে কুঁদে ঐ একই গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগলেন এবং আমাদেরকেও তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে তাল দিয়ে সুর মেলাতে বললেন। মোহান্তজী আমাকে চুপি চুপি বললেন যে ঐ হাপেশ্বর মন্দিরে লক্ষণভারতীর একবার এক অলৌকিক অনুভূতি হয়েছিল, তাই হাপেশ্বর মন্দির দেখলে তিনি আবেগ-প্রবণ হয়ে পড়েন। যাই হোক বেলা প্রায় পৌনে দুটার সময় আমরা মন্দিরে এসে পৌছে গেলাম। দূর থেকে দেখলাম, মন্দিরে বহু লোকের ভীড় আছে। মন্দিরের গায়েই একটি চতুষ্পত্র বিশিষ্ট বেলগাছ, নর্মদা মন্দিরের ধার দিয়ে বয়ে যাচ্ছেন। অদূরেই একটি সদাবর্ত এবং ধর্মশালা আছে। শিঙ্গা, ডম্বরু বাজাতে বাজাতে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে আমরা চারিদিক প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। মন্দিরের পুরোহিত এগিয়ে এসে সশ্রদ্ধভাবে মোহান্তজীকে নিবেদন করলেন, 'আপনি ত জানেন, এসময় প্রভুর দর্শন হবে না। সকাল সাড়ে সাতটা হতে সাড়ে দশটা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা হতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত পূজা এবং আরতির জন্য মন্দির দ্বার খোলা থাকে। অন্য সময় হাপেশ্বর মহাদেবকে জড়িয়ে থাকে, একটা বিরাট সাপ। সেইজন্য মন্দির দ্বার বন্ধ থাকে। আপনাদের নিশান দেখে বুঝতে পারছি আপনি নর্মদাতটের সর্বজনমান্য শ্রীশ্রীকমলভারতীজীর গদীর অধিপতি। আপনি হুকুম করলে মন্দিরের দ্বার আমি খুলে দিতে বাধ্য, তবে দূর থেকে দর্শন করাই নিরাপদ।' মোহান্তজী বললেন—'যা নিয়ম আছে আমরা তাই মেনে চলব'। পুরোহিত আরও জানালেন, আজ ভোরে একজন দিগম্বর স্বচ্ছন্দচারী মহাপুরুষ এখানে এসে পৌচেছেন, তাঁকে দর্শনের জন্যই মন্দিরে আজ অভূতপূর্ব ভীড় হয়েছে। গুজরাটের বিভিন্ন শহর হতে দলে দলে লোক এসেছেন তাঁর দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের জন্য। সকালে তাঁকে দর্শন করে অনেকে চলে গেছেন,

যাঁরা দর্শন পান নি তাঁরা এখনও এখানে ধর্না দিয়ে পড়ে আছেন। ধর্মশালায় বোধ হয় আপনাদের স্থান সঙ্কুলান হবে না।

—উস্‌মে ক্যা, হমলোগ্ ইধারই রহেগা, হাপেশ্বরজীকা জঙ্গল ত খতম হো চুকা। মুক্ত আকাশকা চন্দ্রাতপ হি ত সাধুয়োঁকে লিয়া আচ্ছা হৈ।

মোহান্তজীর কথা শেষ হতে হতেই মন্দিরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন দিগম্বর করপাত্রীজী। দরজার তালা ঝনঝন করে মেঝেতে পড়ে ছিটকে গেল। বেরিয়েই তিনি তাঁর দর্শনার্থী সমাগত ভক্তদেরকে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন—তফাৎ যাও। উধর অশ্বত্থ বৃক্ষকো তরফ যা কর বৈঠা রহো। চার বাজে উধর হম্ ভেট করেগা। পায়ের ধূলো নিবার জন্য বেচারা ভক্তদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছল, কিন্তু মহাপুরুষের হুঙ্কারে তাঁরা বিষণ্ণ অন্তঃকরণে অশ্বত্থ গাছের তলায় গিয়ে বসলেন। মন্দিরের দরজা খুলে যাওয়ায় সেই সুযোগে আমরা ঈশ্বররূপী রুদ্র হাপেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করতে পারলাম। প্রায় দু ফুট লম্বা অত্যুজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গকে জড়িয়ে আছে একটি বিরাট শ্বেতসর্প। আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম এই দৃশ্য দেখে। লক্ষ্মণভারতীজী দরবিগলিত অশ্রু হয়ে স্তব পাঠ করে চলেছেন—

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং।
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশুনাং পতিং॥
বন্দে সূর্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দ প্রিয়ং।
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবশঙ্করম্॥

স্বপ্রকাশ উমাপতি হে সুরগুরো! তোমাকে বন্দনা করি; জগৎকারণকে বন্দনা করি; সর্পভূষণ ও মৃগধরকে বন্দনা করি; পশুপতিকে বন্দনা করি; চন্দ্র, সূর্য ও বহ্নিরূপ ত্রিনয়নধারীকে বন্দনা করি; মুকুন্দপ্রিয়কে বন্দনা করি; ভক্তজনের আশ্রয় ও বরদাতাকে বন্দনা করি; মঙ্গলময় শঙ্করকে বন্দনা করি।

আমি নির্নিমেষ নেত্রে দেখতে লাগলাম সভাকার ধ্যান ও স্তববর্ণিত পন্নগভূষণ মহাদেবকে। হঠাৎ মনে হল একটা বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল শিবলিঙ্গের গায়ে। সেটা আমার চোখের ভুলও হতে পারে তবে সে ক্ষণিক আলোর ঝলসানিতে আমার মনের মধ্যে এক অব্যক্ত আনন্দের অনুভূতি জাগল। আমি থর থর করে কাঁপতে লাগলাম।

করপাত্রীজী আমার হাত ধরে নিয়ে যেতে লাগলেন একটা উদ্যানের দিকে। 'উদ্যান' বলছি এইজন্য যে এখানে পাঁচমিশেলী বহু বুনোফুলের গাছ আছে। যেন কেউ কেয়ারি করে সাজিয়ে রেখেছে। একটি বিরাট বটগাছ ছায়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে প্রায় ৫০০ বর্গগজ এই পার্বত্য প্রান্তরকে। বটগাছের তলায় গিয়ে আমাকে নিয়ে বসলেন। এদিকটা দেখছি, ধর্মশালা ও সদাবর্তের পিছনদিক। আমার পিছনে পিছনে এসেছেন মোহান্তজী এবং নাগা সন্ন্যাসীর দল। করপাত্রীজী বললেন—এহি স্থান আপলোগোঁকো ঠারনেকে লিয়ে আচ্ছাই হোগা। ক্যা কিয়া যায়েগা, ধরমশালামেঁ হাপেশ্বর মহাদেওকা ভক্তলোগ্ পহেলেসে দখল করলিয়া। এই বলে তিনি কারও কাছে শঙ্খ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। রতনভারতীজীর কাছে একটি শঙ্খ ছিল, তিনি তা বার করতেই তাঁকেই বললেন একবার শঙ্খধ্বনি করতে। শাঁখ বাজানোর দু'তিন মিনিটের মধ্যে একজন দৌড়ে এলেন আমাদের কাছে। তাঁর পিছনে পিছনেই এলেন প্রায় দশজন লোক শালপাতা, পানীয়জল এবং চ্যাঙারী ভর্তি পুরী ও লাড্ডু নিয়ে। করপাত্রীজী এক হাত পেতে একটা লাড্ডু নিলেন। তিনি পূর্ব হতেই বলে রেখেছিলেন সদাবর্তের তত্ত্বাবধায়ককে। সদাবর্তের লোকেরা আমাদেরকে পরিবেশন করে চলে গেলেন। আমাদের খাওয়া যখন শেষ হল, তখন চারটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। 'সামকা বখৎ ফিন্ ভেট হোগা' এই বলে করপাত্রীজীও চলে গেলেন। আমরা বুঝতে পারলাম, চারটায় যেসব দর্শনার্থী ভক্তদের সঙ্গে কথা বলবেন বলেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই সেখানে গেলেন। আমরা বটগাছের ছায়ায় শুয়ে-বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, প্রায় সাড়ে পাঁচটায় উঠে বসলাম। পা দুটো টাটিয়েছে বটে তবে ধর্মরায়ের মন্দিরে পৌঁছেছিলাম যে অবস্থায়, সেরকম কষ্টপ্রদ অবস্থা নয়। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই রমনীয়। পর্বতমেখলা নদীপ্রবাহের ধারা এবং গম্ভীর সৌম্য প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে স্বতঃই হৃদয় মন নিবিড় তপস্যার মধ্যে ডুবে যেতে চায়!

মোহান্তজীর ইচ্ছানুসারে আমরা মন্দিরের কাছাকাছি নর্মদার তটে গিয়ে বসলাম। আমাদের জিনিষপত্র পড়ে রইল অরক্ষিত অবস্থায়। এখানে চোরের ভয় নাই। সকলেরই মনে শান্তি এই ভেবে যে শূলপাণির ঝাড়ির

কিছু অংশ বাকী থাকলেও এই পথের ভয়ঙ্করতম হাপেশ্বরের জঙ্গল আমরা নিরাপদে অতিক্রম করে এসেছি। সূর্য অস্ত যাচ্ছেন। তাঁর অস্তকালীন রক্তরাগরশ্মির ছটায় গোটা পশ্চিম আকাশ রঞ্জিত। তারই প্রতিফলন পড়েছে নর্মদার বুকে। অপরূপ! অপরূপ! এ দৃশ্যের বর্ণনা আমার সাধ্যে কুলাবে না।

ঢং ঢং করে তিনবার ঘন্টাধ্বনি হল মন্দিরে। আরতির সংকেত। আমরা নর্মদার জল স্পর্শ করে মন্দিরে এসে দাঁড়ালাম। পুরোহিতমশাই আরতি আরম্ভ করলেন। কি আশ্চর্য, এসময় হাপেশ্বর মহাদেবকে জড়িয়ে নাই কোন সাপ। আজ মন্দিরে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছে। প্রায় আধঘন্টা ধরে আরতি করে রক্তচন্দনের গাঢ় প্রলেপ দিয়ে পুরোহিতমশাই হিমচন্দনের কাজ শেষ করলেন। আমরা প্রণাম করে ফিরে গেলাম বটগাছের তলায়। সদাবর্তের লোক এসে একটি লণ্ঠন জ্বেলে বটগাছের লম্বা ঝুরিতে টাঙিয়ে রেখে গেছেন; বোধহয় করপাত্রীজীর নির্দেশ ছিল। মোহান্তজী নির্দেশ জারী করলেন, হাপেশ্বর জঙ্গল অতিক্রম করে এসেছি, এখান হতে অনেকটা দূরে জঙ্গল। অতবড় ভয়ঙ্কর জঙ্গল যাঁর কথায় নির্ভর করে পেরিয়ে এলাম, সেই করপাত্রীজী স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন, তখন এখানে আর ধূনী জ্বালার দরকার নাই। নর্মদার দিক থেকে সুন্দর ঝিরঝিরে হাওয়া বয়ে আসছে। রাত্রিটা এখানে ভালভাবেই কাটাতে পারব। ধূনী জ্বালা হল না, আমরা যে যার আসন বিছিয়ে সান্ধ্যক্রিয়াতে বসলাম। আমাদের মাঝখানে মোহান্তজীর মৃগচর্মটি পেতে রাখা হল করপাত্রীজীর জন্য।

রাত্রি প্রায় ৮টা নাগাদ 'হর নর্মদে' বলতে বলতে যেন অন্ধকার ভেদ করে করপাত্রীজী আবির্ভূত হলেন। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বসতে দেওয়া হল। তিনি মৃগচর্মের উপর বসেই বললেন—আসার সময় ২নং ডুংরিতে একটা বাঘ ডুংরির উপর দাঁড়িয়ে ঘন ঘন হুঙ্কার ছেড়ে তোমাদের সঙ্গে খুব কৌতুক করেছে না! আমি শেষ পর্যন্ত তাকে ঝর্ণার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছলাম। তিনি এইকথা বলার পরেই মোহান্তজী ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে বলে উঠলেন—ক্যা লছমন্ ভেইয়া হম্ উসবখৎ কহা কি নেহি, করপাত্রীজীকা কৃপাদৃষ্টি হম্‌লোগোঁকা উপর জরুর হ্যায়। ইসীওয়াস্তে এ্যাতনা ভয়ংকর জঙ্গলমেঁ কোঈ জানোয়ারকো হামলা নেহি হুয়া।

এইসময় আমি করপাত্রীজীকে উদ্দেশ্য করে বললাম—ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং এখানকার সকলেই আপনাকে একজন অতি উচ্চকোটির মহাত্মা বলে বিশ্বাস করি। আপনি শুধু বিভূতি দেখিয়েই আমাদেরকে ভুলিয়ে রাখবেন না। আপনার সাধন সম্পদের যৎকিঞ্চিৎ আমাদেরকে দান করলে তা বরং আমাদের চিরকালের সঞ্চয় হয়ে থাকবে। আপনি আমাদের বিপদের বন্ধু সন্দেহ নাই। ভয়ঙ্কর দুর্গম জঙ্গল পথে শুধু হিংস্র জন্তু জানোয়ারই নয়, ভীল দস্যুদের হাত থেকেও কোটেশ্বর মন্দিরে আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন, আমাকে এবং যতীন্দ্রজীকে ত নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেই রক্ষা করেছেন। তবুও হয়ত একদিন কালের ব্যবধানে আপনাকে অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন যোগী বলেই মনে হবে; আপনাকে শ্রেষ্ঠ যোগীন্দ্র বলে ভুলে যাব! আমার নিজের মানসিক গঠনের দিকে তাকিয়েই এ কথা বলছি।

—ক্যা আপ যোগীয়োঁকে বিভূতিমেঁ বিশোয়াস নেহি রাখতে? পাতঞ্জল যোগদর্শনকী বিভূতিযোগ আপ্ পড়া কি নেহি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মুঝে ইয়াদ আতী হৈ, আপ মুঝে কোটেশ্বরমেঁ 'মহাঐন্দ্রজালিক' কহা থা। লিকিন্ যোগজ বিভূতি কভী ইন্দ্রজাল নেহি হ্যায়।

—পাতঞ্জল যোগদর্শনের বিভূতিযোগ পড়ব না কেন? পড়েছি, তবে নিজের আধার এবং অধিকার অনুযায়ী বুঝে রেখেছি। তামাম্ হিন্দুস্থানের সাধারণ লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখুন শতকরা ৯৯ জন Miracle monger। সাধুর কঠিন সাধনা লব্ধ বিভূতির আকর্ষণেই সবাই সাধুর কাছে ভীড় জমায়। অত্যন্ত নিম্নকোটির সাধুরাই উক্ত শিষ্যদেরকে বিভূতির চমকেই মাতিয়ে রাখে। সংসারী লোকের জাগতিক কামনা বা বাসনা পূরণের ঠিকেদারী গ্রহণ করার জন্যই যেন সাধুর তপস্যা! এ জিনিষ বৈদিক ঋষিরা পছন্দ করতেন না, বুদ্ধদেবও পছন্দ করতেন না। কথিত আছে, একবার ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন, যেখানে নৌকার পাটনীকে একটি কড়ি দিলেই সহজেই নদী পার হওয়া যায়, সেখানে জলের উপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হবার জন্য অলৌকিক শক্তি অর্জনের সাধনা সময় ও শক্তির অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়। ভগবান বুদ্ধের এই বাণী স্পষ্টতঃই আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, সত্যোপলব্ধিই আসল, সত্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে অলৌকিক কায়দা কসরৎ নিতান্তই নিষ্ফল ব্যায়াম মাত্র। কাজেই সেই বিভূতির

সাফাই গাওয়ার লাভটা কি হয়? 'অঙ্গুত্তর নিকায়' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে মিরাকল্ (Miracle) বা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মনোভাব আরও প্রকটভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি যোগবিভূতির নামে প্রচলিত অলৌকিক ক্রিয়া কলাপকে তিনটি স্তরে ভাগ করে গেছেন যথা—(১) ভোজবাজী—যেমন সহসা আবির্ভাব সহসা তিরোভাব, শূন্য হতে নানা বস্তু আনয়ন, হিংস্র জন্তু বা কঠিন রোগ হতে বাঁচানো ইত্যাদি (২) অন্যের মনের কথা বলে দেওয়া (৩) সদুপদেশ অর্থাৎ তত্ত্বোপদেশে জীবনের পট পরিবর্তন। এই তিন রকম অলৌকিক কর্মের মধ্যে বুদ্ধদেব শেষোক্ত পদ্ধতিটিরই মহিমা কীর্তন করেছেন এবং প্রথম দুটিকে নিম্নস্তরের জাদু-কৌশল বলে অভিহিত করে গেছেন। সদুপদেশ দিয়ে সত্যই যে মিরাকল্ ঘটানো যায় তা নিষ্ঠুর দস্যু অঙ্গুলীমালের কাহিনীর মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে। দস্যু অঙ্গুলীমাল বুদ্ধের উপদেশে হিংস্রকের জীবিকা অর্থাৎ দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে তপস্বী আজীবকে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বুদ্ধদেব অলৌকিক ক্রিয়া কৌশলকে মূল্য না দিলে কি হবে, তাঁর ভক্তগণ, হিন্দুধর্মের ভক্তগণ যেমন স্ব স্ব গুরুর ভোজবাজীর ঢক্কা নিনাদ করেন, ঠিক তেমনি ভাবেই অলৌকিক কাহিনীর লতাতন্তুর জালে তাঁকে বেষ্টন করে পরবর্তীকালে তাঁর মহিমাকে ম্লান করে দিয়েছে। আমরা এই যে ত্রিশজন শূলপানির ঝাড়িতে অকলবাড়া হতে কোটেশ্বর পর্যন্ত এখনও আপনার মধ্যে যে অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ দেখছি, আপনার এই অলৌকিকত্ব ত্রিশজনের মুখ দিয়ে কিরকম কুসুমিত পল্লবিত হয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার স্থিরতা নাই। বলা বাহুল্য তাতে আপনার মহিমাকে ছোট করাই হবে।

ধর্মের মূল লক্ষ সত্যোপলব্ধি। দিব্যজ্ঞান ও শ্রদ্ধাপ্রীতি হৃদয়ে যে আনন্দস্বরূপকে প্রতিষ্ঠা করে তার সাযুজ্য লাভই মানুষের চরম লক্ষ্য। এই চিরস্থির লক্ষ্যটিকেই মানুষের নানা মত ও পদ্ধতির রঙে ও আকারে গড়ে তুলেছে বলেই দেশে দেশে কালে কালে তার রূপ এত বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সেই কারণে ধর্মত মানুষের জীবনে সৃজনশীলতারই একটি প্রকাশ। বর্তমান ভারতবর্ষে শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় নামে একজন মনীষী চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটেছে। আমি পরিক্রমায় আসার কয়েক মাস আগে তার লেখা Reason

Romanticism & Revolution নামে একখানা ইংরাজী বই পড়েছিলাম। তাতে তিনি মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশের যে সুন্দর ইতিহাস রচনা করেছেন, তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে, অগ্ন্যুৎপাত, শিলাবৃষ্টি, চোখ ধাঁধান বিদ্যুতের চমক ভূমিকম্প জলপ্লাবন প্রভৃতি অতি সাধারণ ঘটনাগুলিই মূলতঃ মানুষের চিন্তায় এক অমিত শক্তিশালী কঠোর নিষ্ঠুর এবং সর্বব্যাপী অস্তিত্বের জন্ম দেয় এবং তার তুষ্টিসাধনের জন্য আদিম মানুষ নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ তন্ত্র-মন্ত্র পূজা অর্চনা প্রভৃতি সুরু করে। ক্রমে, প্রথম যুগে ওঝারা পরবর্তীকালে তথাকথিত গুরু ও সাধুবর্গ সাধারণ মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার মাঝখানে সংযোগরক্ষাকারীর ভূমিকাটি সুকৌশলে একচেটিয়া করে নিয়েছে।

ক্রমে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যতই উন্নত হতে থাকল, তার ধ্যান-ধারনায় ততই সচ্চিদানন্দময় সত্তার উপলব্ধি ঘটতে থাকল। নিষ্ঠুর আদিম নিয়তি হতে সর্বকল্যাণের আকর ও আধার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপলব্ধিতে এই যে উত্তরণ, তা যে মানুষের বুদ্ধি ও সংস্কৃতির পরম অভিব্যক্তি সে কথা অবনতমস্তকে স্বীকার করতেই হবে। একথাও স্বীকার করতে হবে যে এই উপলব্ধিতে পৌঁছবার পথে মানুষের মস্তিষ্ক হতে বিকিরিত অন্তর্লীন এক যুক্তিশীলতাই সদা সর্বদা তাকে পথ দেখিয়ে চলেছে।

তথাপি মানুষ যে ভেল্কিতে ভোলে, ধর্মীয় পরিচ্ছেদে আচ্ছন্ন-তনু জাদুকরের হাত সাফাই-এর কারসাজিতে ঈশ্বর ভেবে তারই পায়ে গড়িয়ে পড়ে, এটি আদিম জীবনের অপরিস্ফুট মনেরই প্রবল মূঢ়তা।

—বহুত সুক্রিয়া। ইসীওয়াস্তে আপ্‌কো হম্ পিয়ার করতা হুঁ, হমারা দোনো দোস্তভি কৃপাদৃষ্টি রাখতে হৈ। আপ্ সাফ্ সাফ্ বাতাইয়ে, আপ্ ক্যা মাংগতা হৈ।

—আমি মাগছি সচ্চিদানন্দে উত্তরণের অব্যর্থ দিব্য পথ। বৈদিক ঋষি এবং পরবর্তীকালের অনেক সিদ্ধ মহাজন অনেক পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। এখানে উপবিষ্ট বর্ষীয়াণ নাগা সন্ন্যাসীরা নিশ্চয়ই সেই পথের কোন না কোন নিশানা পেয়ে থাকবেন। গুরুকৃপায় আমিও যে কোন তরিকা বা পদ্ধতির সন্ধান পাই নি, একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। তবুও চাচ্ছি, আপনিও আপনার 'প্রসাদ' রূপে আমাদেরকে কিছু দান করুন, যা পেয়ে

আমাদের বিপদের বন্ধুকে চিরকাল মনে রাখতে বাধ্য হই, ভুলতে চাইলেও না ভুলতে পারি।

এতক্ষণ ধরে আমার একতরফা বক্‌বকানিতে সবারই মনে যে বিরক্তির আভাস ফুটে উঠেছিল, তা অনুমান করতে পারছিলাম কিন্তু এখন লণ্ঠনের টিম্‌টিমে আলোতেও দেখতে পেলাম, সকলেরই মন উল্লসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাপ্তির সম্ভাবনায় সকলেই উদগ্র এবং উন্মুখ হয়ে উঠেছেন।

করপাত্রীজী জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—'তোমরা যে যার আসনে বসেই হাপেশ্বর মহাদেব এবং নর্মদামায়ীকে প্রণাম কর। প্রণাম করে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক। আমি তোমাদের হৃদয়ে স্ব স্ব গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছি অর্থাৎ গুরুকে চিরকালের জন্য জাগ্রত করে দিচ্ছি। অতঃপর তোমাদেরকে আর গুরুদত্ত মন্ত্র আয়াস করে জপ করতে হবে না। গুরুই হৃদয়ে বসে জপ করবেন। এই পথও সচ্চিদানন্দ সত্তায় উত্তরণের অন্যতম সহজ ও সিদ্ধপথ। এই পদ্ধতিকে কেউ বলেন হংসযোগ। নিজেকে জপ করতে হয় না, কেউ যেন হৃদয়ে বসে অবিচ্ছেদে জপ করে চলেছেন, এইজন্য কেউ একে অজপা গায়ত্রী সাধনও বলে থাকেন।'

তাঁর নির্দেশানুসারে আমরা হাপেশ্বর মহাদেব এবং নর্মদামাতাকে প্রণাম করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। তাঁর দেহ থেকে চারদিকে একটা জ্যোতির আভা ফুটে উঠল। তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ ধীরে ধীরে মাটি থেকে প্রায় চারফুট উঁচুতে শূন্যে ভাসতে লাগল। তিনি বলে চলেছেন—'মানব দেহে প্রাণশক্তি নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস রূপে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই শ্বাস বহির্গমন কালে 'হং'-রূপে এবং ভিতরে প্রবেশ কালে 'সঃ'-রূপে ধ্বনিত হয়। প্রত্যেক মানুষই সুস্থ শরীরে অহোরাত্রে ২১৬০০ বার স্বাভাবিক-ভাবে এই মন্ত্র নিজের জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে জপ করে চলেছে। মহাদেবের কৃপাতে এই যোগ প্রাপ্ত হলে ঐ জপ সুষুম্না মার্গে বিপরীতভাবে নিষ্পন্ন হতে থাকে অর্থাৎ হংস তখন সোহং রূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্বভাবতঃ 'হংসঃ' মন্ত্র মানবের অজ্ঞাতসারে সদা সর্বদা ঈড়া কিংবা পিঙ্গলা নাড়ীতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রূপে সঞ্চারিত হচ্ছে। সুষুম্না পথ ত জন্মের সাথে সাথে রুদ্ধ হয়ে যায়। যোগসিদ্ধ গুরুর কাছ হতে এই পথ খুলবার সঙ্কেত জেনে নিতে হয়। আমি সেই পথ আজ খুলে দিচ্ছি। সকল রকম সাধনার মধ্যে

এই সাধনকেই মহাদেব সহজ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি স্বয়ং পার্বতীকে বলেছিলেন—মনকে একাগ্র করার এর চেয়ে সহজ, সহজাত এবং স্বতঃস্ফূর্ত পথ আর নাই।

হকারেণ বহির্যান্তং বিশন্তং চ সকারতঃ।
চিন্তয়েৎ পরমেশানি জীবন্তং পক্ষিরূপিণং॥

অর্থাৎ হকার দ্বারা শ্বাস বাইরে বেরিয়ে যায় এবং সঃ-কার দ্বারা প্রশ্বাস ভিতরে আসে। অয়ি পরমেশ্বরি! একে একটি জীবন্ত পক্ষীরূপে চিন্তা করবে।

অস্য হংসস্য দেবেশি নিগমাগম পক্ষকৌ.
উভাবপি চাগ্নিসোমৌ বক্ষো হংস শিরো ভবেৎ॥

হে দেবেশি! এই হংসরূপ পক্ষীর নিগম এবং আগম অর্থাৎ বেদ এবং শৈবাগম দুটি পাখা বা ডানাস্বরূপ। অগ্নি এবং সোম এই পক্ষীর বক্ষ ও শিরে অবস্থান করে হংস নামক পক্ষীকে রক্ষা করে।

বিন্দুস্ত্রয়ং শিখানেত্রে মুখং নাদং প্রকীর্তিতঃ।
শিবশক্তি পদদ্বন্দ্বং কালাগ্নি পার্শ্বযুগ্মকম্॥

তিনটি বিন্দু অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, দুই নেত্র ও ভ্রূমধ্যে স্থিত এবং মুখে নাদরূপে এঁর স্থান। শিব ও শক্তি এই পাখীর দুটি পা এবং দুই পার্শ্বে কালাগ্নি অবস্থিত!

হংস পরমহংসোঽহয়ং সর্বব্যাপী প্রকাশবান্।
সূর্যকোটি প্রকাশশ্চ স্ব প্রকাশেন ভাসতে॥

শিব বলছেন, এই হংসরূপ জীবই পরমহংস রূপ স্বয়ং আমি;, আমি কোটি সূর্যের সমান প্রকাশমান হয়ে নিজের জ্যোতির দ্বারা জগৎকে উদ্ভাসিত করে রেখেছি।

এই হল তত্ত্ব, এইবার এই তত্ত্ব তোমাদের প্রত্যেকের বোধে ফুটিয়ে তুলবার জন্য তোমাদের চোখ বন্ধ করতে বলছি, মনকে শূন্য (vacate) করতে বলছি, তথাকথিত অজপার ধারায় দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে যে মন্ত্রস্রোত তোমাদের কারও কারও মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তাও বন্ধ

করে দিচ্ছি, শক্তিসঞ্চার করে প্রত্যেকেরই সুষুম্নার রুদ্ধ দ্বার খুলে দিচ্ছি, প্রণাম কর মহর্ষি পতঞ্জলিকে, আবাহন ও বরণ করে নাও সেই শেষাচার্যকে—

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচা
মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং
পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরাণতোঽস্মি ॥

আমিও, যিনি যোগদর্শন প্রণয়ন করে চিত্তমল নাশের, পাণিনীর মহাভাষ্য প্রণয়ন করে বাক্যমল নাশের এবং চরকসংহিতা প্রণয়ন করে দেহমল নাশের সাধনোপায় প্রদর্শন করেছেন, মুনিদের প্রকৃষ্টরূপে বরণীয় সেই পতঞ্জলিদেবকে নতমস্তকে প্রণাম করছি।

লক্ষ্মণভারতী, যতীন্দ্রভারতী, রতনভারতী! তোমরা চোখ খুলতে বৃথাই চেষ্টা করছ। যে তরল জ্যোতির ধারা বিদ্যুতের ঝলকের মত সূত্রাকারে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্নাপথে বয়ে চলেছে, মুহূর্তকাল পরেই তা তোমাদেরকে আনন্দমত্ত করে তুলবে, আদিগুরু, গুরুণাং গুরু মহাদেব তোমাদের স্ব স্ব গুরুর রূপ ধরে প্রকট হবেন, অতঃপর গুরুই তোমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে, দিব্যমন্ত্র জপ করবেন। ব্যুত্থানের পর তোমরা আমৃত্যু বুঝতে পারবে, বুকের ভিতরে কেউ বসে জপ করে চলেছেন, বিদায়…। তোমাদের উপর আমার নিয়ত দৃষ্টি থাকবে…।

আমার যখন চেতনা এল বা ঘুম ভাঙল কিংবা আনন্দ-ঘন সুষুপ্তি হতে জাগরণ ঘটল, ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখি, গাছপালায় তখনও অন্ধকার আছে, দেখলাম প্রায় সকলেই চোখ খুলে বসে আছেন, কিন্তু কেউ উঠে দাঁড়াতে পারছেন না, কেউ বা টলটলায়মান অবস্থায় দাঁড়াতে গিয়ে আবার বসে পড়ছেন। আমার মনে হচ্ছে সমগ্র জগৎ জুড়ে অসংখ্য শঙ্খঘন্টা, ঝাঁঝ, ঢোল, খোল, করতাল, শিঙ্গা, ডম্বরু, বাঁশী বেজে চলেছে। ক্রমশঃ সেই যন্ত্রসঙ্গীত ঊর্ধ্বাকাশে মিলিয়ে গেল, সকাল হয়ে গেছে। সকলেই স্তব্ধ-বিস্ময়ে দেখলাম একটা বিরাট সাপ আমাদের সেই উদ্যানের চারদিকে দ্রুতগতিতে তিনবার প্রদক্ষিণ করে চলে গেল। দুটো ময়ূর 'কেকা কেকা' শব্দ করতে করতে সামনের আমলকী গাছে গিয়ে উড়ে বসল। আমাদের

পিছনদিকেই বসেছিল ঐ দুটো ময়ূর। তাদের আচমকা 'কেকা' ধ্বনিতে পিছন ফিরে তাকালাম। মাথার উপর অজস্র পাখী ঘুরপাক খেয়ে উড়ছে। হঠাৎ দেখলাম আকাশ ভেদ করে বিদ্যুৎগতিতে নেমে আসছে একটা পাখী, ছোঁ মারার ভঙ্গীতে, আমাদের মাথার উপর প্রায় ৫০ ফুট দূর থেকে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আবার ঘুরে (rebound করে) উড়ে গেল উপরদিকে। চোখের সামনে যেন যুদ্ধ বিমানের চক্করবাজি উঠা-নামার খেলা দেখলাম। লক্ষ্মণভারতীজী জড়িত কণ্ঠস্বরে বললেন—এই পাখীর নাম বাজবৈরি। আমাদের গুরুদেবের একজন বৈমানিক শিষ্য ছিল। গুজরাটী। সে একবার বলেছিল বিমান থেকে স্টপওয়াচ আর দূরসঞ্চার ব্যবস্থার সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে বাজবৈরি ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগে উড়তে পারে। বাজবৈরির দ্রুত আগমন ও প্রস্থানের ফলে পাখীগুলো সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের এ কী অবস্থা! কেউ স্বাভাবিক অবস্থায় নাই, শরীর টলছে, দুলছে, কোন নেশার ঘোরে নয় আনন্দের ঘোরে সবারই ডগমগ অবস্থা। করপাত্রীজী সত্যই কি বিদায় নিলেন! তিনি কখন যে অন্তর্ধান করেছেন আমরা কেউ জানতে পারি নি। সূর্য উদিত হয়েছেন তাঁর প্রাতঃকালীন রশ্মি বটগাছ ভেদ করে কিঞ্চিৎ ক্ষীণভাবে এসে পড়ছে আমাদের গায়ে। আমরা মোহান্তজীর নির্দেশে সকলেই গদগদ হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলাম মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে। সকলেরই মুখে চোখে আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটে উঠেছে। কেউ কারও অনুভূতি বলতে চাচ্ছেন না, কিন্তু সকলের মুখে চোখে যে আনন্দের ছটা তা কেউ লুকাতে পারছেন না।

আমরা লাঠি ধরে ধরে কমণ্ডলু হাতে নিয়ে নর্মদার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মন প্রাণ তৃপ্তিতে ভরে আছে। নর্মদায় স্নান করে সেই তৃপ্তি আরও শতগুণে বেড়ে গেল। হাপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে, এইবার পূজা হবে। আমরা মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এখন আর শিবলিঙ্গকে জড়িয়ে কোন সাপ নাই। আজ মন্দিরে আমরা এবং স্থানীয় জনা পনের লোক ছাড়া বহিরাগতদের কোন ভীড় নাই। করপাত্রীজী অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দর্শনার্থী ভক্তরা সবাই চলে গেছেন। ধর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক মোহান্তজীকে বললেন—'এখন ধর্মশালা খালি' আপনারা স্বচ্ছন্দে ধর্মশালায় গিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু মোহান্তজী তাঁকে জানালেন—যে

উদ্যানে বটগাছের তলায় আছি, ঐ উদ্যান আমাদের কাছে তীর্থস্বরূপ, আজকের দিনটা থেকে কালই আমরা চলে যাবো। কাজেই আপনাকে আর কষ্ট দিব না। আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। পুরোহিতমশাই-এর পূজা দেখতে লাগলাম, তিনি এক কলসী নর্মদার জল ঢেলে শিবলিঙ্গের গাত্র ভাল করে মার্জনা করে পঞ্চামৃত ঢেলে দিলেন 'ঈশ্বর'রূপী রুদ্রের উপর। চতুষ্পত্রী বিল্বপত্রে রক্তচন্দন মাখিয়ে তিনি গুণে গুণে ২১টি বিল্বপত্র অর্পণ করলেন মহাদেবের মাথায়। প্রতিটি বিল্বপত্র অর্পণ করার সময় তিনি উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করলেন—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। এই মন্ত্রপাঠ করেই তিনি ২১টি বিল্বপত্র ঘি-এ ডুবিয়ে হবনও করলেন। কেবল হোমের সময় মূল মন্ত্রের সঙ্গে মহাদেবের ত্র্যক্ষর বীজ যোগ করে 'স্বাহা' শব্দটি উচ্চারণ করলেন।

পূজা শেষ হল, আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম হাপেশ্বর প্রভুকে। মোহান্তজী এবং আমার ইচ্ছা হয়েছিল নিজ হাতে শিবপূজা করার। এই ইচ্ছা ব্যক্ত করতেই পুরোহিত মশাই খুব বিনয় সহকারে জানালেন, নিয়ম নাই। পুরোহিত ছাড়া আর কেউ নিজ হাতে হাপেশ্বর মহাদেবের পূজা করতে পায় না। আমরা বংশানুক্রমে চার ঘর পুরোহিত এখানে আছি। যখন যে পুরোহিতের পালা পড়ে, সেই পুরোহিতকে সারাদিন নির্জলা উপবাসে থাকতে হয়, সান্ধ্য আরতির পর আমরা মুখে জল ও অন্ন তুলতে পাই। আপনারা আমার কোন অপরাধ নিবেন না। আপনারা ইচ্ছা করলে মন্দিরের বারান্দায় বসে স্তব পাঠ, জপ এবং হোম ইত্যাদি প্রাণভরে করতে পারেন। যোগী সাধু মুনি সকলেরই প্রতি এই নিয়ম প্রযোজ্য। পিতামহের মুখে শুনেছি নর্মদাতটের সর্বজনমান্য মহাত্মা কমলভারতীজীও এ নিয়ম ভাঙ্গেন নি। তবে মহাযোগী করপাত্রীজীর কথা স্বতন্ত্র। তিনি সহসা যত্র তত্র আবির্ভূত ও তিরোভূত হতে পারেন। গতকাল এখানে পৌঁছেই আপনারা নিজের চোখেই দেখেছেন, তিনি সহসা মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, দরজার তালা ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভেঙ্গে পড়ল। এঁদের মত মহাপুরুষ সব নিয়মের উর্ধে, স্বয়ং হাপেশ্বরজী তার বোঝাপড়া করবেন ; এই নিয়মভঙ্গের দোষ বেচারা পুরোহিতকে স্পর্শ করবে না। হর নর্মদে।

পূজার পর মন্দিরে তালা পড়তেই আমাদের আশ্রয়স্থল সেই বটগাছের

তলায় ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই এলেন সদাবর্তের ম্যানেজার। তিনি করজোড়ে জানালেন 'অতি প্রত্যূষে এসে মহাত্মা করপাত্রীজী আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন আপনাদের ভিক্ষার ব্যবস্থা করতে। দয়া করে এই ভিক্ষা গ্রহণ করার অনুমতি হোক। এই সদাবর্ত চলছে করপাত্রীজীরই দয়ায়। কাজেই আপনাদের সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। বেলা ১টার মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' এই বলে তিনি মোহান্তজীকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

আমি মোহান্তজীর অনুমতি নিয়ে মহর্ষি তণ্ডিকৃত স্তবরাজের পুঁথিটি হাতে নিয়ে হাপেশ্বরের মন্দিরে গেলাম। পুরোহিত মশাই তালাবদ্ধ দরজার বাইরে বসে জপ করছেন। দুটি ভীমকায় কুকুর পাহারা দিচ্ছে। স্তবরাজ পাঠের শেষে যখন ফিরে এলাম তখন দেখি সদাবর্ত হতে খাবার পৌঁছে গেছে। বেলা তখন ১টা ১৫ মিনিট। সদাবর্তের লোকজনই শালপাতা পেতে আমাদের খিঁচুড়ী পরিবেশন করলেন।

খাবার পর সকলেই খুব পড়ে পড়ে ঘুমালাম। বেলা সাড়ে চারটায় ঘুম ভাঙল। আমি মোহান্তজীকে বলে যতীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে হাপেশ্বর মন্দিরের দিকে বেড়াতে গেলাম। মোহান্তজী বললেন—যাও, আমরা একটু পরে মন্দিরের দিকে যাব, নর্মদাতটে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে একেবারে আরতি দেখে ফিরব। ধর্মশালা এবং সদাবর্তের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গিয়ে প্রায় ১০০ ফুট দূর থেকে দেখছি, মন্দিরের দরজা খোলা, আরও কাছাকাছি হতে মন্দিরের ভিতরে দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেলাম জলজল্ করছেন হাপেশ্বর লিঙ্গ। তাঁকে জড়িয়ে একটি সাপ ফণা বিস্তার করেছে। যতীন্দ্রকে বললাম—'তাকিয়ে দেখুন মহাদেবের দিকে, কি আশ্চর্য এখনও তাঁকে সাপ জড়িয়ে আছে।'

—আপনার কি দেমাক বিগড়ে গেছে। এখনও পাঁচটা বাজেনি। মন্দিরের দরজা বন্ধই আছে। তাঁর কথায় আমি চোখ দুটো রগড়ে নিলাম ভাল করে। কিন্তু আমার চোখে সেই একই দৃশ্য! মন্দিরের কাছে এসে দেখলাম, সত্যই মন্দিরের দরজা তালা বন্ধই আছে। দরজার বাইরে পুরোহিত মশাই পূর্ববৎ বসে বসে জপ করছেন। আমার গাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আমি ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে দু'মিনিট পড়ে থাকলাম। প্রণাম

করে উঠে যতীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে সেই চতুষ্পত্রী বিল্ববৃক্ষের তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে প্রায় ৩০ ফুট দূর হতেই কলকল নাদে বয়ে যাচ্ছেন নর্মদা। নর্মদা গর্ভ হতে বড় বড় পাথর ফেলে মন্দিরসহ এই বিল্ববৃক্ষকে বাঁধানো হয়েছে অত্যন্ত মজবুত করে। দুটো বেলপাতা ছিঁড়ে মুখে ফেলে চিবিয়ে খেলাম, অবিকল ত্রিপত্রী বেলপাতার মত স্বাদ। যতীন্দ্রও আমার কথায় একটা বেলপাতা চিবিয়ে খেল। মন্তব্য করল, এখন গাছে বেল ফলবার সময় নয়। গাছে বেল ফলে থাকলে তোমার মনে অহেতুক সন্দেহ জাগত না! ঐ যে মোহান্তজীসহ সবাই আসছেন। চলুন মোহান্তজীর সঙ্গে বেড়াই। আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সঙ্গ নিলাম। কিছুক্ষণ এদিকে-ওদিকে বেড়িয়ে সবাই এসে বসলাম নর্মদার ঘাটে। সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য দুচোখ ভরে দেখতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরেই ঢং ঢং করে ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠল। এবার আরতি হবে। আমরা নর্মদাস্পর্শ করে মন্দিরে এসে দাঁড়ালাম। মন্ত্রপাঠ করতে করতে ভক্তি বিহ্বল কণ্ঠে পুরোহিত মশাই আরতি করছেন মন্ত্রের তালে তালে নাচতে নাচতে। তাঁর কণ্ঠে আরতির মন্ত্র শুনলাম—

কৈলাসশৈলভবনে ত্রিজগৎ জনিত্রীং
গৌরীং নিবেশ্য কনকাদিতরত্নপীঠে।
নৃত্যং বিধাতুমভি বাঞ্ছতি শূলপানৌ
দেবাঃ প্রদোষসময়ে নু ভজন্তে সর্বে॥

প্রদোষকালে কৈলাসপর্বতস্থিত শিবালয়ে ত্রিজগৎ-জননী গৌরীকে রত্নখচিত স্বর্ণময় সিংহাসনে বসিয়ে শূলপানি নৃত্য করতে ইচ্ছা করলে, দেবতারা তাঁর ভজন করতে থাকেন।

বাগদেবী ধৃতবল্লকী শতমখো বেণুং দধৎ পদ্মজঃ
তালোন্নিদ্রকরো রমা ভগবতী গেয় প্রয়োগান্বিতা।
বিষ্ণুঃ সান্দ্রমৃদঙ্গবাদনপটুর্দেবাঃ সমন্তাৎ স্থিতাঃ
সেবন্তে তমনু প্রদোষসময়ে দেবং মৃড়ানীপতিম্॥

সেই সন্ধ্যাকালে তাঁর নৃত্যের অনুযায়ী সরস্বতী বল্লকী ধারন করে, ইন্দ্র বেণু

বাজিয়ে, ব্রহ্মা তালের জন্য হস্ত প্রসারিত করে, লক্ষ্মী গান আরম্ভ করে, বিষ্ণু ঘন ঘন মৃদঙ্গ বাদন করে এবং দেবতারা চতুর্দিকে অবস্থিত থেকে মহাদেবের সেবাতে তৎপর হয়ে পড়েন।

আরতিকালে মন্দিরের মধ্যে একবার বিদ্যুতের চমক দেখলাম। আরতি শেষ হতে মোহান্তজী পুরোহিত মশাই এর হাতে একটি গিনি দিয়ে প্রণাম করলেন হাপেশ্বরকে। গিনিটি হাতে নিয়ে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলেন— গিনি লেকর্ ক্যা করুঙ্গা? ইসমেঁ ক্যা কাম বনেগী? তাঁর এই অনাসক্ত কণ্ঠস্বর শুনে মোহান্তজী ঘাবড়ে গেলেন। মুহূর্তকাল নীরব থেকে বললেন —'মহাদেওজীকে সেবা কো লিয়ে।' আর কোন উত্তর না দিয়ে পুরোহিত-মশাই গিনিটি মহাদেবের গৌরীপট্টের উপর রেখে দরজায় তালা দিয়ে সকলের হাতে এক টুকরো করে বিল্বপত্র প্রসাদ হিসাবে দান করলেন। আমরা প্রণাম করে ফিরে এলাম আমাদের সেই আনন্দ-তীর্থ উদ্যানে।

পরদিন ভোরে উঠেই আমরা নর্মদাস্নান সেরে হাপেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে যাত্রা সুরু করলাম; পশ্চিম দিকের পথ ধরে। নর্মদার কিনারে কিনারে। আজ ত্রয়োদশী তিথি। রবিবার। বিজয়ার পরের দিনই আমরা হাতনী সংগম থেকে যাত্রা করে পৌঁছেছিলাম এই হাপেশ্বর মন্দিরে। করপাত্রীজীর দয়ায় আমাদের প্রাপ্তিযোগ কম হল না। মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। হাপেশ্বর মহাদেব আমাদের স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে রইলেন। মোহান্তজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন— শৈলেন্দ্র! এই মুহূর্তে কি তুমি ভাবছ?

—আপনি কি ভাবছেন, আগে বলুন।

—মহাত্মা করপাত্রীজী গুরুদেবকে আমার বুকে জাগ্রত করে দিয়েছেন, একথা ধ্রুবসত্য। আমার বুকের মধ্যে বসে সত্যই কেউ যেন ছন্দে ছন্দে প্রত্যেকটি হৃদ্‌স্পন্দনের তালে তালে আমার গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করে চলেছে। আমি বেশ রস পাচ্ছি; একটা অপূর্ব সুখানুভূতির আবেশে আমার মন মজে আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা অপরাধবোধও বিবেককে খোঁচা মারছে যে, 'এই কি তোর গুরুনিষ্ঠা? যে কেউ অলৌকিক কোন বস্তু দান করতে চাইবে, তারই কাছে কান পেতে দিবি আর ওড়না পেতে বসে যাবি ভিখারীর মত? আমার পরমগুরুদেবের একটি উপদেশই ছিল—

'গুরুকা দ্বারমেঁ কুত্তা কী মাফিক পড় রহো বাচ্চা!' অর্থাৎ গুরুকেই ধ্যান-জ্ঞান করতে হয়। যা কিছু পাব, তা গুরুর হাত দিয়েই পাব। কাজেই করপাত্রীজীর কাছে পরশু রাত্রে যা পেলাম, তাতে একাগ্র গুরুনিষ্ঠার হানি হল না কি?

এই সময় রতনভারতী মাঝখান থেকে বলে উঠলেন—গুরুজী! ঐটি আমারও প্রাণের কথা। আপনি যেন আমারই বুক ও মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে বলছেন। আমার তন্ মন্ আপনার চরণকমলেই চিরকালের জন্য বিক্রীত হয়ে আছে। কিন্তু কোটেশ্বরে ত দেখেছেন, সাধু কি রকম বিপজ্জনক, আমার ইষ্টমন্ত্রই ভুলিয়ে দিয়েছিলেন! সেই ভয়ে আমার ইচ্ছা না থাকলেও যন্ত্রচালিতবৎ হয়ে যখন খোলা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে বলেছেন, তখন তাকিয়ে থেকেছি, যখন চোখ বন্ধ করতে বলেছেন, তখন চোখ বন্ধ করেছি!

আমি রতনভারতীকে বললাম—তাই যদি করে থাকেন তাহলে আপনি কাপুরুষের মত কাজ করেছেন। গুরুনিষ্ঠ ব্যক্তি কারও ভয়ে মাথা নোয়ান না। গুরু স্বয়ং আনন্দ-ব্রহ্ম এই বোধ থাকলে সে সাক্ষাৎ কালান্তক মৃত্যুকেও ভয় করে না—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন:।

মোহান্তজীকে বললাম—পরশু রাত্রির ঘটনায় আপনার বা কারোরই গুরুনিষ্ঠার হানি হয়েছে বলে আমি মনে করি না। গুরু কি সাড়ে তিন হাত দেহের মধ্যে আবদ্ধ নাকি? মহর্ষি পতঞ্জলি বলে গেছেন—স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥ (সমাধিপাদ সূত্র ২৬)। গুরুসত্ত্বা অনাদি। পূর্বকাল হতে গুরুসত্ত্বার আলোকধারা অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। গুরুর স্থূল দেহের বিনাশ ঘটে, গুরুর অমৃতসত্ত্বার উপর কালের কোন অধিকার নাই, একই গুরুসত্ত্বা দেশে দেশে কালে কালে বিভিন্ন আধারকে আশ্রয় করে বয়ে চলেছেন। আমার বাবা বলতেন একটা bulb fuse হয়ে গেলে আর একটা bulb লাগাতে হয়। Bulb may be different but light is the same. আপনি কি করে জানলেন যে আপনার গুরু স্বয়ং চৈতন্যভারতী কিংবা আমার বাবাই করপাত্রীজীর শরীর ধারণ করে আমাদের সামনে প্রকট হন নি? আমার ত মনে হয়েছে, সেদিন আমার বাবাই করপাত্রীজীর দেহ ধারণ করে তাঁর অসমাপ্ত কাজ

করে গেলেন। তিনি দেহে থাকাকালে আমি দেহেমনে অনধিকারী ছিলাম বলে বা সেই সময় এই মহাপথ প্রাপ্তির লগ্ন বা ক্ষণ আসেনি বলে তিনি যা তাঁর এই অভাগা সন্তানকে দিয়ে যেতে পারেন নি, তা তিনি পবিত্রতম হাপেশ্বর মহাদেবের স্থানে তপোভূমি নর্মদার কোলে দান করে গেলেন; দান করে গেলেন করপাত্রীজীর দেহকে আশ্রয় করে। আর তা ছাড়া করপাত্রীজী কি একবারও বলেছেন যে তিনি নিজেকে আমাদের ধ্যেয় মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন কিংবা নূতন কোন ইষ্টমন্ত্র দান করেছেন? তিনি ত আমাদের বুকের মধ্যে আমাদেরই বুকের ধন স্ব স্ব গুরুমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, স্ব স্ব গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রকেই উদ্বোধনার তড়িৎ সংঘাতে জাগ্রত করে গেলেন। কাজেই বিবেকের গ্লানির কথা আসে কি করে? একথা ত আধ্যাত্মিক পথের পথিক মাত্রেই জানেন, অন্ততঃ প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে—

'রামের গুরু শ্যামের গুরু,
যত্নর গুরু মধুর গুরু,
তোমার গুরু আমার গুরু,
সবার গুরু একই গুরু
বুঝলে তবে সাধন সুরু!'

আমার কথা শুনে মোহান্তজী পথের মধ্যেই জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বললে, শতায়ু হও। কিন্তু প্রথম তোমাকে যে জিজ্ঞাসা করেছিলাম হাপেশ্বর মন্দির থেকে আসতে আসতে সেই মুহূর্তে তুমি কি ভাবছিলে, কথার পিঠে কথা অনেক হল, কিন্তু আসল কথাটা ত বলনি!

আমি বললাম, তখন আমি বিশেষ কিছু ভাবছিলাম না। 'নীরাকারা' নর্মদার জলস্রোত দেখতে দেখতে এই মনোমুগ্ধকর পার্বত্য পথে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের গ্রামের এক বাউলের একটি গান আমার মনে পড়েছিল। আমি সেই গানের ভাষা মনের মধ্যে ভাঁজছিলাম, বাংলা গান, আপনারা তার রসোপলব্ধি করতে পারবেন না, আমিও সাবলীল হিন্দীতে অনুবাদ করতে পারব না।

—তা হোক, তুমি বল। যতীন্দ্র হিন্দীতে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিবে। অগত্যা আমি গানের ভাষা তাঁদেরকে শোনালাম, গানটির নাম—'কে আমি? কে তুমি?'

তোমার মাঝে রয়েছি আমি,
জেনেও আমি জানি না।
আমার মাঝে রয়েছ তুমি
জেনেও আমি জানি না!
আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
রয়েছে মিশে একই সঙ্গে—
তোমার রূপ যে বিশ্বভুবন,
চিনেও আমি চিনি না!
মনের ওপারে রয়েছ তুমি
রয়েছি আমি এপারে,
ভাবের খেয়ায় পাল তুলে
দেখতে যাই যে তোমারে!
আমার মনের এপার ওপার
তুফান এলে হয় একাকার—
তখন কোথায় তুমি, কোথায় আমি
কিছুই খুঁজে পাই না,
আমার মাঝে রয়েছ তুমি
জেনেও আমি জানি না!!

যতীন্দ্রজী এই গানটির ভাবার্থ হিন্দীতে অনুবাদ করে নাগা সন্ন্যাসীদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। আমাদের দু' ঘন্টা হাঁটা হয়ে গেল, বেলা ৯টা বেজে গেছে। সহসা লক্ষ্মণভারতীজী ডাক দিয়ে উঠলেন—'চড়াই বা।' আমরা সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি আমরা বিন্ধ্যপর্বতের বিস্তৃত ঢালের মুখে এসে পৌঁছেছি। এতক্ষণ প্রায় সমতলভূমির উপর দিয়ে হাঁটছিলাম, পথের দুধারে বড় বড় গাছের জটলা থাকলেও যে সব দুর্ভেদ্য অন্ধকারময় জঙ্গল পেরিয়ে

এসেছি, তাদের তুলনায় একে জঙ্গলই বলা চলে না। আমরা এবার চড়াই পথে উঠে এলাম একটা মালভূমির উপর। পাহাড়টা এদিকটায় আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে যেখানে এসে নেমেছে সেখানে উঁচু নিচু ভাঙা জমি, অবশ্যই প্রস্তরময়। তারই এক একটা খোঁদলের মধ্যে এলোমেলো হয়ে আছে চাষের ক্ষেত। অন্যদিকে আছে প্রায় চার পাঁচশ ফুট নিচু গভীর খাদ। নিচে নালা। আর তারপরেই একটা বিরাট গহ্বর পার হয়ে সোজা উঠে গেছে আব একটা দীর্ঘতর পাহাড়ের বিষমতর খাড়াই।

বিশাল বিশাল শালগাছ আর সেই সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশেষ ধরনের জংলী ঘাস। এগুলো যে পাটেরা ঘাস নয় তা একনজর দেখলেই বুঝা যায়। লক্ষ্মণভারতীজীকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন—এই ঘাসের নাম ধোলু। ধোলু ঘাসের গন্ধ বাঘ নেকড়ে চিতা সহ্য করতে পারে না, তাই ধোলু ঘাস দেখলেই বুঝতে হবে সেখানে বাঘ নেকড়ে প্রভৃতির উপদ্রব নাই।

গাছ গাছালিতে ঢাকা মালভূমির মাঝখানে খাঁড়ি আর খোয়াই ; সেই সঙ্গে ইতস্ততঃ ছড়ানো ঝোপ। আমরা ধীরে ধীরে মালভূমি বেয়ে এসে পৌঁছলাম ডাঙ্গা জমির শেষপ্রান্তে, ডাঙ্গার পাড় যেখানে ঢালু হয়ে সরু একটা পাহাড়ী নদীর খাতে নেমে গেছে। পাহাড়ের গোটা এলাকা জুড়ে এঁকে-বেঁকে গেছে সেই নদী, গিয়ে নর্মদার সঙ্গে মিশে গেছে। তার দুপাড়ে বহু কুঁড়েঘর। এই নদীর নাম বানপক্ষ, পল্লীর নাম বানপক্ষ সংগম।

বানপক্ষ সংগমে কুঁড়েঘরের বস্তি দেখে মোহান্তজী স্পষ্টতঃই নার্ভাস হয়ে পড়লেন। তাঁর কেবলই ভয় এই বুঝি ভীলদের আক্রমণ সুরু হয়। তিনি এমন হাবভাব দেখাতে লাগলেন যে পারলে যেন দৌড়াতে দৌড়াতে কোনমতে এস্থান পেরোতে পারলে তিনি বাঁচেন! তিনি অত্যন্ত দ্রুতবেগে হাঁটতে লাগলেন। এইভাবে হাঁটতে গিয়ে তিনি দুবার আছাড় খেলেন, শেষবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন পাথরের উপর। তাঁর দুই কনুই, দুই হাতের তালু এবং হাঁটুতে চোট লাগল। রক্ত পড়ছে। লক্ষ্মণভারতীজী বিরক্ত হয়ে তাঁকে বললেন—'আপ ক্যা নয়া পরিক্রমা কর রহা হৈ। আপ্‌কো হম পহেলেই বোল দিয়ে ইধর কোঈ ভীল নেহি হ্যায়, পাহাড়ীলোক ত হ্যায় জরুর লেকিন্ ইহ্ লোগোনে ডাকু নেহি হ্যায়।'

ঝোলা থেকে ধর্মরায়ের মন্দিরে সেই বৈদ্যজী প্রদত্ত 'মলহম্' মতীন্দ্র তাঁর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে হঠাৎ তাল রেখে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছিলাম, আমার পায়েও চোট লেগেছে, কাজেই আমিও বিরক্ত হয়ে তাঁকে বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে উঠলাম—'কি দরকার ছিল ঐ সব গিনি সঙ্গে আনার। সেইজন্যই আপনি অহরহ ডাকুর ভয়ে মরছেন! কুঁড়েঘর বা পাহাড়ী বস্তী দেখলেই আপনি কেবলই ভয় করছেন এই বুঝি ভীল ডাকুরা তেড়ে এল।' আমার কথা শুনে মোহান্তজী করুণভাবে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন—'কি করব বাবা গুরুজী যে আমার মত একটা অপদার্থকে একটা বিরাট সংঘের দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। আমাদের আশ্রমে হাজার জন নাগা আছেন। তার উপর অতিথি অভ্যাগতের ভীড় লেগেই থাকে। তুমি যখন মণ্ডলেশ্বরে আমাদের আশ্রমে গেছলে তখন সবাই পরিক্রমায় বেরিয়ে গেছেন, আমিও বেরিয়ে এসেছি, কার্তিক মাসের শেষে সবাই ফিরবেন। এই হাজার জনের খাদ্য ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়। প্রত্যেকের সারা বছরের পরিধেয় কৌপীন, কম্বল প্রভৃতি ছিঁড়ে গেলে নূতন করে দিতে হয়। আমি গুজরাটে পৌঁছে সে সব ক্রয় করে কিঙ্করলালের নৌকায় চাপিয়ে দিব। তার নৌকা সব 'সামান উমান' পৌঁছে দিবে মণ্ডলেশ্বরের ঘাটে তাই গিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি।' তিনি যেভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অতিকষ্টে কথাগুলি বললেন, তা শুনে আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। বেলা বারটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম পাগলী ঘাটে। নর্মদার তীরে পাহাড়ের কোলে এই পাগলী ঘাট। এখানে কতকগুলি পোড়ো বাড়ী দেখে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কোন মন্দির আছে না কি?

লক্ষ্মণভারতীজী বললেন—'আগে একটু বিশ্রাম করা যাক। মোহান্তজী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছেন বলে তিনি হাঁপিয়ে গেছেন। তাঁর জন্য আমাদের একটু বসা দরকার। নর্মদাতে হাত মুখ ধুয়ে জল খেয়ে তখন এ স্থানের বিবরণ তোমাকে জানাব।'

আমরা সেইখানে ঝোলা গাঁঠরী রেখে সবাই নর্মদাতে নেমে হাত মুখ ধুয়ে এসে একটা অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বসলাম। লক্ষ্মণভারতীজী বলতে লাগলেন—মহাত্মা কমলভারতীজীরও আগে এইখানে আবাল্য ব্রহ্মচারিণী

এক মহাযোগিনী তপস্যা করতেন। হাবভাবে তিনি পাগলের মত আচরণ করতেন বলে লোকে তাঁকে বলত—পাগলী মা। তাঁর নামেই এই স্থানের নাম পাগলী ঘাট। এখানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোন শিবমন্দির নাই বটে তবে তাঁর অখণ্ড ধূনী এখনও জ্বলছে। এই যে অশ্বত্থ, বট, যজ্ঞডুম্বুর, পাকুড় ও বিল্ববৃক্ষের বড় বড় গাছগুলি দেখছ এগুলি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বলে কিংবদন্তী চলে আসছে। এইখানে ছিল তাঁর পঞ্চবটী আশ্রম। তাঁর সেই অখণ্ড ধূনীতে প্রত্যেক পরিক্রমাবাসী এক টুকরো করে কাঠ নিক্ষেপ করে যান। এই নিয়ম দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। সারা বছর ধরে ত আর পরিক্রমাবাসী এই পথে হাঁটেন না। তাছাড়া এই উত্তরতটের দুর্গমতার কথা ভেবে প্রায় শতকরা ৯০ জন পরিক্রমাবাসী আজকাল দক্ষিণতট পরিক্রমা করেই পরিক্রমা সমাপ্ত করে থাকেন। কাজেই নিত্যই যে পাগলী মার অখণ্ড ধূনীতে কাঠ ফেলবেন তা ভাববার অবকাশ কোথায়? চল আমরা সবাই যাই ধূনীতে এক টুকরো করে কাঠ দিয়ে প্রণাম করে আসি। কুড়ুল দিয়ে তক্ষুনি নাগারা কিছু কাঠ কেটে ফেললেন গাছ থেকে। মোহান্তজীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সবাই চললুম সেই ধূনীতে কাঠ দিতে। ছাদহীন জীর্ণ একটি পাথরের বাড়ীতে সেই অখণ্ড ধূনীর কুণ্ড দেখতে পেলাম। কয়লার স্তূপ যেন। একখণ্ড কর্পূর নিয়ে মোহান্তজী সেই কুণ্ডে ফেললেন, দু মিনিট পরেই তা দপ্ করে জ্বলে উঠল। উপর থেকে আগুনের কোন চিহ্ন না দেখা গেলেও ভিতরে যে ধূনীর অগ্নি অনির্বাণ আছে তা বুঝা গেল। আমরা কাঠের টুকরো ফেলে ধূনীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল এই ভেবে যে ছাদহীন ঘরে বর্ষা বাদলেও এই ধূনী নিভে যায় নি কেন? কাঠ শেষ হলেও আগুন আপনা হতে নিভে যাওয়ার কথা। বর্ষাকালে যখন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে তখন তা সরাসরি কুণ্ডের উপরেই পড়েছে। নর্মদার ধারেই এই আশ্রম। নর্মদায় বান এলে নির্ঘাৎ এস্থানে জল উঠে, তবুও ধূনী কিভাবে অনির্বাণ রয়েছে, তা বোধগম্য হল না। বাণপঙ্ক সংগমে কিছু পাহাড়ী লোকের বাস দেখে এলাম বটে, কিন্তু সেখান থেকে দুমাইল পাহাড়ী পথ হেঁটে কেউ এখানে কাঠ দিতে আসে তাও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রায় একহাত গভীর কুণ্ডের মধ্যে এবং উপরে কয়লার যে চেহারা দেখলাম তাতে মনে হয় না

যে, গত একবৎসরের মধ্যে এখানে কেউ কাঠ অর্পণ করেছে। যাইহোক চিন্তান্বিত মনে সেই অখণ্ড ধূনীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আগুনের রহস্য রহস্যাবৃতই রয়ে গেল। সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা লাভ নাই। তাঁদের একমাত্র উত্তর হবে 'পাগলী মার যোগবলে এই তপোবহ্নি জ্বলছে।'

মোহান্তজী আর এখানে না অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে পথ চলতে চলতে পাগলী মার মহিমা বর্ণনা করতে লক্ষ্মণভারতীজীকে আদেশ করলেন। তিনি বলতে লাগলেন—গুরুদেবের সঙ্গে একবার পরিক্রমাকালে এখানে পৌঁছে তাঁর শ্রীমুখেই পাগলী মার কথা শুনি। মোহান্তজীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—সেবারে জমায়েৎ নিয়ে আপনি অমরকন্টক গিয়েছিলেন। আমি গুরুজীর সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। সেইবারেই আমি হাপেশ্বর মহাদেবের বিশেষ করুণা উপলব্ধি করি। গুরুজী আমাদের পরমগুরুদেবের মুখে শুনেছিলেন যে, পাগলী মার যোগৈশ্বর্যের কোন অন্তঃ ছিল না। তাঁর অলৌকিক যোগসিদ্ধির আকর্ষণে বরোদা ও গুজরাট হতে বহুলোক নানা কামনা বাসনা নিয়ে আসতেন। বলাবাহুল্য, কেউ নিরাশ হয়ে শূন্য হাতে ফিরে যেত না। সকলেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হত। অতিথি অভ্যাগতকে খাইয়ে তিনি এক ছটাক পরিমাণ পঞ্চকণিকার আটা নিজ হাতে সিদ্ধ করে খেতেন। নিত্য ভিক্ষা করতে বেরোতেন একটি ঝুলি কাঁধে নিয়ে। তাঁর মুখের বুলি ছিল—'ভিক্ষাসে ভিক্ষা দেও, তিন জগৎ কো জিত লেও।' 'রেবা কী নাম রটো, ঔর কুবের ভাণ্ডার কো লুটো' অর্থাৎ সর্বদাই রেবা নাম রটনা কর। মায়ের নামের প্রভাবেই কুবেরের ভাণ্ডার লুটে নিতে পারবে। এখনই ত সবাই দেখে এলেন, বাণপঙ্ক সংগমে কিছু আদিবাসীর বাস ছাড়া এই ঘোর জঙ্গলে কোন লোকজনের বাস নাই। তাঁর আমলে নিশ্চয়ই এই শূলপানির জঙ্গল আরও ভয়াবহ ছিল, বসতি শূন্য ছিল। এই নির্জন জঙ্গলে কে তাঁকে ভিক্ষা দিবে? তবুও তিনি প্রতিদিন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন আর কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলে দেখা যেত তাঁর ভিক্ষার ঝুলি চাল, ডাল, আটা সব কিছুতেই ভরে উঠেছে। সেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিয়ে তিনি আশ্রমে অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা যতই হোক না কেন, তাঁদের সবকেই পরিতোষ সহকারে ভোজন করাতেন।

বরোদার গাইকোয়াড় বংশের ছোট তরফের রাণী অমৃতা রাজে তাঁর

শিষ্যা ছিলেন। একবার তিনি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন সেইসময় সহস্রাধিক পরিক্রমাবাসী পাগলী মার আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। রাণী আসার সময় নৌকা বোঝাই করে আটা, চাল, ডাল এনেছিলেন। কাজেই রাণী জোর করে তাঁকে সর্বাগ্রে ভোজন করে নিতে বলেন। পরিক্রমাবাসীদের জন্য পুরী ভাজা হতে লাগল। তিনি রাণীর পীড়াপীড়িতে যথারীতি এক ছটাক পঞ্চকণিকার আটা দুধে সিদ্ধ করে খেয়ে নিতে বাধ্য হন। এদিকে পুরী ভাজতে ভাজতে হঠাৎ ঘি-এর অনটন ঘটল। পরিক্রমাবাসীরা অভুক্ত হয়ে ফিরে যাবেন, এই আশঙ্কায় রাণীমা কাঁদতে কাঁদতে পাগলী মায়ের কাছে গিয়ে সব নিবেদন করলেন। মহাত্মা কমলভারতীজী স্বয়ং সেই ঘটনার সাক্ষী। কেনা না, তাঁরই নেতৃত্বে পরিক্রমাবাসীরা পরিক্রমা করতে করতে সেদিন পাগলী মার অতিথি হয়েছিলেন। পরমগুরুদেব গুরুদেবের কাছে গল্প করেছিলেন, রাণী অমৃতা রাজের কান্নায় বিচলিত হয়ে পাগলী মা বলেছিলেন—এইজন্য ত মা তোমাকে বলেছিলাম, 'আমাকে আগে খাইয়ে দিও না। যাইহোক তুমি কাতর হয়ো না। আমার ভিক্ষার ঝুলিতে ঋদ্ধি সিদ্ধি দুই আছে, ভাবনা করো না, আমার কমণ্ডলুটা দাও। *আমি মা রেবার কাছে আজ ঘি ভিক্ষা চেয়ে আনব। এই বলে তিনি তাঁর কমণ্ডলু হাতে নিয়ে নর্মদা থেকে এক কমণ্ডলু জল নিয়ে এসে পুরী ভাজার তাঁতা কড়াই-এর উপর জল ঢালতে লাগলেন। তাতে ঘি-এর কোন বিকার বা পরিবর্তন ঘটল না, নির্বিঘ্নে সব পুরী ভাজা হয়ে গেল এবং সকল অতিথিরাই পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন সমাধা করতে পারলেন।

পাগলী মা বলতেন—কায়সে মনসে বচনসে সত্যনিষ্ঠা হোনা চাহিয়ে। কলিকালমেঁ উনসে বড়া কোঈ তপস্যা নেহি। অদ্ভির্গাত্রানি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি। অর্থাৎ কলিতে সত্যের চেয়ে বড় তপস্যা নাই। কায়মনো-বাক্যে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। জলের দ্বারা কেবল শরীর শুদ্ধ হয়, সত্যের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়ে থাকে।

তাঁর আর একটি প্রধান উপদেশ ছিল—'বিষয়কা নাম বিষ্ঠা, চন্দন কা নাম নিষ্ঠা।' তিনি তাঁর এই বাণীর এইভাবে ব্যাখ্যা দিতেন যে, বিষ্ঠাকে নাড়াচাড়া করলেই তার থেকে দুর্গন্ধ বের হয়ে মানুষকে যেমন অতিষ্ঠ করে তোলে, অবিকল সেইরকম বিষয়তত্ত্বের নাড়াচাড়া বা আলোচনা করলেই

তা হতে মনের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধাদি নানা রকমের দুর্গন্ধের অর্থাৎ দূষিতভাবের উদয় হয়ে মানুষকে অস্থির করে তোলে, ফলে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে, চন্দনকে ঘষলেই তার সৌরভে চতুর্দিক সুরভিত হয়ে উঠে, মনে শুচিতা, প্রফুল্লতা ও নিষ্ঠাকে জাগিয়ে তোলে। ঠিক এইভাবে সত্যতত্ত্ব নিয়ে মেতে থাকলে নিজের অন্তরেই তত্ত্বামৃতের উদয় ঘটে। পূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তিলাভ সম্ভব হয়। সত্যচিন্তা, সত্যধ্যান এবং সত্যভাষণ তপস্যার রুদ্ধ দুয়ারকে উন্মোচন করে দেয়।

পাগলী মার স্থূলদেহের বয়স হয়েছিল ২৫১ বৎসর। পূর্ব থেকে সবকে জানিয়ে তিনি কোন এক চৈত্রমাসের মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আগ্নেয়ী যোগধারণার দ্বারা তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহকে স্বতঃই উদ্ভূত যোগাগ্নিতে আহুতি দিয়ে দেন।

আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে একমাত্র জগদম্বা সতীরাণীর ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর পিতা দক্ষ প্রজাপতি শিবনিন্দা করলে, সতী অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন যে, আপনার অঙ্গোৎপন্ন এই দেহ মৃতদেহের ন্যায় এখনই আপনার সামনে পরিত্যাগ করব, পতিনিন্দা শুনে আমি আর এক মুহূর্তও বাঁচতে চাই না। এই বলে তিনি উত্তরাস্যা হয়ে ভূমিতলে উপবিষ্ট হলেন এবং আচমনপূর্বক পীতবসনে দেহ ঢেকে যোগস্থ হলেন। সমাধিজাত অগ্নিদ্বারা তাঁর দেহ সহসা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। এই পাগলী ঘাটের পাগলী মাও তেমনি তাঁর পূর্ব ঘোষিত নির্দিষ্ট দিনে নর্মদাতটবাসী হাজার হাজার তপস্বী ও মহাত্মাদের সামনে মধ্যাহ্নকালে যোগাসনে বসে যোগাগ্নি দ্বারা নিজের দেহকে ভস্মীভূত করে দিয়েছিলেন। স্বয়ং পরম গুরুদেব মহাত্মা কমলভারতীজী এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন।

আগ্নেয়ী যোগধারণার দ্বারা মহাযোগিনী বা যোগীশ্বররাই কেবল দেহকে এইভাবে প্রজ্জ্বলিত করে ফেলতে পারেন। গুরুদেব শুনেছিলেন যে, পাগলীমার দেহ ছিল রসোজ্জ্বলা জ্যোতির্ময়ী। তিনি দেহান্তের দিন সকাল থেকেই আনন্দে বিগলিত হয়ে বারবার বলছিলেন যে—

লালী মেরে লাল হৈ, যিন্‌ দেখন্‌ তিন্‌ লাল।
লালী দেখন্‌ হম গয়ি ম্যায় ভি হো গিয়া লাল॥

অর্থাৎ আমার প্রিয়তম বড়ই মধুর, বড়ই প্রেমিক। যিনি তাঁকে দেখেছেন, তিনিই তাঁর প্রেমের মাধুর্যে প্রেমময় অমৃতোজ্জল হয়ে গেছেন। আমিও সেই আমার 'লাল'কে দেখতে গিয়ে নিজেও রসোজ্জ্বলা হয়ে উঠেছি।

এই ছিল তাঁর শেষ বাণী।

যোগেশ্বরী পাগলী মার পবিত্র স্মৃতিচারণ করতে করতে আমরা কঠিন পার্বত্যপথ ও জঙ্গল অতিক্রম করে মাকড়খেড়াতে এসে পৌঁছলাম। তখন বেলা ৩টা বেজে গেছে। মোহান্তজী জিজ্ঞাসা করলেন—পুষ্করিণী তীর্থ ক্যাত্না দূর বা? আজ সামতক্ পৌঁহচ্ জায়েগা কি নেহি?

—পৌঁছতে পারা যাবে ত ঠিকই, আর বাকী ত মোটে তিন মাইল। কিন্তু সামনে যে পাহাড়ের ঢাল দেখা যাচ্ছে, তার একপাশে দেখুন বড় বড় গাছের জঙ্গল। অন্যদিকে যে সোনালী ঘাসের ঝোপ দেখা যাচ্ছে ঐগুলোকে বলে ভাবর ঘাস। ঐ ঘাসবন চিতাবাঘদের প্রিয় আড্ডা। আজ আর এগুতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আপনার খোঁড়া পা তাহলে আরও জখম হয়ে যাবে। আজ এখানেই রাত্রি কাটানো যাক। আপনার আর একবার স্নান করতে ইচ্ছা করলে স্নান করতে থাকুন, আমি সেই ফাঁকে কয়েকজন নাগাকে নিয়ে কিছু কাঠ কেটে আনি। চিতাবাঘের হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে আজ ধূনী জেলে রাতভোর বসে থাকতে হবে।

—লছমন ভেইয়া! তোমার সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি! দেখলে ত এতবড় হাপেশ্বরের জঙ্গল কত নির্বিঘ্নে করপাত্রীজীর দয়ায় অতিক্রম করে এলাম। সামনের জঙ্গলপথও নিরুপদ্রবে পেরিয়ে যেতে পারব। আর আমাদেরকে অগ্নিপ্রাকারের মধ্যে ফেলো না।

লক্ষ্মণভারতীজী তাঁর কথার কোন জবাব দিলেন না। তিনি কয়েকজন নাগাকে নিয়ে গাছের ডাল কাটতে লেগে গেলেন। প্রায় ৪৫ মিনিট পরে বহু কাঠ কেটে এনে তিনি মাণ্ডবগড়ের নিকট রেবাকুণ্ডের ধারে যেমনভাবে ধূনী সাজিয়েছিলেন ঠিক তেমনিভাবে মাঝখানে যাতে সকলে স্বচ্ছন্দে শুয়ে বসে কাটাতে পারে, ততখানি ফাঁক রেখে চারদিকে ঘিরে ১২টা ধূনী সাজিয়ে ফেললেন। কাঠ কেটে আনার সময় তিনি প্রায় একঝুড়ি মেটে আলুও তুলে এনেছিলেন। নর্মদাতে ডুব দিয়ে এসে তিনি একটি ধূনী জেলে সেই আলুগুলো ঝলসে নিয়ে সকলকে ভাগ করে খেতে দিলেন। খেতে

বেশ ভালই লাগল। ঠিক রাঙা আলুর মত স্বাদ, অত্যন্ত মিষ্টি। আমাদের খাওয়া যখন শেষ হল, তখন বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। তিনি প্রত্যেক ধূনীতে আগুন দিয়ে মোহান্তজীকে বলতে লাগলেন—আপনি করপাত্রীজীর কৃপাদৃষ্টির কথা বলছিলেন, হয়ত তাঁর কৃপায় আমাদের কোন বিপদ ঘটবে না। রেবাকুণ্ডে আমরা বেঁচে গেছলাম মহাত্মা সোমানন্দজীর সহসা আবির্ভাবের ফলে। কিন্তু এখানে যে কার কৃপা আমাদেরকে রক্ষা করবে, তা আমাদের জানা নাই। বিধিদত্ত বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে আত্মরক্ষার জন্য যতরকম সাবধানতা অবলম্বন করা যায় তা আগে করতে হয়। তারপর মা নর্মদার ইচ্ছা। এই মাকড়খেড়াতে বহু পরিক্রমাবাসী প্রায় প্রতি বছর একজন দুজন করে চিতার আক্রমণে প্রাণ হারিয়ে থাকেন। তাই এই রাস্তাকে পরিক্রমাবাসী সযত্নে এড়িয়ে চলেন। ঘুরপথ হলেও এই পথ ছাড়া আরও একটি পথ আছে। সে পথে ভাবর ঘাসের ঝোপ নাই, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কিন্তু পাগলী ঘাট থেকে আসার সময় পাগলী মায় গল্প করতে করতে সে পথ আমি হারিয়ে ফেলেছি। চিতাবাঘের এখানে আড্ডা আছে বলেই আমি সকলের কষ্ট হবে জেনেও ধূনী জ্বালার ব্যবস্থা করলাম। চিতার স্বরূপ আপনারা জানেন না, আমি গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর সকল পরিক্রমায় যোগ দিয়েছি বলেই আমার এ বিষয়ে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। আমি অনেক বড় বড় শিকারীর কাছে শুনেছি, চিতাবাঘ জঙ্গলে সকল হিংস্র প্রাণীর মধ্যে নিষ্ঠুরতম ঘাতক। আমরা এতগুলি লোক একসঙ্গে আছি বলে সহসা সে দাপট দেখিয়ে আক্রমণ করতে আসবে না, কারণ যূথবদ্ধ জীবজন্তুকে এড়িয়ে চলাই তার স্বভাব। সে কেবল সুযোগ খোঁজে দলের পিছনে যাকে একটুখানি আলাদাভাবে পাবে, নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখের নিমেষে তাকে নিয়ে পালাবে। বাঘের সঙ্গে চিতাবাঘের স্বভাবের এইখানেই পার্থক্য। বাঘের মত হাঁকডাক করে বেপরোয়াভাবে চিতাবাঘ কখনও শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে, নিতান্ত বেকায়দায় না পড়ে গেলে চিতা শত্রুর মুখোমুখী হয় না। ঝোপঝাড় বা যে কোন আড়াল ঘেঁষে তারা রাস্তার ধার দিয়ে চলে। বাঘের চেয়ে চিতাবাঘ খুব তুখোড় শিকারী, নিঃশব্দে চলে আর কৌশলে ঘাড় মটকায়। একনজরে একটা বুনো কালো কুকুর আর চিতাবাঘের

মধ্যে তফাৎ বুঝা কঠিন। বেড়ালের মত সে অনায়াসেই চটপট গাছ বা দেওয়াল বেয়ে উঠে যেতে পারে, নিজেকে গুটিয়ে ছোট করে ফেলতে পারে। মাণ্ডবগড়ে দেখেছেন ত গাছের মগডালে লুকিয়ে ভীলটা চিতা-বাঘটাকে তীর মেরেছিল, বিষাক্ত তীরের ঘা খেয়েও সে চটপট বিদ্যুৎগতিতে গাছের উপর উঠে গিয়ে ভীলের ঘাড় কামড়ে ধরে গাছ হতে নীচে টেনে এনেছিল। চিতা তার চেয়ে তিন চার গুণ ওজনে ভারী প্রাণীকে ঘাড়ে ফেলে চোখের নিমেষে পালাতে পারে। শিকারের আশায় এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মড়ার মত চুপচাপ পড়ে থাকতে পারে, রেবাকুণ্ডে দেখেছেন অতগুলো চিতা আমাদের একদিকে জল এবং একদিকে ধুনীর আগুনের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় রাতভোর চুপচাপ পড়েছিল। বাঘ আক্রান্ত হয়ে আঘাত পেলে যন্ত্রনায় গোঙাতে থাকে, গোঙাতে গোঙাতেও গর্জন করে এবং কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে পুনরায় আঘাতকারীর উপর বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিতাবাঘ কদাচ এরকম করে না। জখম হলেও চিতাবাঘ মুখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করে, মাইলের পর মাইল সে শিকারকে অনুসরণ করে যায়, শত্রুর সঙ্গে সে লড়ে খুব সুকৌশলে, অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে দারুণ নিঃশব্দে এবং শেষ পর্যন্ত জেতে। আকারে ছোট, আত্মগোপনে অদ্বিতীয়, ছোটায় বিদ্যুৎগতি এবং স্থান কাল বুঝে আক্রমণে পটু চিতাবাঘের চেয়ে ভয়ঙ্কর ঘাতক আর কেউ নয়। কে জানে, ইতিমধ্যেই কোন চিতা আমাদের গন্ধ পেয়ে এখানে কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা।

—লছমন ভেইয়া, তুমি এমনভাবে চিতাবাঘের বর্ণনা দিচ্ছ, যেন এখুনি চিতাবাঘ আমাদের কারও-না-কারো ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে! যাই হোক, জঙ্গলপথের অভিজ্ঞতা তোমার অনেক বেশী। শুনেছি, তুমি ত আগে শিকারী ছিলে। শিকার করতে এসেই পথ হারিয়ে তুমি গুরুদেবের দৃষ্টিতে পড়। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ধারা তোমার বদলে গেল। তাই নয় কি?

—জী হাঁ।

৬টা বেজে গেছে। ধীরে ধীরে সূর্যদেব ঢলে পড়ছেন পাহাড়ের আড়ালে, তবুও এখনও চারদিকে বেশ রোদের আভাষ জেগে আছে। আমরা ৬০/৭০ গজ দূরে একটা সম্বরকে কঠিন খ্যান্‌খ্যানে আওয়াজে বাংক্ বাংক্ শব্দ তুলে এই পথেই আসতে দেখলাম। হঠাৎ দেখলাম আসতে আসতে

সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ঘণ্টার মত কান দুটো সামনে এমনভাবে ঝুলে পড়ল যেন একটা কান আর একটা কানকে ছুঁয়ে আছে। কান দুটো উলটানো, তার মানে সজাগ। লক্ষ্মণভারতীজী মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগলেন—লক্ষ্য করুন সম্বরটা তার একটা কান পাহাড়ের দিকে, আর একটাকে সমতলভূমির দিকে ঘুরিয়ে দিল। মোহান্তজী মৃদু কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন—এ্যায়সা কেঁও করতা হৈ! লক্ষ্মণভারতীজী উত্তর দিলেন—'সম্বরটা ঐ রকম করছে যাতে জঙ্গলের যে কোন দিক থেকে উঠে আসা শব্দ সে শুনতে পায়। শুধু সম্বর কেন, এইভাবে জঙ্গলের সমস্ত জন্তু কান ছড়িয়ে দিয়ে জঙ্গলের প্রত্যেকটা শব্দ একসঙ্গে এবং আলাদা আলাদাভাবে শুনতে পায়। দেখুন, দেখুন সম্বরটা আর এক পাও এদিকে এগিয়ে আসছে না, পরিবর্তে তার সামনের পা দুটোকে মাটিতে ঠুকছে, তার মানে এদিকটাতে সে কোন বিপদের গন্ধ পেয়েছে!' লক্ষ্মণভারতীজীর কথা শেষ হতে না হতেই সম্বরটা ঘুরে পড়ে রণপা করে হাঁটার মত তার লম্বা লম্বা পা ফেলে যে পথে এসেছিল, সেই পথেই দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। লক্ষ্মণভারতীজী মন্তব্য করলেন, সম্বরটাকে কেউ আক্রমণ করল না, তার মানে যে আক্রমণ করবে সেই মহদাশয় জীব নিশ্চয়ই আমাদেরকেই নিশানা করে ধারে কাছে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। থাক্, এই আগুন ঠেলে কারও পক্ষে এখন আমাদেরকে আক্রমণ করা সম্ভব হবে না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর একদিন পরেই পূর্ণিমা। তাই সূর্যাস্তের পরেই চাঁদের উদয় হল আকাশে। জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের উপরে। পাহাড়ের আড়ালে চাঁদ আছে বলে দেখতে পাচ্ছি না। আর কিছুক্ষণ পরে চাঁদ আর একটু উপরে উঠে এলে তখন চাঁদকে দেখতে পাবো। লক্ষণভারতীজী আর কিছু শুকনো পাতা প্রত্যেকটি ধূনীর উপর চাপিয়ে দিলেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। মাঝে মাঝে 'ফটাস্ ফটাস্' শব্দে কাঠ ফাটার আওয়াজ হতে লাগল। দুঃসহ আগুনের তাপ, ততোধিক দুঃসহ এই আতঙ্ককর পরিবেশ। শত্রুকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তারই অনাগত আক্রমণের আশঙ্কায় আমরা প্রত্যেকেই জবুথবু হয়ে বসে আছি। অন্যমনস্ক হবার জন্য আমরা কমণ্ডলুর নর্মদা-জল স্পর্শ করে সান্ধ্য-

ক্রিয়ায় বসে গেলাম। কিছুক্ষণের জন্য আমাদের মন অন্যজগতের শান্ত-স্নিগ্ধ নিভৃতিতে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আমাদের যখন সান্ধ্যক্রিয়া শেষ হল, যতীন্দ্র ঘড়ি দেখে বলল রাত্রি ১০টা বেজেছে। লক্ষ্মণভারতীজী ক্রিয়াতে বসেননি। তিনি এবং আর চারজন নাগা ত্রিশূল এবং বল্লম হাতে সমানে পাহারা দিচ্ছেন। মোহান্তজী বললেন—সব লেট যাও, কাঁহি কিসীকো নাহি দেখতা হুঁ, লছমন ভেইয়া কো বাধ ঔর চিতাকো সমহালেনো দো। এই বলে তিনি বৈদ্যজীর একটি বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর পায়ের ক্ষততে রতনভারতীজী মলম লাগিয়ে দিলেন। মাঝে মাঝে আগুনের তাপ সত্ত্বেও ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাসের দমকা আমাদের গায়ে এসে লাগছে। দুঘন্টা ছাড়া ছাড়া চারজন করে পাহারা দেওয়া এবং ধুনিতে কাঠ চাপানোর বন্দোবস্ত করে আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম। শেষরাত্রে আমাদের ঘুম ভাঙল। বিবর্ণ চাঁদের কিরণে সবকিছু অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। বুনো মুরগী ডাকছে। জঙ্গলের গাছে অন্যান্য পাখীরও কলরব শোনা যাচ্ছে। বিচিত্র সব শব্দ উঠছে জঙ্গলের মধ্য থেকে। লক্ষ্মণভারতীজী তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে গোটা রাত্রি অতন্দ্র প্রহরায় ছিলেন। হঠাৎ হা-আ, হা-আ শব্দে একটা কর্কশ শব্দ উঠল। তা শুনে আমি চমকে উঠলাম। লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন—পাহাড়ের ধার থেকে 'কাকর' ডাকছে।

—কাকর কি?

—নেহি দেখনেসে উহ্ জন্তুকো ক্যায়সে পয়ছানেগা?

আবার শব্দ উঠল—খা-অখ্-উন্-আখ্।

লক্ষ্মণভারতীজীর দিকে তাকাতেই বললেন—উহ্ লেঙ্গুড় হৈ। আমি ইতিপূর্বে লেঙ্গুড় মুণ্ডমহারণ্যে দেখেছি। দেখতে বাঁদরের মত। রঙ কালো। চোখের পাতায় বড় বড় খাড়া খাড়া চুল। গাছের ডালে লাফিয়ে বেড়ায়।

'উধর দেখিয়ে'—এই বলে লক্ষ্মণভারতীজী আঙুল দিয়ে দেখাতেই আমরা দেখে চমকে গেলাম যে দু'দুটো কালো চিতা আমাদের কাছ হতে প্রায় বিশ হাত দূরে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে যেন নিরীহ দুটি কালো কুকুর। একবার করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, বেরিয়ে পড়ছে তাদের লকলকে

লাল জিহ্বা। কারও মুখে কোন কথা নাই। ভয়ে সবাই আড়ষ্ট। মোহান্তজী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে 'হর নর্মদে হর নর্মদে' জপ করতে লাগলেন। ধূনীতে কিছু শুকনো পাতা ও কাঠ চাপালেন লক্ষ্মণভারতীজী। আগুনের ফুলকি উঠতে তারা পিছন দিকে একটু সরে গেল। লক্ষ্মণভারতীজী একটা জলন্ত কাঠ নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন তাদের দিকে। তারা আর একটু সরে গিয়ে জলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকল। মোহান্তজী চাপা ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন— লছমন ভেইয়া, হিংস্র চিতাকে ক্ষেপিয়ে কি লাভ?

লক্ষ্মণভারতীজী বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যতক্ষণ আমরা ধূনীর কাছে আছি এবং দল বেঁধে আছি, ওরা কখনও আক্রমণ করতে আসবে না। অসীম ধৈর্য নিয়ে যেমন ওরা রাত কাটিয়েছে, তেমনি দরকার হলে আরও কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা করবে। চিতার স্বভাব হচ্ছে, শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সে এ বিষয়ে নিশ্চত হয়ে নিবে যে শিকারের তুলনায় তার নিজের জোর বেশী। আমি কখনও কোন চিতাবাঘকে এমন কোন জন্তু শিকার করতে দেখিনি বা শুনিনি যে তার চেয়ে বড় কিংবা গায়ের জোরে যার সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে না। আমরা একসঙ্গে এতগুলি লোক আছি, তার উপর ধূনীর গনগনে আগুন সহায়। ওদের লকলকে জিহ্বা এবং ধারালো দাঁতের চেয়ে এই লাল গনগনে আগুনের তেজ যে কোটিগুণ বেশী তা ওরা ভালভাবেই বোঝে। সকাল হয়ে গেছে। গাছপালায় কুয়াশার ধূম্রজাল ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে, আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, সূর্য উঠবার আর দেরী নাই।

হঠাৎ দুটো চিতা একসঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আমাদের বিপরীত দিকে দ্রুতবেগে দৌড় লাগাল। আমরা দেখার আগেই তারা দেখতে পেয়েছে তিনটে হরিণ প্রায় ১০০ গজ দূর দিয়ে পূব দিকে দৌড়ে পালাচ্ছে। শুয়ে থাকা অবস্থাতেই তারা গন্ধ পেয়েছে হরিণের! লক্ষ্মণভারতীজী তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে নিজের ঝোলা গাঁঠরী নিতে নিতে বললেন— 'এই সুযোগ! যে যার ঝোলা গাঁঠরী নিয়ে এখন দৌড়ে পালাই চলুন। ওরা ছুটে গেল পূর্বদিকে, আমরা যাব পশ্চিমদিকে! ওদের আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নাই। শিকার করতে পারলে ওরা উপাদেয় হরিণ মাংসেই এ বেলার মত পরিতুষ্ট থাকবে। হর নর্মদে, হর নর্মদে!'

'হর নর্মদে হর নর্মদে' করতে করতে আমরা সবাই এলোপাতাড়িভাবে কম্বল ঝোলা পিঠে ফেলে পড়িমড়ি করে হাঁটতে লাগলাম পশ্চিমদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে। ভাগ্য ভাল যে, এই পাহাড়ের গা সূচালো কর্কশ এবড়ো-খেবড়ো পাথরে ভর্তি নয়। শিশিরে ভেজা পাহাড়ের ঢাল বেশ মসৃন। এইরকম পাথর দেখে এসেছি মুণ্ডমহারণ্য যেখানে শেষ হয়েছে সেই মান্দালায়, সহস্রধারার কাছে। পাথরের গা যেন ঘি দিয়ে মেজে ঘষে চকচকে করা হয়েছে। বাঁদিকে সেই সোনালী ভাবর ঘাসের ঝোপ শুরু হয়েছে। সকলেই 'হর নর্মদে' জপতে জপতে দ্রুত হেঁটে চলেছি। মোহান্তজীর পায়ে ক্ষত থাকা সত্ত্বেও তিনিও প্রাণপণে হাঁটছেন। শিশির-ভেজা ভাবর ঘাসের ডগা হতে টপটপ্ করে শিশির গড়িয়ে পড়ছে। উচ্চিংড়ে, ভোমরার মত কালো পোকা এবং মাকড় আমাদের গায়ে ঘাসবন থেকে ঠিকরে ঠিকরে এসে পড়ছে। মাকড়খেড়া বিদায়! আমরা আধ-মাইলটাক হেঁটে ভাবর ঘাসের ঝোপ শেষ হতে মাকড়ের উপদ্রব হতে রক্ষা পেলাম। আমরা নর্মদার চরে নেমে হাঁটতে হাঁটতে নর্মদার কিনারে এসে বসলাম। গোটা রাত্রি কেউ চিতার ভয়ে আগুনের গণ্ডী ছেড়ে প্রস্রাব করতেও যান নি। ঝোলা গাঁঠরী রেখে প্রত্যেকে প্রাতঃকৃত্য সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদা স্পর্শ করে যে যার কম্বলাদি পাট করে গুছিয়ে বেঁধে নিলাম। এবারে হাঁটতে লাগলাম নর্মদার কিনার ধরে, শিঙ্গা ডম্বরু বাজিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি তুলে। দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বড় বড় গাছপালার জঙ্গল দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু আমরা নর্মদার বালুচরের উপর দিয়ে হাঁটছি। বেলা সাড়ে ৯টা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম পুষ্করিনী তীর্থে। মোহান্তজী ভাববিহ্বল কণ্ঠে নতমস্তকে যুক্তকরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে সকলকেই সূর্য প্রণাম করতে বললেন। আমরা ঝোলা গাঁঠরী রেখে দেবদিবাকরকে নতমস্তকে প্রণাম করতে লাগলাম। মোহান্তজী বলতে লাগলেন—

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ—

ততঃ পুষ্করিণীং গচ্ছেৎ সর্বপাপ প্রণাশিনীম্।
শ্রুতে যস্যাঃ প্রভাবে তু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

রেবায়া উত্তরে কূলে তীর্থং পরম শোভনম্।
যত্রাস্তে সর্বদা দেবো বেদমূর্তি দিবাকরঃ ॥

রেবাখণ্ডম্ ৫৯ অধ্যায়

অর্থাৎ মহামুনি মার্কণ্ডেয় বলছেন—অনন্তর সর্বপাপ-প্রনাশিনী পুষ্করিণী তীর্থে গমন করবে। এই পুষ্করিণী তীর্থের মাহাত্ম্য শুনলে মানুষ সমস্ত কলুষ হতে মুক্ত হয়। এই পরম শোভন পুষ্করিণী তীর্থ রেবার উত্তরতটে বিদ্যমান। বেদমূর্তি স্বয়ং দিবাকর এই তীর্থে সর্বদা বিরাজমান আছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—সামনে যে মন্দির দেখা যাচ্ছে, ঐখানে কি সূর্যদেবের বিগ্রহ আছে।

—না, না। নর্মদা তপোভূমি। এখানে শুধু সাধু মহাত্মারাই তপস্যা করেন না, দেবতারাও তপস্যা করেন। নর্মদা-তটে শিবলিঙ্গ ছাড়া, আর কোন বিগ্রহ নাই। ভগবান সূর্যনারায়ণের তপস্যা ক্ষেত্র এই পুষ্করিণী তীর্থ।

মন্দিরের পাশেই একটি পাথরের বাড়ী। একটি টানা হল—প্রায় ৪০ ফুট দীর্ঘ ৩০ ফুট চওড়া। এই ঘরে কোন দরজা বা জানালা নাই। দেওয়ালের উপরের দিকে চারদিকে প্রায় দু ফুট লম্বা এবং দেড়ফুট চওড়া করে আটটি ঘুলঘুলি আছে। প্রবেশ দ্বার একটি। দরজা বিহীন এই প্রবেশ দ্বারে ঢুকে নাগারা ঘরটি পরিষ্কার করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে বললেন, ঘরে পরিষ্কার করার কিছুই নাই। পাথরের মেঝে তকতকে ঝকঝকেই আছে। সেখানে 'সামান উমান' রেখে সকলকে মোহান্তজী নর্মদার কিনার থেকে একটু উঁচুতে একটা জলাধারের কাছে এনে দাঁড় করালেন। আমার ত দেখে মনে হল, পাহাড়ের গায়ে পাথরের খোরে জল জমে এই জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। মোহান্তজী বললেন—এই পুষ্করিণীর নামানুসারেই এই নর্মদাঘাটের নাম হয়েছে পুষ্করিণী তীর্থ। এখন চল, এই জল মাথায় নিয়ে আমাদের বিশ্রামস্থলে ফিরে যাই। এখানে আমাদের কিছু তীর্থকৃত্য আছে। আজ ও কাল দুদিন আমরা এখানে থাকব। যৎকিঞ্চিৎ আমরা শাস্ত্রবিধি অনুসার জপ ও যজ্ঞাদিরও অনুষ্ঠান করব। মার্কণ্ডেয়জী বলে গেছেন—ঋচমেকাং জপদ্ যস্তু যর্জুর্বা সাম এব চ। স সমগ্রস্য বেদস্য ফলমাপ্নোতি বৈ নৃপ। মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে

বলেছিলেন, সামবেদান্তর্গতই হোক আর যজুর্বেদান্তর্গতই হোক, যে লোক পুষ্করিণী তীর্থে যে-কোন একটি বেদমন্ত্র জপ করে তার সমগ্র বেদপাঠের ফললাভ হয়। শুধু তাই নয়, মার্কণ্ডেয়জী আরও বলে গেছেন—

যঃ ত্র্যক্ষরং জপেন্মন্ত্রং ধ্যায়মানো দিবাকরম্।
আদিত্যহৃদয়ং জপত্বা মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ॥

অর্থাৎ যিনি ভগবান সূর্যনারায়ণের ধ্যান করে ত্র্যক্ষর সূর্যবীজ এবং আদিত্যহৃদয় এই তীর্থে বসে পাঠ করতে পারবেন, তাঁর সমূহ দুরিতরাশি বিদূরিত হবে। কাজেই যে যেমনভাবে পার এখানে সূর্যনারায়ণের ধ্যানজপ ইত্যাদি করে আজকাল দুদিন এখানে আনন্দে অতিবাহিত কর।

এইবলে তিনি লক্ষ্মণভারতীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাল ত মাকড়-খেড়ায় মেটে আলু সিদ্ধ খাইয়ে আমাদেরকে রেখেছ। এখানে ত সত্রাদি কিছু নাই। আজ আমাদের ভিক্ষার ব্যবস্থা কি হবে?

'লছমন ভেইয়া' জানালেন—হাত্‌নী সংগমের সত্র হতে যে আটা পেয়েছিলাম, তার থেকে প্রতিদিন যা বেঁচে যেত, তা জমিয়ে রেখেছিলাম, আপনাকে না জানিয়ে আমি 'পোয়াভর' করে প্রত্যেকের ঝোলাতে রেখে দিয়েছি। তাতে আজ কাল দুদিনই আমাদের চলে যাবে।

এইবলে তিনি চারজন নাগাকে সঙ্গে নিয়ে কাঠকুটো সংগ্রহ করতে চলে গেলেন। আমরা স্নান করার জন্য নর্মদাতে নামলাম। দক্ষিণতটের দিকে তাকিয়েই আমার চক্ষুস্থির! বিরাট এক শিবমন্দিরের ধ্বজা এবং ঘন সন্নিবিষ্ট বড় বড় গাছপালার ফাঁকে আরও কয়েকটি বড় বড় অট্টালিকার কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। এপারে এই শিবমন্দির এবং একটা পরিত্যক্ত পাথরের একতলা বাড়ী ছাড়া কিছু চোখে পড়ছে না কিন্তু ওপারে নর্মদার ঘাটে বহুলোকের সমাগম দেখছি। ঐ স্থানের নাম কি?

মোহান্তজী যুক্তকরে প্রণাম করতে করতে বললেন—ঐ মন্দিরেই ত শূলপাণীশ্বর মহাদেব বিরাজমান আছেন, এই পুষ্করিণী তীর্থের ঠিক বিপরীত দিকে। নর্মদাতটের অন্যতম শ্রেষ্ঠতীর্থ। শূলপাণীশ্বর মহাদেবের মর্যাদা ওঁকারেশ্বরের সমতুল্য। ওঁর নামেই এই মহারণ্যের নাম শূলপাণির ঝাড়ি। শূলপাণীশ্বরের মহিমা অনন্ত। দক্ষিণতট দিয়ে পরিক্রমা করার সময় কারও

না কারও মুখে তুমি ওঁর মহিমা শুনতে পাবে। রেবাখণ্ডে মার্কণ্ডেয়জীও ওর মহিমা উচ্ছ্বসিত হয়ে বর্ণনা করেছেন। আমরা এখন যে মন্দিরে এসে পৌঁছেছি, এই মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গের নামও শূলপাণি, সূর্যনারায়ণের তপস্যা-ক্ষেত্র বলে এঁকে কেউ কেউ হিরণ্যপাণিও বলে থাকেন। ঐ দক্ষিণতটের শূলপাণীশ্বর মহাদেবকে যখন দর্শন করবে তখন তাঁর অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণবর্ণরঞ্জিত বিরাট লিঙ্গরূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবে, এখানেও মন্দিরে গিয়ে দেখবে এখানকার হিরণ্যপাণি মহাদেবও স্বর্ণোজ্জ্বল।

স্নান তর্পণাদি সেরে আমরা মন্দিরের দরজা খুলে ঢুকলাম।

সত্যই স্বর্ণোজ্জ্বল শিবলিঙ্গ প্রায় এক ফুট উঁচু। শিবলিঙ্গের উপরে চন্দনলিপ্ত বিল্বপত্র চাপানো আছে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। মোহান্তজী প্রণাম করেই বেরিয়ে এসে রতনভারতীকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা চন্দন ও বিল্বপত্র কোথায় পেলে তা দিয়ে মহাদেবের অর্চনা করে গেছ? আমাদেরকেও দাও, আমরাও পূজা করব।

আমরা যখন স্নান করছিলাম, তখন অন্যান্য নাগারা একে একে স্নান করে পূজা করে গেছেন। তাই তিনি ভেবেছিলেন যে নিশ্চয় তাঁরাই পূজা করে গেছেন। কিন্তু রতনভারতী মন্দিরে এসে জানালেন যে, তাঁরাও পূজা করতে এসে, শিবের মাথায় চন্দন ও বেলপাতা দেখে গেছেন!

আমি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন—'এতে বিস্মিত হবার কিছু নাই। আমি গুরুদেবের মুখে শুনেছি নর্মদাতটে কোন শিবলিঙ্গই অপূজিত থাকে না। মানুষের অগম্য স্থানে ভয়ঙ্কর দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে নর্মদাতটে কোন শিবলিঙ্গ অপূজিত থাকলে সূক্ষ্মদেহধারী দেবর্ষি মহর্ষিরা এসে পূজা করে যান। তাঁরা না পূজা করলে নর্মদার মানসপুত্র, সপ্তকল্পান্তজীবী স্বয়ং মার্কণ্ডেয় মুনি এসে শিবলিঙ্গের পূজা করে থাকেন। একথা যে ধ্রুব সত্য, তার আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম। এখন আমি মন্ত্র বলি, তুমি ধীরে ধীরে জল ঢাল। এই দিবাকর-তীর্থে সূর্যমন্ত্রেই শিবের অর্চনা করার নিয়ম। এইবলে তিনি মন্ত্র পড়লেন—

ওঁ ভাস্বদ্ রত্নাঢ্যমৌলিঃ স্ফুরদধররুচা রঞ্জিতশ্চারুকেশো
ভাস্বান্ যো দিব্যতেজাঃকরকমলযুতঃ স্বর্ণবর্ণ প্রভাভিঃ।

বিশ্বাকাশাবকাশগ্রহপতিশিখরে ভাতি যশ্চোদয়াদ্রৌ
সর্বানন্দপ্রদাতা হরিহর নমিতঃ পাতু মাং বিশ্বচক্ষুঃ॥

উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। এসে দেখি, লক্ষ্মণভারতীজী এবং আরও চারজন নাগা যাঁরা মাকড়খেড়ার জঙ্গলে চিতা বাঘের ভয়ে গোটা রাত্রি ধূনী জ্বেলে অতন্দ্র প্রহরায় ছিলেন, তাঁরা পাথরের ঘরে খালি মেঝেতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। 'আহা, মানুষের দেহ ত! গতকাল রাত্রে বেচারারা দুই চোখের পাতা এক করতে পারে নি। রাত্রি জাগরণে এবং অসহ্য স্নায়ুর চাপে অবশ হয়ে ঘুমে ঢলে পড়া স্বাভাবিক। এখন মোটে ১২টা বেজেছে। আরও এক দেড়ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিক্। আমরা দেড়টায় খেতে বসব।' মোহান্তজীর কথা শুনে যে চারজন নাগা লিট্টি তৈয়ার করছিলেন, তাঁরা বললেন—'ভালই হবে। আমাদেরও ভোজন প্রস্তুত করতে আরও বোধহয় ঘণ্টাখানিক সময় লেগে যাবে।'

মোহান্তজীর আসন পাতাই ছিল, আমিও কম্বল বিছিয়ে বসলাম। তিনি বললেন—সূর্যমন্ত্রে শিবের পূজা করা যায় আবার শিবমন্ত্রেও সূর্য ভগবানের পূজা করলে কোন দোষ হয় না।

আমি বললাম—অভেদ দৃষ্টিতে বিচার করলে দুজনেই ত মূলে একই পরমেশ্বর। কেবল বিভিন্ন গুণানুসারে (attribute) একই পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম। বৈদিক ব্যুৎপত্তি অনুসারে, (ষুঞ্ অভিষবে, ষুঞ্ প্রাণিগর্ভ বিমোচনে) এইসকল ধাতু হতে 'সবিতা' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'অভিষবঃ প্রাণিগর্ভ বিমোচনং চোৎপাদনং। যশ্চরাচরং জগৎ সুনোতি সূতে বোৎ-পাদয়তি স সবিতা পরমেশ্বরঃ' যিনি সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা, পরম মঙ্গলময়, সেই পরমেশ্বরের নাম সবিতা। আবার, (শিবুকল্যাণে) এই ধাতু হতে 'শিব' সিদ্ধ হয়। যিনি কল্যাণস্বরূপ এবং কল্যাণকর্তা, সেই একই পরমেশ্বরের নাম 'শিব'। সূর্যের আর এক নাম 'আদিত্য'। (দো অবখণ্ডনে) এই ধাতু হতে 'অদিতি' এবং তার সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে 'আদিত্য' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'ন বিদ্যতে বিনাশো যস্য সোঽয়মদিতিঃ অদিতিরেব আদিত্যঃ' অর্থাৎ যাঁর কখনও বিনাশ হয় না, সেই অবিনাশী প্রভুর নাম আদিত্য। এইভাবে সূর্য, সবিতা, শিব, আদিত্য প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিচারে বিভিন্ন নাম রূপের অন্তরালে সেই একই পরমেশ্বর বন্দিত।

বেলা ১টার সময় লক্ষ্মণভারতীজী এবং আরও চারজন নিদ্রাচ্ছন্ন নাগাকে ঘুম থেকে জাগানো হল। বেলা ২টায় আহারপর্ব শেষ হতেই আমরা শুয়ে পড়লাম। অল্প বিস্তর সবাই একটু ঘুমিয়ে নিয়ে বেলা সাড়ে চারটা নাগাদ আমরা সবাই গিয়ে বসলাম সেই পুষ্করিণী তীর্থের পাড়ে। এখানকার পাথরও চকচকে মসৃণ, পায়ে ফোটে না। যেন সমগ্র অঞ্চলটার পার্বত্য-প্রান্তর ঘি দিয়ে মাজা। এই বিস্তৃত জলাধার যার গভীরতা কম কিন্তু বিস্তার বেশী, তার স্বচ্ছতা মনকে আকর্ষণ করে। এক হাঁটু জলের তলাও পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। পুষ্করিণীর সীমানা ধরে আমাদের প্রদক্ষিণ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু খররৌদ্রের তাপে পাথর খুব তেঁতে গেছে। তাই ছায়া খুঁজে খুঁজে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গাছতলায় বসলাম।

মোহান্তজী বললেন—এই শান্ত গম্ভীর স্তব্ধ পরিবেশ তপস্যার আদর্শ স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ২২ জন কপিলের সন্ধান পাই। তাঁদের মধ্যে আদি বিদ্বান কপিল, যিনি সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা তিনি শৈলেন্দ্রের দেশে বাংলার গঙ্গাতটে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই গঙ্গাসাগর সংগম মহর্ষি কপিলের তপস্যা প্রভাবে যুগযুগ ধরে একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থের মর্যাদা লাভ করেছে। তিনিই তপস্যা করেছিলেন রেবাতটে। অমরকন্টক হতে কিছুদূরে প্রসিদ্ধ কপিলধারা তাঁরই তপস্যাক্ষেত্র। কোন এক কপিল তপস্যা করেছিলেন গয়াতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের কোলে এক প্রাচীন গুহায়। সে স্থানও কপিলধারা নামে প্রসিদ্ধ। আর এক কপিল তপস্যা করেছিলেন এই পুষ্করিণী তীর্থে। তাই এই পুষ্করীণী তীর্থকে কপিল তীর্থও বলা হয়। একবার গুরুদেবের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। সে সময়েও দেখেছি, এখনও দেখছি এখানে বসলে মন স্বতঃই অন্তর্মুখ হতে চায়। শুধু আমার কেন, ধ্যানে বসলে কিংবা শান্ত হয়ে চুপ করে বসে থাকলে তোমাদেরও মন দ্রুত অন্তর্মুখ হতে বাধ্য। এর একটা কারণ আমার মনে হয়, যুগযুগ ধরে কত তপস্বী, সাধু এবং মহাত্মারা এখানে তপস্যা করে গেছেন। তারফলে এখানকার বায়ুমণ্ডল চিদ্-অণুর হিল্লোলে সর্বদাই surcharged হয়ে আছে। আর একটা কারণ এখানকার স্থান বা পরিবেশ মাহাত্ম্য। শৈলেন্দ্র তোমার কি মনে হয়?

—আপনার বর্ণিত দুটো কারণই ঠিক বলে মনে করি। তবে চিদ্-অণুর তরঙ্গ-প্রবাহের চেয়ে আমি এখানকার পরিবেশকেই ধ্যানের বেশী অনুকূল

বলে মনে করি। সামবেদের ঐন্দ্রকাণ্ডের অন্তর্গত ২য় অধ্যায়ের ৩য়া দশতিতে আমাদের গোত্র প্রবর্তক ঋষি বৎস দৃষ্ট একটি মন্ত্রে এইরকম পর্বতপ্রান্তস্থিত জলাশয়ের সন্নিকটস্থ স্থল বা নদী-সঙ্গম যে ধ্যানসিদ্ধি বা তত্ত্বসাক্ষাৎকারের আদর্শস্থল তা ঘোষণা করা হয়েছে। যথা—

উপহ্বরে গিরীণাং সঙ্গমে চ নদীনাম্।
ধিয়া বিপ্রো অজায়ত॥ ৯

(গিরীণাং) গিরি সকলের (উপহ্বরে) সমীপদেশে এবং (নদীনাং সঙ্গমে) অর্থাৎ নদী সকলের সঙ্গমে (ধিয়া) স্তুতি এবং উপাসনার দ্বারা (বিপ্র) সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর প্রকটীভূত হন (অজায়ত)।

এই সামগানের ভাবার্থ হল, পরমেশ্বর সর্বব্যাপী হলেও গিরিগুহা সমীপে এবং নদী সকলের সঙ্গমস্থানে অর্থাৎ মনোরম নিভৃতস্থানে চিত্তের একাগ্রতা হেতু, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সহজ হয়।

—আমার কাছে 'আদিত্যহৃদয়ম্' পুঁথি আছে। মার্কণ্ডেয়জীর নির্দেশানুসারে আমি ত কাল সকালেই সেই পুঁথি পড়ব। আমার পড়া শেষ হলেই একজন একজন করে আমার কাছ থেকে পুঁথি নিয়ে পাঠ করতে পার। শৈলেন্দ্রনারায়ণও ইচ্ছা করলে আদিত্যহৃদয় পাঠ করতে পার নতুবা সামবেদ বা যজুর্বেদের কোন মন্ত্র মনন করতে পার। এ বিষয়ে ত মার্কণ্ডেয়জীর সুস্পষ্ট নির্দেশই আছে—'ঋচমেকাং জপেদ্‌যস্তু যজুর্বা সাম এব চ' ইত্যাদি।

—আমি সামবেদী বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। কাজেই আমি সামবেদেরই কোন একটি বা দুটি মন্ত্র এই দিবাকর তীর্থে হিরণ্যপাণির ক্ষেত্রে মনন করার চেষ্টা করব।

—তোমার কোন দ্বিধা বা আপত্তি না থাকলে সেই মন্ত্রটি আমাকে শোনাও। এখন সাড়ে পাঁচটা বাজতে যায়। দূরেই জঙ্গল আছে। আর এখানে বসে থাকা উচিত হবে না। মন্দিরে ফিরে যাই চল। তুমি মন্ত্রটি আমাদেরকে শুনাও।

আমি সামবেদের ঐন্দ্রকাণ্ডেরই অন্তর্গত (২য় অধ্যায়, ২য়া দশতি) একটি মন্ত্র (দ্রষ্টা বৎসঃ ঋষি) এবং ৪র্থ অধ্যায়ের দ্বাদশী দশতির একটি মন্ত্র (দ্রষ্টা নকুল ঋষি) উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে করতে তাঁদের সঙ্গে মন্দিরের দিকে হেঁটে চললাম—

১। (দ্রষ্টা বংশঃ ঋষি)

ওঁ উদ্যেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্যাপসম্।
অস্তারমেষি সূর্য ॥ ৯

হে সূর্য! হে শোভনবীর্যশালীন্ পরমাত্মন্! (শ্রুতামঘং), তুমি সমস্ত ধন-সম্পদের আকর, তুমি যাচমান ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ধনবর্ষণকর্তা (বৃষভং) তুমি নরহিতকারী (নর্যাপসম্) দানশীল ও উদার হৃদয় ব্যক্তিদের যজ্ঞে (অভি-উদেষি) উদিত হয়ে থাক।

২। (দ্রষ্টা নকুল ঋষি)

ওঁ অভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যো
কবিক্রতুং অর্চামি সত্যসবং রত্নধামভি প্রিয়ং মতিম্।
ঊর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি
হিরণ্যপাণি রমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ ॥ ৮

(কবিক্রতুং) সর্বজ্ঞ (সত্যসবং) সৎকর্মের প্রেরণাদাতা (রত্নধাং) রমনীয় ধনদাতা (অভিপ্রিয়ং) সর্বজনপ্রিয়, সর্বতোভাবে প্রিয় (মতিং) সর্বদা মনন যোগ্য (সবিতারং) সর্বোৎপাদক (দেবং) স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর সূর্যদেবকে (অভ্যর্চামি) আমি অর্চনা করছি, (যস্য) যাঁর (ভাঃ) জ্যোতিঃ (ঊর্ধ্বা) উৎকৃষ্টরূপে (ওণ্যোঃ) দ্যুলোক ও ভূলোকে (অদিদ্যুতৎ) অত্যন্ত দীপ্ত রয়েছে এবং (সবীমনি) যে কান্তির আবির্ভাব ঘটলে (অমতিঃ) সর্বকান্তি প্রকাশিত হয় সেই (সুক্রতুঃ) শোভনকর্মা (হিরণ্যপাণিঃ) জ্যোতির্ময় স্বপ্রকাশ সবিতৃদেব কৃপাপূর্বক (স্বঃ) সূর্যমণ্ডলকে (রমিমীত) নির্মাণ করেছেন।

মন্দিরে এসে পৌঁছলাম, সূর্যাস্তও হয়ে গেল। আমরা সবাই মন্দিরের চারদিকে ঘিরে বসলাম। লক্ষ্মণভারতীজী টর্চের আলো জেলে হলঘর থেকে পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূরদানী প্রভৃতি নিয়ে এলেন। নর্মদা স্পর্শ করে এসে মোহান্তজী হিরণ্যপাণি মহাদেবের আরতি শেষ করলেন। হলঘরে সবাই ঢুকে যাবার পর যে যার শয্যা পেতে সান্ধ্যক্রিয়ায় বসে গেলেন। হলের প্রবেশদ্বারে লক্ষ্মণভারতীজী একটি ধূনী জালতে চেয়েছিলেন কিন্তু মোহান্তজী তাঁকে কিছুতেই ধূনী জালতে দিলেন না।

বললেন—'গত রাত্রিতে তুমি যাকড়খেড়াতে চিতাবাঘের ভয়ে ধূনী জেলে গোটা রাত্রি আমাদেরকে দমে দমে হায়রাণ করেছ। আজও কি আমাদেরকে দমবন্ধ করে মারবে নাকি? যা নর্মদার উপর নির্ভর করে পড়ে থাকব, যা ঘটে ঘটুক।' ধূনী জালা হল না। নিরাপদেই রাত্রি প্রভাত হল।

আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। ভোরে উঠেই সকলে নর্মদাতে স্নান করে সূর্যার্ঘ্য অর্পণ করতে লাগলেন। স্নান তর্পণাদি সেরে সকলেই পুষ্করিণী তীর্থের সেই পুষ্করিণীর তীরে গিয়ে বসলাম। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোহান্তজী আদিত্যহৃদয় পাঠ শুরু করলেন। তাঁর পাঠের পরে লক্ষ্মণভারতীজী যতীন্দ্রজী, রতনভারতীজী এবং দুই পণ্ডিতজী একে একে পাঠ করলেন। অন্যান্য নাগারা শ্রবণ করেই পরিতৃপ্ত থাকলেন। মোহান্তজী লক্ষ্মণভারতীজীকে বললেন—যতটুকু ঘি আছে, আমাকে এনে দাও, আমার হবন করতে ইচ্ছা হচ্ছে। লক্ষ্মণভারতীজী দুজন নাগাকে সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘি আনতে দৌড়ে গেলেন। পাথরের হলঘর থেকে ঘি এবং কাঠ এনে একটা পাথরের খোরে অল্প কাঠ সাজিয়ে তিনি মন্ত্রপাঠ করে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলেন। তাঁর হোমের পদ্ধতিটি অদ্ভুত! বাঁ পাটিকে গুটিয়ে এনে বাঁ হাত দিয়ে তা বেষ্টন করে ডান হাতে চমসের সাহায্যে আহুতি দিতে লাগলেন। তাঁর হোমমন্ত্রটিও আমার কানে অদ্ভুত শোনাল।

ওঁ হ্রীং হিমালীঢ়ং স্বাহা।
ওঁ হ্রীং নিলীঢ়ং স্বাহা।
ওঁ হ্রীং মালীঢ়ং স্বাহা॥

এই মন্ত্র ২৮ বার উচ্চারণ করে ২৮ বার আহুতি দিলেন। তারপর দণ্ডায়মান হয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে তিনি মধুর সুরে স্তব শুরু করলেন—

ওঁ যন্মণ্ডলং সর্বগতস্য বিষ্ণোঃ
আত্মা পরং ধাম বিশুদ্ধতত্ত্বম্।
সূক্ষ্মান্তরৈর্যোগপথানুগম্যং
পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্॥

মোহান্তজীর হোম ও প্রণাম শেষ হতেই লক্ষ্মণভারতীজী চারজন নাগাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন আমাদের যাত্রীনিবাসে। বুঝলাম, তিনি গেলেন আমাদের ভিক্ষার বন্দোবস্ত করতে। এই বর্ষীয়াণ সাধুর কর্মক্ষমতা, সর্বদিকে সমান দৃষ্টি, সেবা তৎপর বুদ্ধি প্রথম থেকেই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। ইনি আমাদের একাধারে পথপ্রদর্শক, খাওয়া দাওয়া, ভিক্ষা সংগ্রহ, দুর্গম পথের প্রয়োজনীয় সবকিছুর প্রবন্ধক এবং শ্রেষ্ঠ সহায়ক। পরিক্রমায় বেরিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে অনেকক্ষেত্রেই আমাকে জঙ্গলপথে পরিক্রমা করতে হয়েছে, কিন্তু এঁর মত কর্মিতকর্মা লোক আর কাউকে দেখেছি বলে মনে হয় না। যে কোন ধর্মসম্প্রদায়ে ইনি একজন রত্নস্বরূপ। নিজের ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার চেয়ে সংঘের সেবাকেই ইনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

লক্ষ্মণভারতীজী চলে যাওয়ার পরেই মোহান্তজী জপে বসলেন। তাঁর দেখাদেখি সকলেই জপে মনোনিবেশ করলেন। আমি পূর্বোক্ত সামবেদের মন্ত্র বারবার মৃদুকণ্ঠে পাঠ ও মনন করতে লাগলাম।

বেলা প্রায় ১০টা নাগাদ আমরা ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরে এলাম মন্দিরে। এসে দেখি, যা ভেবেছিলাম তাই, লক্ষ্মণভারতীজী লিট্টি তৈরী করতে লেগে পড়েছেন। আমরা কিছুক্ষণ বসে জিরিয়ে নিলাম। তারপর সবাই মিলে গেলাম হিরণ্যপাণি মহাদেবের পূজা করতে। মন্দির খুলে দেখা গেল, আজ আর শিবলিঙ্গের উপর বেলপাতা নাই। মোহান্তজীকে সে কথা বলতেই তিনি মন্তব্য করলেন—'আজ ত আর মহাদেব অপূজিত নাই। পুষ্করিণী তীর্থে যাবার আগেই লছমন ভেইয়া এবং আরও অনেকে হিরণ্যপাণির মাথায় পবিত্র নর্মদাবারি ঢেলে পূজা করে গেছেন!' তিনি আমাকে বললেন—'কাল আমি মন্ত্র পড়েছিলাম, সেই ধ্যানমন্ত্র আদিত্যহৃদয়েরই মন্ত্র। আজ তুমি বেদমন্ত্র পড়ে যাও, আমরা একে একে জল ঢালি।'

আমি তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রথম গায়ত্রী মন্ত্র পড়লাম। কারণ আমি মনে করি গায়ত্রীই ভর্গ দেবতা সূর্যনারায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজার মন্ত্র। পাঁচবার গায়ত্রী পাঠ করতেই সেই সময় কয়েকজন হিরণ্যপাণির মাথায় জল ঢাললেন। পাঁচবার পাঠ করলাম পূর্বোক্ত সেই সামবেদের মন্ত্র। সে সময়েও কয়েকজন পূজা সেরে নিলেন। বাকী রইলেন কেবল মোহান্তজী। তিনি কমণ্ডলু

হাতে করে আমাকে হাসতে হাসতে বললেন, নূতন কোন বেদমন্ত্র পাঠ কর, আমি হিরণ্যপাণির পূজা করি। মহাদেবের কাছে নতজানু হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, 'হে হিরণ্যপাণি! আমি অত্যন্ত অভাজন, শুধু জল ছাড়া এখানে আর কি দিয়ে তোমার পূজা করব প্রভো!' এই বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁর সেই ভক্তিভাব দেখে আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঋগ্বেদ হতে পাঠ করতে লাগলাম (১ম মণ্ডল, সূ ২২)—

ওঁ হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্ ॥ ৫
অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি। তস্য ব্রতান্যুশ্মসি ॥ ৬
বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ। সবিতারং নৃচক্ষসম্ ॥ ৭
সখায় আ নিষীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ। দাতা রাধাংসি শুম্ভতি ॥ ৮

আজকে ডাকি মোদের মাঝে	দিব্যদ্যুতি সে দেবতা!
রক্ষা করুন হিরণপাণি	পরম পদের জ্ঞাপয়িতা ॥ ৫
স্তুতি করি আমরা আজি	তমোনাশক সবিতারি
অজ্ঞান আঁধার দূর করে দিন	তিনিই মোদের রক্ষাকারী ॥ ৬
হবন করি সেই সবিতার	নরলোকের চক্ষু যিনি।
বিচিত্র ও রমনীয়	বিভাগ করেন ধন যে তিনি ॥ ৭
ঐ যে শোভেন সবিতৃদেব	অভীষ্ট ধন দিবার লাগি
শীঘ্র এস হে সখাগণ	স্তোত্রে তাঁরই কৃপা মাগি ॥ ৮

পূজা ও প্রণাম সেরে আমরা বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসেই মোহান্তজী বললেন—'তোমার কাছে বেদমন্ত্র শুনে আমার খুবই আনন্দ হল তবে তুমি বাংলায় পদ্যানুবাদ যা ঠাকুরকে শোনালে, তাতে তুমি 'হিরণ্যপাণি' এবং 'অপাংনপাত' শব্দ দুটির যে অর্থ প্রকাশ করলে, ঐ দুটি শব্দার্থ সম্বন্ধে আজই অপরাহ্নে তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। এখন চল দেখি, লছমন ভেইয়া আমাদের ভিক্ষার আয়োজন কতদূর কি করলেন।'

এসে দেখলাম, লিট্টি 'পাকানো' চলছে। বেলা সাড়ে বারটা নাগাদ

আমরা খেতে বসলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আমরা সকলেই মন্দিরের সম্মুখস্থ নর্মদাতটে এসে বসলাম। তিনি বসেই বললেন—বেদমন্ত্রে উদাহৃত 'হিরণ্যপাণি' শব্দের অর্থ তুমি করেছ 'দিব্যদ্যুতি' আর 'অপাংনপাত' শব্দের অর্থ করেছ 'তমোনাশক'। কিন্তু এই বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে এই দুটি শব্দের অন্যরকম অর্থ শুনেছি। গুরুজী যখন ভারোচে আসতেন, তখন তিনি একমাস থাকতেন। হাজার হাজার ভক্তের ভীড় হত। সেইসময় তিনি নানা শাস্ত্রের আলোচনা ছাড়াও বেদজ্ঞ পণ্ডিতদেরকে দিয়ে বেদ ব্যাখ্যা করাতেন। ঋগ্বেদের যে চারটি মন্ত্র উচ্চারণ করে তুমি আজ হিরণ্যপাণির পূজা করালে, এই চারটি মন্ত্রই গুরুদেবের খুবই প্রিয় ছিল। কাজেই এমনই ঘটনার পারম্পর্য ও সমাপত্তি (coincidence of facts) দেখ, তুমি যখন সেই বিশেষ চারটি মন্ত্রই পড়ে শোনালে, আমি হিরণ্যপাণি মহাদেবের বিশেষ দয়া ভেবে আনন্দে অধীর হয়ে পড়েছিলাম। পণ্ডিতগণের মুখে হিরণ্যপাণি শব্দের সায়ন-ভাষ্য শুনেছি। সায়নাচার্য কৌশীতকী ব্রাহ্মণ হতে একটি উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন, দেবতাদের অনুষ্ঠিত কোন এক যজ্ঞে সবিতৃদেব স্বয়ং ঋত্বিক হয়ে ব্রহ্মা রূপে অবস্থিত ছিলেন। সেই সময় অধ্বর্যুগণ সেই ব্রহ্মারূপী সবিতাকে 'প্রাশিত্র' নামক পুরোডাসের (হুতাবশিষ্ট ঘৃত) অংশ প্রদান করেন—অধ্বর্যবঃ তস্মৈ সবিত্রে ব্রহ্মণে প্রাশিত্রনামকং পুরোডাশভাগং দত্তবন্তঃ। সবিতা সেই প্রাশিত্র হস্তে গ্রহণ করলে তাঁর হস্ত ছিন্ন হয়। তখন অধ্বর্যুগণ তাঁর সুবর্ণময় হস্ত তৈরী করে দিয়েছিলেন—ততঃ প্রাশিত্রস্য দাতারোঽধ্বর্যবঃ সুবর্ণময়ং পাণিং নির্মায় প্রক্ষিপ্তবন্তঃ। সেইজন্যই সূর্যদেবের অপর নাম হিরণ্যপাণি।

আবার কোন কোন ভাষ্যকারের মতে, সবিতার দুটি হাতেই সুবর্ণবলয় আছে, তিনি যজ্ঞকর্তা যজমানকে দান করার জন্য সুবর্ণধারণ করেছিলেন সেইজন্য তাঁর নাম হিরণ্যপাণি। আমি এও শুনেছি, সূর্যদেবের 'হিরণ্যপাণি' নাম উপলক্ষে এদেশে যেমন ঐরকম উপাখ্যান আছে, অন্যান্য দেশে অন্যান্য ভাষাতেও ঐরকম গল্প প্রচলিত আছে। গ্রীকদের Helios, ল্যাটিনদের Sol, টিউটনদের Tyr (টার) এবং ইরাণীদের 'খরসেদ' প্রভৃতি শব্দ সূর্যেরই নাম। এদেশের গল্প যেমন যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে গিয়ে সূর্যের হাত কাটা পড়েছিল, তেমনি জার্মানদের টারদেব (Tyr) বাঘের মুখে হাত

দিয়ে হাত হারিয়েছিলেন, এইরকম কিংবদন্তী আছে। এমতাবস্থায় তুমি হিরণ্য শব্দের প্রচলিত অর্থ সুবর্ণের কথা উড়িয়ে দিলে সেটা কি করে মানা যায়?

—আগে আপনি বলুন বেদমাতা সূর্য অর্থে এমন কোন নবনীত কোমলতনু জীবের কথা বলছেন, যার প্রাশিত্র হাতে করলেই দুই হাত কাটা পড়ে কিংবা বাঘের মুখে হাত ঢোকালে সঙ্গে সঙ্গে হাত উড়ে যায়? বৈদিক ব্যুৎপত্তি অনুসারে আগেই আমি দেখিয়েছি সূর্য বা সবিতা শব্দের অর্থ পরমেশ্বর। পরমেশ্বর কি স্থূল ও জড়পদার্থ সুবর্ণবলয় পরবার জন্য লালায়িত? দিব্যতেজের আধার ভগবান সূর্যের কি সুবর্ণময় হস্ত ধারণ করার প্রয়োজন? সায়ণাচার্যই হোন বা কোন গ্রীক বা জার্মান পণ্ডিত হোন, অবৈদিক রোচক উপাখ্যান রচনা করলে বেদনিহিত মূল দিব্যভাবকে উপেক্ষা করে তা মেনে নিতে হবে নাকি? হিরণ্যপাণিতে অর্থাৎ হস্তে যাঁহার স্বর্ণ তিনি হিরণ্যপাণি, এই সাধারণ অর্থ সকলেই জানেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে সুবর্ণের মূল্য যতই হোক না কেন, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তার মূল্য কতটুকু? বেদের মূল মন্ত্রে হিরণ্যপাণি শব্দের সঙ্গে উতয়ে শব্দটি যুক্ত আছে। 'উতয়ে' শব্দের অর্থ রক্ষা করার জন্য—অস্মাকং রক্ষণার্থ, পরিত্রানার্থং। সুবর্ণ কি কাউকে কখনও রক্ষা করতে পারে? সুবর্ণের দ্বারা এই স্থূলজগতে সাময়িকভাবে কোন প্রয়োজন সাধিত হলেও সত্যাভিলাষী সাধকের সত্যানুসন্ধানে বা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য কতটুকু কাজে লাগে? জীবের চিরপরিত্রাণ বা মুক্তি সুবর্ণের দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। চিরপরিত্রাণ ঘটে দিব্যজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানরূপ হিরণ্যের দ্বারা। কাজেই হিরণ্যপাণিং শব্দের অর্থ সুবর্ণধারিণং নয়, প্রজ্ঞাপ্রদং হওয়াই সঙ্গত। জড় সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়ে আলোর প্রকাশ ঘটে, হিরণ্যবর্ণ রশ্মি বা কিরণ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, তেমনি রূপক অর্থে নিগূঢ় ভাবসমৃদ্ধ বেদমন্ত্র বলেছেন, জীবের হৃদয়ে দিব্যদ্যুতিময় অর্থাৎ প্রজ্ঞাময় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের দিব্যতেজ প্রকটিত হলে তবেই জীবের চৈতন্যজগতে জাগরণ ঘটে। এইজন্যই ঐ বেদমন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছে, সাধক সেইরকম 'সবিতারং' অর্থাৎ সূর্যনারায়ণকে আবাহন করুক 'স চেত্তা দেবতা পদং' যিনি পরম পদের জ্ঞাপয়িতা। 'চেত্তা' শব্দের অর্থ 'জ্ঞাপয়িতা ভবতি'। সুবর্ণবলয় পরিহিত সুবর্ণধারী কেউ

আমাদের পরমপদের জ্ঞাপয়িতা হতে পারবেন, না, দিব্যজ্ঞান ও দিব্যতেজের আধার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরই সে কাজে সমর্থ? কাজেই সায়নাচার্য মশাইরা যাই বলুন, আমি মনে করি হিরণ্যতেজা দিব্যজ্যোতির আধার ভগবান সূর্যদেবই পরমপদের জ্ঞাতা এবং জ্ঞাপয়িতা। তাই ঐ মন্ত্রে হিরণ্যপাণি শব্দের দিব্যদ্যুতি অর্থ করাই বেদসম্মত।

সাধু! সাধু! বাঙালীবাবা! তোমার ব্যাখ্যাতে নূতন আলোর নিশানা পেলাম। এবার 'অপাংনপাতং' শব্দটির অর্থ তোমার পক্ষে কিভাবে 'তমোনাশক' অর্থ করলে তা বুঝিয়ে দাও। অপাংনপাতং শব্দের অর্থ ত আমরা 'জলের শোষক' বুঝে থাকি। সায়ণাচার্যও ত শব্দটির এইভাবে ব্যুৎপত্তি করেছেন—'ন পাতয়তি' এই অর্থে গত্যর্থক ন্যন্ত (পৎ) ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয় করে 'ন পাৎ' অগ্ন্যাদিভ্যো হি অপাং ন প্রাপকৌ প্রভূত তৎ শোষকৌ।

—'অপাংনপাতং' বাক্য হতে তমোভাব-নাশের, অজ্ঞান-আঁধার দূরীকরণের ভাব কেন আসে, সামান্য অনুধাবন করলেই তা বুঝা যায়। জল বা জলীয় অংশই তমোভাবের, অন্ধকারের দ্যোতক। জড়ত্ব, শৈত্য—জলের ধর্ম। সেইজন্যই 'জলের' বা জলীয়ভাবের, যে-কোনও তরল লঘুভাবের 'নাশক' সংজ্ঞায় সবিতাকে অভিহিত করা হয়। জলের আধিক্য, শৈত্যের প্রাধান্য—জ্যোতির বা জ্ঞানের হানিকর। 'অপাংনপাতং' শব্দে যদি পৃথিবীর জল শুকিয়ে দেওয়া যাঁর কার্য, এইরকম বুঝাত, তাহলে এইরকম প্রার্থনা বেদে থাকত না। যে জল মানুষের প্রাণস্বরূপ সেই জলকে শুকিয়ে শেষ করে ফেলার জন্য কেউ আবার প্রার্থনা করেন নাকি? ঋকে 'অপাংনপাতং' এর সঙ্গে 'অবসে' যুক্ত থাকায় সবিতারূপী পরমেশ্বরের নিকট ধূলিমলিন মর্ত্যভাবের কবল থেকে পরিত্রাণের কথাই বলা হয়েছে; কেননা, 'অবসে' শব্দের অর্থ 'রক্ষণায় রক্ষণার্থং'। জাড্য বা জড়তা দূর করে যিনি জীবের মধ্যে চিতিশক্তির উদ্বোধন ঘটান, অজ্ঞান-আঁধার দূর করে হৃদয়ে জ্ঞানলোক বিচ্ছুরিত করেন, তিনি তমোনাশক সবিতা, জলশোষক সবিতা নন।

ব্যাখ্যা শুনে মোহান্তজী হাসতে হাসতে বললেন—আইয়ে আইয়ে

আপ্কা নাথ 'হ্মাণ্ডসেক' করুণা, এইবলে আমার ডান হাতটা ঝাপটে ধরে সজোরে ঝাঁকিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে। সমগ্র আকাশ জুড়ে আলোর বন্যা। হিরণ্যপাণি মহাদেবের আরতির জন্য মোহান্তজী মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করলেন। শিঙা ডম্বরু বাজাতে লাগলেন নাগারা। প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রদীপ জেলে আরতি করতে করতে সহসা তাঁর মধ্যে দেখলাম যেন ভাবের জোয়ার এসেছে। তিনি পঞ্চপ্রদীপ ঘোরাতে ঘোরাতে ভাবাবেগে উদ্দণ্ড নৃত্য সুরু করে দিলেন। লক্ষ্মণভারতীজী ও যতীন্দ্র প্রভৃতির ভয় হল হয়ত তিনি পড়ে যাবেন! তাঁরা দুজন গর্ভগৃহে প্রবেশ করে পড়ে গেলে যাতে তাঁরা ধরে ফেলতে পারেন সেইজন্য হস্ত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিন্তু তিনি পড়লেন না। ঢুলুঢুলু নেত্রে ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে তিনি নাচের তালে তালে গাইতে থাকলেন—

ওঁ লোকাভিরামং আশুতোষং ত্বং
রাজীবনেত্রং ভর্গনাথনাথং।
কারুণ্যরূপং করুণাকরং ত্বং
সর্বযোগসারং শিবমহং শরণং প্রপদ্যে॥

জ্যোৎস্না প্লাবিত নর্মদাতটে এই ধ্যান গম্ভীর পরিবেশে হিরণ্যপাণির স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তির দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকেরই দেখছি ধ্যানাবিষ্ট অবস্থা। শ্রুতিমধুর স্তোত্রধ্বনি প্রত্যেকেরই কানে মধু বর্ষণ করছে। অপূর্ব ভাবের তরঙ্গে যেন ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছি আমরা। এমন সময় মন্দিরের মধ্যে সহসা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। হিরণ্যপাণির সামনে কর্পূরদানীতে রাখা কর্পূর আপনা হতেই দপ্ করে জলে উঠল। পঞ্চপ্রদীপ রেখে মোহান্তজী কর্পূরদানী হাতে নিয়ে দুচারবার ঘোরাবার পরেই টলে পড়লেন। লক্ষ্মণভারতীজী এবং যতীন্দ্র তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে হিরণ্যপাণি মহাদেবের সামনে শুইয়ে দিলেন।

আমরা সকলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রায় আধঘণ্টা এভাবে পড়ে থাকার পর তাঁর দেহটা কেঁপে উঠল কয়েকবার। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে বলছেন শুনতে পেলাম—ওঁ লোকাভিরামং আশুতোষং ত্বং, রাজীবনেত্রং ভর্গনাথনাথং……

নাগারা তখন নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলাবলি করছেন মোহান্তজীকা 'সমাধিসে ব্যুত্থান হো গয়ি'। এঁদের মুখে 'সমাধি লাগ গয়ি' এবং 'সমাধিসে ব্যুত্থান' বহুবার শুনেছি। এঁরা সমাধি বলতে কি বুঝে রেখেছেন জানি না, যাইহোক তাঁদের কথা আমার ভাল লাগল না, আমি মন্দির থেকে বেরিয়ে গিয়ে নর্মদার ঘাটে গিয়ে বসলাম। নর্মদার জলে বাতাসের জন্য যে হিল্লোল জেগেছে তাতে চাঁদের আলো পড়ে এক অপরূপ দৃশ্যের রচনা করেছে; মনে হচ্ছে যেন স্বচ্ছতোয়া নর্মদার বুকে এ যেন চন্দ্ররশ্মি নয়, চন্দ্র হতে সুবর্ণ বিগলিত হয়ে গল্‌গল্‌ ধারায় নিরন্তর পড়ে চলেছে। ঢেউ পর ঢেউ-এ বাধা পেয়ে নর্মদার অভ্যন্তর হতে চন্দ্র যেন উপরে উঠে আসতে পারছে না! ঊর্ধ্বাকাশে তাকালেই দেখছি পূর্ণচন্দ্র তাঁর স্বমহিমায় অশেষ বিশেষ রূপলাবণ্য নিয়ে তাঁর আকাশজোড়া হাসিতে বিশ্বভুবন ভরিয়ে রেখেছেন। 'চাঁদের হাসির বান ডেকেছে উথলে পড়ে আলো', কবিগুরুর এই গান কত সার্থক!

হঠাৎ 'সামহালকে, সামহালকে' শব্দ শুনে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, লক্ষ্মণভারতীজী ও রতনভারতী মোহান্তজীকে ধরে ধরে নিয়ে এসে মন্দিরের সিঁড়ির উপর বসিয়ে দিলেন। তিনি এখনও কচি শিশুর মত আধো আধো বুলিতে জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন বিড়বিড় করে বলে চলেছেন। আমার ধর্মপুরীর কথা মনে পড়ে গেল। সেদিনও ছিল পূর্ণিমা। সে রাত্রিতেও তিনি এইরকম ভাববিহ্বল অবস্থায় তাঁর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে জ্যোৎস্নালোকে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

একে একে লক্ষ্মণভারতীজী, যতীন্দ্র, রতনভারতী প্রায় প্রত্যেকেই তাঁকে হলঘরে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই এখান থেকে উঠে যাবেন না। তাঁর মুখে একটিমাত্র বুলি—'এই অত্যাশ্চর্য রাত্রি ঘুমের জন্য সৃষ্টি হয় নি।' এই একই বুলি তিনি আওড়ে ছিলেন ধর্মপুরীতেও। আমার মন ক্রমশঃ বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। লক্ষ্মণভারতীজীরা বারবার সাধাসাধি করে থকে গিয়ে বসে পড়েছেন। আর অন্যান্য ভক্তরা, ভক্তরা সাধারণতঃ যেমন ল্যালাক্ষ্যাপা হয়, সেইরকমভাবে কেউ তাঁর পায়ে মাথা ঠুকছেন, কেউ তাঁকে একবার স্পর্শ করে নিজেকে ধন্য করে নিচ্ছেন, কেউ বা হাততালি দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় করছেন।

সব দেখে শুনে আমার আর সহ্য হল না। আমি মোহান্তজীকে ঠেলা মেরে বললাম—যথেষ্ট হয়েছে। আর নাটক নাই বা করলেন। আমি বাংলাদেশের ছেলে। সেখানে ভাবসমাধির নামে সাধুবাবা এবং গুরুজীদের অনেক নাটুকেপনা করতে দেখেছি। কেউ বা কোন গান শুনে বাঁ হাতকে মুদ্রা করে বুকে রেখে ডান হাতকে উপর দিকে তুলে দাঁত মুখ খিঁচে দাঁড়িয়ে পড়েন, কেউ বা অর্ধনিমীলিত নয়নে স্থির হয়ে বসে সেই অবস্থার ফটো ছাপিয়ে নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে বলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। দয়া করে আপনি আর সেইসব আত্মপ্রচারকামী তথাকথিত সাধুর স্তরে নিজেকে নামিয়ে আনবেন না। নর্মদাতটের কোন প্রিয় মহাত্মা সম্বন্ধে এইরকম নীচু ধারণা নিয়ে আমি যেতে চাই না। কোন আধ্যাত্মিক গান বা স্তোত্র পাঠ করতে করতে কেউ যদি ধেই ধেই করে নাচতে থাকে বা নাচতে নাচতে ভূলুণ্ঠিত হন, দাঁত মুখ খিঁচে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন, ল্যালাক্ষ্যাপা ভক্তরা তাঁকে যাই ভাবুন, প্রকৃত সত্য এই যে সেই মহাত্মার স্নায়ুশিরা এমনই দুর্বল যে তাঁর দেহমন কোন অবস্থাতেই সমাধির উপযুক্ত নয়। সমাধি শব্দের অর্থ সমভাবে অধিষ্ঠান, চৈতন্যে পরম প্রজ্ঞার স্তরে অধিরোহন ও স্থিতিকে বুঝায়, তা কোন নাটুকেপনা নয়।

এক নিঃশ্বাসে আমি কথাগুলি বলে গেলাম কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে। আমার কথা শুনে মোহান্তজী বললেন—সমাধি কাকে বলে বাবা ?

—পাতঞ্জল যোগদর্শনে সজীব নির্বীজ, সবিকল্প নির্বিকল্প, সম্প্রজ্ঞাত অসম্প্রজ্ঞাত প্রভৃতি সমাধির যে বিচার আছে, তা আমার চেয়ে আপনি ভালই জানেন।

সলিলে সৈন্ধবং যদ্বৎ সাম্যং ভবতি যোগতঃ
তথাত্মমনসোরৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে ॥

(হঠযোগ প্রদীপিকা ৪।৫-৭)

অর্থাৎ জলের সঙ্গে সৈন্ধব লবণের যোগ হলে যেমন উভয়েই এক হয়ে যায়, সেই রকম মন যখন আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একীভাবাপন্ন হয়, তখন সেই অবস্থার নাম সমাধি। মণ্ডলব্রাহ্মণ উপনিষৎ ঘোষণা করেছেন—সমাধৌ মৃদিতশ্চেতোবিকারস্য তদাকারকারিতাঽখণ্ডাকারবৃত্ত্যাত্মক সাক্ষিচৈতন্যে

প্রপঞ্চলয়ঃ সম্পদ্যতে, প্রপঞ্চস্য মনঃ কল্পিতত্বাৎ—সমাধিতে তমোবিকার এককালীন বিনষ্ট হয় এবং মন অখণ্ডচৈতন্যাকারে আকারিত হয় এবং মনের কল্পিত এই প্রপঞ্চময় জগতেরও লয় হয়। এই রকম অবস্থার নাম সমাধি। 'ফুল, চাঁদ, জ্যোৎস্না বা যে কোন অপরূপ দৃশ্য দেখে কিংবা মধুর কোন সঙ্গীত বা স্তোত্র গাইতে গাইতে বা শুনতে শুনতে মনের মধ্যে যে ভাবতরঙ্গ সাময়িকভাবে জাগ্রত হয় এবং দেহে নানা বিকার দেখা যায় তা সমাধির অনুকূল নয়, তা তমোবিকারের নামান্তর। আপনি এবার উঠে পড়ুন, রাত্রি ৯টা বেজে গেছে, আমাদের ঘুম পাচ্ছে।' এই বলে আমি তাঁর হাত ধরে টান দিতেই তিনি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মণভারতীজী ও আমার কাঁধে ভর দিয়ে তিনি হলঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। আমরাও যে যার আসনে বসলাম।

আধঘন্টা পরেই মোহান্তজী পা টিপে টিপে উঠে হলঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, ১০।১২ জন জেগে ছিলাম। আমরা টের পেয়ে বেরিয়ে এলাম। আমাদেরকে দেখেই তিনি বললেন—লছমন ভেইয়া, আমাকে বকো না বা বাধা দিয়ো না। পুষ্করিণী তীর্থের পাড়ে যেতে আমার ইচ্ছা হয়েছে। এই বলেই তিনি দৌড় লাগালেন। লক্ষ্মণভারতীজী ও যতীন্দ্র দৌড়ে গিয়ে দুজনে তাঁকে ধরে ফেললেন। লক্ষ্মণভারতীজী ত রীতিমত তাঁকে ধমকাতে সুরু করেছেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন—গুরুজী যে কেন আপনার মত একজন অর্ধপাগলকে গদীতে বসিয়ে গেছেন জানিনা। আপনার কি খেয়াল আছে যে, আমরা এখনও শূলপাণির ঝাড়ির মধ্যে আছি! আপনার খেয়ালের বশে কি এতগুলো লোক বেঘোরে মারা পড়বে নাকি? ইত্যাদি।

—'লছমন ভেইয়া! হম্ তুমহারা গোড় পাকাড়তা হুঁ, মুঝে একদফে যানে দিজিয়ে। আপলোগ্ ভি হমারা সাথ মেঁ কৃপয়া চলে।'

তাঁর এইরকম কাতর উক্তিতে বাধ্য হয়ে লক্ষ্মণভারতীজী ঘরের মধ্যে ঢুকে কয়েকটা টাঙ্গি এবং বল্লম বের করে নিয়ে এলেন। আমরা প্রত্যেকে এক একটা হাতে নিয়ে সেই বেদমূর্তি দিবাকরের তপস্যাস্থল হিসাবে বর্ণিত পুষ্করিণীর দিকে যেতে লাগলাম। মন্দির থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরেই এই পবিত্র জলাধার। ধবধবে জ্যোৎস্নায় পর্বতপ্রান্তর সব আলো করে আছে।

যেন এক রূপকথার রাত্রি! যেন কোন এক রূপকথার দেশে আমরা এই ১২ জন যাত্রী এসে পৌঁছে গেছি। পুষ্করিণীর পূর্ব পাড়ে এসে আমরা দাঁড়ালাম। পুষ্করিণীর জলে চাঁদের কিরণ পড়ায় মনে হচ্ছে স্বর্ণদ্যুতিময় হিরণ্যপাণি যেন মন্দিরে নাই, আছেন এই পুষ্করিণীর নীরে।

মোহান্তজী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে গুনগুন স্বরে গাইতে লাগলেন—

ওঁ যন্মণ্ডলং বেদবিদো বদন্তি
গায়ন্তি যচ্চারণ সিদ্ধসংঘাঃ।
যদ্‌যোগিনো যোগযুষাঞ্চ সর্বাঃ
পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্‌॥

এমন সময় রতনভারতী ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠলেন—'গুরুজী উত্তর এবং দক্ষিণপাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন ওঁরা কারা?' আমরা তাকিয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। উত্তরপাড়ে দুটি এবং দক্ষিণপাড়ে দুটি ধূনী জলছে। প্রত্যেক ধূনীর কাছে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন একজন করে জটাজুট সাধু। ধ্যানস্থ। ধূনীর আগুনে এবং চাঁদের আলোতে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি, প্রত্যেকের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল তামার মত। জটার চুলও তাম্রবর্ণ। তাঁদের প্রত্যেকের গলার রুদ্রাক্ষমালাও তাম্রবর্ণ। যতীন্দ্র আমার কানে কানে বললেন—'আমরা আলেয়া দেখছি না ত?' আমি চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে আবার তাকালাম। সেই একই দৃশ্য। মোহান্তজী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাঁদের দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁদের কাছে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। লক্ষ্মণভারতীজী তাঁকে জড়িয়ে ধরে মৃদুস্বরে বললেন—'অবুঝ হবেন না, ওঁরা হয়ত কোন সিদ্ধচারণ বা সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধযোগী। যতই কাছে যাবার চেষ্টা করবেন, হয় তাঁরা দূরে সরে যাবেন নতুবা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবেন। এইখান থেকে প্রণাম করে আমরা ফিরে যাই চলুন।' মোহান্তজী তাঁর কথা গ্রাহ্য করলেন না। ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তিনি লক্ষ্মণভারতীজীর হাত ছাড়িয়ে মাত্র কয়েক পা এগিয়ে গেছেন এমন সময় সমস্ত বনভূমিকে প্রকম্পিত করে বাঘের গর্জন উঠল। হুঙ্কারের পর হুঙ্কার! এই হুঙ্কারে মোহান্তজীর চৈতন্যোদয় হল। তিনি নিজেই লক্ষ্মণভারতীজীর হাত ধরে পিছন ফিরলেন। দ্রুত চলতে লাগলেন মন্দিরের দিকে। প্রায় ১০০ গজ

এসে একবার পিছন ফিরে দেখলাম, সকলেই দেখতে পেলাম সেই উত্তর-দক্ষিণ পাড়ের চারজন মহাত্মা ছাড়া পশ্চিমপাড়েও একজন মহাত্মা, তাঁর ধূনীর আগুন দাউদাউ করে জলছে, একই রকম জটাজুট তাম্রবর্ণ শরীর. তিনি অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়ছেন যেন। তাঁর গমকে গমকে হাসির লহর আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আমাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আমরা স্পষ্টতঃ ভয় পেয়েছি। সন্ত্রস্তভাবে আমরা পড়ি মরি করে হলঘরে এসে ঢুকলাম। এসে দেখি, আমাদের সাথীরা অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। মোহান্তজী বললেন—'বেচারারা জানতেও পারল না আমাদের এই আশ্চর্য অভিযান এবং অভিজ্ঞতার কথা!' এখন তাঁর কণ্ঠস্বরে তাঁকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ বলে মনে হল : তাঁর ভাবের ঘোর বা 'দশা' কেটে গেছে।

সবাই শুয়ে পড়লাম একে একে ; যতীন্দ্র জানাল রাত্রি ১২টা বাজতে আর ১০ মিনিট মাত্র বাকী। আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না। সন্ধ্যার সময় আরতি কালে হিরণ্যপাণি মহাদেবকে ঘিরে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠা, আপনা হতে কর্পূরের প্রজ্বলন এবং একটু আগে পুষ্করিণীর তীরে রহস্যময় সাধুদের দর্শন, পর পর এইসব দৃশ্যপটের কথা চিন্তা করতে করতে চোখ হতে ঘুম চলে গেল। আমি হিরণ্যপাণির উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম—হে হিরণ্যরেতা! দৃশ্য বিপদ আপদে তুমিই আমাদের রক্ষক। অদৃশ্য গোপন যত ত্যান বা অন্তরায় তুমি যদি তা নিবারণ না কর, তবে সত্যপথের অভিযাত্রীকে কে তাহলে রক্ষা করবে? ডিমের খোলায় যেদিন পাখী থাকে বদ্ধ, সেদিন সপ্তস্বরের মধুর মূর্ছনা তার কাছে স্বপ্ন—যেদিন সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে সে আকাশে ওড়ে, সেদিনই ত তার নবজন্ম, সত্যজন্ম। সেই সত্যজন্ম লাভের অভীপ্সায় যেসব অভিযাত্রী পরিক্রমাবাসী তোমার নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, তাদেরকে তুমি যদি কৃপা করে তপস্যার গোপন রহস্যটি না শিখিয়ে দাও, তাহলে তাদের তপস্যা কি কোনদিন সার্থক হবে? যদি বল নিজের মুক্তির জন্য নিজেকেই উদগ্র ও একাগ্র ব্রত জপ পূজায় ঢেলে দিতে হবে, তবে তা কি সম্ভব? মনে পড়ে বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ত্রিত ঋষির ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের প্রার্থনা—

স্বয়ং যজস্ব দিবি দেব দেবান্ কিংতে পাকঃ কৃণবদপ্রচেতাঃ।
যথায়জ ধাতুর্ভিদেব দেবানেবা যজস্ব তন্বং সুজাত॥ ৬ (১০ম,)

তিনি আমাদের সকলের আর্তিকে ভাষা দিয়েছেন এইবলে—'হে দ্যুতিসমৃদ্ধ দেবতা, মানুষ আমরা জ্ঞানহীন, আমরা কি পূজা করব? কতটুকুই বা পারব? অজ্ঞান ও অবোধ আমাদের ভজন ও যজনের মূল্য কতটুকু? তুমি নিজেই নিজের আরাধনা করে আরাধনার মন্ত্র শিখিয়ে দাও, সেইখানেই ত তোমার পরমেশ্বরত্ব!

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়,
আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়;
তবে ঘর-ছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শতশত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো?

(রবীন্দ্রনাথ)

বন্য মোরগের ডাক শুনতে পাচ্ছি, তার মানে সকাল হয়ে আসছে। মনে পড়ছে ছোটবেলাকার স্মৃতি। কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে আমাদের গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতেই ছোট ছোট শিশু ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই জেগে রাত কাটাতেন। আজকাল যেমন কোন পূজোপলক্ষে রাত জাগতে হলেই তাস, পাশা, জুয়ার আড্ডা বসে যায়, শিবরাত্রির সময় যারা 'ভক্ত' হয়, তারাও যেমন শিবনাম এবং শিব-মাহাত্ম্য পাঠ আলোচনা বাদ দিয়ে ভক্ত-বেশে সজ্জিত থেকে নেশার আসর জমায়, না হয় সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের সম্বন্ধে নানা সরস চুটকী ঝেড়ে মনে করে ব্রতপালন করা হল, আগে গ্রামবাংলায় ধর্মের নামে এইরকম ন্যক্কারজনক ক্রিয়াকলাপের কথা কেউ চিন্তা করতেও পারতেন না। মা মাসীমা পিসীমার দল 'লক্ষ্মীর পাঁচালী'

পাঠ করতেন। আর সবাই তাঁদেরকে ঘিরে বসে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য ভক্তিভরে শুনতেন। সেই সুর ও কথা এখনও আমার কানে বাজে;

নমো নমঃ লক্ষ্মীমাতা নমো নারায়ণী।
করহ সেবকে দয়া ক্ষীরোদ-নন্দিনী॥
বিনন্দ রাখাল নামে বিরাট নগরে।
হইল সে লক্ষপতি শ্রীলক্ষ্মীর বরে॥

সামান্য গরীব ঘরের সন্তান বিনন্দ রাখাল কিভাবে লক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষে লক্ষপতি ধনী হয়ে গেলেন, সেইকথা শুনতে শুনতে সবাই ভক্তির আতিশয্যে কেঁদে ভাসাতেন। প্রত্যেক গৃহে একটি প্রদীপ সারারাত্রি জ্বলত। বাতাসের ঝাপটায় তা হঠাৎ নিভে না যায়, সেইজন্য একটি বড় হাঁড়ির ভিতর রেখে তার উপর সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখা হত। গ্রাম-বাংলার সকলের মনে এই সংস্কার ও বিশ্বাস ছিল যে, কোজাগরীর রাত্রে মা লক্ষ্মী প্রত্যেক গৃহে একবার করে আসেন, ডাক দেন কো জাগরী অর্থাৎ কে আছো জেগেরে? যদি কোন গৃহে তাঁর জন্য আবাহনী মঙ্গল-প্রদীপ জ্বলে এবং তাঁর জন্য জেগে থাকে, তাহলে তার উপর মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়ে নতুবা মা বিমুখ হয়ে ফিরে যান; গৃহস্বামীর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। এই সংস্কার ও বিশ্বাসের জন্য কোজাগরী পূর্ণিমা গ্রামবাংলায় এক নূতন তাৎপর্য বহন করে আনে। আমার মনে পড়ল, যেহেতু সকাল হয়ে গেছে, এখন নিশ্চয়ই মা কংসাবতী নদীর ঘাটে যাচ্ছেন, গোটারাত্রি জাগরণের ব্রত পালন করে 'গঙ্গা গঙ্গা' বলে ডুব দিতে! মায়ের কথা মনে পড়তেই আমার চোখগুলো ছলোছলো হয়ে উঠল।

লক্ষ্মণভারতীজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন 'বাঙালীবাবা উঠে পড়ুন, গাঁঠরী গুছিয়ে প্রাতঃকৃত্য এবং স্নান সেরে ফেলুন, আজ আমরা আদিত্যেশ্বরের পথে রওনা হব।'

আমি তাঁকে কোন সাড়া বা উত্তর দিতে পারলাম না, তখন আমার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। মন তখন নর্মদাতটে ছিল না, আমি তখন আমার প্রিয় পিতৃপিতামহের ভিটা কালিয়াড়া গ্রামে চলে গেছি!

চোখের জল মুছে, কম্বল গাঁঠরী গুছাতে লাগলাম। অন্য সকলের

গুছানো হয়ে গেছে। তাঁরা সকলেই চলে গেছেন প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সারতে। আমিও গিয়ে নর্মদাতে নেমে স্নান তর্পণ সেরে শেষবারের মত মন্দিরে ঢুকলাম হিরণ্যপাণিকে প্রণাম ও পূজা করতে। শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালবার উদ্যোগ করতেই আমার কণ্ঠে যেন স্বতঃই উছিয়ে এল সামবেদের উত্তরার্চিকের অন্তর্গত তৃতীয় খণ্ডের পঞ্চম সূক্তের একটি মন্ত্র। আমার জিহ্বা যেন অবশ হয়ে উচ্চারণ করতে থাকল—

ওঁ ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং
বিশ্বজিদ্ ধনজিদুচ্যতে বৃহৎ।
বিশ্বভ্রাড্ ভ্রাজোমহি সূর্যো দৃশ উরু
পপ্রথে সহ ওজো অচ্যুতম্॥ ৩

অর্থাৎ হে হিরণ্যপাণি! ভগবান সূর্যনারায়ণ! সকল জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমার জ্যোতিকেই বিশ্বজয়ী, ধনজয়ী ও বৃহৎ বলা হয়। তুমি অবিচলিত বল ও তেজঃস্বরূপ, বিশ্বের সকল বস্তুকে তুমিই আলোকিত কর। সকল জীব যাতে তোমার সহজে দর্শনলাভ করতে পারে এজন্য তুমি নিজেকে সর্বত্র বিস্তার করেছ। তোমার করুণার অন্তঃ নাই।

আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণতি নিবেদন করে বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। অন্যান্য নাগা সন্ন্যাসীরা আমার আগেই পূজা করে গেছেন। হলঘরে গিয়ে দেখলাম, সবাই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সকলের সঙ্গে আমিও ঝোলা গাঁঠরী কমণ্ডলু ও লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়লাম। শিঙ্গা ডমরু বাজাতে বাজাতে হর নর্মদে ধ্বনি তুলে তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করে আমাদের যাত্রা হল শুরু। নর্মদার তট ধরে কিছুটা পশ্চিমদিকে হেঁটে যাবার পরেই কঠিন পার্বত্যপথ শুরু হল। চড়াই-এর পথে এক বিরাট মালভূমির উপর উঠে এলাম। চারদিকেই বড় বড় গাছের জটলা। শাল, মেহগিনি, পিপলাস গাছ ছাড়াও বাংলাদেশে যে অর্জুন গাছ দেখা যায় সেই অর্জুন গাছও প্রচুর দেখলাম। আর এক রকম গাছ দেখলাম সেগুলি বেশ উঁচু, তাদের কাণ্ডগুলিও অর্জুন গাছের চেয়ে অনেক সাদা। লক্ষ্মণভারতীজীকে জিজ্ঞাসা করা মাত্রই তিনি বললেন—‘ঐগুলির নাম ধব গাছ। মুণ্ডমহারণ্য বা ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িতে যেমন একটি শালের পরেই একটি সাজা গাছ দেখা

যায়, এখানেও তেমনি একটি ধব গাছের পরেই একটি তিন্দুক গাছ দেখা যায়। ঐ দেখ তিন্দুক গাছ। ধব ও তিন্দুক গাছের কাছাকাছি বাঁদিকের ঢালের দিকে তাকিয়ে দেখ, কুঞ্জ, শমী, কেসর, শিমুল এবং খদির গাছের সমাবেশ।'

ধীরে ধীরে আমরা আরও ঘনঘোর জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। পথ ক্রমশঃই দুর্গম হয়ে উঠছে। পায়ের নীচে এবড়ো খেবড়ো পাথরের উপর হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। মোহান্তজীকে নীরব দেখছি, প্রায় দু মাইল হাঁটা হয়ে গেল, তিনি একটিও কথা বলেন নি। যতীন্দ্রকে চুপিসারে জিজ্ঞাসা করলাম—'মোহান্তজী আজ স্বাভাবিক ত বটেই, গতকাল রাত্রিতে তাঁর উদ্ভট আচরণের কথা স্মরণ করে লজ্জা পেয়েছেন বলে মনে হয়।'

'হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!' লক্ষ্মণভারতীজীর সাবধান বাণীতে আমাদের আলোচনায় বাধা পড়ল। তিনি সকলকে ঢালের দিকে যে কোন বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে বললেন। আমরা এর কারণ কিছু বুঝলাম না। মোহান্তজী গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্পষ্টতঃই অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন। তিনি চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—ক্যা হুয়া? কোন উত্তর না দিয়ে লক্ষ্মণভারতীজী মুখে আঙুল চাপা দিলেন। দু মিনিটও গেল না, আমরা একটা চাপা গোঁ গোঁ ফোঁস ফোঁস শব্দ ক্ষীণভাবে ভেসে আসছে শুনতে পেলাম। একটু পরেই গাছের আড়াল থেকে কিঞ্চিৎ মুখ বাড়িয়ে দেখি, একদল ক্রুদ্ধ বুনো মহিষ ছুটে আসছে। আমরা যে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, সেই পথেই তারা ছুটে আসছে। আমরা সামনা সামনি হলে যে কি দশা হত, তা বিধাতাই জানেন! কিন্তু এই ভেবে অবাক লাগল যে, লক্ষ্মণভারতীজী এত দূরে থেকেও বুনো মহিষের আভাস পেলেন কি করে? ভাববার আর সময় পেলাম না, বুনো মহিষের দল এসে গেছে। তারা আশেপাশে কোনদিকে না তাকিয়ে গুড়গুড় করে সোঁ সোঁ শব্দে দৌড়ে যাচ্ছে, গলায় তাদের প্রচণ্ড শব্দ উঠছে—গোঁ, গোঁ, ফোঁস, ফোঁস! গুণে দেখলাম পনেরটা মহিষ পেরিয়ে গেল, ঐ ষোল নম্বরেরটা আসছে। একটা হলুদ আলোর ঝিলিক খেলে গেল, প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে মহিষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা বাঘ। এই অতর্কিত আক্রমণে মোষটা চারপায়ে লাফিয়ে উঠল। প্রচণ্ড নাসিকা গর্জন ও পদসঞ্চালনের সঙ্গে তার বাঁকা শিং দুটো ঘন ঘন ঘুরিয়ে সে বাঘটাকে ঠেকাবার চেষ্টা করল। মহিষটা

যে প্রচণ্ড শক্তিশালী তা স্বীকার করতেই হবে, এতবড় বাঘের ঝাপটা সে অবলীলাক্রমে সহ্য করেও দাঁড়িয়ে আছে, গড়িয়ে পড়ে নি, বরং শিং-এর গুঁতো মেরে যুঝবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার সব চেষ্টাই বৃথা! এক সেকেণ্ডের জন্য বাঘটা মহিষের কাছ হতে সরে এসে বিদ্যুতের মত আচমকা তার পিছনদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মহিষটা কিছু বুঝবার আগেই তার পা ধরে বাঘ এমন এক প্রচণ্ড টান দিল যে, মহিষটা টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল। মহিষটার গা দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে। সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই বাঘটা এগিয়ে এসে গলায় দাঁত বসিয়ে দিল। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে এক ঝাঁকুনিতে যমরাজের বাহনকে মাটিতে ফেলে দিল। মহিষের বুকটা প্রচণ্ড জোরে পাথরের উপর আঘাত পেল কিন্তু সে কিছুতেই উপুড় হল না। তার শিং ঘুরতে লাগল চতুর্দিকে, বাঁচার তাগিদে। বাঘ নিজেকে সামলে নিয়ে এবার গলা ছেড়ে ঘাড়ে কামড় বসাল। মহিষটা মাথা তোলার চেষ্টা করলেই বাঘ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে এক ঝাঁকুনিতে আবার তাকে মাটিতে চেপে ধরে।

এইরকম একপেশে লড়াই কিছুক্ষণ চলার পর মহিষটা তার শেষ শক্তি নিয়ে আর একবার উঠে দাঁড়াল। তারপর এক ঝাঁকুনিতে বাঘকে মাটিতে ছিটকে ফেলল। নিমেষের মধ্যে বাঘটা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে একটু ডান দিকে হেলে গলায় শক্ত করে দাঁত বসিয়ে বাঁ দিকে লাফ মারতেই মহিষের মাথাটা ভীষণ জোরে মাটিতে এসে পড়ল আর হয়ত ওর নিজের দেহের ভারেই ঘাড়টা গেল ভেঙে। বাঘটা এবার গর্জন করে উঠল। এটা তার বিজয় হুঙ্কার। তার গর্জনে কানে তালা লাগার জোগাড়। চোখ বন্ধ করে দুই আঙুলে কান চেপে ধরলাম। যখন চোখ খুললাম, তখন দেখি বাঘও নাই, মহিষটাও নাই। বাঘটা অতবড় বুনো মহিষটাকে পিঠে ফেলে পালিয়ে গেছে! বাঘ মহিষের রণক্ষেত্র হতে মাত্র ৩০।৪০ ফুট দূরে পাহাড়ের ঢালে একটা শালগাছের আড়ালে লুকিয়ে এতক্ষণ ধরে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দুটো ভীষণ জানোয়ারের লড়াই দেখছিলাম। ঘেমে নেয়ে গেছি একেবারে। চার-পাঁচ হাত দূরে একটা শিমুল গাছের আড়ালে গাঁঠরী ও কমণ্ডলু পড়ে আছে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। জল খাওয়ার জন্য কমণ্ডলুটার কাছে যাওয়ার দরকার। দাঁড়াতে গিয়ে পা দুটো থরথর করে

কেঁপে উঠল। একটা ছোটগাছের ডাল ধরে সেখানেই আবার ধপ করে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে কতকটা সামলে নিয়ে কমণ্ডলুর কাছে গিয়ে ঢকঢক করে সমস্ত জলটাই গিলে ফেললাম, যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। কারও কোন সাড়া পাচ্ছি না। বাতাসে বাঘের গায়ের বোটকা দুর্গন্ধ এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে। এদিকে সেদিকে ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে একটু দূরে বড় বড় গাছের ধারে, বিভিন্ন ঝোপের আড়ালে কয়েকজন নাগাকে দেখতে পেলাম। আরও পাঁচ সাত মিনিট পরে দেখলাম লক্ষ্মণভারতীজী ঝোপঝাড় ভেঙে ঢাল থেকে রাস্তার উপর উঠে গেলেন। কমণ্ডলুর জল পান করে দুতিন বার গলা-খাঁকারি দিয়ে চাপা গলায় রব তুললেন—হর নর্মদে, হর নর্মদে, হর নর্মদে। তাঁর উঠে আসার সঙ্কেত পেয়ে একে একে নাগারা ধুঁকতে ধুঁকতে এসে পৌঁছলেন। মোহান্তজীর ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া পাওয়া গেল—'মেরে হালৎ বহোৎ বুরা হ্যায়। মুঝে লে যাইয়ে।' শব্দ অনুসরণ করে যতীন্দ্রজী আমি এবং রতনভারতীজী দৌড়ে গেলাম। দেখলাম, আমি যে গাছটার আড়ালে ছিলাম, তার থেকে মাত্র দুটো গাছের পরেই একটা ধব গাছের তলায় ঝোপের মধ্যে মোহান্তজী হাত পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছেন, তাঁর বুকটা ঘন ঘন উঠানামা করছে। তাঁকে কতকটা জল খাইয়ে সুস্থ করা হল, তিনি যতীন্দ্রজী এবং রতনভারতীজীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে এলেন তাঁর লছমন ভেইয়ার কাছে। এসেই বললেন—ম্যায় কসম খাতা হুঁ, ঔর কভি ইসী তরফ আউঙ্গা নেহি। সবাই এসে পৌঁছেছেন, কেবল দুজন পণ্ডিতমশাই-এর দেখা নাই। লক্ষ্মণভারতীজী ব্রস্তব্যস্ত হয়ে কয়েকজন জোওয়ান নাগাকে সঙ্গে নিয়ে বড় বড় গাছের তলায় খুঁজতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে যতীন্দ্রের সাড়া পাওয়া গেল—মিল গয়া লেকিন বেহোঁস হ্যায়। আমাকে মোহান্তজী পাঠালেন দেখতে। গিয়ে দেখি, তাঁদের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন। তাঁদেরকে পাঁজাকোলা করে তুলে আনা হল। প্রায় আধঘণ্টা পরেই তাঁরা কিছুটা সুস্থ হতেই লক্ষ্মণভারতীজীর তাগিদে আবার ধীরে ধীরে সবাই হাঁটতে লাগলাম। দুই পণ্ডিত দুজন নাগার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। হিরণ্যপাণির মন্দির থেকে সকাল সাতটায়

যাত্রা করেছিলাম, এখানে এসে পৌঁছেছিলাম প্রায় সাড়ে ৮টায়, এখন বেলা ১১টা বাজতে যায়। প্রায় আরও আধমাইলটাক এই দুর্গম বনপথে হাঁটার পর আমরা উৎরাই-এর মুখে এসে পৌঁছলাম। সাবধানে পা ফেলে লাঠি ঠুকে ঠুকে নামতে লাগলাম চালুতে। একটু অসাবধান হলে গড়িয়ে পড়তে হবে খাদের মুখে। শালভূমির সীমা শেষ, বনের প্রকৃতি ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। চারদিকে শুধু পাথর আর পাথর কিন্তু বড় বড় বনস্পতির আর দেখা মিলছে না। প্রায় আধঘন্টা উৎরাই-এর পথে হাঁটার পর আমরা মোটামুটি সমতল প্রান্তরে নেমে এলাম। সামনেই মা নর্মদাকে দেখা যাচ্ছে। যতক্ষণ দুর্গম বনপথে হাঁটছিলাম তখন বাঁদিকেই তাঁর জলধারা দেখতে পাচ্ছিলাম, এখন সামনে দক্ষিণদিকে তাকিয়ে দেখছি নর্মদা বন পাহাড় ভেদ করে বক্রমান গতিতে সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন! এ অঞ্চলে দেখছি, পাহাড় তুলে ফেলে বহু চাষযোগ্য জমি বের করা হয়েছে, তাতে চাষবাসও হচ্ছে। কোন কোন জমিতে গম জোয়ার ভুট্টার গাছ দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আমরা নর্মদার কিনারে এসে পৌঁছলাম। নর্মদার পবিত্র ধারাকে স্পর্শ ও প্রণাম করে আমরা পশ্চিমদিকে বাঁক নিতেই দূরে একটি মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম। লক্ষ্মণভারতীজী সোল্লাসে চেঁচিয়ে বললেন—'ওহি অদিতোশ্বর মন্দির দেখাই দেতা হে। শূলপাণিকা ঝাড়ি খতম হো গয়ি।' তাঁর এই কথায় আমাদের কর্ণকুহরে যেন মধুবর্ষণ হল, নাগারা পরস্পরকে জড়াজড়ি করে নাচতে লাগলেন, সকলের মুখে রব উঠেছে—স্বস্তি! স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি।

জঙ্গলের বিষম দুঃখ দূর হয়েছে, পদে পদে মৃত্যু যন্ত্রনা আর ভোগ করতে হবে না। লক্ষ্মণভারতীজী বুড়োর রস যেন উথলে উঠেছে। তিনি নর্মদার চরে গড়াগড়ি দিয়ে ছড়া কাটলেন—

নর্মদাপুরীকো বসবো বসিয়ে কৌন্ ঔর।
এ তিনো দুঃখ দেবত্ হৈ বাঘ ভল্লু চোর॥

অর্থাৎ নর্মদাপুরীর কোন্ অংশে বাস করি? বাঘ ভালুক আর ভীল দস্যুরা এখানে দুঃখ দেয়।

স্বয়ং মোহান্তজীরও আনন্দের অবধি নাই। তিনি নাচতে নাচতে ঐ ছড়ার জবাব দিলেন—

গুল্লা মারো বাঘকে রাত্ রাখিয়ে চোর।
ভজন করো ভগবান্‌কে ভীল্ লেগি পোর॥

বাঘকে গুলি মার। রাত্রি জেগে ভগবানের ভজন কর। ভীলরা আর কি নিবে?

লক্ষ্মণভারতীজী আবার গড়াগড়ি দিতে দিতে বললেন—

জীবন্ত মরে সোহি পৈচানে,
গৈব নগর সহজে চড় জানা
ইঙ্গলা পিঙ্গলা চামর ঢোরত হৈ নিশিদিন
সুখমনা হনে নিশানা।
দেখরে গুরু গম মস্তানা॥

যে ব্যক্তি জীবন্ত মরে, সেই জানে শরীর রূপ নগরে প্রবেশ করে সর্বোচ্চস্থানে আরোহণ করতে হবে অর্থাৎ মস্তকস্থিত সহস্রার পদ্মে উত্থিত হতে হবে। বাম দিকস্থ ইড়া এবং দক্ষিণ দিকস্থ পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্য দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের চামর অহর্নিশ ব্যজন করে চলেছে। হে গুরুপ্রেমে মত্ত মস্তানা, তুমি সুষুম্না নাড়ীকে ধরে এগিয়ে যাও।

প্রত্যুত্তরে মোহান্তজী গদগদ কণ্ঠে আবার একটি ছড়া কাটলেন—

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ধারা,
লাগ্ মদোদর কর্ অস্নানা,
দেখরে গুরুগম মস্তানা॥
তুরিয়া চড়চড়্ গর্জয়ে লাগে
দেখ্ রূপ যমরাজ ডবানা,
রেবা রেবা গুরু গুরু জপরে মস্তানা॥

দেখ্‌রে, গুরুগতপ্রাণ মস্তানা! গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর ধারা সন্নিধানে কেমন সুন্দর মেলা বসেছে, সেখানে স্নান কর। রসনায় রেবা রেবা ও গুরু গুরু নাম নিয়ে তাতেই মগ্ন হয়ে যা, তা দেখে যমরাজও ভয় পাবেন, কারণ তাঁর আর জারিজুরি খাটবে না।

এইভাবে আনন্দে ছড়া কাটতে কাটতে এবং নৃত্য করতে করতে আমরা

মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। মোহান্তজী যুক্তকরে প্রণাম করে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে মুখস্থ বলতে লাগলেন—

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ—

ভূয়োঽপ্যহং প্রবক্ষ্যামি আদিত্যেশ্বরমুত্তমম্।
সর্বদুঃখহরং পার্থ সর্ববিঘ্নবিনাশনম্॥

(রেবাখণ্ডম্ ৬০ অধ্যায়)

অর্থাৎ মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, হে রাজন! পুনরায় আমি সর্ববিঘ্নহর অখিল দুঃখনাশন সর্বোত্তম আদিত্যেশ্বর মাহাত্ম্য বর্ণনা করছি।

নালভন্ত শ্রিয়ং নাকে মর্ত্যে পাতাল গোচরে।
কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা নৈমিষং পুষ্করং তথা॥
বারাণসী চ কেদারং প্রয়াগং রুদ্রনন্দনম্।
মহাকালং সহস্রাক্ষং শুক্লতীর্থং নৃপোত্তম!
রবিতীর্থস্য সর্বানি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে যে-সব তীর্থ বিদ্যমান, নর্মদাতটস্থ এই আদিত্যতীর্থের সঙ্গে সে সকলের তুলনা হয় না। কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা নৈমিষ পুষ্কর, বারাণসী কেদার প্রয়াগ রুদ্রনন্দন, মহাকাল সহস্রাক্ষ শুক্লতীর্থ প্রভৃতি পবিত্র তীর্থগুলি এই আদিত্যেশ্বর তীর্থের ষোড়শাংসের একাংশ যোগ্যও নয়।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই আমরা মন্দিরের চত্বরে এসে পৌঁছে গেলাম। শিঙা ডম্বরু বাজিয়ে হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করা হল। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রায় দুফুট দীর্ঘ তাম্রবর্ণের অত্যুজ্জ্বল আদিত্যেশ্বর মহাদেবকে দেখে আমাদের চক্ষু জুড়িয়ে গেল। প্রণাম করে উঠে দেখি, গলায় রুদ্রাক্ষ ও ত্রিপুণ্ড্র শোভিত এক ব্রাহ্মণ মূর্তি লক্ষ্মণভারতীজী ও মোহান্তজীর সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে বাক্যালাপ করছেন। যতীন্দ্রজী আমাকে চুপিচুপি জানালেন—'ইনিই মন্দিরের পুরোহিত। গুরুজী ও লক্ষ্মণভারতীজীর গুরুভ্রাতা।' আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন—'আজ অতি প্রত্যুষে এসেই দিগম্বর করপাত্রীজী আমাকে আপনাদের আগমন বার্তা দিয়ে গেছেন। আপনাদের ভিক্ষার ব্যবস্থা আমি

করে রেখেছি। মোহান্তজীর কাছে তাঁর প্রদত্ত নর্মদা মায়ের কিসব সম্পত্তি আছে, তা তিনি এখানে নর্মদা মায়ের কাছে প্রত্যর্পন করতে বলে গেছেন।' তাঁর কথা শুনে আমরা সকলেই চমকে উঠলাম। তাহলে সত্য সত্যই মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি এখনও আমাদের উপর রয়েছে! মোহান্তজী সাশ্রুনেত্রে একটি ঝোলা হাতে নর্মদার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমরাও পিছনে পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মোহান্তজী এক কোমর জলে নেমে হাতজোড় করে স্তব করতে লাগলেন—

ওঁ নমোঽস্তুতে সিদ্ধগণৈর্নিষেবিতে নমোঽস্তুতে সর্বপবিত্রমঙ্গলে।
নমোঽস্তুতে বিপ্রসহস্রসেবিতে নমোঽস্তু রুদ্রাঙ্গসমুদ্ভবেবরে॥

মা নর্মদে! তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর। সিদ্ধগণ তোমার সেবা করেন। তুমি সকলেরই সর্ববিধ মঙ্গলসাধন করে থাক, তোমা হতেই সকলে পবিত্রতা লাভ করে! তুমি রুদ্রদেহ হতে সমুদ্ভূতা হয়েছ, সহস্র সহস্র বেদপাঠী ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে তোমার অর্চনা করে থাকেন, তোমাকে প্রণাম করি।

স্তবপাঠ করেই তিনি কোটেশ্বরের মন্দিরে করপাত্রীজীর প্রদত্ত তাম্রকুণ্ড, কোশাকুশী, পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূরদানী প্রভৃতি যা কিছু ছিল, ঝোলা থেকে একে একে নর্মদার জলে অর্পণ করলেন। আমরাও আর একবার স্নান করে নিলাম। মন্দিরের কাছেই দেখছি একটা প্রাচীন ধর্মশালা আছে, একটু দূরেই একটা সদাবর্তও আছে। পুরোহিত মশাই আমাদেরকে নিয়ে ধর্মশালার দোতলায় নিয়ে গেলেন। ধর্মশালার অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য লোকজন এসে মোহান্তজীকে প্রণাম করে গেলেন। দোতলারই একটি ঘরে আমরা খেতে বসলাম। পর্যাপ্ত ঘি সহ খিচুড়ি আমাদেরকে পরিবেশন করা হল। আমাদের খাওয়া যখন শেষ হল, তখন মতীন্দ্রের ঘড়িতে দেখলাম ২টা বেজে গেছে। দোতলার পাঁচখানা ঘরে আমরা আট দশজন করে যে যার শয্যা পেতে শুয়ে পড়লাম। গতরাত্রিতে 'হিরণ্যপাণিতে' আমি জেগে কাটিয়েছি। কাজেই শয্যাগ্রহণের পরেই আমি ঘুমে ঢলে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল, তখন বোধহল ৫টা বেজে গেছে। ঘরে শুয়েই দেখতে পেলাম, ধর্মশালার বারান্দায় বসে মোহান্তজী লক্ষ্মণভারতীজী এবং মন্দিরের পুরোহিত মশাই এই তিনজন গুরুভ্রাতা বসে ইষ্ট গোষ্ঠী করছেন। তাঁদের গুরুদেব চৈতন্য-

ভারতীজীর প্রসঙ্গ ছাড়াও কোটেশ্বর মন্দিরে ভীল দস্যুদের অত্যাচার এবং কিভাবে করপাত্রীজী সহসা আবির্ভূত হয়ে আমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন সে প্রসঙ্গও আলোচিত হল, শুনতে পেলাম।

আমি বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম। পুরোহিত মশাই তখন মোহান্তজীকে বলছেন—সন্ধ্যা হলেই আরতির আয়োজন করব। তখন ত আপনারা নিশ্চয়ই উপস্থিত হবেন। তবে এখনই যদি বেলা থাকতে থাকতে আমার সঙ্গেই মন্দিরে যান, তাহলে আশ্চর্য সুন্দর এক ভক্তকে দেখতে পাবেন, তাঁর গান শুনলে সকলেই বিমোহিত হয়ে যাবেন। এই অসাধারণ ভক্তের নাম সুদর্শন ঝাড়ুকা, মহারাষ্ট্রের সন্তান। খুবই সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ীর সন্তান। পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল থেকে তাঁর সংগীতে অনুরাগ ছিল। বিধিদত্ত প্রতিভা এবং সহজাত কণ্ঠমাধুর্যের গুণে অচিরাৎ তিনি গানে পারদম হয়ে উঠেন। এম. এ. পড়তে পড়তেই এক রাত্রিতে অলৌকিকভাবে মীরাবাঈ-এর রচিত একটি ভক্তিরসাশ্রিত গান তাঁর কানে ভেসে আসে। ঝাড়ুকার বদ্ধমূল ধারণা স্বয়ং মীরাবাঈই সেদিন তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর দিব্যকণ্ঠের গান শুনিয়েছিলেন। রাত্রি প্রভাত হলে সকলেই দেখলেন ঝাড়ুকার ভাবোন্মাদ অবস্থা। সারাদিন সেই অবস্থায় থাকার পর রাত্রে গৃহত্যাগ করলেন। নানা তীর্থে পর্যটন করার পর আজ তিন বৎসর হল এখানে এসে পৌঁচেছেন। তাঁর গানের আকর্ষণে প্রতি বছর এখানে বহু লোকের সমাগম ঘটে। দেশ বিদেশের কত যে জ্ঞানীগুণী বড় বড় ওস্তাদ আসেন তাঁর কাছে সুরসুধা পান করতে তার ইয়ত্তা নাই। সুদর্শন ঝাড়ুকার গান বৈকুণ্ঠের গান, মনে হয় যেন কোন গন্ধর্ব বা কৈলাসের কোন কিন্নর হঠাৎ পথ ভুলে এখানে পৌঁছেছেন। তিনি এখানে যে কোথা থেকে আসেন তা কেউ জানেন না। তাঁর বয়স ৩২/৩৪-এর বেশী হবে না। মন্দিরে তাঁর আসার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। তবে অপরাহ্নকালে কিংবা সন্ধ্যা-কালেই সাধারণতঃ এসে থাকেন। গত বৎসর তাঁর মা বাবাও এসেছিলেন তাঁর খবর পেয়ে। তিনি যতক্ষণ গান করেন, ততক্ষণ আদিত্যেশ্বরের প্রত্যাদেশে মন্দিরের দরজা খোলাই রাখতে হয়। অপরাহ্নে এসে তিনি গান আরম্ভ করে দিলে আরতি পর্যন্ত করা হয় না। সেদিন ঝাড়ুকা চলে গেলে তবেই 'হিমচন্দন' করে দরজা বন্ধ করি। আরতির পর এলে ছবে

সেদিন আরতি করতে পাই। ঝাড়ুকা মহারাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁকে কোন ভক্ত প্রশ্ন করলে তার উত্তর দিয়ে থাকেন। তবে তাঁর উপজীব্য বিষয়ে প্রশ্ন করলে তবেই উত্তর দেন। নতুবা আপন মনে গানই গাইতে থাকেন। গানই তাঁর পূজা।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই দেখলাম, সকল নাগা সন্ন্যাসী মন্দিরে যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা তখনই রওনা হলাম। আমাদের আগেই প্রায় জনা পঞ্চাশেক নরনারী মন্দিরের চত্বরে এসে বসে আছেন। আদিত্যেশ্বর ভগবানকে প্রণাম করে আমরাও একধারে বসে পড়লাম। ক্রমে ৬টা বাজল, অস্তগামী সূর্যের রক্তরাগরশ্মি এসে পড়ে রাঙিয়ে দিল বিন্ধ্যপর্বতের চূড়াগুলো। সেই রশ্মিচ্ছটা পড়েছে নর্মদার জলে, সেই অপরূপ দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখছি, এমন সময় পিছন থেকে এক অপূর্ব কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কেউ যেন ভুবনমাতানো সুরের যাদু সৃষ্টি করে গাইতে গাইতে আসছেন, মীরাবাঈ-এর সর্বজনপ্রসিদ্ধ গান—

নিত্ত নহানে সে হরি মিলে ত জলজন্তু হোই।
ফলমূলখাকে হরি মিলে ত বান্দর বাঁদরাই॥
তীরণ ভখন-সে হরি মিলে তো বহুত মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুত হৈ খোজা॥
দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুত বৎসবালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা॥

পায়ে ঘুঙুর বাঁধা, দু হাতের বাহুতে রুদ্রাক্ষ, কপালে হরিচন্দনের তিলক, গলায় তুলসীর মালা—এই অদ্ভুত বেশে নাচতে নাচতে ভাবঢুলুঢুলু নেত্রে এসে মন্দিরের চত্বরে উপস্থিত হলেন এক ভাবোন্মাদ; আমরা অনুমানে বুঝলাম ইনিই সেই কিন্নর-কণ্ঠ ঝাড়ুকা।

এসেই প্রভু আদিত্যেশ্বরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়েই ভাবগদগদকণ্ঠে আপনমনেই বলতে লাগলেন মহাদেবের দিকে তাকিয়ে—শ্রাবণের বাদল বর্ষণ করছে; শ্রাবণের নয় গো শ্রাবণের নয়, এ হচ্ছে মন-ভাবনের বর্ষণ। দেখ, দেখ, শ্রাবণে আমার মন কেমন উন্মনা হয়ে উঠেছে হরির আগমনধ্বনি শুনে। গুরুগম্ভীর মেঘ চারদিক থেকে ঘিরে

আসছে, দামিনী-লাবণ্যের চকিত চমক কেমন বিচ্ছুরিত হচ্ছে দেখ; গুঁড়ি গুঁড়ি যে বারিবিন্দু বর্ষিত হচ্ছে এ আমার প্রিয়তমের আদর, শীতল পবনের মধ্য দিয়ে আমার প্রীতম্ স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছেন। মীরার প্রভু গিরিধারী নাগর আনন্দ-মঙ্গল গান করে শোনাচ্ছেন! এই বলেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে গাইতে লাগলেন—

বরসে বদরিয়া সাবন-কী।
সাবন-কী-মন-ভাবন-কী।
সাবন-মেঁ উমগ্যো মেরে মন-বা…
ভনক সুনী হরি-আবন-কী॥
উমড় ঘুমড় চহুঁ দিস-সে-আয়ো,
দামিন-দমকে ঝর লাবন-কী।
নন্‌হি নন্‌হি বুদন মেহা বরষে
শীতল পবন সোহাবন কী।
মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর,
আনন্দ-মংগল গাবন-কী॥

পায়ের তালে তালে ঘুঙুরের ধ্বনি এবং হাতের আঙুলে ধরা দুটো পাথরের চাকতিতে 'চটাং চটাং চটাং' শব্দ তুলে এমন এক সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করলেন যে আমরা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য নিজেদেরকে হারিয়ে ফেললাম। এমন ভক্তিরসাশ্রিত দরদভরা মিষ্টি গান আর কোথাও শুনেছি বলে মনে হল না। দিওয়ানাজীর গানও অন্তরকে নাড়া দিত, তিনিও মহাভক্ত, তাঁর আবেগোচ্ছল কণ্ঠ যখন তখন কোকিলের মত কলকণ্ঠে মধুর তান তুলত সন্দেহ নাই কিন্তু তাতে এতখানি মাদকতা ছিল বলে মনে হয় নি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে আরতির কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। গর্ভগৃহে প্রদীপের আলোতে আদিতোশ্বর অত্যন্ত দীপ্তিময় হয়ে উঠেছেন। ঝাভুকা নির্নিমেষ নেত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন তাঁর প্রিয় পরমের রূপসুধা পান করছেন। সেই অবস্থাতেই জনৈক শ্রোতা তাঁকে প্রশ্ন করলেন—'সংগীতের জগতে মীরাবাঈ, সুরদাস এবং তানসেনের মধ্যে কে বড়?

প্রশ্ন শুনেই তিনি বীরাসনে বসে বলতে লাগলেন, 'মেরে বিচারমেঁ মীরাবাঈকা সাথ কিসীকো তুলনা ত কভী নেহি হো সকতী। হরবিলাস সর্দা কৃত 'মহারাণা সাঁগা' নামক পুস্তকের ১ম ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময় কৃষ্ণগতপ্রাণা মীরাবাঈ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আগে পিছে অত্যল্প কালের ব্যবধানে বিরাজ করেছিলেন সংগীতগুরু তানসেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ সুরদাস ও তুলসীদাসজী। তানসেনের গুরু ছিলেন বৈজু বাওরা। তিনি ছিলেন সংগীত জগতের সম্রাট। এক কথায় এইসব সর্বজনপূজ্য ভারত-রত্ন সমসাময়িক ছিলেন, সকলেই ষোড়শ শতাব্দীর লোক; প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সুরদাস তাঁর প্রসিদ্ধ 'সুরসাগর' গ্রন্থে বহু ভক্তিমূলক গান রচনা করে গেছেন। তাঁর ভক্তদের বিশ্বাস যে, সুরদাস উদ্ধবের অবতার ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সখা ভেবেই আজীবন পূজা করে গেছেন। তানসেন সুরদাসের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তানসেন 'নওরতনের' সামিল হয়ে প্রায়ই দিল্লীতে থাকতেন বলে সুরদাসের সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হত না। একবার বহুদিন পরে সুরদাসের একটি ভজন তানসেন গেয়ে খুবই পরিতৃপ্ত হন, তিনি দিল্লী থেকে সুরদাসকে চিঠি লিখে পাঠান—

> 'কি ধোঁ সুরকো শর লগেও কী ধোঁ সুর কি পীর,
> কি ধোঁ সুর কি তন লগেও তনমন দহত শরীর।'

'আজ আমার অঙ্গে কি সুরের (অর্থাৎ বীরের) তীর এসে বিঁধলো না সুরদাসের বিরহ-বেদনা ব্যথিত করল? আজ কি সুরদাসের সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে যে, আমার শরীরে একটি অনুভূতি জেগেছে? উত্তরে সুরদাস লিখে পাঠালেন—

> 'বিধ্‌না এহ্‌ জিয়া জান কর, শেষ ন দিয়ো কান,
> ধরা মেরু সব ডোলতো, তানসেন কি তান।'

'বিধাতা একথা পূর্ব হতে জেনেই ত শেষকে (অর্থাৎ বাসুকী নাগকে, যার মস্তকে এই পৃথিবী আছে) কর্ণ দান করেন নি। কেননা শেষনাগকে কান দিলে সে তানসেনের অপূর্ব সংগীত শুনে মাথা দোলাতো আর সমস্ত পৃথিবীটা দুলে উঠে সব চুরমার হয়ে যেত!'

তানসেন প্রশংসা করেছিলেন সুরদাসের মধুনিস্যন্দিনী ভাষার আর সুরদাস প্রশংসা করে পাঠালেন তানসেনের সুধানিস্যন্দিনী সুর-মাধুর্যের। এমনই ছিল উভয়ের মধ্যে উভয়ের নিবিড় অনুরাগ!

ঠিক এই রকমই মহাযোগিনী মীরাবাঈ-এর সঙ্গে পত্র ব্যবহার ছিল মহাত্মা তুলসীদাসজীর। যখন কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী মীরাবাঈকে রাণার পক্ষ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও নির্যাতন করা আরম্ভ হল, তাঁর সাধন পথের জয়যাত্রায় নানা বিঘ্নবিপদ এসে পড়ল, তখন তিনি দুঃখ দুশ্চিন্তায় একেবারে ভেঙে পড়েন। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠির ভাষা সুরের যাদুতে ফুটিয়ে তুললেন শ্রীঝাভুকা। মীরার আর্তি যেন অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে লাগল ঝাভুকার অপূর্ব কণ্ঠস্বরে—

'শ্রীতুলসী সুখনিধান, দুখহরণ গুঁসাই,
পায়ের পর প্রণাম করু, অবহরো শোকসমুদাই।
ঘর কে স্বজন হমারে যেতে সবনে উপাধি বাঢ়াই,
সাধুসঙ্গ অরু ভজন করত মোহি দেত কলেশ মহাই।
বালপনসে মীরা কীনৃহা গিরিধরলাল মিতাই,
সো তো ছুটত নহি কৈঁসে, লগন লগি বরিয়াই।
মেরে মাতাপিতাকে সম হো, হরিভক্ত ন সুখদাই,
হম্‌কো কহা উচিত করিকে হয় সো লিখিয়ে সমঝাই।'

অর্থাৎ 'হে দুঃখহরণ সুখনিধান গোস্বামী তুলসীদাসজী! আমি বারংবার তোমাকে প্রণতি জানাচ্ছি। তুমি আমার সকল শোক হরণ করো। আমার স্বজন আমার মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করছে, তারা আমাকে ভজন করতে ও সাধুসঙ্গ করতে অনেক ক্লেশ দিচ্ছে। শৈশব হতে মীরা গিরিধারীলালের সঙ্গে প্রেম করেছে এবং তা ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও তা এখন ছাড়তে পারি না। তুমি আমার মাতাপিতা সদৃশ এবং তুমি হরিভক্তদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তুমি আমাকে বুঝিয়ে লিখে পাঠাও, এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত।'

এর উত্তরে গোস্বামী তুলসীদাসজী যা লিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তাও তিনি গান গেয়ে শুনাতে লাগলেন; কী মধুমাখা কণ্ঠস্বর, সুরের কী অপূর্ব

কলতান! তিনি পাথরের দুখানি চাকতি বাজিয়ে গাইতে লাগলেন তুলসীদাসজীর ভাষা—

যাকে প্রিয় না রামবৈদেহী।
তজিয়ে তায় কোটি বৈরীসম, যদ্যপি পরম সনেহী।
তজে পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মহতারী।
বলি গুরু তজে, কান্ত ব্রজবনিতা ভয়ে সব মঙ্গলকারী।
না তো নেহ রাম সো মনিয়ত, সুহৃৎ সুসেব্য যহাঁলো;
অঞ্জন কহাঁ আঁখ সো ফুটে বহুতক্ কাহাঁ কঁহালো।
তুলসী! সো সব ভাঁতি পরমহিত, পূজ্য প্রাণতে প্যারো;
যা সৌঁ হোয় সনেহ রামপদ এহি মতো হমারো॥'

'তোমার রামনাম নেওয়ার পথে যে বাধা জন্মায়, সে যদি তোমার পরম-স্নেহের পাত্রও হয় তবুও তাকে তুমি কোটি বৈরী অর্থাৎ পরমশত্রু ভেবে অবিলম্বে ত্যাগ করবে। প্রহ্লাদ পিতাকে, বিভীষণ বন্ধুকে, ভরত মাতাকে, বলি গুরুকে, ব্রজবনিতারা নিজেদের স্বামীকে, ভগবদ্-আরাধনায় বিঘ্ন হয় বলে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছিলেন এবং তাতে পরম মঙ্গল হয়েছিল। চোখে জ্ঞানাঞ্জন লাগালে চোখের দীপ্তি উজ্জ্বল হয় এবং রামপদে ভক্তি বাড়াবার জন্য যদি পরম সুহৃদকেও ত্যাগ করতে হয় তবে তাও ত্যাগ করবে—আর আমি তোমায় কত বোঝাব। যে সব কাজ করলে রামের উপর তোমার অচলা ভক্তি হয় তা তুমি অবিলম্বে করবে—এই আমার মত।'

গান ও কথা শেষ করেই সুদর্শনজী পূর্ববৎ বীরাসনে বসলেন। এমনভাবে আদিত্যেশ্বরজীকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে লাগলেন এবং তাঁর চোখেমুখে আনন্দচ্ছটা প্রকাশ হতে লাগল, আমাদের মনে হল তিনি সত্যসত্যই লোকাতীত প্রভুর দর্শন পেয়েছেন। ভাবাবিষ্ট হয়ে তিনি দুলতে লাগলেন। তাঁর শরীরে অশ্রু পুলক শিহরণ রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকী বিকার প্রকট হতে লাগল। আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে সবাই বসে আছি। আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না প্লাবিত নর্মদা-তটের অপরূপ রূপসজ্জা দেখে মুগ্ধ হলাম। বারেক মুখ ফিরিয়ে নর্মদাকে দর্শন করে মন্দিরের দিকে তাকাতেই দেখি এক বৃদ্ধা গুটিগুটি করে ঝাড়ুকার কাছে গিয়ে ঠেট্ হিন্দীতে তড়বড় করে বললেন—

ঠাকুরজী, মীরাবাঈজীকে বারেমেঁ মুঝে কুছ্ বাতাইয়ে। উন্‌কা মাতা-পিতাজী কোন্ থা? উন্‌কা কোঈ মরদ্ থে কী নেহি? তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি হয়ত শ্রীঝাড়ুকার নিথর নিঝুম ভাব দেখে ঠেলা মেরে বসবেন! শশব্যস্ত হয়ে পুরোহিত মশাই বৃদ্ধার হাত ধরে দূরে সরিয়ে আনলেন। শ্রীঝাড়ুকার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুরোহিত মশাই-এর দিকে তাকাতেই তিনি তাঁকে বৃদ্ধার প্রশ্নগুলি বুঝিয়ে বললেন। ঝাড়ুকা তখন প্রসন্ন দৃষ্টিতে হাসিমুখে বলতে লাগলেন, তাঁর ইষ্ট এবং উপাস্য মীরাবাঈ-এর পুণ্য জীবনকথা—

'মাড়োয়ার দেশে মেড়্তা পরগনার অধিপতি ছিলেন একজন রাঠোর সামন্ত। তাঁর নাম ছিল রতন সিংহ। লোকে তাঁকে বলত রাতিয়া রাণা। তাঁরই কন্যার নাম মীরাবাঈ। মীরার জন্ম হয়, মেড়্তা পরগণারই অন্তর্গত কুড়্কি গ্রামে। মীরা বাল্যকাল থেকেই অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। যেই তাঁকে দেখত, সেই তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হত। এই সৌন্দর্যের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন এক মোহিনী মাধুরী এবং সঙ্গীতের সহজপটুত্ব ছিল যে তাতে তিনি সকলেরই অত্যন্ত আদরের ছিলেন। মীরা বাল্যকাল হতেই নির্জনে একাকিনী থাকতে ভালবাসতেন এবং আপনমনে গান গাইতেন। তিনি অন্য গানের চেয়ে হরিগুণ গাথাই গাইতে ভালবাসতেন। তাঁর আর একটি ভালবাসার সামগ্রী ছিল চন্দনচর্চিত পুষ্পমালা।

মীরা বাল্যকালে কোন প্রতিবেশীর কন্যার বিবাহোৎসব দেখে নিজের মাতাজীকে জিজ্ঞাসা করেন—আমার স্বামী কে? মাতাজী কৌতুকচ্ছলে নিজেদের গৃহদেবতার বিগ্রহকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন—'এই গিরিধারীলাল তোর স্বামী।' বালিকা মীরা সেইদিন থেকে গিরীধারীলালকেই স্বামী জেনে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তি দিয়ে পূজা করতে আরম্ভ করলেন; এইভাবে বিশ্বস্বামী মীরার পার্থিব স্বামীর আসন আগেই দখল করে বসলেন! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মীরার রূপগুণ এবং ভুবনমোহিনী সঙ্গীত-খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে দূরদূরান্ত হতে লোকে মীরাকে দর্শন এবং তাঁর গান শুনে চরিতার্থ হবার জন্য কুড়্কি গ্রামে এসে ভীড় করতে লাগলেন। মেড়্তা মাড়োয়ারের একটি তীর্থস্থানে পরিণত হল।

চিতোরের মহারাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র ভোজরাজ মীরার সুখ্যাতি শুনে তাঁকে দেখবার জন্য উৎসুক হলেন এবং একদিন ছদ্মবেশে মীরার পিতৃগৃহে গিয়ে মীরার রূপ দেখে এবং গান শুনে মুগ্ধ হলেন। দু' তিনদিন অতিথি হিসাবে থাকার পর বিদায় নিবার সময় আত্মবিস্মৃত হয়ে মীরার অঙ্গুলিতে একটি মহামূল্য হীরকাঙ্গুরীয় পরিয়ে দিতে দিতে বললেন—মীরা, তোমার সঙ্গ স্বর্গসুখতুল্য, মনোহর। এই স্বর্গ ছেড়ে চিতোরে যেতে মন চাচ্ছে না। তুমি যদি চিতোরের ভবিষ্যৎ রাজমহিষী হতে স্বীকার করো তাহলে চিতোর ও মহারাণার কুল ধন্য হয়। মীরার পিতৃদেব অতিথির পরিচয় পেয়ে সানন্দেই তাঁর হাতে কন্যা সম্প্রদান করলেন। স্বচ্ছন্দবিহারিণী বিহঙ্গী বন্দিনী হলেন স্বর্ণপিঞ্জরে।

মীরার শ্বশুরকুল শৈব। জনপ্রবাদ এই যে, মীরা শ্বশুরবাড়ীতে আনীত হলে তাঁকে কুলদেবতা মহাদেবকে প্রণাম করতে বলা হয়। তখন তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন—'এক গিরিধারীলাল ছাড়া আর কাউকে প্রণাম করি না।'

সেইদিন থেকে সুরু হল মীরার কপালে লাঞ্ছনাভোগ। চারিদিকে কেবল নিষেধের বেড়াজাল, এমন গলা ছেড়ে গান গাওয়া রাণীর সাজে না, এমনভাবে যখন তখন গান গাওয়া এবং ঠাকুর নিয়ে পড়ে থাকা কুলবধূর যোগ্য নয়, সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা চলবে না ইত্যাদি। মীরা দুঃখে ও ব্যথায় ম্রিয়মানা হয়ে পড়লেন।

তিনি সদা-সর্বদা হরি-সংকীর্তনে মত্ত থাকায় স্বামী সেবায় ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। রাণা রুষ্ট হলেন। মীরা বৈষ্ণব মহাত্মা পেলেই তাঁর সঙ্গে ভজনকীর্তনে মেতে উঠেন, এতে রাণা মীরার চরিত্রে সন্দেহ করতে লাগলেন। রাণা পুনরায় বিবাহ করবেন বলে ভয় দেখালেন। তাতে বিনম্রভাবে মীরা বললেন—'মহারাণা, আপনি বিবাহ করলে আমি অত্যন্ত সুখী হব। মীরার প্রতি রাণার সন্দেহ আরও প্রবল হয়ে উঠল। এই সন্দেহের আগুনে বাতাস দিতে লাগলেন মীরার ননদ শ্রীমতী উদাবাঈ। মীরার উপর দিনরাত গঞ্জনা ও নির্যাতন চলতেই থাকল। তিনি তাঁর প্রাণের ঠাকুর গিরিধারীলালকে বুকে আঁকড়ে ধরে সব ব্যথা নীরবে সইতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে মীরার স্বামীর মৃত্যু হলে তাঁর দেবর বিক্রমজিৎ মহারাণা হলেন। তিনি মীরার সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ ও সাধন-ভজনে নানারকম বাধা সৃষ্টি করতে থাকলেন ; ননদ উদাবাঈএর অত্যাচার চতুর্গুণ বেড়ে গেল। মীরাকে মেরে ফেলবার জন্য ফুলের ঝাঁপিতে ফুলের মধ্যে কালসর্প পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এক্ষেত্রেও ভক্তকে রক্ষা করলেন ভগবান। তাঁর প্রাণঢালা ভক্তির গুণে তিনি ঝাঁপির মধ্যে পেলেন শালগ্রাম। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখেও মহারাণা এবং তাঁর ভগ্নির চোখ খুলল না, চৈতন্যোদয়ও হল না। তাঁরা সত্যসত্যই একদিন ঠাকুরের চরণামৃত বলে মীরাকে বিষ খাওয়ালেন। চরণামৃত ভেবেই মীরা সাগ্রহে সেই বিষ পান করেছিলেন, কিন্তু তাতেও মহাসাধিকার কিছুই হল না, বরং তাঁর ভগবৎ প্রেমের মাদকতা আরও বেড়ে গেল। তিনি হরিনামে দিনরাত্রি ডুবে থাকলেন।

এই সময়েই হরি ভজনে নিরন্তর ব্যাঘাত ঘটায় তিনি মহাত্মা তুলসীদাসজীকে পত্র লেখেন। 'তজিয়ে তায় কোটি বৈরীসম, যত্তপি পরম সনেহী', তুলসীজীর এই নির্দেশ পেয়েই তিনি আনন্দিত চিত্তে গিরিধারীলালকে বুকে নিয়ে চিরকালের জন্য চিতোর ত্যাগ করলেন। সেই সময়কার আর্তি ও গান মীরার সুধামাখা কণ্ঠস্বরে যেভাবে ফুটে উঠেছিল, তা শুনলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। এই বলেই ঝাড়ুকাজী ভাববিহ্বল অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে নাচের ভঙ্গীতে তাল ঠুকতে ঠুকতে এবং আঙুলে পাথরের চাকতি বাজাতে বাজাতে গাইতে লাগলেন—

তুম্হরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা
অব মোহে কেঁও তরসাবো।
বিরহ বিথা লাগি উর-অন্দর
পীতম্, সো তুম আয়ো বুঝাবো॥……

এ কী গান! এ কী গলা! মানুষের কণ্ঠস্বরে কি এত যাদু থাকে? কণ্ঠস্বর শুনে আমার মত নীরস ব্যক্তিরও প্রাণে যেন হিল্লোল উঠেছে, সমস্ত তন্ত্রীতে জেগেছে কান্নার আবেগ। আমার ভিতরটা কাঁপছে, চন্দ্রালোকিত নর্মদার তটের এই শান্ত স্তব্ধ ভূমিও যেন আবেগে উচ্ছ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে। অনেকে ডুকরে ডুকরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। চাঁদের রূপালী ধারা

যেন গলে গলে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে এই মর্ত্যপৃথিবীতে। অমর্ত্যলোকের করুণ-স্নিগ্ধ-স্পর্শে সমগ্র সত্তায় আনন্দ শিহরণ!

ঝাড়ুকাজী গানের প্রত্যেকটি কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছেন; গান গাইতে গাইতে কখন যে তিনি বীরাসনে বসে পড়ে দুহাত তুলে গাইতে আরম্ভ করেছেন, তা বুঝতে পারিনি। আমার কেবলই মনে হচ্ছে শ্রীঝাড়ুকা গাইছেন না, হয়ত বা তাঁর কণ্ঠের মাধ্যমে সুরলোকের কোন বাসিন্দা গন্ধর্ব বা কিন্নর তাঁর মধ্যে আবিষ্ট হয়ে গেয়ে চলেছেন। মানুষের কণ্ঠস্বরে কি এত উন্মাদনা, এত মাধুর্য থাকে? হয়ত বা স্বয়ং মীরাবাঈই আবির্ভূত হয়ে গাইছেন আজ—'তুম্হারে কারণ সব সুখ ছোড়্যা।' হে আমার প্রীতম্-প্রিয়তম! ওগো তোমার জন্য যে আমি সব সুখ পরিত্যাগ করে এসেছি, এখন তুমি আমাকে গ্রহণ না করার ভয় দেখাচ্ছ কেন? অন্তরের অন্তরে বিরহ ব্যথা জ্বলে উঠেছে, ওগো! এখন তুমি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরো, আমার জ্বালা নির্বাপিত করো—পীতম্, সোতুম্ আয়ো বুঝাবো……

শ্রীঝাড়ুকার দুইচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, সুরের মূর্চ্ছনায় এবং আনন্দের আবেশে তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠেছে এক অপূর্ব দীপ্তি। তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবার গেয়ে উঠলেন—

নয়ন ললচায়ত জিয়রা উদাসী।
শ্যাওল বনমেঁ বাজে শ্যাওল কী বাঁশী॥
মধু! মেরে মধু!
রৈনা-মে শয়না মে, মেরা নয়না না লাগে,
মেরা নীঁদ ন লাগে—
পীতম্ কে শোঁয়াস আবে কুসুম-সুবাসী॥

ঝাড়ুকা নন! মীরাই কেঁদে কেঁদে গাইছেন আর বলছেন—'আমার নয়ন হয় লালায়িত আর জীবন হয় উদাসী যখন শুনি শ্যামল বনে বেজে উঠে শ্যামের বাঁশী। মধু, আমার মধু! রজনীতে শয্যায় শুয়ে আমার নয়ন মুদ্রিত হয় না, আমার নিদ্রা আসে না, ওগো প্রিয়তম! আমার বুকের কাছে যে তোমার কুসুম-সুবাসিত নিঃশ্বাস এসে পড়ে!'

এ কী প্রাণ-মাতানো গান ! নাসিকায় একি অপূর্ব সুবাস ! ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেন এক ঘনীভূত আনন্দ মস্তিষ্কের কুহরে কুহরে প্রবেশ করে মুহূর্তে আমার সমগ্র সত্তাকে আনন্দ শিহরণে রোমাঞ্চিত করে তুলল। এক অপূর্ব সুখানুভূতি আমাকে যেন একটা সুখ-সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চাচ্ছে ! সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম শিথিল—মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয়ভাবে শুধু সেই সুবাসে সুবাসিত হয়ে যেতে চায় !...

বুকের ভিতরটা গুমরে গুমরে উঠছে। দেহমন যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল, তখনও আমি চোখ মেলে কি যেন দেখতে চাচ্ছি, কান দিয়ে কি যেন শুনতে চাচ্ছি !......

ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মন্দিরের দরজা বন্ধ করে পুরোহিত মশাই বসে আছেন। শ্রীঝাড়ুকা চলে গেছেন। কোন শ্রোতাই উঠে দাঁড়াতে পারছেন না স্বাভাবিকভাবে। যিনিই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন তাঁকে দেখছি টলটলায়মান অবস্থায় আবার বসে পড়ছেন। যাইহোক, আমরা অবশেষে পরস্পরকে ধরাধরি করে কোনমতে ধর্মশালার দোতলায় পৌঁছে, যে যার শয্যায় যেন নেশাচ্ছন্নের মত গড়িয়ে পড়লাম। আমার পাশেই মতীন্দ্রজীর শয্যা। তিনি নিজেই নিদ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে জানালেন 'এখন রাত্রি সাড়ে এগারোটা'। বলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আর কারও মুখে কোন সাড়া নাই। আমি ভাবতে লাগলাম ; সন্ধ্যা সাড়ে ছটা হতে রাত্রি সাড়ে এগারটা এই পাঁচ পাঁচটা ঘন্টা সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল, আমরা বুঝতে পারলাম না। একটা ভাবাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। সত্যই এ যেন 'বৈকুণ্ঠের গান' শুনে এলাম।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, ঘুমের মধ্যে যেন ঘুঙুরের ঝুনুর ঝুনুর ধ্বনি শুনছি। কানের কাছে বাজছে সেই দুটি পাথরের চাকতির চটাচট্, চটাচট্ শব্দ। বিভোর হয়ে পড়লাম। সহসা মনে হল, বুকের উপর কারও যেন নিঃশ্বাস পড়ছে, তার অঙ্গ-সৌরভে ভরে গেছে সারা ঘর, কানে ভেসে আসছে—'পীতম্ কে সোঁয়াস আবে কুসুম-সুবাসী। কী মধুনিস্যন্দিনী কণ্ঠস্বর ! ঘুম ভেঙে গেল। আমি ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। কোকিল ডাকছে। সকাল হয়ে আসছে। বহুদিন পরে কোকিলের ডাক শুনে মনে আনন্দ হল। মনে পড়ল, আমরা গহন গভীর ঝাড়িপথ অতিক্রম

করে সমতল অঞ্চলে চলে এসেছি। এতদিন ভয়ংকর জঙ্গলে ভোর হওয়ার আগেই শুনতে পেতাম বন্য মোরগের ডাক। জানালা দিয়ে দেখলাম আকাশ ফরসা হয়ে আসছে। গাছপালায় আবছা অন্ধকার থাকলেও পাখীর কলকাকলিতে মনে হচ্ছে, প্রকৃতিতে সাড়া জেগেছে। মোহান্তজীসহ নাগা সন্ন্যাসীদের কারও সাড়া নাই, সবাই ঘুমে অচেতন; কি জানি বা, মহাত্মারা সকলেই ভাব-সমাধিতে আচ্ছন্ন। আমি পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে বসলাম।

ধর্মশালার একতলায় পাঁচজন সাধু আছেন দেখেছিলাম। তাঁরাও গত-রাত্রে আমাদের সঙ্গে ঝাড়ুকা মহারাজের গান শুনছিলেন দেখেছিলাম। তাঁদেরকে দেখলাম তাঁরা কমণ্ডলু হাতে বেরিয়ে যাচ্ছেন বোধহয় স্নান ও প্রাতঃকৃত্য সারতে। সকাল হয়ে গেছে, আর বসে থাকার কোন মানে হয় না। আমিও গামছা কমণ্ডলু হাতে স্নান ও প্রাতঃকৃত্য করতে চলে গেলাম।

স্নান ও তর্পণ সেরে আদিত্যেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছলাম। মন্দিরে কেউ নাই। মন্দিরে দরজায় কোন তালা নাই। শিকল খুলে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। আমি প্রণাম ও আচমন করে শিবের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে শিবলিঙ্গ ভাল করে মার্জনা করতে লাগলাম। শ্রীলিঙ্গের শীর্ষদেশে দেখছি একটি স্বর্ণময় বৃত্ত, একটু নিচেই তিনটি সোনালী ত্রিপুণ্ড্র শোভা পাচ্ছে। আমি হাতজোড় করে স্তোত্রপাঠ করতে লাগলাম—

ওঁ নমঃ কারণ কারণানাং নমো নমঃ কারণবর্জিতায়।
নমো নমঃ কার্যময়ায় তুভ্যং নমো নমঃ কার্যবিভিন্নরূপ॥
অরূপরূপায় সমস্তরূপিণে পরাণুরূপায় পরাপরায়।
অপারপারায় পরাব্ধিপারপ্রদায় তুভ্যং শশিমৌলয়ে নমঃ॥

হে কারণগণের কারণ! হে মহাকারণ স্বরূপ! তোমাকে প্রণাম। হে কারণরহিত! তোমাকে প্রণাম। হে কার্যময়! অথচ হে কার্যবিভিন্নরূপ! তোমাকে প্রণাম। হে অনির্বচনীয় স্বরূপ! হে সমস্তরূপিন্! হে পরমাণু-স্বরূপ! হে পরাপর! তোমাকে প্রণাম! হে অপারপার! হে পরাব্ধিপার-প্রদ! হে শশিশেখর শশিভূষণ! তোমাকে প্রণাম।

প্রণাম করেই উঠে দেখি, সূর্যোদয় হয়ে গেছে। পূর্বমুখী মন্দিরের দরজা

এমনভাবে স্থাপিত যে প্রভাত সূর্যের উদয়রশ্মি সোজা এসে পড়েছে আদিত্যেশ্বরের উপর। সূর্যকিরণে জল্‌জল্ করছেন শিবলিঙ্গ। একতলার সেই পাঁচজন সাধু স্নান সেরে এসে পৌঁছলেন মন্দিরে। আমি মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেই তাঁরা মন্দিরে ঢুকে শিবের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে স্তব করতে লাগলেন—

ওঁ উদয়গিরিমুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তং
নিখিল ভুবন নেত্রং রত্নরত্নোপমেয়ম্।
তিমিরকরিমৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনীনাং
সুরবরমভিবন্দে সুন্দরং বিশ্ববন্দ্যম্॥

স্তব শুনে আমি চমকে উঠলাম। এখানেও কি তাহলে সূর্যমন্ত্রে মহাদেবের অর্চনা করতে হয়! আমি একথা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করতেই বেশ টেরিয়া মেজাজে বলে উঠলেন—'আপ্ ক্যা নয়া পরিক্রমা কর্ রহা হৈ? পুষ্করিণী তীর্থ সে আদিত্যেশ্বর তীর্থ তক্ ভগবান সূর্যনারায়ণকী তপস্যাক্ষেত্র হ্যায়। ইধর সূর্যমন্ত্রসে হি শিবজীকো উপাসনা বিধি হৈ।'

—'তথাস্তু ভগবন্ তথাস্তু' এইবলে তাঁদেরকে শান্ত করলাম। তাঁরা চলে গেলেন। 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' বলতে বলতে পুরোহিত মশাই অনেক পুষ্পসম্ভার এবং রৌপ্যপাত্রে পঞ্চামৃত নিয়ে পূজা করতে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁকে 'হর নর্মদে' বলে অভিবাদন করে ধর্মশালার দিকে যেতে লাগলাম। একবার নর্মদার ঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম, মোহান্তজী তাঁর দলবল নিয়ে স্নান করতে এসেছেন কিনা। কাউকে দেখতে পেলাম না। কী আশ্চর্য! প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটা হয়ে গেছে, সমস্ত অঞ্চল রৌদ্রে ঝলমল করছে, এখনও তাঁরা উঠেন নি? তাঁদের কি তাহলে ভাবের ঘোর এখনও কাটে নি? ধর্মশালার প্রাঙ্গনে ঢুকেই মহাত্মাদের সাড়া পেলাম। দোতলায় উঠে দেখি, সকলেই বারান্দায় বসে আরাম করছেন। নির্বিঘ্নে জীবিত অবস্থায় এবং অক্ষতদেহে সকলেই যে শূলপাণির ঝাড়ি অতিক্রম করে আসতে পেরেছেন, এই আনন্দে সকলেই মশগুল! মতীন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার স্নান পূজা হয়ে গেল ভাই?

মোহান্তজী বললেন—কহিয়ে বাঙ্গালীবাবা, বৈকুণ্ঠকা গান ক্যায়সা মিঠা !

রতনভারতী মন্তব্য করলেন—হম্ শোচতা হুঁ, কৈলাসশিখরে রহো শিবভবন মেঁ ঝাড়ুকাজী কোঈ কিন্নর থে ; হো সক্‌তা হৈ নারদজী ইয়া ভৃগুজীনে কোই বখত্ ইন্‌কো শরাপ দিয়ে থে, ইসীওয়াস্তে ইনোনে ফিন্ জনম্ লিয়া !

লক্ষ্মণভারতীজী টীপ্পনি কাটলেন—হাঁ হাঁ হম্ শোচতা হুঁ উস্ বখৎ তুম্ উধর বিরাজমান থে ঔর নারদজী ইয়া ভৃগুজীকা গোড়কা ঠোকর খা কর্, ইস্ মধ্যপ্রদেশ মেঁ গির গিয়া !

তাঁর কথা শুনে সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

মোহান্তজী বললেন—হাসিঠাট্টা থাক্। বুঝলে লছমন ভেইয়া, মণ্ডলেশ্বর থেকে আমাদের গদী এখানে উঠিয়ে নিয়ে এলে কেমন হয় ? তাহলে রোজই আমরা ঝাড়ুকাজীর মধুময় কণ্ঠস্বরে ঐ অলৌকিক ভজন শুনতে পেতাম !

—ভালই হয় তবে ঝাড়ুকাজী যদি এখান থেকে চলে যান, তখন কি করবেন ? আবার তল্পীতল্পা নিয়ে মণ্ডলেশ্বর ফিরে যাবেন ?

—তব ত বহুৎ ঝঞ্ঝাট হোগা। অব চলিয়ে নর্মদা ঘাটমেঁ নাহায়েগা।

তাঁরা সবাই দল বেঁধে স্নান করতে গেলেন। আমি লক্ষ্মণভারতীজীর কাছে একটি ছুরি চেয়ে নিলাম। লিড পেন্সিলের মুখটা একটু চেঁছে নিয়ে ডায়েরী লিখতে বসব। হাত্‌নী সঙ্গম পর্যন্ত সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি, পাগলী ঘাট, মাকড়খেড়া এবং হিরণ্যপাণি তথা পুষ্করিণী তীর্থ সম্বন্ধে নোট লেখা হয় নি। ঝোলা থেকে ডায়েরীটি বের করে লিখতে বসব, এমন সময় যতীন্দ্রজী আবার ফিরে এলেন—'ভুল করে ঘড়িটা সঙ্গে নিয়ে গেছলাম। ঘড়িটা আপনার কাছে রাখুন ত ভাই। গুরুজী আপনাকে জানাতে বললেন, স্নান পূজা সেরে আসতে আমাদের কিঞ্চিৎ দেরী হবে, আপনি কিছু ভাববেন না। আপনি যখন স্নান করতে গেছলেন সেই সময় পুরোহিতজী এসে তাঁর স্বগৃহে ভিক্ষাগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন।'

—এই সুসংবাদ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ ! যতীন্দ্রজী হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

আমি ডায়েরী লিখতে বসলাম। আমার এই ডায়েরী লেখা মানে সংক্ষিপ্ত নোট নেওয়া। বাণপঙ্ক সঙ্গমের কিছু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য লিখে

পাগলী ঘাটের পাগলী মায়ের সম্বন্ধে লক্ষণভারতীজীর কাছে যা শুনেছিলাম, তা লিখলাম। মাকড়খেড়াতে কালো চিতার ভয়ে কিভাবে সেই কালরাত্রি কাটিয়েছিলাম সে সম্বন্ধে কিছু লিখে চিতাবাঘের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা যা শুনেছিলাম তাও সংক্ষেপে লিখলাম। পুষ্করিণী তীর্থে সেই কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে মোহান্তজীর ভাবোন্মাদ অবস্থা, পুষ্করিণীর পাড়ে চারজন রহস্যময় সাধুর দর্শন, তাঁদের অলৌকিক গাত্রবর্ণ, তাঁদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই মুহুর্মুহু বাঘের হুঙ্কার, সকালে হিরণ্যপাণির পূজা করতে যেতেই স্বতঃই কণ্ঠে সামবেদের মন্ত্রাবির্ভাব, সহসা মন্দির মধ্যে বিদ্যুৎ ঝিলিক, এখানে আসার সময় বাঘ মহিষের লড়াই, সেই বীভৎস দৃশ্য, সর্বশেষ গতরাত্রে ঝাড়ুকাজীর কণ্ঠে 'বৈকুণ্ঠের গান', সব বিষয়েই কিছু কিছু নোট লিখে ডায়েরী লেখা বন্ধ করলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি মোটে ন'টা বেজেছে। আমি ধর্মশালার ছাদে উঠে দেখলাম, মোহান্তজীর দল সেইমাত্র স্নানাদি সেরে মন্দিরে এসে পৌঁচেছেন। ৩০ জন নাগার একে একে পূজা করে আসতে দেরী হবে। আমার কৌতূহল হল, একতলার ঘরে গিয়ে সেই পাঁচজন সাধুর সঙ্গে আলাপ করতে। ডায়েরী হাতে নিয়েই নেমে গেলাম তাঁদের ঘরে। জানালা দিয়েই দেখতে পেলাম, তাঁরা সর্বাঙ্গে ভস্মলেপন করছেন। তাঁরা সকলেই উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন। প্রত্যেকের লিঙ্গদেশ মোটা লোহার জিঞ্জির দিয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ। তাঁদেরকে গতরাত্রে ঝাড়ুকাজীর গানের আসরে কিংবা আজ সকালে নর্মদার ঘাটেও দেখেছিলাম, তাঁদের পরিধানে ছিল একখণ্ড গেরুয়া বস্ত্র। ঘরে ঢুকব, না, দোতলায় ফিরে যাব ইতস্ততঃ করছি এমন সময় তাঁদের একজন আমাকে দেখতে পেয়ে ডাক দিলেন—'আইয়ে, আইয়ে, অন্দরমেঁ আইয়ে।'

আশ্বস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলাম। প্রথমেই তাঁরা আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি জানি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সাধারণতঃ বিরোধ থাকে। যে যার সম্প্রদায়কেই চরম এবং একমাত্র খাঁটি ভেবে থাকেন। তাই প্রথমেই আমি জানালাম, 'বাবার ইচ্ছাক্রমে স্বাধীন ভাবে নর্মদা পরিক্রমা করছি। শূলপাণির ঝাড়িতে পরিক্রমার সময় পথিমধ্যে এঁদের সঙ্গে দেখা হয়। হরিধামে পৌঁছে এঁদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।' আমার কথা শুনে মনে হল তাঁরা খুশী হলেন। মন্দিরে যাঁকে 'টেরিয়া মেজাজের সাধু' বলে

মনে হয়েছিল, তিনিই আমাকে বলতে লাগলেন—'ভারোচে আমাদের বিরাট আশ্রম। আমাদের মোহান্তজীর নির্দেশে আমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে ভিক্ষা করি। ভিক্ষালব্ধ অর্থে দরিদ্র নারায়ণের সেবা হয়। এখানে আরও তিন চার দিন থেকে আমরা ভারোচে ফিরে যাব। আমরা লিঙ্গকে লোহার জিঞ্জিরে বেঁধে রাখি বলে আমাদেরকে কেউ বলে 'লোহিয়া', গাত্রে ভস্মলেপন করি বলে কেউ বলে 'খাকি', কারণ খাক শব্দের অর্থ ভস্ম। পাঁচটি বাঁক দেখিয়ে বললেন—আমাদের এই ভিক্ষাযন্ত্রের নাম 'কামধেনু।' এই কামধেনু কাঁধে নিয়ে ভিক্ষা করি বলে অনেকে আমাদেরকে বলে 'কামধেন্বী।' আমরা কোন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করি না। গুরুপরম্পরাক্রমে যেসব উপদেশ বাক্য আমাদের সম্প্রদায়ে প্রচলিত, আমরা সেইসব দোঁহা গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই, গৃহীরা নিজেরাই এসে ভিক্ষা দিয়ে যান। আমরা মা নর্মদা, শিব, সূর্য, রাম ও নারায়ণকে একই পরমেশ্বরের প্রকাশ বলে মানি, তাই পরমেশ্বর জ্ঞানে এই পাঁচ দেবতারই উপাসনা করি। তুমি ভারোচে গিয়ে আমাদের বিখ্যাত খাকি-কামধেন্বী আশ্রমে গেলে আমরা খুশী হব। আমাদের ভিক্ষাযন্ত্রগুলি ভাল করে লক্ষ্য কর।'

তাঁর কথায় ভিক্ষা যন্ত্রগুলিকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। ভিক্ষাযন্ত্র একগাছি করে বাঁক ছাড়া কিছু নয়। ভারীরা যেমন বাঁকে ভার নিয়ে যায় ঠিক সেই রকমই এই কামধেনু নামক যন্ত্রের দুই দিকে দুই গাছি শিকা আছে। প্রত্যেক শিকায় একটি করে ছোট্ট চাদারী বসানো থাকে। শিকাগুলি লাল রংএর কাপড়ের টুকরো দিয়ে জড়ানো। একদিকের শিকায় গাভী এবং অন্যদিকের শিকায় হনুমানের মূর্তি অঙ্কিত আছে দেখলাম।

আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা যখন ভস্মলেপন করছিলেন, তখন বিড়্‌বিড়্‌ করে কোন মন্ত্র আওড়াচ্ছিলেন বলে মনে হল। ভস্ম মাখায় কোন মন্ত্র আছে না কি?

—আছে বৈকি! শুধু ভস্মলেপন নয়, লিঙ্গকে জিঞ্জিরে বদ্ধ করারও সংযম-সাধনী মন্ত্র আছে। জিঞ্জির বন্ধনের মন্ত্র—

মুক্তিকো বন্ধন ধরমকো ধাগা।
লোহাকো এড়বন্দ্‌ কমরমেঁ লাগা।
গুরুকা দোহাই কামনাশ হোগা॥

আর ভস্ম মাথায় মন্ত্র হল—বরসেগা মেঁহ জমেগা, দুব্ চরেগা গৌ হগেগা, গোবর অগিণ্ মুখ জরে সূর্য মুখ তপে ওহি খাক, সন্তনকে চঢ়ে লগা, খাক্ হুয়া দিল্ পাক, অলখ নিরঞ্জন আপহি আপ্।

আস্কারা বা প্রশ্রয় পেয়ে আমার সাহস আরও বেড়ে গেল। আমি হাতজোড় করে বললাম—আমাকে দয়া করে যদি দু চারটি দোঁহা বলেন তাহলে ধন্য হই।

—আপকা পাশ ডায়েরী ত হ্যায়; আচ্ছা হমারা গুরুজীকা উপদেশ দো চারঠো লিখ লো। অপর গুরুভ্রাতাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—ক্যা ভেইয়া? ইস্‌মে কোঈ হরজা হ্যায়?

—নেহি, নেহি, ক্যা হরজা? ইয়ে ভকত্ আদমী হ্যায়। ইনকো শুনা দিজিয়ে—

১। সোই হমারা সাঁইয়া জো সবকা পূর্ণহার।
থাকি জীবন মরণকা জাকৈ হাথি বিচার॥

যিনি সকল বস্তুকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমার ঈশ্বর। জীবনমরণের বিচার তাঁরই হাতে, তাঁরই চিন্তা কর।

২। সাঁই কিয়া সব হৈ রহ্যা যো কুছ্ করৈ সো হোই।
করতা করৈ স হোতে হৈ কাহে কলপৈ কোই॥

পরমেশ্বর যা করেছেন, তাই হয়েছে। তিনি যা করবেন, তাই হবে। তিনিই তাবৎ বিদ্যমান্ পদার্থের কর্তা। তবে লোকে কেন শোক করে?

৩। সুমিরণসে প্রেমধন জাগৈ কৌন্ঁ কিয়া সব হোই।
থাকি মারগ মেহের্ কা বিরলা বুঝে কোই॥

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্মরণ করে, তারই প্রেমানন্দের উদয় হয় এবং কোন বিষয়ের চেষ্টা না করলেও তার সকল সম্পদই আপনা হতেই সম্পন্ন হয়। থাকিদের পথ মেহের্ বা দয়ার পথ। এই দয়ার পথ বুঝতে পারে, এমন লোক অতি অল্প।

৪। পূরণহারা পরখি জো চিত রহসী ঠাম।
অন্তর তৈঁ হরি উমগসী সকল নিরন্তর রাম॥

পূরণ-কর্তা পরমেশ্বর যদি তোমার হৃদয়বাসী হয়ে তোমাকে স্পর্শ করেন, তবে তোমার অন্তর হতে হরি আপনা হতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন। রাম সকল বস্তুতে নিরন্তর স্থিতি করেন।

৫। মূরখ! সো তো পাস হি হৈ নাহীঁ দূরীগবার।
সব জানত হৈ বাপুরে! দেবে কোঁ হুসিয়ার॥

ওরে মূঢ়! ঈশ্বর তোর দূরে নন, তোর নিকটেই আছেন। ওরে বাপু! তিনি সকলই জানেন এবং সযত্নে যথাযথ দান করে চলেছেন।

৬। চিন্তা করণা কুছ নহীঁ, চিন্তা জীবকো খাই।
হোনা থা সো হৈ রহ্যা, জানা হৈ সো জাই॥

চিন্তা করা কিছু নয়; চিন্তা জীবনকে শোষণ করে। যা হবার ছিল তাই হয়েছে। যা যাবার তাই যায়।

৭। জো রচিয়া সোই হোগা কাহেকো শির মেঁ লে।
সাহিত উপরি রাখিয়ে দেখি তামাসা ইয়ে॥

ঈশ্বর যা বিধান করেছেন, তাই ঘটবে। অতএব, তুমি কি জন্য নিজের মাথায় ভার গ্রহণ কর? পরমেশ্বরকে সর্বোপরি বলে জান; বসে বসে শুধু কৌতুক দেখ।

মন্দিরের দিক থেকে শিঙ্গা ডম্বরুর নাদ সহ 'হর-নর্মদে' ধ্বনি উঠতেই 'খাকিবাবা' বললেন, 'তুমহারা সাথীয়োঁ নে, আ রহা হৈ।' বেলা ১১টা বেজে গেছে। আমি তাঁদেরকে নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লাম। যিনি আমাকে উপদেশ শুনাচ্ছিলেন, তিনি বললেন—'ভারোচ মেঁ পৌঁছকর্ খাকিবাবা কো আশ্রম মেঁ জরুর যাইয়ে গা।' আমি উত্তর দিলাম 'জো রচিয়া সোই হোগা অর্থাৎ ঈশ্বর যা বিধান করেছেন, তাই ত ঘটবে!'

এইবলে দোতলায় উঠে গেলাম। দু' এক মিনিট পরেই নাগা সন্ন্যাসীর দল পৌঁছে গেলেন। মোহান্তজী বললেন, 'বাঙ্গালীবাবা, আদিত্যেশ্বর ভগবানের পূজা করে আজ বড় তৃপ্তি পেলাম। তুমি ত আমাদেরকে ছেড়ে একলাই সর্বাগ্রে পূজা করে এসেছ। ভালই করেছ। তুমি এখন আমাদের সঙ্গে থাকলে বড় আনন্দ পেতে।'

আমি সন্ত শেখা বুলি আওড়ালাম—'জো রচিয়া সোই হোগা!' অর্থাৎ ঈশ্বর যা ঘটাবেন তাই ত ঘটবে।

কিছুক্ষণ পরেই পুরোহিত মশাই এলেন সসম্ভ্রমে অতিথিদেরকে আবাহন করে স্বগৃহে নিয়ে যাবার জন্য। 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে আমরা তাঁর দ্বারদেশে উপস্থিত হলাম। ব্রাহ্মণের সহধর্মিনীসহ পাঁচ পুত্র সকলের পা ধুইয়ে দিলেন। বারবার বারণ করা সত্ত্বেও তাঁরা শুনলেন না। মন্দির হতে বোধহয় ৫০০ গজ দূরেই তাঁর দোতলা পাকাবাড়ী। প্রশস্ত প্রাঙ্গন এবং শস্যভাণ্ডার আছে দেখলাম। প্রায় ৪০টি গাভী আছে। পুরোহিত মশাইকে বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ বলেই মনে হল। বাড়ীর ভিতরের বারান্দায় মহাত্মা কমলভারতীজী এবং চৈতন্যভারতীজীর বড় তৈলচিত্র দেখলাম। পুষ্পমালো সুসজ্জিত। 'ব্রহ্মার্পনং ব্রহ্মহবি' মন্ত্রোচ্চারণ করে পুরী ডাল একটা শব্জীর তরকারী হালুয়া প্রচুর দুধ সর সহযোগে আমরা সকলেই পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করলাম। এদেশে যেকোন শাকপাতার তরকারীই হোক, মূলো শাক, সরষে শাক, হিংচা, ধনেপাতা, পলতা বা আলু-পটল সহযোগে কোন ডালনা বা ঝোলই হোক, তার সর্বজনীন্ নাম শব্জী! তা আজকে যে শব্জী খেলাম, তার মধ্যে সাদা সাদা হড়হড়ে আমাদের দেশের কচুর মত কিছু মিশানো ছিল। সেই বস্তুটা কি তা জিজ্ঞাসা করতেই পুরোহিত মশাই বললেন—'উস্‌কা নাম পেকৃচি।'

কিছুই বুঝলাম না। তিনি তখন বললেন যে পেকৃচি এক ধরণের কান্দা, মাটির নিচে হয়। তবুও দুর্বোধ্য ঠেকল। লক্ষ্মণভারতীজী বললেন—ধর্মশালায় গিয়ে তোমাকে বুঝিয়ে দিব চল। মোহান্তজীকে পুরোহিতজী প্রণাম করতে উদ্যত হতেই মোহান্তজী তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। পূর্বেই শুনেছি লক্ষ্মণভারতীসহ এই তিনজনই পরস্পরের গুরুভাই। তাঁরা পরস্পরকে কোলাকুলি করলেন, বাকী আমরা সবাই 'হর নর্মদে' বলে অভিবাদন জানিয়ে ফিরে এলাম ধর্মশালায়। সকলেই বিশ্রাম করতে লাগলেন। আমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মণভারতীজী জানালেন—'অতিথি হিসাবে গৃহস্বামী প্রদত্ত 'ভিক্ষায়' কোন সমালোচনা করতে নাই। আমি কোন সমালোচনার দৃষ্টিতেও বলছি না। তোমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য জানাচ্ছি, পেকৃচি কোন কান্দাফান্দা নয়, বনকচু! অতি অখাদ্য বস্তু।

আমি স্পর্শও করি নি। দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে যারা বাস করে, সেই ভীল, ওয়াফি, হো প্রভৃতি জাতির গরীব লোকরাই বাধ্য হয়ে বনকচু খায়। ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসীদের ভাণ্ডারার পরিপাটি ব্যবস্থাই করেছিলেন, ঐ জাতীয় সব্জী না বানালেই পারতেন।' আমাদের কথা শেষ হতে না হতেই মোহান্তজী বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন—ঝাড়ুকাজী আজ সামকা বখৎ আয়েগা ত ? উন্‌কা 'বৈকুণ্ঠ কী গানা' কি লিয়ে মেরা দিল তড়পাতা হৈ।

—এই নিয়ে আপনি তিনবার ঝাড়ুকার তালাশ করলেন। পুরোহিত ভেইয়াকেও দুবার জিজ্ঞাসা করেছেন। তাঁর কাছে ত শুনে এলেন ঝাড়ুকাজীর আসা না আসা তাঁর মর্জি! আসতে পারেন, নাও আসতে পারেন! এলে তাঁর গান আর একবার শুনব, না এলে শোনা হবে না। পরিক্রমাবাসীর কাছে পরিক্রমাটাই মুখ্য। এখন আমরা ঘুমাব ; পাঁচটার আগে উঠছি না। আপনার ইচ্ছা হলে আপনি মন্দিরে গিয়ে ঝাড়ুকাজীর পথের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে বসে থাকুন।

জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার ধমক খেয়ে মোহান্তজী শুক্‌নো মুখে গিয়ে বসলেন নিজের আসনে। সবাই অল্পবিস্তর আমরা ঘুমিয়ে নিলাম, কিন্তু মোহান্তজী ঠায় বসে রইলেন। বিকেল ৫টা বাজতে না বাজতেই মোহান্তজী লক্ষ্মণভারতীজীকে কাতর মিনতি জানালেন—'অব চলিয়ে মন্দরমেঁ।'

—নেহি জী! ঝাড়ুকাজী সামকা বখৎ আয়েঙ্গে! নেহি আনেসে আচ্ছাই হোগা! এইবলে তিনি আমাদের দিকে চোখ টিপলেন। ঠোঁটে চোরা হাসি! তাঁর কথা শুনে মোহান্তজী চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন।

লক্ষ্মণভারতীজী মুখে ঐ রকম কথা বললেন বটে কিন্তু মুখ হাত ধুয়ে তক্ষুনি তিনি মন্দিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। উভয় গুরুভ্রাতার এই রাগ অনুরাগের পালা আমার খুবই ভাল লাগল।

লক্ষ্মণভারতীজী প্রস্তুত হয়ে বললেন—উঠিয়ে জী, আপ্‌কো আশিক্ কা পাশ লে চল্‌তা হুঁ। মোহান্তজী লাফিয়ে উঠে তাঁর লছমন ভেইয়াকে জড়িয়ে ধরলেন।

আমরা মন্দিরে যখন পৌঁছলাম, তখন মতীন্দ্রের ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। গিয়ে দেখি, মন্দিরের চত্বর ভরে গেছে। গান শুনার আগ্রহে সকলেই এসে ঝাড়ুকাজীর আগমনের প্রতীক্ষা করছেন। গত-

রাত্রে যিনি মীরাবাঈ-এর পুণ্য জীবনচরিত জানতে চেয়েছিলেন তিনিও এসে বসে আছেন। সন্ধ্যা ৬টা বাজতেই ঘুঙুরের ধ্বনি শোনা গেল। ঝাড়ুকাজী আসছেন, আসছেন সদাবর্তের পাশ দিয়ে। তাঁর পিছনেও দেখছি, তাঁকে অনুসরণ করে করজোড়ে আসছেন দশ বার জন ভক্ত।

তিনি গুন্‌গুন্ করে গাইতে গাইতে আসছেন,

মীরা কে প্রভু গহীর গম্ভীরা, হৃদয় রহেঁ জী ধীরা।
আধী রাত প্রভু দরশন দীন্‌হে প্রেম নদী-কী তীরা॥

অর্থাৎ মীরার প্রভু গভীর গম্ভীর, বড় গহন সেই রহস্য! হৃদয় ধৈর্য ধরে থাকো, অর্ধরাত্রে প্রেম-নদীর তীরে প্রভু তোমাকে দর্শন দিবেন।……

তাঁকে দেখা মাত্রই সকলেই শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াবার উদ্যোগ করতেই পুরোহিতজী, বললেন—'এ্যায়সা মৎ করনা। ইয়ে উন্‌কা বিলকুল বেপসন্দ। চুপচাপ বৈঠা রহিয়ে।'

ঝাড়ুকাজী কারও দিকে না তাকিয়ে মিনিট দুই ভগবান আদিত্যেশ্বরজীকে বিহ্বল দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন, পরে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। প্রণাম করে উঠেই তিনি বীরাসনে বসেই সেই বৃদ্ধামায়ীর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—'গতকাল শুনিয়েছি যে পরম বৈষ্ণবী মীরাবাঈ জন্মেছিলেন মেড়্‌তার কাছে কুড়্‌কি গ্রামে। তিনি জন্মেছিলেন বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে। সূর্য তখন মেষরাশিতে, তুঙ্গী। তাই সূর্যের নামানুসারে তাঁর নাম রাখা হয় 'মিহিরা', মিহিরা থেকেই অপভ্রংশে মীরা। মীরাবাঈ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন দিল্লীতে লোদী সাম্রাজ্য অস্তোন্মুখ। ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে হারিয়ে বাবর বসেছেন দিল্লীর সিংহাসনে। ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে মোগলের সেই প্রথম পদসঞ্চার। মহারাণা সংগ্রামসিংহ তখন স্বপ্ন দেখছেন ভারতে পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার। তাঁর স্বপ্ন যদি সফল হত, তাহলে মহারাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র মীরার স্বামী কুমার ভোজরাজ বসতে পারতেন ভারতের সিংহাসনে আর আমার উপাস্যা দেবী মীরাবাঈজী হতে পারতেন ভারতের পট্টমহিষী।

মহারাণা সংগ্রামসিংহের মাতাঠাকুরাণী রতনকুমারী ঝালা একবার

কাশী গিয়েছিলেন। সেখানেই মহাযোগী রৈদাস বা রুইদাসজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি রুইদাসজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর কাছে অপূর্ব কারুকার্য বিশিষ্ট গিরিধারীর একটি বিগ্রহ ছিল। তিনি সেটি গুরুদেবকে সমর্পণ করেন। রুইদাসজীর বয়স তখন ১০০, সেইসময় তিনি একবার রাঠোর সর্দার রত্নসিংহের গৃহে অতিথি হন। মীরাবাঈ তখন শিশু, বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। গিরিধারীজীর সুন্দর মূর্তিটি দেখে বাচ্চা মেয়ে আবদার করেন সেই মূর্তিটি পাবার জন্য। রুইদাসজী প্রথমে সেটি দিতে চান নি। কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতেই রুইদাসজী গভীর রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে শুনতে থাকেন মীরার কণ্ঠস্বর, তাঁর আর্তি ; তিনি অনুভব করেন গিরিধারীজীও যেন মীরার কাছেই থাকতে চান। মহাযোগী অগত্যা সেই গিরীধারীলালের বিগ্রহ মীরার হাতেই সমর্পণ করে আসেন।

অনেক বই-এ মীরাকে রাণা কুম্ভের পত্নী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি মারাত্মক ভুল তথ্য। তেমনি বৃন্দাবনে তাঁর শেষ জীবনের কাহিনীও গালগল্প, বিলকুল ঝুট্। মীরা ছিলেন বাবর ও গুরুনানকের সমসাময়িক। তরুণ আকবরের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয়, তখন তিনি ১০০ বৎসরের বৃদ্ধা ! দেখা হয়েছিল চিতোরে নয় ; সমস্ত তীর্থ পরিক্রমান্তে মীরা তখন পরিচয় গোপন করে বাস করছিলেন বন্ধোগড়ের বাঘেলা রাজা রামচন্দ্রের রাজপ্রাসাদে।

সেই শিশুকালে গিরিধারীলালকে পাবার পর থেকে তিনিই হয়ে উঠেন মীরাবাঈ-এর ধ্যানজ্ঞান। গিরিধারীলালের সেবা পূজা করতে করতেই তার কণ্ঠে স্বতঃই উৎসারিত হতে থাকে বিচিত্র সব গান ও গানের ভাষা। সংগীত জগতে তাঁর অভিনব সৃষ্টি মল্লার। তীব্র সুরার মত একটা মাদকতায় এই ভক্তি রসাশ্রিত গান মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। শুধু আত্মনিবেদন নয়, প্রীতম্ প্রিয়তমের উপর জোর-খাটানো আবদার তাঁর গানের ছত্রে ছত্রে—মায়ীরী, মায়িরী, মায় ভো গোবিন্দ লীনো মোল, মাগো ! আমি ত গোবিন্দকে একেবারে কিনে নিয়েছি। বলেই উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে গাইতে লাগলেন—

অঁসুয়ন জল সীঁচি সীঁচি
প্রেম বেলি বোঈ।

অব তো বেলি ফ্যায়ল গঈ
আনন্দ ফল হোঈ ॥

অর্থাৎ মীরাদেবী তাঁর গোবিন্দকে বলছেন—চোখের জলে সিঞ্চন করে বুনে দিয়েছি প্রেম ভালবাসার লতা। এখন ত সেই লতায় ফুল ফুটেছে, জন্মেছে সেথায় আনন্দ ফল!

ঝাড়ুকাজীর কণ্ঠ দিয়ে উৎসারিত হচ্ছে সেই সুধামাখা 'বৈকুণ্ঠের গান', সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছি, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে একটা সুখাবেশ সঞ্চারিত হয়ে গেল।

তিনি গেয়ে চলেছেন—

বিরহিনী বৈঠী জাগুঁ
জগৎ শোয়রে আনি,
তারা গিন্ গিন্ রৈন বিহানী ॥
হারে মেরা জনমমরণকে সাথী
রাজা মেরে রাজা!
থানেঁ নহীঁ বিসরু দিন রাতি।
হে-রী মাঁয়ত দরদ দিওয়ানী
মেরে দরদ ন জানেঁ কোয়।
মীরা দাসী জনম জনম কী
পড়ি তুম্হারে পায় ॥

মীরা প্রাণ ঢেলে তাঁর অন্তর বেদনা ব্যক্ত করছেন গিরিধারীলালের চরণকমলে—'সারা জগৎ ঘুমিয়ে আছে, একা আমি জেগে বসে আছি বিরহিনী। আকাশের তারা গুনে গুনে আমার সময় কাটছে। ওগো আমার জীবন-মরণের সাথী! মধু! আমার মধু! দিনে রাতে বারেকের জন্যও তোমাকে ভুলতে পারছি না। ওরে, আমি যে ভালবাসার বেদনায় বিবাগী, আমার ব্যথা ত কেউ বুঝে না!'

সুরের ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে ঝিম্ মেরে বসে আছি সবাই। হঠাৎ দেখলাম, মন্দিরের গর্ভগৃহ হতে বেরিয়ে এসে দুটি কালো সাপ ঝাড়ুকাজীর

কাছ হতে তুতিন ফুট দূরেই ফণা বিস্তার করে দুলছে। এখন সকলের যা বিগলিত তন্ময় অবস্থা দেখছি, তাতে ঐ দুটো বিষধর সাপ যদি তেড়ে এসে দংশন করে, কারও দৌড়ে পালানোর ক্ষমতা নাই। ঝাড়ুকাজীর অবিরাম অশ্রুধারা এবং স্বতোৎসারিত সুরের লহরীতে কোন ছেদ পড়ল না, যতিভঙ্গ হল না। তিনি পূর্ববৎ ভাবঢুলুঢুলু নেত্রে তান ধরলেন—

সখী, মেরো নীঁদ নসানী হো।
পিয়কো পন্থ্ নিহারত সিগরী
রৈণ বিহানী হো।
জ্যুঁ চাতক ঘন কুঁরটে,
মছরী জিমি পানী হো,
মীরা ব্যাকুল বিরহিনী
সুধ বুধ বিসরানী হো।
সখী মেরো নীঁদ নসানী হো……

মীরার আর্তি আমাদের সকলেরই বুকে এসে বিঁধছে, তার চোখের জল আমাদের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে গড়িয়ে পড়ছে। আর চোখ খুলে রাখতে পারলাম না। আবেশে ঢলে পড়লাম সবাই। মগ্নচৈতন্যের স্তরে নেমে এসেছে জ্যোতির প্লাবন……

যখন চেতনা ফিরে এল, তখন দেখলাম ঝাড়ুকাজী চলে গেছেন। সাপ দুটোও নাই। সবাই টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। ভগবান আদিত্যেশ্বরকে প্রণাম করতে গিয়ে সকলেই কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে পড়ে রইলাম। প্রত্যেকে প্রত্যেককে ধরে জড়াজড়ি করে কোনমতে ফিরে এলাম ধর্মশালায়, কারও মুখে কথা নাই। কেবলই কানে বাজছে অপরূপ সুরের মূর্ছনা—'সখী মেরো নীঁদ নসানী হো'……মীরা যেন কানে কানে বলছেন—'ও সখী, আমার চোখ থেকে ঘুম চলে গেছে। সারা সময় কেটে যাচ্ছে প্রিয়তমের পথ চেয়ে। যেমন মেঘের প্রত্যাশায় থাকে চাতক আর মাছ পড়ে থাকতে চায় জলে… … তেমন ভাবেই ব্যাকুল বিরহিনী হয়ে আছে মীরা, তার সব হুঁস চলে গেছে……ও সখী! আমার চোখ থেকে ঘুম চলে গেছে—সখী মেরো নীঁদ্ নসানী হো……।

হাপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সেই বটতলায় করপাত্রীজী একসঙ্গে আমাদের ৩০ জনকে এক অলৌকিক আনন্দের জগতে টেনে নিয়ে গেছলেন, আর এখানে ঝাড়ুকাজী যে তাঁর গানের সুরে প্রায় একশ জনকে একসঙ্গে ডুবিয়ে দিলেন আনন্দের সমুদ্রে! ঋষির কথা কত আক্ষরিক অর্থে সত্য, তা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম—

যোগানাং যোগ শাস্ত্রাণাং সারং আকৃষ্য পদ্মভূঃ।
ইদন্তং সর্বযোগসারং সঙ্গীতাখ্যং অকল্পয়ৎ॥

সমস্ত যোগ ও যোগের সার নিয়ে স্বয়ং পদ্মযোনি ব্রহ্মা সর্বযোগের সার এই ...ত' নামক মহাযোগ সৃষ্টি করেছেন।

ঝাড়ুকাজী চলে গেলেন। তাঁর গানের প্রভাব কিছুক্ষণ আবিষ্ট করে রাখল; তারপর সেই ভাবাচ্ছন্ন অবস্থা ধীরে ধীরে কাটল। আমরা কালকের মতই পরস্পরের হাত ধরে ধর্মশালায় পৌঁছে শুয়ে পড়লাম। আজ একঘুমে সকাল। বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢাকা পড়েছে। গাছপালায় টপটপ করে শিশির পড়ছে। হিসাব করে দেখলাম, কোজাগরী পূর্ণিমা কেটেছিল হিরণ্যপাণির মন্দিরে সেদিন ছিল মঙ্গলবার। বুধ ও বৃহস্পতি দুদিন কাটল এখানে। আজ ১৩৬১ সালের ২২শে আশ্বিন, শুক্রবার। আশ্বিন মাস আর দুদিন পরেই শেষ হয়ে যাবে। গায়ে অল্প অল্প শীতের স্পর্শ অনুভব করছি। লক্ষ্মণভারতীজী সবাইকে তাড়া দিচ্ছেন, এখনই যাত্রা করতে হবে। অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সবাই যে যার গাঁঠরী গুছিয়ে দোতলা থেকে নেমে সেই ঘোর কুয়াশার মধ্যেই আদিত্যেশ্বর মন্দিরে এসে জড়ো হলাম। মোহান্তজী তাঁর লছমন ভেইয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁদের গুরুভ্রাতা পুরোহিতজীর কাছে বিদায় নিতে। এই সুযোগে আমরা প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদার ঘাটে নামলাম মা-নর্মদাকে স্পর্শ করতে। আমরা কয়েকজন স্নানও করে নিলাম। অনেকেই স্নান করলেন না। মোহান্তজী ফিরে আসতেই লক্ষ্মণভারতীজী 'হর নর্মদে' ধ্বনি তুলে সকলকে সঙ্গে নিয়ে যথারীতি মন্দির পরিক্রমা করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করলেন ভগবান আদিত্যেশ্বর এবং তাঁর 'নীরাকারা' পুত্রী মা নর্মদার চরণে।